কাজী নজরুল

বাংলা একাডেমী : বর্ধমান হাউস : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
বা/এ ১৫

পাণ্ডুলিপি ঃ ফোকলোর উপ-বিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক,
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা।

মুদ্রাকর
রেক্স রোটারী সার্ভিস
১২৫, পশ্চিম রামপুরা
ঢাকা।

প্রচ্ছদ ঃ কাজী হাসান হাবিব

বিদ্রোহী শিল্পী

শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

ও

বিদ্রোহী কবি

কাজী নজরুল ইসলামের

করকমলে—

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

প্রণাম

নজরুল একটি নাম
জপি অবিরাম
জানাই প্রণাম ॥
নিপীড়িত-জনগণ
দেবে তাঁর দাম ।

নিবেদন

দীর্ঘকাল বিদ্রোহী কবির সাহচর্য লাভ কবায় তাঁর মর্মরূপের সন্ধানটি পেয়েছিলাম। উদাব আকাশের মত সুদূর বিস্তাবী হৃদয়ের পরিচয় পেতেও আমাব কষ্ট হয়নি। কিন্তু বিস্মৃত হওয়াই আমাদের স্বভাবের বীতি হয়ে দাঁড়িযেছে। এ কাবণেই আজ পর্যন্ত সাহিত্যেব আসরে নজরুল সম্পর্কে কোন আলোচনাই যথাযথ ভাবে হয়নি। এ কথা স্মরণ কবেই তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখবাব বাসনা অনেক দিন থেকেই পোষণ করে এসেছি, কিন্তু স্বল্প ক্ষমতা নিয়ে বৃহতের কথা বলতে যাওযা ছোট মুখে বড কথা বলার শামিল বলে এতকাল সাহস পাইনি, তবে পূজনীয় শিশু সাহিত্যিক ৺দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় ও সুসাহিত্যিক বন্ধুবব শ্রীযুক্ত শুভেন্দু ঘোষ মহাশয় নজরুলেব উপর কিছু লিখবার জন্য অনেক দিন থেকেই চাপ দিচ্ছিলেন। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপরিতোষ চট্টোপাধ্যায় এ বিষযে আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত কবেছেন।

এরপর হুগলীব পিপুলপাতি "নবারুণ সংঘ" নজরুল সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখতে বলায় আমি "হুগলীতে নজরুল" প্রবন্ধটি লিখি। পরে তা দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

নজরুল বন্ধু শ্রদ্ধেয় কবি সুবোধ রায় অনেক তথ্যাদির নির্দেশ দিয়েছেন ও ভুলত্রুটির সংশোধন করেছেন। চুঁচুড়ার সাহিত্য পরিষদের সভ্যবৃন্দ বিশেষতঃ কবি শ্রীমান সরিৎ শর্মা ও কবি শ্রীমান প্রণব মিত্র গ্রন্থাদি সরবরাহ করে ও পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ দেখে দিয়ে কবি নজরুলের প্রতি তাঁদের ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় আমার পক্ষে সমগ্র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। সমগ্র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান শক্তিরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় ও চুঁচুড়া কিশোর সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীমান রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী। এদের সাহায্য না পেলে এ গ্রন্থ কোনদিন মুদ্রাযন্ত্রের মুখ দেখত কিনা সন্দেহ।

এরপর উল্লেখযোগ্য হল "দেবদত্ত এণ্ড কোম্পানির" স্বত্বাধিকারী শ্রীমান অনিলকুমার দেবমহাশয়ের কথা। "কাজী নজরুল" প্রকাশ করে আমাকে ও

দেশবাসীকে আনন্দ পরিবেশনের ভার নিয়ে তিনি বিদ্রোহী বাংলার ধন্যবাদের পাত্র হলেন।

এই প্রসঙ্গে ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দার, শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না সিংহরায় ও শ্রীব্রজবিহারী বর্মণের ঋণ স্বীকার্য। "ক্রান্তি" পত্রিকায়ও একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত বর্মণ আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

গ্রন্থ প্রকাশিত হল। প্রয়োজন বোধে তাকে সংশোধিত করার ভার দেশবাসীর উপর। জাতীয় জাগরণের বাহক ধূমকেতু অনুসন্ধান করেও পাইনি। নজরুলের বহু চিঠি নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। এ সবের হদিস দিয়ে যদি কেউ আরও ভাল নজরুল জীবনী রচনায় সাহায্য করেন, তবে তাঁরা আমার ও দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদের পাত্র হবেন সন্দেহ নাই।

দুটি কথা

১৯২১ সালের কথা। তখন গান্ধীর অহিংস আন্দোলন, অনুশীলন, যুগান্তর দলের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন চলেছিল সমান্তরাল গতিতে। মনে পড়ে, ১৯২২ সালে বিজলী পত্রিকায় "বিদ্রোহী" কবিতা পড়ে আমরা নূতন মনোবলে বলীয়ান হয়ে কবির কলকাতার আস্তানা ৩২নং কলেজ স্কোয়ারে দল বেঁধে তাঁর সঙ্গলাভ করতে গিয়ে অজস্র রবীন্দ্র-সঙ্গীত, তাঁর লেখা বৈপ্লবিক সঙ্গীত ও উদাত্ত আবৃত্তি, প্রাণখোলা অট্টহাস্য, দাবনা ঠুকে মতামত প্রকাশ করা, মাঝে মাঝেই "দে গরুর গা ধুইয়ে" বলে উল্লাসে ফেটে পড়ার প্রাণপ্রাচুর্যতার স্পর্শ পেয়েছি। এমন শক্তিমান উদার মানুষের সঙ্গে সেই যুগে লাভ করেছিলাম বলেই আজ বাহাত্তরোর্ধ্বেও সেই শক্তি প্রচণ্ড সাড়া, প্রচণ্ড নাড়া অনুভব করে বুড়ো হয়েও জোয়ান হয়ে আছি।

আজ সেই কবি, পশ্চিমবঙ্গের চুরুলিয়া গ্রামের সন্তান নজরুল, পূর্ববাংলার— "বাংলা দেশের" ঢাকার মাটিতে চিরনিদ্রায় সমাধিস্থ হলেন, আর তার বহুপূর্বেই তাঁর জীবনসঙ্গিনী স্ত্রী পূর্ববঙ্গের কুমিল্লার সন্তান প্রমীলা দেবী পশ্চিমবঙ্গের চুরুলিয়ার মাটিতে চিরনিদ্রায় শায়িত। দুই বাংলার বাঙালী কবি নজরুল যেন সেতুবন্ধ হলেন স্বামী স্ত্রী দু'জনে দুই বাংলায় সমাধিলাভ করে।

তাঁর স্মৃতিকথা কি দুটো কথায় শেষ করা যায়! ১৯২১ সাল থেকে '৩০ সাল পর্যন্ত তাঁর যে সংগ্রামী জীবন, সেই জীবনের সঙ্গে সাথী হয়ে কাটানোর সৌভাগ্য হয়েছিল। এই দশ বছর ও তারপর '৪২ সাল যে পর্যন্ত তাঁর চেতনা ছিল সাকুল্যে এই বাইশ বছরের স্মৃতি সমুদ্র-কল্লোলের উত্তাল তরঙ্গ তুলে আমাকে বিহ্বল করে দেয়। নজরুলের জীবন তো শুধু তাঁকে নিয়ে নয়; দেশের সামগ্রিক সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম, গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত জীবন। নজরুল যেন একটা গ্লোব। গ্লোব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে যেমন এক স্থান থেকে আর এক স্থান দেখতে দেখতে সমগ্রটাই দেখা যায়, না ঘোরালে একই স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ থেকে সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়। নজরুল-জীবনও গ্লোবের মত নানা দিক থেকে দেখলে তবে দেখা সার্থক হয়।

নজরুল জীবনী পড়লে, গোঁড়াদের গোঁড়ামি নাশ হয়; নিপীড়িত মানুষ

বুকে জড়িয়ে ধরার প্রেরণা আসে, গ্রামে ও কারখানার বস্তিতে যাবার প্রেরণা পাওয়া যায়, ধর্মধ্বজিদের ভাঁওতা থেকে মুক্ত হওয়া যায়; তেমনি বিশ্ব-দরদী রূপে জীবন রূপান্তরিত হয়।

এই প্রথম খণ্ডের পর দ্বিতীয় খণ্ডে আরো অনেক তথ্যমূলক কথা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। তাঁর ৪৩ বছর জীবনে এত জীবনবৈচিত্র্য খুব অল্পই দেখা যায়।

নজরুল স্মৃতি ভাবতে গিয়ে এটাই মনে হচ্ছে তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি যে প্রজ্বলন্তবাণী নিপীড়িত, শোষিত মানুষের জীবনের মান উচ্চ পর্যায়ে তুলে ধরার প্রেরণা দিলেন তার জন্য তিনি বিশ্বের শোষিত, নির্যাতীত, পতিত মানুষের মধ্যে অমর হয়ে থেকে বিদ্যুৎ-সঞ্চারিত প্রেরণা দেবেন। তার কথাতেই বলি:

যে গেল সে নিজেরে নিঃশেষ করি
তোদের পাত্র দিয়া গেল ভরি
ঐ বন্ধ মৃত্যু পারেনিক তারে পারেনি করিতে লয়
তাই সবার মাঝারে আপনা বিলায়ে সে আজি শান্তিময়।

তাঁর ত্যাগ, তাঁর সংগ্রামময় জীবন, জীবন-যজ্ঞাগ্নির স্ফুলিঙ্গ মানবমাত্রকেই উজ্জীবিত করবে যুগে যুগান্তরে।

"পথচারী"

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

কে জানে কোথায় চলিয়াছি ভাই মুসাফির পথচারী,
দু'ধারে দু'কূল দুঃখ-সুখের—মাঝে আমি স্রোত-বারি!
আপনার বেগে আপনি ছুটেছি জন্ম শিখর হ'তে
বিরাম বিহীন রাত্রি ও দিন পথ হ'তে আন্ পথে।
নিজ বাস হ'ল চির-পরবাস, জন্মের ক্ষণপরে
বাহিরিনু পথে গিরি পর্বতে—ফিরি নাই আর ঘরে।
পলাতকা শিশু জন্মিয়াছিনু গিরি-কন্যার কোলে,
বুকে না ধরিতে চকিতে ত্বরিতে আসিলাম ছুটে চ'লে।

জননীরে ভুলি' যে পথে পলায় মৃগ-শিশু বাঁশী শুনি'
যে পথে পলায় শশকেরা শুনি' ঝর্ণার ঝুনঝুনি,
পাখী উড়ে' যায় ফেলিয়া কুলায় সীমাহীন নভোপানে,
সাগর ছাড়িয়া মেঘের শিশুরা পলায় আকাশ-যানে,—
সেই পথ ধরি' পলাইনু আমি! সেই হ'তে ছুটে চলি
গিরি দরী মাঠ পল্লীর বাট সোজা বাঁকা শত গলি।

—কোন্ গ্রহ হ'তে ছিঁড়ি'।

উল্কার মত ছুটেছি বাহিয়া সৌর-লোকের সিঁড়ি!
আমি ছুটে যাই জানিনা কোথায়, ওরা মোর দুই তীরে
রচে নীড়, ভাবে উহাদেরি তরে এসেছি পাহাড় চিরে।
উহাদের বধূ কলস ভরিয়া নিয়ে যায় মোর বারি,
আমার গহনে গাহন করিয়া বলে সন্তাপ-হারী!
উহারা দেখিল কেবলি আমার সলিলের শীতলতা,
দেখে নাই—জ্বলে কত চিতাগ্নি মোর কূলে কূলে কোথা!

হায় কত হতভাগী—
আমিই কি জানি—মরিল ডুবিয়া আমার পরশ মাগি'!
বাজিয়াছে মোর তটে তটে জানি ঘটে-ঘটে কিঙ্কিনী,
জল-তরঙ্গে বেজেছে বধূর মধুর রিনিকি ঝিনি।
বাজায়েছে বেণু রাখাল-বালক তীর-তরুতলে বসি',
আমার সলিলে হেরিয়াছে মুখ দূর আকাশের শশী।

জানি সব জানি, ওরা ডাকে মোরে দু'তীরে বিছায়ে স্নেহ,
দীঘি হ'তে ডাকে পদ্মমুখীরা, 'থির হও বাঁধি' গেহ!'

আমি বয়ে যাই—বয়ে যাই আমি কুলুকুলু কুলুকুলু,
শুনিনা-কোথায় মোরই তীরে হায় পুরনারী দেয় উলু।
সদাগর-জাদী মণি-মাণিক্যে বোঝাই করিয়া তরী
ভাসে মোর জলে—"ছল ছল" ব'লে আমি দূরে যাই সরি'!
আঁকড়িয়া ধরে' দু'তীর বৃথাই জড়ায়ে তন্তুলতা,
ওরা দেখে নাই আবর্ত্ত মোর, মোর অন্তর ব্যথা।

লুকাইয়া আসে গোপনে নিশীথে কূলে মোর অভাগিনী,
আমি বলি চল্ ছল্ ছল্ ছল্ ওরে বধূ তোরে চিনি!
কূল ছেড়ে আয়রে অভিসারিকা, মরণ-অকূলে ভাসি!
মোর তীরে-তীরে আজো খুঁজে' ফিরে তোরে ঘর ছাড়া বাঁশী।
সে পড়ে ঝাঁপায়ে জলে,
আমি পথে ধাই—সে কবে হারায় স্মৃতির বালুকা-তলে।

জানিনাক হায় চলেছি কোথায় অজানা আকর্ষণে,
চলেছি যতই তত সে অথই বাড়ে জল ক্ষণে ক্ষণে।
সম্মুখ-টানে ধাই অবিরাম, নাই নাই অবসর,
ছুঁইতে হারাই—এই আছে নাই—এই ঘর এই পর!
ওরে চল্ চল্ ছল্ ছল্ ছল্ কি হবে ফিরায়ে আঁখি?
তোরি তীরে ডাকে চক্রবাকেরে তোরি যে চক্রবাকী।

ওরা সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে' যায় কূলের কুলায় বাসী,
আঁচল ভরিয়া কুড়ায়ে আমার কাদায় ছিটানো হাসি!
ওরা চ'লে যায়, আমি জাগি হায় লয়ে চিতাগ্নি শব,
ব্যথা—আবর্ত্ত মোচড় খাইয়া বুকে করে কলরব!

ওরে বেনোজল, ছল্ ছল্ ছল্ ছুটে' চল্ ছুটে' চল্!
হেথা কাদাজল পঙ্কিল তোরে করিতেছে অবিরল।
কোথা পাবি হেথা লোনা আঁখিজল, চল্ চল্ পথচারী!
করে প্রতীক্ষা তোর তরে লোনা সাত-সমুদ্র-বারি!

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট



বাল্য কথা

বিদ্রোহী কবি নজরুলের জীবনকে বুঝতে হলে তাঁর বাল্য জীবনের দিকে নজর দিতে হবে। কারণ ঐ বাল্য জীবনেব মধ্যেই রয়েছে নজরুল-জীবনের বীজ। এই বীজ পরবর্তীকালে যে মহাবৃক্ষের সৃষ্টি করেছিল তার একমাত্র কারণ সুরসাল মহৎ মৃত্তিকা যে তাঁর জন্মভূমি, কবির পিতৃবংশের ধাবাবাহিক কাব্য সাধনার এবং নানা সদ্‌গুণের পরিচয়। কবির পূর্বপুরুষগণ পাটনায বাস কবতেন; সম্রাট শাহ্‌ আলমের সময় চুরুলিয়ায় এসে বসবাস আরম্ভ কবেন। তাঁরা বাদশার সরকারে চাকুরি করতেন। তাঁদের সামন্ত-তান্ত্রিক আভিজাত্য ছিল। সম্রাট শাহ্‌ আলম তাঁদের লাখেরাজ সম্পত্তি দেন। তারপব কাজী পবিবার চুরুলিয়ায় এসে বাস করেন।

বর্ধমান জেলার আসানসোল কয়লাশিল্পেব জন্য বিখ্যাত। এই আসানসোলের মধ্যে চুরুলিয়া গ্রামে কবি নজরুল ১৩০৬ সালে ১১ই জ্যৈষ্ঠ জন্মলাভ করেন। চুরুলিয়ার উত্তরে অজয় নদী তির তির করে বয়ে চলেছে, বালু-বেলা দিগ্‌দিগন্তে রয়েছে মেলা। শরৎকালে কাশ গাছে কাশফুলে হেসে উঠত উষর ভূমি। তার কিছু দূবে পঞ্চপাণ্ডবেব অজ্ঞাত বাসের চিহ্ন পঞ্চপাণ্ডবেশ্বর শিবের পাঁচটি দেউল। পরপারে বীরভূম—কবি জয়দেবের জন্ম ও লীলাভূমি বাংলার পরমতীর্থ কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি গ্রাম। তার কিছু দূরে চণ্ডীদাসের পদরজ নিয়ে নান্নুর গ্রাম "সবার উপরে মানুষ সত্য" এই মহাবাণীর প্রেমের আলোক বর্তিকা তুলি ধরে রয়েছে। দক্ষিণে কয়লা খণির কারখানা আসানসোল, রাণীগঞ্জ। পশ্চিমে দামোদরের বাঁধ 'মাইথন'। এরই কিছু দূরে 'কল্যাণেশ্বরীর' মন্দির। 'মাইথন' নামটা মায়ের মন্দিরের 'মায়ের থান' নামের থেকেই হয়েছে।

নজরুলের মায়ের নাম জাহেদা খাতুন। পিতার নাম ফকীর আহম্মদ। কবি নজরুল বাল্যকালেই পিতৃহীন হন, মাতার পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে এন্তেকাল হয়, অর্থাৎ তিনি স্বর্গলাভ করেন। ফকীর আহম্মদ সাহেবের সাত ছেলে ও দুই মেয়ে। শিশুকালেই চার ছেলে মারা যায়। দুই ভগ্নী সাজেদনুন্নেসা ও উম্মেকুলসুম্। নজরুল ছাড়া সকলেই এন্তেকাল করেছেন। পূর্বে নজরুল ইসলাম, সাহেবের এক ভাই চুরুলিয়াতে গুণ্ডাদের হাতে মারা যান।

ফকীর আহম্মদ সাহেব সুপুরুষ ও স্বাস্থ্যবান ছিলেন। পারসী ও বাংলা কাব্যে তাঁর গভীর রুচি ছিল। তাঁর এন্তেকাল হয় ১৩১৪ সালের ৭ই চৈত্র। আর কবির মাতা পরলোক গমন করেন ১৩৩৫ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ। ফকীর

আহম্মদের মৃত্যুর পর চুরুলিয়ায় কাজী পরিবার অশেষ অভাব ও দুঃখের মধ্যে পড়েন। অনেক কষ্টে তাঁদের দিন গুজরান হত। তাই কবিকে বাল্যকাল থেকেই দারিদ্র্যের সঙ্গে নিদারুণ লড়াই করতে হয়েছে। লড়াইয়ের এখনও অবসান হয়নি।

কবির ছেলেবেলার নাম ছিল দুখুমিয়া। কেউ কেউ "তারাক্ষেপা" বলেও ডাকত। দুখুমিয়া ছেলেবেলা থেকেই পরের দুঃখে ব্যথা বোধ করতেন। নানা ধর্মের নানা আচরণ করে কোন ধর্ম ভাল তাই পরীক্ষা করে দেখতেন। বোধ হয় এই জন্যই তাঁকে "তারাক্ষেপা" বলে ডাকত। কবি প্রাণসম্পদে ভরপুর ছিলেন। তাই তাঁর স্বভাব ছিল চঞ্চল। কোন অব্যক্ত চাঞ্চল্যে জীবনব্যাপী কি মহৎ প্রাণকে যে খুঁজছিলেন তা কেউ বুঝল না। যখন যে খেয়াল হত সেই খেয়ালের শেষ দেখা ছিল তাঁর স্বভাব। এই স্বভাব তাঁর ছেলেবেলাতেও ছিল। "দুখুমিয়া" বা "তারাক্ষেপা"—এই স্বভাবের বেগেই পরবর্তীকালে বিদ্রোহী কবিরূপে গণ-জাগরণের নকীবরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই নজরুলের একটা ধর্মোন্মাদনা ছিল। এই উন্মাদনার বশে তিনি কখনও হিন্দু কখনও মুসলমান ধর্মের মহান ভাবকে নানা রকম কঠোর আচরণের মাধ্যমে লাভ করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের বাড়ির পূর্বদিকে রাজা নরোত্তম সিংহের গড়, আর দক্ষিণে রয়েছে পীর পুকুর। এই পীর পুকুর সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে যে হাজী পালোয়ান নামক একজন শক্তিমান ফকীর এ দীঘিটি প্রতিষ্ঠা করেন, তাই তাঁর নামে পীর পুকুর হয়েছে। এই পুকুরের পূর্বপারে একটি সুন্দর মসজিদ আছে। ছেলেবেলায় নজরুল ঐ মসজিদের ও হাজী পালোয়ানের মাজারে[১] খাদেম ছিলেন। খাদেমের মানে সেবাইত। সেই বাল্যকালে নজরুল ইসলাম যে কত নিষ্ঠার সঙ্গে, আগ্রহ ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে ধর্মাচরণ করতেন, তা যাঁরা দেখেছেন তাঁদের মুখে শুনে অবাক হয়ে যেতে হয়। কিছুদিন মসজিদে এমামতিও[২] করেছিলেন। হাজী পালোয়ানের মাজারে যখন সেবাইত ছিলেন তখন তিনি হাজীর দর্শন এবং কথা শুনতে পেতেন। এ কথা কবিকে তাঁর অন্তরঙ্গদের কাছে বলতে শুনেছি।

কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি পাননি, ধার করা জ্ঞানও তাঁর নেই। কিন্তু তাঁর মত মেধাবী লোকও অল্পই আছে। বাল্যকাল থেকেই জানবার উদগ্র আগ্রহ তাঁকে নানা পথে ঘুরিয়েছে। নানা বিষয় জেনেছেন রকমারি লোকের সঙ্গে মিসে। পড়বার ক্ষুধাও তাঁর ছিল অসম্ভব। যা পেতেন পড়তেন, তার থেকে সংগ্রহ করতেন। এই ভাবেই ইংরেজী, বাংলা, উর্দু, আরবী, ফারসী সাহিত্য থেকে তিনি রস ও ভাষা আহরণ করে নিজেকে ও বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

(১) মাজার—মহৎ লোকের কবর

(২) এমামতি—ধর্ম নেতা, যিনি নামাজে নেতৃত্ব করেন।

কবির লেখা কাব্য, গান, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতি পড়লে দেখা যাবে তাঁর মধ্যে গ্রীক, রোমান, মুস্লিম. হিন্দু প্রভৃতি পৌরাণিক জ্ঞানের গভীরতা কত ছিল। গানের মধ্যে যোগী জীবনের কথা, তাঁদের সাধনার গোপন তত্ত্বের ইঙ্গিত কত সহজ ভাবে দিয়েছেন। এই অভ্যাসটা এসেছে কবির লেটোর দল থেকে। কথকরা যেমন পৌরানিক উপমা, প্রবাদ বাক্য, প্রচলিত উদাহরণমূলক গল্পদ্বারা বিষয়কে বোধগম্য করবার চেষ্টা করেন, নজরুলের লেখাও সেই ধারায় এসেছে ঐ লেটোর দল থেকে। পডাশুনার সঙ্গে চাই অনুভূতি, বেগবান আবেগ, সর্বতোমুখী দরদ ও চাই সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি। এ সব কটা গুণই কবি নজরুলের বাল্যকাল থেকে ছিল। যেখানে কথকতা হত, কীর্তন হত, যাত্রাগান হত, 'মৌলবীরা' কোরানের ব্যাখ্যা মিলাতসরিফ করতেন, সেখানে বালক দুখুমিয়া গিয়ে নিবিষ্ট হয়ে শুনতেন। অন্যান্য বালক ও বালিকারা দুষ্টামি করত, কিন্তু কবি শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতেন।

বালককাল থেকেই ধর্ম-প্রবণতা তার মধ্যে প্রখর গতিতে ফল্গুধারায় প্রবাহিত হত। শুনেছি বালককালে তিনি কঠোর উপবাসের ভিতর দিয়ে নামাজের দ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্তির চেষ্টা করতেন। এই কঠোরতা আবার দেখা দিয়েছিল বর্তমান অবস্থার প্রায় বেশ কযেক বছর আগে।

১৩১৬ সালে দশ বছব বয়সে কবি গ্রামের মোক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পাশ করেন। পরে এই মোক্তবেই আবার এক বছর মাস্টারিও করেন ঐ বয়সেই। নজরুলেব এক কাকা কাজী বজলে করীম ফার্সী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। ফার্সী কাব্য তাঁর অন্তরের জিনিস ছিল। তিনি কাব্য চর্চাও করতেন। কাকার কাব্য চর্চা দেখে নজরুল কবিতা লেখার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। কাকার উৎসাহ ও শিক্ষায় নজরুল কবিতা লেখায় বেশ হাত পাকাতে লাগলেন। এই কাকার উপরে ছেলেবেলায় নজরুল একটি দীর্ঘ কবিতাও লিখেছিলেন। এই কাজী বজলে করীম সাহেবের একটি লেটোর দল ছিল। অন্যান্য অনেকের দলের মধ্যে করীম সাহেবের দলটি একটু আভিজাত্যপূর্ণ ছিল। কারণ করীম সাহেব নিজে বাংলা, আরবী, ফার্সী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর দল সৌখিন লোকদের মধ্যে গাইত। তিনি বাংলা গানের মধ্যে ফার্সী ও আরবী ভাষা এমন কি প্রয়োজন বোধে ইংরাজী ভাষাও গেঁথে দিতেন। কবি নজরুল এই কাকার কাছে প্রথম শিক্ষালাভ করেন। করীম সাহেবের এই অভ্যাসটাও তাঁর মধ্যে এসে যায়। যখন লেটোর দলে ছিলেন তখন এবং বিদ্রোহী কবি হিসাবে যখন আবার উচ্চ শিখরে তখনও বাংলা কবিতা গানে ফার্সী, আরবী, হিন্দী শব্দ দিয়ে ভাষাকে জোরালো করবার জন্য লিখেছেন। বজলে করীমের লেটোর দল ছেড়ে শেষে "চাকর গোদার দলে" নজরুল দশ বছর বয়সে প্রবেশ করেন। এই গোদার দলে তিনি প্রবেশ করেন ছাত্র হিসাবে। তারপর এই দলেরই নেতাও হন, গানের শিক্ষকও হন ঐ দলে। শেখ গোদার দলটি বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে, অন্যান্য দলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে

গান গেয়ে বেড়াতো। রোজগারও হত, তার কিছু ভাগও নজরুল পেয়ে মায়ের হাতে দিতেন।

শেখ গোদা যদিও তাঁর দলের নেতা ছিলেন, কিন্তু দুখুমিয়াকে তিনি এত ভালবাসতেন যে, দুখুমিয়াকে দলের নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। বালক কালে কাজী বজলে করীম ও শেখ চাকর গোদার উৎসাহে, প্রেরণায় ও প্রতিপালনে কবি নজরুলের কাব্য-কমল সুষ্ঠু ভাবে ফুটে উঠবার সুযোগ পেয়েছিল। কবি নজরুল তাঁর ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে, শেখ গোদা ও কবি বজলে করীমের কথা যখন বলতেন তখন বলতে বলতে বিহ্বল হয়ে পড়তেন। লেটোর দলের গানের একটি নমুনা নিচে দিলাম।

"সর্ব্বপ্রথমে বন্দনা গাই তোমারই ওগো বারিতালা,
তারপর দরুদ পড়ি মোহম্মদ সাল্লে আলা,
সকল পীর আর দেবতাকুলে
সকল গুরুর চরণ মূলে
জানাই সালাম হস্ত তুলে
'দোয়াকর' তোমরা সবে, হয় যেন সুখ উজালা
সর্ব্বপ্রথমে বন্দনা গাই তোমারই ওগো বারিতালা
খোদাতালা"। (লেটো)

নজরুলের আর একটি লেটোর গান

"নিষ্প্রভ এ শশী॥
তব বদন শশী।
বেরোলো না হাসি। শশীমুখে॥
পূরব আকাশে রবি প্রায় সমাগত॥
কোকিলা ঝম্‌কারে কুহু"অবিরত॥
তব মুখের আভা॥
যেন বিদ্যুৎ প্রভা॥
পরিণত শোভা॥ ক্ষীনালোকে॥
গুণ গুণ সুরে অলি বসিছে কমলে॥
বিভুগানে মত্ত বিহঙ্গম দলে॥
তাহে আজ রবে॥
জীবন সংশয় হবে॥
বুঝি রইতে হবে॥ জনম দুখে॥
নজরুল এ'সলাম বলে প্রিয়ার চরণ ধরে॥
দিবা যামিনী মান ভাঙাও পাঁচবার করে॥
মালা তিরিস ফুলে॥
পরাও হে তার গলে॥
বাগানে তা হলে পাবে সুখে।'

আট বছর বয়সে কবি নজরুল "লেটোর" দলে প্রবেশ করেন সামান্য রোজগারের জন্য। লেটোর দল বীরভূম ও চুরুলিয়া অঞ্চলে গ্রাম্য গাঁথা গেয়ে সকলের মনোরঞ্জন করে ভালমন্দ বিচার করবার হদিস দেখিয়ে দেয়। এইদলে কবি নজরুল প্রথমে গান করতেন পরে গানের শিক্ষকতা ও নেতৃত্ব করেন।

সময় উপযোগী গান, প্রহসন যাত্রা, নাটক লিখে কবি গ্রামে গ্রামে দল নিয়ে গিয়ে অভিনয় করেছেন। সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন করে শিখবার উন্মেষ হয়, লেটোর দলে এসেই। জনগণের প্রিয়কবি নজরুলের জীবনমূল এই চুরুলিয়ার লেটোর দলের মধ্যেই রয়েছে। নজরুলের জনপ্রিয়তার মূল উৎস যে লেটোর দল, সেটা বুঝলেই পরবর্তী গান, কবিতার উৎসের সন্ধান পাওয়া যাবে। তার বয়সে লেটোর দলের যে সব বন্ধু এখনও বেঁচে আছেন তাঁদের কাছে তাঁর লেখা বই থাকা সম্ভব। নজরুল লেটোর দলের জন্য নিম্নলিখিত নাটক লিখেছিলেন ঃ—

(১) "শকুনীবধ" (২) "মেঘনাদবধ" (৩) "চাষার সং" (৪) "রাজপুত্র" (৫) "আকবর সা" প্রভৃতি পালাগান। গ্রামেব মক্তবে এক বছর মাষ্টারি কবার পর চিরচঞ্চল নজরুল নূতনের সন্ধানে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। এদিকে সংসারের অভাবও খুব তীব্র হয়ে ওঠে। কবি নজরুল গ্রাম থেকে তের বছর বয়সে পালিয়ে এসে প্রসাদপুরের গার্ড সাহেবের ছোকরা চাকরের কাজ নেন[৩]। পরে আসানসোলে এ. এম্ বকস্-এর রুটির দোকানে আট টাকা মাইনেতে ছোকরা মজুরের চাকুরি নেন। রুটির দোকানে তাঁকে রীতিমত চাকরের কাজ করতে হত। মালিক তার উপর যথেষ্ট অত্যাচার কবত, খাটাতো, তাঁকে লিখতে পড়তে গান গাইতে দিত না। কিন্তু দুখুমিয়া আটা ময়দার খমীর ঠাসতে ঠাসতে গুন গুন করে গান করতেন।

"বাহির পানে মন টানিছে কোথায় জানিনা
আমি পাইনাকো পথ
পাইনাকো রথ
    পাই না ঠিকানা।
বাহির পানে মন টানিছে কোথায় জানিনা।"

এই সময় আসানসোলের থানার দারোগা রফিউদ্দীনের সঙ্গে কবির পরিচয় হয়। দারোগাসাহেব রুটির দোকানের বালক চাকরের গুণে আকৃষ্ট হয়ে নজরুলকে তাঁর দেশ ময়মনসিংহে নিয়ে যান এবং তাঁর গ্রামে দরিরামপুর স্কুলে ভর্তি করে দেন। সেখানে এক বছর থাকেন ও পরীক্ষা

(৩) অনেকে লিখেছেন বাবুর্চী, ছোকরা চাকরের কাজের কথা। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে গার্ড সাহেব নজরুলের রূপে ও গুণে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে ভাইয়ের মত তার সহায়ক হিসাবে বিপদের সময় রক্ষা করেছিলেন। (কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা—মু. আহ্‌মদ)

দেন এবং তাঁর বাংলা প্রশ্নপত্রের সমগ্র প্রশ্নের উত্তর কবিতায় লেখেন। ১৩১৯ সালের এই ঘটনা। পরে আবার দেশে চলে আসেন ১৩২০ সালে, এসে রাণীগঞ্জে সিয়ারশোল রাজ স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলে তিন বছর পড়েন। এইখানে কথা-সাহিত্যিক শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়-এর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। শৈলজানন্দের কথাতেই বলি, "নজরুল আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আর সবাই ডাকবে শৈলজা বলে, ও ডাকবে শৈল বলে। আমি রাণীগঞ্জে হাইস্কুলে, ও সিয়ারশোল রাজস্কুলে। মাইল দুয়েকের ছাড়াছাড়ি। থার্ড ক্লাসে এসে মিললাম দুজনে, আমি হিন্দু ও মুসলমান, আমি লিখি কবিতা—আশ্চর্য—ও লেখে গল্প। তবু মিললাম দুজনে। সেইটানে মিললাম, যে টানে ধর্মাধর্ম নেই, বর্ণাবর্ণ নেই, সৃষ্টির টান, সাহিত্যের টান। দুজনে রোজ এক সঙ্গে মিলি, ঘুরে বেড়াই, গল্প করি, কোন দিন বা স্কুল পালাই। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্ ধরি, ধরি ই. আই. আর-এর রেল লাইন; কোনদিন বা চলে যাই শিশু সালের অরণ্যে। তখন ইংরেজ জার্মানীতে প্রথম লড়াই লেগেছে। আমরা দুজনে ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠে প্রিটেষ্ট দিচ্ছি। শহরে গাঁয়ে চলেছে তখন সৈন্য যোগাড়ের তোড় জোড়। হাতে গরম, মুখে গরম বক্তৃতা। সবাই এগিয়ে গেল বীরত্বের 'ঘোড় দৌড়ে', বাঙালী হিন্দু মুসলমানই শুধু পিছিয়ে থাকবে?

দুই বন্ধু ক্ষেপে উঠলাম। প্রিটেস্ট পরীক্ষা দিয়েই দুজনে চুপি চুপি পালিয়ে এলাম আসানসোল। সেখান থেকে এস. ডি. ওর চিঠি নিয়ে সটান কলকাতা…না মঞ্জুর হয়ে গেলাম।…নজরুলকে যুদ্ধে পাঠিয়ে "সাথীহারা" হয়ে ফিরে এলাম গৃহকোণে[৪]। যুদ্ধে গিয়ে নজরুল হাবিলদার কোয়ার্টার মাষ্টার পদে উন্নীত হয়েছিলেন।"

ছেলেবেলায় নজরুলের বয়সের আন্দাজে যতটা শরীরের বাড় হওয়া উচিত ছিল, তার চেয়ে বেশী বাড় ছিল কবির দেহের। নানারকম স্পোর্টসে কবি ঐ বয়সে সমবয়সীদের হারিয়ে দিয়ে জয়ী হতেন। কবি ফুটবল, ক্রিকেট, ধাপ্সা প্রভৃতি খেলতে ভালবাসতেন। এই বালক বয়স থেকেই জয়দেব, চণ্ডীদাস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির লেখা কাব্য পড়ে ফেলেছিলেন। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর একটা অসীম অন্ধ ভক্তি ছিল। রবীন্দ্রনাথের ছবি বাঁধিয়ে আসনে বসিয়ে ধূপ-ধূনো-ফুল দিয়ে প্রতিদিন পূজোও করতেন। একথা তাঁর এক লেখায় বলেছেন[৫]।

রবীন্দ্রনাথের নিন্দে শুনলে নিন্দুকের উপর মারমুখো হয়ে উঠতেন। একবার চুরুলিয়ার খেলার মাঠে কবির বন্ধুরা তাঁকে নিয়ে মজা করবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা কথা বলে কবিকে অতিষ্ঠ করে তোলে। কবি ক্ষেপে গিয়ে গোলপোস্টটা উপড়ে ফেলে নিন্দুকের কপালে সজোরে বসিয়ে দেন।

(৪) কল্লোল যুগ—পৃষ্ঠা ৪০।
(৫) "বড়র পীরিতি বালির বাঁধ" নামক প্রবন্ধে।

বন্ধুর কপাল ফেটে রক্ত গড়াতে শুরু করে। পরে এই ভদ্রলোক পোস্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ অফিসে চাকরি করছেন। তাঁর কপালে সে দাগ আমরাও দেখেছিলাম। নজরুল যখন হুগলীতে ছিলেন এই ভদ্রলোক কবির সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। উক্ত ভদ্রলোক কবিকে কপালটা দেখিয়ে বলেন—তোর হাতের জয়টিকা এখনও আমার কপালে আছে[৬]। খেলা দেখার স্পৃহা কবির জ্ঞান থাকা পর্যন্ত ছিল। যত কাজই থাক খেলার মাঠে শত অসুবিধা ভোগ করেও নজরুল খেলা দেখতে যাবেনই। স্পোর্টসের দিকে তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল।

বালক নজরুল যখন লেটোর দলে গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে, যাত্রা নাটক করে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সময় বাংলা দেশের মাতৃ সাধক মুকুন্দ দাসও দেশাত্ম-বোধ জাগাবার ব্রত নিয়ে গান ও যাত্রা লিখে বরিশাল জেলার ঋষিকল্প অশ্বিনী দত্তের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে স্বদেশী যাত্রা করে দেশে জাগরণের সাড়া এনে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মুকুন্দ দাস নজরুলের অনেক গান তাঁর স্বদেশী যাত্রায় গ্রহণ করে গেয়েও গেছেন।

মুকুন্দ দাসের যাত্রা ও গানে "যে সহজ ধারা ছিল নজরুলের গানেও সেই সহজ ধারাই রূপ নিয়েছিল। দুজনেই গ্রামের ছেলে। দুজনেই গ্রামের সহজ ধারাকে বজায় রেখে দেশের সেবা করেছেন। এই দুটি গ্রাম্য দুলালের পর এখন আর সত্যকথা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা, সহজ ধারায় কেউ বলে না। কেউ লেখে না বা গেয়েও বেড়ায় না। কবি নজরুলের জীবনে শক্তির উৎস যে লেটোর দল, শহুরে মেজাজে নয়, সে কথাটা আজকের জাতীয় কবিদের ভাল করে অনুধাবন করা উচিত। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি।

(৬) শ্রীজগৎ রায়, চুরুলিয়ায় বাড়ি, পোস্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফে অফিসার ছিলেন।

লেটোর দলের পরিচয়

বাংলাদেশ গানের দেশ ও কবির দেশ। নদীমাতৃক বাংলা খাল, বিল, জলাভূমির দ্বারা সিক্ত মাটি, এই সিক্ত মাটির মানুষের মন, স্বভাব ও ব্যবহার রসে ভরা। এর তৃণ, গুল্ম, বনভূমি ঘন সবুজের আস্তরণে মানুষের মনকে যেমন সজীব করে তোলে, তেমনি গান গাইতে, গান রচনা করতে প্রেরণা দেয়। তাই বাস্তব কর্মপটুতায় অন্য প্রদেশ থেকে বাংলা অনেক পেছিয়ে আছে। এরা নিরালায় ভাবতে চায়, চায় গান গাইতে, প্রতি কর্মের মধ্যে সঙ্গীতের সুর ফুটিয়ে তুলে কাজকে প্রাণবান করার দিকেই ঝোঁক দেয় বেশী। কার্য-কারণ বিচারের থেকে ভাবপ্রবণতা প্রায় ভাবালুতার পর্যায়ে এনে ফেলে, চালাক বা বুদ্ধিমানের জগতে বোকা বনে যায়। এমন যে সঙ্গীতময় বাংলাদেশ; ভাবপ্রবণ বাঙালী তারা গ্রামে গ্রামে সঙ্গীত-বৈশিষ্ট্যের সঙ্ঘ রচনা করে একদা সারা বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। তার প্রমাণ প্রতি জেলাতেই পাওয়া যায়।

পূর্ববঙ্গের জারি, সারি, নাথপন্থীদের পালাগান গাওয়ার রেওয়াজ ছিল। যেমন ময়মনসিংহর পালাগানে—মনুয়া, ময়নামতি, প্রভৃতি প্রাচীনকালের পালাগানের দল, কবিয়ালদের কবিগান, তরজাগান প্রভৃতিও এর মধ্যে পড়ে, মালদহের 'তুষু' গান, বীরভূমের 'ঝুমুর' গান ও নৃত্য, 'কথাকলি' নৃত্য, গান ও বাদ্য, পালাগানসহ জেলেপাড়ার সং ও চাটীম সঙ্গীত। বর্ধমানের প্রান্তসীমায় তেমনি 'লেটো গানের দল'। এই লেটো গান নিয়ে এপর্যন্ত কেউ কোন বিশেষ কথা বলেন নি, অনুসন্ধান করেন নি। কিন্তু লোকসঙ্গীত হিসাবে উপরে যেসব লোকসঙ্গীতের কথা বলা হয়েছে তার কথা নিয়ে বহু আলোচনা তো হয়েছেই এমনকি বর্তমান সমাজজীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এসব বিষয়ের কাঠামোতে গান, নৃত্য পরিবেশনও করা হয়েছে। কিন্তু এই 'লেটোর' দলের কথা এক সময়ে বিশেষভাবে পরিচিত হবে এই কারণে যে এ যুগের জাতীয় কবি, বিপ্লবী ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের জীবন-গঠনের মূলে ছিল এই লেটোর গানের দল। তাই এর পরিচয় আমাদের জানা উচিত। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব থেকে 'লেটো' গানের রেওয়াজ চলে আসছে। গ্রাম এবং তৎকালীন শহরজীবনে যাতে নৈতিকজীবন উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকে, সেই দিকেই প্রাচীনকালের লেটোর দলের সর্দার গাইয়েদের ছিল নজর। সমাজের মধ্যে কোথাও গলদ হলে তাকে সংশোধনের চেষ্টা হতো নানাভাবে, উপদেশমূলক গান, কথকতা ও সংলাপের মাধ্যমে। সেকালে কোন একটি ভালো কোন একটি মন্দ ঘটনাকে নিয়ে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকেই সৎ, কর্মঠ ও গৌরবময় জীবন গঠনের প্রেরণা দিত এই লেটোর দল। এই লেটোর দলকে রাজপুতানার চারণদলের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

প্রাচীনকালে লোকশিক্ষার জন্য এই দল ধর্মবিষয়ক, দেহতত্ত্ব, আধ্যাত্মবাদমূলক গান রচনা করত।

এই লেটোব দল গ্রামে গ্রামে শহবে শহবে মুজবাও খাটতো তথাকথিত যাত্রাদলের মতো। এই লেটো গানের স্রষ্টা ছিলেন এই অঞ্চলের শিক্ষিত মুন্সী মুসলমানেব দল। এঁরা শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, রসিক ভাবাপন্ন মুসলমানদেব নিয়ে দল গঠন কবতেন। প্রাচীনকালেব ভাগবৎ কথা, বামায়ন গান, মহাভারতেব আখ্যান নিয়ে যেমন লোকশিক্ষাব রেওয়াজ ছিল, তেমনি মুসলিম পুবানাদিব বিষয়বস্তু অবলম্বনে পালাগান লিখে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা কবতেন।

কালের পরিবর্তনে, পরিবেশ, সমাজরূপ, মানুষেব রুচি, ভাষা সবকিছুরই পবিবর্তন এলো। লেটো গানেব পবিবর্তনও সঙ্গে সঙ্গে হতে লাগলো। প্রাচীন আমল থেকে নূতন আমলের লেটোব মান অনেকটা নিচেব দিকে নেমে গেল। আগে যেখানে গুরুগম্ভীর নৈতিক শিক্ষাব সঙ্গে মানুষকে আনন্দ দেবার জন্য মান বক্ষা কবে বঙ্গ-ব্যঙ্গর বিকাশ গানে, কথকতায় ছিল। নূতন যুগে সে ঢং বদলে সং সাজিয়ে, নানা হালকা ধরনের রংদাব কথা ও গানের প্রচলন হতে লাগল। এমনিভাবে যে দল লোকশিক্ষার ভাব নিযেছিল কালের বদলেব সঙ্গে তারও রূপেব বদল হয়ে শুধু নিছক কালক্ষেপণের সাময়িক আনন্দ যোগানোব কাজে লেটোব দলেব কাজ দাঁড়িয়ে গেল। প্রায় তরজা, খেউড গানের দলের মতো গড়ে উঠতে লাগলো। যে দলকে এক সময়ে শিক্ষিত, অভিজাত, অশিক্ষিত, জনসাধারণ, নরনাবী, বালক, যুবক আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল, সেই দল মধ্যবর্তীকালে প্রায় অপাঙক্তেয় হয়ে উঠেছিল।

প্রাচীনকালেব এমন একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাঙালী হিন্দু মুসলমান সমাজের সম্পদ তার এই অধঃপতন দেখে তৎকালীন কয়েকজন লেটো-দরদী, শিক্ষিত, গান কথকথায় পারদর্শী ব্যক্তি একে আবার উন্নীত করার কথা ভাবছিলেন এবং হাতে-নাতে গড়ে তুলবার চেষ্টাও করেছিলেন। এই প্রস্তুতির কালে কাজী নজরুল লেটোব দলে আট বৎসর বয়সে প্রবেশ কবলেন।

কবি নজরুলের কাকা কাজী বজলে করীম একজন ভালো কবি ছিলেন। তিনি ফারসী, আরবী, বাংলা প্রভৃতিতে বেশ সুশিক্ষিত ছিলেন। বাংলা গানে, কবিতায় আরবী ফারসী শব্দ দিয়ে লিখতেন। যেখানে যে-শব্দটি মানায় সে-শব্দটি সেখানে দিয়ে লেখা ছিল তাঁর একটি বিলাস। কবি নজরুলেরও এই অভ্যাস দেখা গেছে, তাঁর এ শিক্ষাটি তিনি তাঁর কাকা বজলে করীমের কাছেই পেয়েছেন। কাজী বজলে করীমের একটি নিজস্ব লেটোর দল ছিল। এই দলটির একটু আভিজাত্য ছিল এই যে, এঁরা কখনও বাইরে বায়না নিয়ে গাইতে যেতেন না। নজরুল প্রথমে তাঁর কাকার দলে প্রবেশ করেন। কিন্তু নজরুলের পিতা অনেকগুলি নাবালক ছেলেমেয়ে রেখে মারা যান। নজরুলের মাতা এদের নিয়ে দারিদ্র্য যন্ত্রণায় যথেষ্ট কষ্ট পাচ্ছিলেন। নজরুলের সেজন্য কিছু রোজগারের দরকার, তাই অত অল্প বয়সে লেটোর দলে প্রবেশ করতে হয়েছিল তাঁকে।

কাজী বজলে করীমের দলের পাশে আর একজনের বেশ জোরদার লেটোর দল ছিল। এই দলটির সর্দার গায়ক ছিলেন "ওস্তাদ শেখ চাকর গোদা"। এঁর গান রচনার, তাতে সুর দেওয়ার, শেখাবার ও কথকতার ও স্থানীয় সংবাদ দিয়ে পালা রচনার ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। করীম সাহেবের দলের সঙ্গে গোদার দলের গানের লড়াই চলত। গোদারই হত জয়জয়কার। পরে নজরুল গুরু গোদার দলে এসে যোগ দেন। চাকর গোদা নজরুলের শৈশবে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে মুখে মুখে নজরুলকে কবিতা গান তৈরি করতে শেখাতেন। নজরুলও গুরুর প্রেরণায়, ভালবাসায় গোদার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। গোদা বলতেন—"আমার এই ব্যাঙাচি কবি একদিন সাপ হয়ে ছোবল মারবে। তাঁর কথা ভবিষ্যতে ফলে গিয়েছিল। নজরুল "চাষার সং", "ঠগপুরের সং" প্রভৃতি প্রহসন "আকবর বাদশা", "দাতাকর্ণ", "কবি কালিদাস", "শকুনিবধ", "মেঘনাদবধ" নাটক বা পালাগান "রাজপুত্র" নাটক রচনা করেছেন, আরও বহু বচনা আছে, কিন্তু তার কোন হদিস পাওয়া যায় নি। কবি নজরুল গানের আসরে যখন আসতেন, তখন দর্শকদের মধ্যে বেশ একটা উৎসাহের সঞ্চার হোত। সেই বয়সেই কবির জনপ্রিয়তা, লোকবরেণ্য হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। পরবর্তী কালেও বিদ্রোহী কবি হিসাবে তাঁকে যারা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

ওস্তাদ গোদার কাছেই তাঁর কাব্য রচনা, জনপ্রিয় সঙ্গীত রচনা, জনপ্রিয় সুরযোজনার শিক্ষা হয়েছিল, হারমোনিয়মের পর্দায় তাঁর লম্বা লম্বা আঙ্গুলগুলো যেন সাপুড়ের সাপ নাচাবার মতো নেচে বেড়াতো তাঁর গান গাওয়ার বৈশিষ্ট্য ছিল বাণীপ্রধান; সুরকে প্রয়োজনের খাতিরে চালাতেন, বাণীকে প্রাণময় করবার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই সুরের সাহায্য নিতেন, কখন কখন হারমোনিয়ম ছেড়ে দিয়েই আবৃত্তির মতো করে গানের বাণীকে জনগণের মনে সেঁধিয়ে দিতেন। লোকসঙ্গীতের ধারাই বোধহয় এই—কারণ চারণকবি মুকুন্দদাস তাঁর যাত্রায় এই পদ্ধতিতেই গাইতেন।

ওস্তাদ শেখ চাকর গোদাই নজরুলের কবি জীবনের পরিচয় পেয়ে ছিলেন। এবং তিনিই এই উৎসকে তাঁর লেটোর দলের মাধ্যমে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। এই জন্যই কবি নজরুলের লেটোর দলের এবং তাঁর ওস্তাদ গোদার জীবনরহস্য উদ্ঘাটনের জন্য আমাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা দরকার। আমি গত ১৯৬৮ সালে চুরুলিয়ায় কবির জন্মভূমি পরিক্রমায় গিয়ে ওস্তাদ গোদার বিষয় চুরুলিয়াবাসীদের জিজ্ঞাসা করেও কোন সাহায্য পাই নি। নজরুলের কালে যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরাও কোন সহযোগিতা করেন নি। তাতেই মনে হয় গ্রামস্থ লোকদের মনে কোন বিষয়েই আগ্রহ নেই।

নজরুল জীবনে কবি বজলে করীম ও শেখ গোদা এই দুই লোক-কবিই নজরুলের গুরু। তাই বিদ্রোহী কবিরূপে নজরুল রচনার সহজতর ভাষায়

সুরে, ভাবাবেগের প্রাণোচ্ছলতায় বাংলা দেশে জনপ্রিয় কবি হতে পেরেছিলেন। কবি নজরুলের কাব্য-উৎসের সন্ধান করতে হলে চুরুলিয়া আর চুরুলিয়ার লেটোর দলের কথা জানতে হবে।

লেটোর দলের কিশোর কবি. ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে অন্য দলকে হারিয়ে দেবার জন্য গান ধরতেন ঃ—

"পাল্লাসাথে লেটোর ল্যাঠা লাগ্‌লো,
ছড়াদাব ও দোহাররা সব ভাগ্‌লো ;
ছন্দসুরের মিল নাহিক গানেতে,
ও' মিঞার জ্ঞান নাহিক তানেতে ;
মাটির সাথে আঁকড়া মিশোল ধানেতে,
ষাঁড়ের সাথে গাধা বাঁধা "থানেতে"
দেখে ইহা ভদ্রলোক রাগ্‌লো
ছড়াদার আর দোহাররা সব ভাগ্‌লো" ॥

এইভাবে নিজের লেখা গান গেয়ে আনন্দ দিতেন। বিপক্ষ দলেরা এই ছোট ছেলেটিকে ভয় কবত। তিনি যখন বিপক্ষ দলের 'ওস্তাদ'কে লক্ষ্য করে বলতেন ঃ—

ওরে ছডাদার , ওরে (That) "দ্যাট" পাল্লাদার
মস্তবড় "ম্যাড্‌" (Mad)
চেহারাটাও "মান্‌কি লাইক" (Monkey like)
দেখতে ভারী "ক্যাড্‌" (Cad)
'মান্‌কি' লড়বে "বাবর্‌কা" সাথ
ইয়ে বড় তাজ্জব বাত
জানেনা ও—ছোট্ট হলেও
হমভি "লায়ন ল্যাড" (Lion lad)

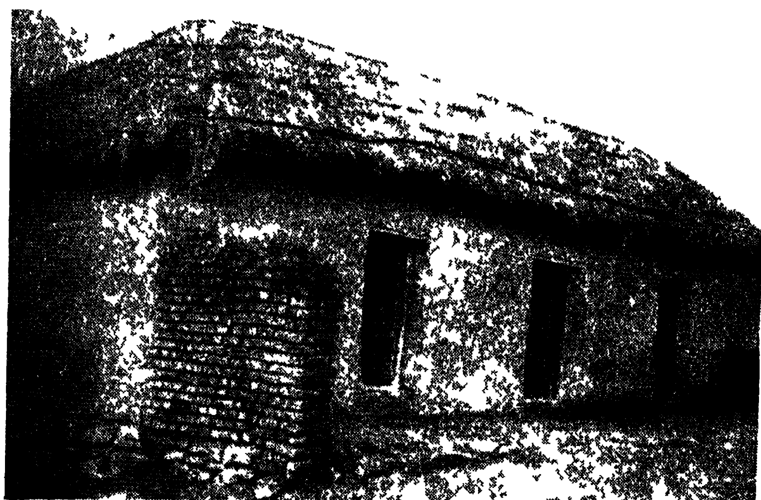
আবার ঐ বয়সেই গুরু গোদার আদেশে নিজের লেখা বন্দনা গান গেয়ে শোনাতেন ঃ—

"সর্ব্বপ্রথমে বন্দনা গাই তোমারই ওগো বারী তালা,
তারপরে দরুদ পড়ি মোহম্মদ সাল্লে আলা,
সকল পীর আর দেবতা কুলে
সকল গুরুর চরণ মূলে
জানাই সালাম হস্ত তুলে
দোয়াকর তোমরা সবে, হয় যেন গো মুখ ওজালা
সর্ব্বপ্রথমে বন্দনা গাই তোমারই ওগো বারীতালা
তোমারই ওগো বারীতালা ॥"

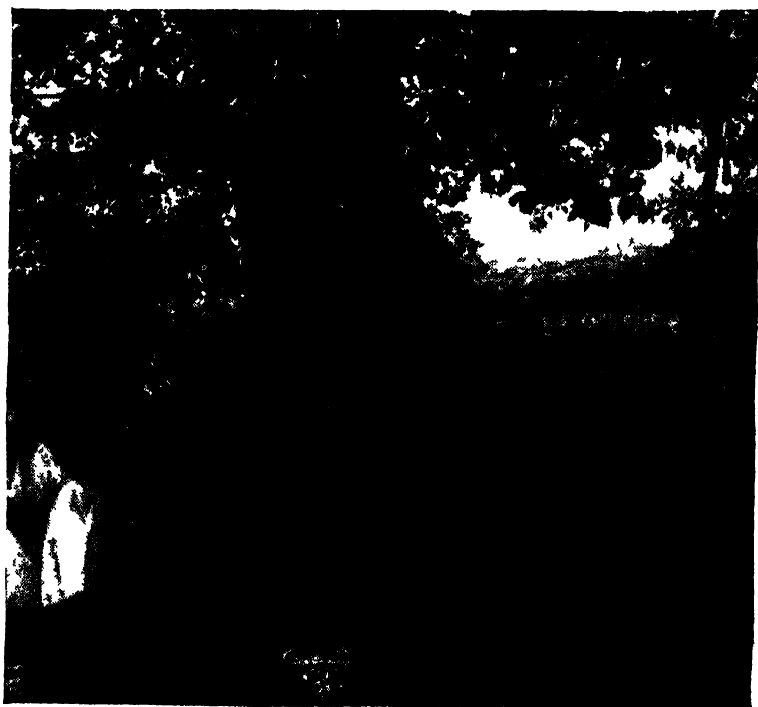
নজরুল ও লেটোর দলের লীলাও প্রায় শেষ হয়ে এলো, নতুন পথ কেবলই তার ভিতরে ডাক দিয়েছে বিপুল বিশ্বের দিকে হাতছানি দিয়ে। কবি লেটোর সংশ্রব ত্যাগ করে ১৯১২ সালে চুরুলিয়া ছেড়ে আসানসোলে

একটি রুটির দোকানে ছোকরার চাকরি নেন। তখন থেকে কবির জীবনে নূতন জীবনের উন্মেষ হতে থাকে। বাহির বিশ্বের অসীমতার স্বপ্ন জাগে চোখে, অসীমের বেদনায় কবিকে করে তোলে উন্মনা; অজানা আনন্দ তাঁকে গিরি উল্লঙ্ঘনের দেয় প্রেরণা। কবি সেই আকর্ষণে গা ভাসিয়ে দিলেন অজানার দিকে ১।

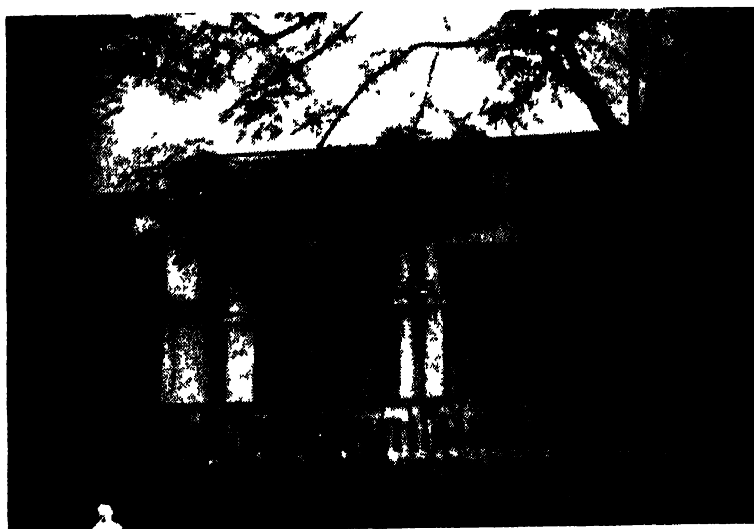
(১) পশ্চিমবঙ্গ মুস্‌লিম অনুসন্ধান সমিতির (পোঃ কাটোয়া, বর্ধমান) সংগৃহীত উপকরণ অবলম্বনে এম. আবদুর রহমান লিখিত প্রবন্ধ থেকে কিছু কিছু তথ্য গ্রহণে এই অধ্যায় লিখিত।



কবি এই মাদ্রাসায় বাল্যে অধ্যয়ন করেছেন



চুরুলিয়ার সুফী ফকীরের মাজারে সুষমা দেবী



চুরুলিয়া নজরুল একাডেমি



চুরুলিয়া প্রমীলা কুঞ্জ, পীরের মাজার, পীরপুকুর ও মসজিদ

নজরুল ও তাঁর মা

বহু বিতর্কিত একটি কথা সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে যে নজরুল তাঁর মায়ের ওপর অভিমান করলেন কেন ? এই দুর্জয় অভিমানের জন্য কখনও কবি তাঁর মায়ের কাছে চুরুলিয়ায় আর গেলেনই না, হুগলী জেলে অনশনের সময়েও মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না, এমনকি মৃত্যুর সময়েও মায়ের শত অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে কবি একটি বারও দাঁড়ালেন না কেন ? এই দুর্জয় অভিমানের কি কারণ ?

এ সম্বন্ধে নজরুলের পরমভক্ত কবি আবদুল কাদির ঢাকা থেকে আমাকে ২৭. ৭. ৬৭ তারিখে একপত্রে লিখলেন "আপনি হামিদুল হক সাহেবের (হুগলী কংগ্রেস) কাছ থেকে নজরুলের সেই চিঠি উদ্ধার করতে চেষ্টা করবেন—সেই চিঠি কবি ও কবি মাতার সম্পর্কের একটি মস্ত দলীল। যদি মূল চিঠি হামিদুল হক দিতে অস্বীকৃত হন, তবে Photostat কপি করিয়ে আমাকে পাঠাবেন। আপনি এবিষয়ে আমার শ্বশুরের সাহায্য নেবেন। আবদুল কাদির।"

এই চিঠি পাওয়ার পরেই হুগলীতে আমি হামিদুল হক ও তাঁর ছোট ভাই বিপ্লবী সিরাজুল হক্‌কে চিঠি দিলাম। তাতে সিরাজুল হক ৮. ৮. ৬৭ তারিখে জবাব দেন "দাদার (হামিদ) সঙ্গে দেখা করে জানলাম এবং আমি বা তুইও জানিস যে নজরুল দাদাকে তখন হুগলী জেল থেকে চিঠি লিখে-ছিলেন। কিন্তু অনেক দিনের কথা, আমরা জেলে চলে গেলে সব কোথায় তছনচ্ হয়ে যায়। তবে যতদূর মনে পড়ে কাজীদার বৈমাত্রেয় ভাই হোল সামসুদ্দীন সাহেব। কাজীদার মাকে নিয়ে হুগলী জেলে দেখা করতে আসেন। যে ব্যাপারে তোরও যোগাযোগ ছিল। কাজীদা কেন তার বিমাতার সঙ্গে দেখা করেননি, সেটা সঠিক্ বলা যাচ্ছে না। তবে তাঁরা যে দেখা করতে এসে দেখা না পেয়ে ফিরে গেছেন সেটা ঠিক। সিরাজুল হক।"

বহুদিনের কথা, সিরাজ বা হামিদ নজরুলের মাকে বিমাতা বলেছেন, এটা ঠিক নয়।

এই দুটি চিঠির মাধ্যমে এবং বহু লেখকের সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থে দেখতে পাচ্ছি যে নজরুলের সঙ্গে তাঁর মায়ের একটা অভিমানের পালা বেশ গভীরেই প্রসারিত হয়েছিল। হুগলীর উক্ত বিপ্লবী সিরাজুল হক বলছেন, বৈমাত্রেয় ভাই সামসুদ্দিন সাহেব। সামসুদ্দীন নয়, আর বৈমাত্রেয় ভাইও নয়, গ্রামস্থ জ্ঞাতি ভাই জনাব আবদুর রহিম। এটা হয় সিরাজের কিছুটা স্মৃতিভ্রষ্টতার জন্য নয়ত তখন যা শুনেছিলেন তাই লিখেছেন। কিন্তু আমি ১৪. ১০. ৬৮ সালে আমার পরিবারাদি সহ নজরুলের জন্মভূমি চুরুলিয়ায় বেড়াতে যাই। যেখানে প্রায় আশীবৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ জনাব কাজী আবদুর রহিমের সঙ্গে দেখা হয়। আমি হুগলীর লোক শুনে বললেন যে

"আমি বহুদিন পূর্বে হুগলীতে গিয়েছিলাম নজরুলের মাকে নিয়ে।" তিনি হামিদুল হকের নামও করলেন। সে আজ পঁয়তাল্লিশ বৎসর (১৯২৩-১৯৬৮) পূর্বের কথা। আমি রহিম সাহেবকে মা ও ছেলের মান অভিমানের ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্ন করলাম, তাতে তিনি আমায় ধরা ছোঁয়া দিলেন না।

আমি তাঁকে এও বল্লাম যে পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে নজরুল ও তাঁর মায়ের সম্পর্ক নিয়ে আলাপ আলোচনা চলেছে অথচ কেউ নির্দিষ্ট কোন কথাই বলতে পারছেন না, এ রহস্য আপনাদের উদ্ঘাটন করা উচিত। কারণ নজরুল যে রকম মাতৃভক্ত ছিলেন, তাতে কবির মায়ের প্রতি এমন মারাত্মক অভিমান কেন হল যে, ১৯২০ সালে পল্টন থেকে সাত দিনের ছুটিতে এসে চুরুলিয়ায় একবার যাবাব পর আর কেন জীবনে সেখানে গেলেন না। জেলে মায়ের সঙ্গে দেখাতো করলেনই না বরং সেখানে নজরুলের কবিমাতা বিরজা সুন্দরীর হাতে পানীয় মারফৎ অনশন ভঙ্গ করেন। পরে "সর্ব্বহারা" গ্রন্থ তাঁকে উৎসর্গ করে লিখলেন ঃ

"সর্ব্বসহা সর্ব্বহারা জননী আমার"

এটাওতো ভাবা উচিত যে এই অস্বাভাবিকতার পথে কবিকে কে প্রেরণা দিল ?

কবি নজরুল তাঁর চুরুলিয়াবাসীদের কাছে শৈশব ও বালককালে খুব বেশি পাত্তা পান নি। কারণ তাঁর সদা প্রাণচঞ্চল মন সেখানে ক্ষ্যাপা নামেই প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। চুরুলিয়া থেকে কোনও কারণে ঐ বয়সেই বিরাগী হয়ে গৃহছাড়া যখন হয়েছিলেন তখন তাঁর তের বৎসর বয়স। এর ভেতর একবছর মৈমনসিংহ কাটিয়ে আবার ফিরে আসেন চুরুলিয়ায়। সেখানেও থাকেন নি তিনি। এর আগে ১৩১৮ সালে বর্ধমান মাথরুন স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে এক বছরের জন্য ছাত্র ছিলেন প্রসিদ্ধ কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কাছে। এখানে দেখা যাচ্ছে নজরুল লেখাপড়া করবার জন্য পাগলের মতো চারদিকে ছুটোছুটি করছেন। তার এই আগ্রহ দেখেই সিয়ারশোল রাজ স্কুলের কর্মকর্তাগণ তাঁকে মাসহারা সহ বিনাবেতনে পড়ার ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু চুরুলিয়ার গ্রামস্থ বিত্তশালী হিন্দুমুসলমানগণ তাঁর এই জ্ঞানান্বেষনের ব্যাকুলতা না বুঝতে পেরে তাকে ক্ষ্যাপা বা পাগলা ছেলে হিসেবেই অবহেলা করেছেন। কবির মন তাই গ্রামকেন্দ্র ছেড়ে বিশ্ববিধাতার বিপুল অঙ্গনে ছুটে যাওয়ার বাসনাকে প্রবলতর করে তুলেছিল। এই ক্ষ্যাপা যে, যে সে ক্ষ্যাপা নয়, এ ক্ষ্যাপা যে পরশ পাথর খুঁজে বেড়াচ্ছে তা বিষয় বুদ্ধিতে পোক্ত স্থানীয় লোকেরা কি করে বুঝবেন ? তাই তার আত্মীয় স্বজন ও গ্রামের পড়শীরা তাঁকে অনেক পরে চিনেছিলেন, যখন রাষ্ট্র তাঁকে সম্মানিত করল তখন। তার পূর্বে নজরুলের দেশবাসী স্বজনগণকে দেখিনি কখনও তাঁর খবর নিতে।

কাজী আবদুর রহিম সাহেবকে বললাম যে আমরা হুগলীর লোক। হুগলী জেলে নজরুল যখন ছিলেন, তখন আমরাই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে নজরুলের মাকে ও আপনাকে সাদরে গ্রহণ করে নজরুলের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করি। কি ঘটেছিল আপনি যেমন জানেন আমরাও জানি। শুধু জানতে চাই নজরুলের মায়ের ওপর অভিমানের কারণ কি? তিনি এর কোন উত্তর দেন না। তখন তাঁকে বলি যদি এবিষয়ে আপনার ভিন্ন বলার কিছু থাকে তা হলে আপনি বা আপনারা সঠিক কথা বলুন, অযথা রহস্যাচ্ছন্ন করে রাখছেন কেন? এও দেখলাম—সারা ভারতে নজরুলকে নিয়ে এত যে লেখা, উৎসব, গ্রন্থাদি প্রকাশিত হচ্ছে তার খবরও ওঁরা রাখেন না, বা জানবার আগ্রহও নেই। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর গ্রন্থে বলেছেন "কলকাতায ৩২নং কলেজ স্ট্রীটের সাহিত্য সমিতিব বাড়িতে দুদিন থাকার পরে নজরুল ইসলাম তার জিনিসপত্র সেখানে রেখে দিযে চুরুলিয়া গ্রামে তাব নিজের বাড়িতে চলে যায। আমার যতদূর মনে পড়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে সে সাত-আট দিন ছিল। এই সময়ে তার মাযের সঙ্গে কিসের একটা মান অভিমানের ব্যাপার তার ঘটে। তারপরে যতদিন মা জীবিত ছিলেন, ততদিন তো সে চুরুলিয়া গ্রামে যায়ই নি। মায়ের মৃত্যুর পরেও সম্বিৎ থাকা অবস্থায়ও সে আর কখনও চুরুলিয়া গ্রামে ফেরে নি।"

তা ছাড়া আহ্‌মদ সাহেব আরও লিখেছেন, "নজরুলের গর্ভধারিণী মা, হুগলী এসেছিলেন। মা'র সঙ্গে নজরুলের কি একটা প্রচণ্ড মান অভিমানের ব্যাপার ঘটেছিল। পলটন হতে ফিরে এসে সে একবার মাত্র চুরুলিয়ায় গিযে আর কখনও যায় নি। মা'র সঙ্গে নজরুল দেখাও করে নি।"[১]

জনাব আবুল ফজল সাহেব লিখেছেন, "তাঁহার (নজরুল) অনশন ভাঙাইবার জন্য তাঁহার মাতা জাহেদা খাতুনও জেলে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তাঁহার মাতাকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল।"[২]

স্বর্গত অশোক গুহ বললেন—"হয়তো মায়ে পোয়ে ঝগড়া হয়েছিল, হয়তো কোন মান অভিমানের পালা চলেছিল, তাই চুরুলিয়ায় তিনি আর গেলেন না।"[৩]

এই অধ্যায়ে এই বিষয়ে এত নজীর কেন টানতে হল তা প্রবন্ধের শেষে আমি বলব। আমি চুরুলিয়ায় গিয়ে ঘণ্টা দুই ছিলাম। তারমধ্যে এইটুকু অনুমান করেছি যে নজরুলের প্রতি তাঁরা বর্তমানে যে আগ্রহ ও আত্মীয়তা দেখাচ্ছেন, তার রহস্য অন্য খাতে প্রবাহিত। কিন্তু রহিম সাহেব আমাকে প্রশ্নের জবাব দিয়েও দিলেন না, চেপে গেলেন কেন বুঝলাম না।

---

(১) কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা—মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, পৃঃ ৪৬—১৯৬৫

(২) বিদ্রোহী কবি নজরুল - আবুল ফজল, পৃঃ ৩৫—পাকিস্তান ১৯৪৮

(৩) অগ্নিবীণা বাজান যিনি—৺অশোক গুহ, পৃঃ ৩৫—পাকিস্তান ১৩৭০

নজরুল যখন প্রমীলা দেবীকে বিবাহ করলেন তখন আমরা তাঁর কোন আত্মীয়স্বজনকে দেখি নি। বিবাহের পর যখন হিন্দু মুসলমান সমাজ নজরুলকে বর্জন করল, তখন তিনি কত ছেলেমানুষ। দুঃসাহসী ব্যক্তি ছিলেন বলেই অত বিপদের মধ্যেও গর্দান খাড়া রেখে স্থির হয়ে ছিলেন। এই অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে হুগলীর যুগান্তর দলের বিপ্লবী যুবকরা তাঁকে মাথায় করে নিয়ে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেদিন কোথায় ছিল আত্মীয় স্বজন, স্বগ্রামের পড়শীরা ? আজ যারা নজরুলকে ভাঙিয়ে খাওয়ার সুযোগ সন্ধানী তাদের তো সেদিন দেখাও যায় নি।

তাই আজ যখন নজরুল সম্বিৎ হারা তখন দেখছি চুরুলিয়ার লোকেরা নজরুলকে নিয়ে যেসব প্রচার করছেন, বিশেষ করে মা ও ছেলের সম্বন্ধ বিষয়ে তা বিশেষ প্রতিবাদযোগ্য।

১৯৬৯ সালে চুরুলিয়ার (নজরুল একাডেমির) নজরুল জন্মজয়ন্তীতে জনাব আবদুর রহিম সাহেবের বক্তৃতা ও বেতার ভাষণে তিনি বলেছেন,

"হুগলী জেলে কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর মায়ের সাক্ষাৎকার ও কবির অনশন ভাঙ্গার জন্য ব্যর্থ প্রয়াস।

"কাজী নজরুল ইসলামের মা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মরহুম কাজী সাহেবজান ও আমি, কাজী আবদুর রহিম এই তিনজনে ব্যাণ্ডেল থেকে সকাল ৭টার সময় ঘোড়ার গাড়ি করে প্রথমে হুগলী তৎকালীন কংগ্রেস অফিসে গেলে কবির মাকে দেখবার জন্য প্রচুর লোকের সমাগম হয় এবং বহুলোক কবির মাকে শ্রদ্ধা জানায়। উক্ত কংগ্রেস অফিসের জনৈক কর্মী জনাব হামিদুল হক্ সাহেব আমাদিগকে তাঁর নিজ বাড়ি নিয়ে যথাযথ সমাদর ও আপ্যায়িত করলেন। কবি সাহেবের মাকে সেখানে রেখে হামিদুল হক্ সাহেবের সহযোগিতায় একটা ইন্টারভিউ লেটার নিয়ে হুগলী জেলের Superintendent (সুপারিনটেনডেন্ট)-এর সঙ্গে দেখা করলাম ও কবির সাথে দেখা করবাব অনুমতি চাইলাম। Superintendent (সুপারিনটেনডেন্ট) আমাদের অনুমতি দিলেন। তারপর হামিদুল হক্ সাহেবের বাড়ি হতে কবির মাকে আমরা হুগলী জেলে নিয়ে এলাম। হুগলী জেলের Jailcr প্রথমে একটা খাতায় আমাদের তিনজনের সহি নিলেন। তারপর কবিকে নিয়ে আসার জন্য একজনকে আদেশ করলেন। মিনিট দশ পরে দেখলাম জেলের ভিতরের গেট থেকে কবি জেলারকে বললেন—"আপনি আমাকে ডেকেছেন ?" জেলার বললেন—"হ্যাঁ, আপনার মা ও ভাইরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।" আরও একটি চেয়ার আনিয়ে কবিকে বসতে দেওয়া হল এবং জেলার আড়ালে চলে গেলেন। শুধু Assistant Jailor আমাদের কথা শোনবার জন্য রইলেন এবং আমাদের সঙ্গে কবিকে সালাম করলেন। তারপর কবি বললেন—"তোমরা কি করে সংবাদ পেলে ? আমরা বললাম—খবরের কাগজ হতে।" কবির পরনে তখন খদ্দরের ধুতি ও সার্ট, মাথায় টুপি ও পায়ে কেম্বিসের চটি। কবির মা জিজ্ঞাসা করলেন—"দুখু তোকে এত রোগা লাগছে কেন ?" কবি

হো হো করে হেসে মাকে বললেন, "মা, আজ আমার ৩৭ দিনের Hunger Strike (অনশন)। এইমাত্র ডাক্তার আমাকে জোর করে শুইয়ে নাকে নল দিয়ে দুধ পান করিয়ে গেলেন।" এরপর কবি গ্রামের সকলের কুশলাদি জানতে চাইলেন, জিজ্ঞাসা করলেন,—"কোথায় তোমরা উঠেছ এবং কী ভাবে এলে ?" ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভয়ে পাছে হামিদুল হক সাহেবের কিছু ক্ষতি হয়, তাই সব কিছু গোপন রেখে কবিকে সন্তোষজনক সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম। তিনি খুবই উৎফুল্ল ছিলেন কিন্তু মনে হল ভিতরে তিনি খুব দুর্বল। কবির মা তখন কবিকে কোলে টেনে নিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন এবং কবির মুখে, মাথায় হাত বুলিয়ে চুমু খেয়ে কবিকে অনুরোধ করলেন— "বাবা দুখু, আমি চুরুলিয়া হতে শুধুমাত্র এখানে এসেছি তোকে কিছু খাওয়াবার জন্য। তোকে খেতে হবে বাবা, আমি সঙ্গে খাবার এনেছি।" কবির মা আরও বললেন,—'বাবা, আমি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কাছে তোর হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেব। মায়ের এই কথা শুনে কবি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং মাকে বললেন 'মা তুমি কারবালা প্রান্তরের আবদুল ওহাব-জননীর কথা ভুলে গেছ ? আবদুল ওহাব-জননীব মত কথা বলো। আমি শুনতে রাজি আছি।' এব পর কবি পুনবায় মায়ের পদ চুম্বন করে বললেন, 'মা, মনে রেখো, তুমি কাজী নজরুল ইসলামের জননী। তোমাকে বলছি দেশমাতার সম্মান এবং গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখাব জন্য আমার জীবন সমর্পণ করেছি। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর যেন আমি তোমার এই কান্নাভরা মুখে হাসি ফোটাতে পারি। মা, তুমি কেঁদো না। কাজী নজরুল ইসলামের জননীর চোখে কান্না শোভা পায় না।' এই বলে কবি আমাদের কাছ হতে বিদায় নিলেন। অনেক চেষ্টা করেও কবিকে কিছু খাওয়ান গেল না।

"হুগলী জেলে কাজী নজরুল ইসলামের সাথে তাঁর মায়ের ও আমাদের সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি এবং কবির সঙ্গে আমাদের কথোপকথন সব কিছু আমার স্মৃতি হতে উদ্ধৃত করে দিলাম।"[8]

স্বাক্ষর : কাজী আবদুর রহিম
গ্রাম ও ডাকঘর : চুরুলিয়া, জেলা : বর্ধমান

আমাকে বহু বিশিষ্ট লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে এবং আবদুল কাদির সাহেবের চিঠির অংশ বিশেষ তুলে আমাকে এ বিষয়ে নজরুলের প্রিয় জনগণের কাছে তুলে ধরতে হল এই জন্য যে, প্রায় অশিতীপর বৃদ্ধ মাননীয় রহিম সাহেব কতখানি অমূলক কথা ও অসত্য ভাষণ ইনিয়ে বিনিয়ে লিখতে পারেন ও বেতার মারফত আত্মপ্রচারণার মাধ্যমে নজরুলকে ভাঙিয়ে নিজেদের বাহাদুরী প্রতিষ্ঠার অহমিকা দেখাতে পারেন তার প্রমাণের জন্য।

---

(৪) নজরুল একাডেমী, চুরুলিয়া ২৫ ও ২৬শে মে ৬৯-এর সোভেনির থেকে উদ্ধৃত

সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে হামিদুল হক সাহেবের কথা কাজী আবদুর রহিম সাহেব তাঁর বেতার ভাষণ ও রচনায় বলেছেন, সেই হামিদুল ও তার ভাই সিরাজুলের চিঠিও আমি প্রবন্ধে উপস্থাপিত করেছি। তা থেকেও প্রমাণিত হয় যে জনাব রহিম সাহেব যা বলেছেন তার সবটুকুই কল্পনা প্রসূত। এই কল্পনা দ্বারা নজরুলের জীবন নিয়ে শুধু চুরুলিয়াবাসীই নয়; বর্তমানে সর্বত্রই এই বাহাদুরী করার খেলা চলেছে। নজরুল ১৮৯৯ সালের মে মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্বসাকুল্যে চুরুলিয়ায় ছিলেন ১৩ বছর বয়স পর্যন্ত। অর্থাৎ ১৯১২ সালের মাঝামাঝি তিনি চুরুলিয়া ছেড়ে চলে যান। এর ভেতরে এক বছর মৈমনসিংহে ছিলেন। তারপর ফিরে এসে চুরুলিয়ার অদূরে সিয়ারশোল রাজ স্কুলের ছাত্র ছিলেন, তাও ছাত্রাবাসেই বেশির ভাগ সময় বাস করতেন। কখনও কখনও চুরুলিয়ায় যেতেন। সিয়ারশোলে ছাত্র থাকা কালেই তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে চলে যান ১৯১৭ সালের প্রথম দিকে। এই হিসাব থেকেই বোঝা যায় জনাব কাজী আবদুর রহিম সাহেব নজরুল সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। তিনি বা গ্রামস্থ লোকেরা তৎকালে এবং এখনও নজরুল সম্বন্ধে যে কত উদাসীন, তারও প্রমাণ মেলে। হুগলীর হামিদুলের কথা উনি বলেছেন। কিন্তু সেই হামিদুলের সঙ্গে আরও যে সাক্ষী নজরুলের মায়ের সঙ্গে হুগলী জেলে নজরুলের সাক্ষাতের সময় ছিল, তিনি সে কথা ভুলে গেছেন। হামিদুল হক, তার ভাই সিরাজুল হক, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ও বিজয় মোদক প্রভৃতি যুগান্তর দলের হুগলীর বিশিষ্ট সভ্যরাও ছিল। সত্য ঘটনা তারাও জানতে পারে এই ভেবে রহিম সাহেবের সংযত হয়ে বলাই উচিত ছিল। তিনি আরও একটি কথা বলেছেন, "সকাল ৭টার সময় ঘোড়ার গাড়ি করে প্রথমে হুগলী কংগ্রেস অফিসে গেলে কবির মাকে দেখবার জন্য প্রচুর লোকের সমাগম হয় ও বহু লোক কবির মাকে শ্রদ্ধা জানান।" (ভাষণ দ্রষ্টব্য)

প্রথমতঃ, সময়টা ভুল হয়েছে, ওঁরা এসেছিলেন বিকেলের দিকে। তারপর, তখন বহু লোক সেখানে ছিল না। কবির মাকে শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই দেখান হয়েছিল। ওঁরা কিছু না জানিয়েই হঠাৎ আসেন, কোথায় গেলে সুবিধা হবে তা তাঁরা না জেনে কংগ্রেস অফিসেই আসেন। বিকেল বেলা বলে সব কর্মী ও নেতারা তখন ছিলেন কংগ্রেস অফিসে, তাঁরাই তাঁদের সাদর সম্ভাষণ করেছিলেন। গল্প বা কাহিনী কল্পনার পাখা মেলে অনেক দূর যেতে পারে, কিন্তু জীবন কথা বা জীবনী বলা হয় না। অবশ্য বিদ্যামন্দির ও কংগ্রেসের তৎকালীন প্রধান কর্মী হিসাবে ছিলেন হামিদ, সিরাজ ও বিজয় মোদক। এঁদের মধ্যে হামিদুল হক ছিলেন বাহির-ভিতরের সংযোগ রক্ষক। সেজন্য নজরুলের সঙ্গে তাঁর মায়ের সাক্ষাতের জন্য দৌড়-ঝাঁপ যা করার তিনিই করেছিলেন। সেই জন্য রহিম সাহেবের তাঁর কথাটা বেশি মনে ছিল। কিন্তু কি ঘটেছিল, সেকথা হয় তিনি ভুলে গেছেন এই পঁয়তাল্লিশ বছর পরে; অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল বিষয় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর উক্ত ভাষণে বলেছেন—"উক্ত কংগ্রেস অফিসের

জনৈক কর্মী জনাব হামিদুল হক সাহেব আমাদিগকে তাঁর নিজ বাড়ি নিয়ে যথাযথ সমাদর ও আপ্যায়িত করলেন", এটাও ঠিক কথা নয়। কারণ ঐ সময় বিদ্যামন্দিরের অর্থাৎ কংগ্রেস কর্মী হিসাবে যাঁরা সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন তাঁরা কখনও বাড়ি যেতেন না। কারণ তখন চলেছিল আন্দোলনের দুটি ধারা। একটি সশস্ত্র বিপ্লবের, আর একটি অসহযোগ। হামিদ, সিরাজ ইত্যাদিরা এই দুটি ধারার বিশিষ্ট কর্মী। তাঁদের দাদারা সকলেই ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের চাকুরে। যাতে বাড়িতে কোন পুলিসী হাঙ্গামায় কেউ জড়িয়ে না পড়ে সেই জন্যই কর্মীরা কংগ্রেস অফিসকেই ঘরবাড়ির সামিল করেছিলেন। অতএব কাজী আবদুর রহিম সাহেবের এ কথা সম্পূর্ণরূপেই অলীক। অবশ্য বর্তমানে তাঁর বয়সও হয়েছে, সত্য ঘটনা বিস্মৃত হওয়াই স্বাভাবিক।

নজরুল তাঁর "পথচারী" কবিতায় লিখেছেন,

"কে জানে কোথায় চলিয়াছি ভাই মুসাফির পথচারী,
দুধারে দু'কূল দুঃখ-সুখের মাঝে আমি স্রোত-বারি।
আপনার বেগে আপনি ছুটেছি জন্মশিখর হতে
বিরাম বিহীন রাত্রি ও দিন পথ হতে আন্ পথে।
**নিজ বাস হল চির পরবাস, জন্মের ক্ষণ পরে
বাহিরিনু পথে গিরি পর্বতে—ফিরি নাই আর ঘরে**
পলাতকা শিশু জন্মিয়াছিনু গিরি-কন্যার কোলে,
বুকে না ধরিতে চকিতে ত্বরিতে আসিলাম ছুটে চলে।"

(পথচারী, চক্রবাক)

এই কয়েকটি পঙক্তির মধ্যেই নজরুলের বাল্যজীবনের আকুতি, বেদনার গতিশীল জীবনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। ছেলেবেলা থেকে সম্বিৎ হারানো পর্যন্ত তাঁর জীবন ছিল "ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর"এর ক্ষ্যাপার মতই, তিনি জীবন নিয়ে ফিরেছিলেন সেই মহারত্নকে পাবার জন্য। কিন্তু তিনি নিজেই যে পরশ পাথর, সে চেতনা তাঁর ছিল না। পথ চলতে চলতে যাকে ছুঁয়েছেন, সেই তো জীবনরত্নে পরিণত হয়েছে। দেশবাসীকে, নিপীড়িত মানবকে তিনি যে রত্নের সন্ধান দিয়েছেন সেই রত্নকে চুরুলিয়াবাসীরা কি ভাব-নেত্রে দেখতে পেরেছিলেন ?

তাই তিনি বলেছিলেন—

"নিজবাস হল চির পরবাস, জন্মের ক্ষণপরে,
বাহিরিনু পথে গিরি-পর্বতে ফিরি নাই আর ঘরে।"

নজরুলের এই স্বীকৃতির বাণীর খবর কি তাঁর গ্রামবাসীরা জানেন ? শুধু এইটুকু তাঁরা জেনেছিলেন ও দেখেছিলেন 'গ্রামের একটা ক্ষ্যাপা ছেলে

ও অকেজো সংসার বিমুখকে। সেই দুঃখে নজরুল "জন্মের ক্ষণপরে" অর্থাৎ তের বছর বয়সে গৃহছাড়া হয়ে চিরকালের জন্য "বাহিরিনু পথে গিরি পর্বতে **ফিরি নাই আর ঘরে**।" কথাটি বলে কাজী আবদুর রহিম সাহেবের উক্ত ভাষণের প্রতিবাদ কবি নজরুলই করেছেন। শুধু তাই নয়, নজরুলের মায়ের সঙ্গে যে প্রচণ্ড অভিমানের কথা এতক্ষণ বলা হল সে কথাও তিনি এই কবিতায় বলেছেন, "পলাতকা শিশু জন্মিয়াছিনু গিরিকন্যার কোলে"। কবি নিজেকে বেগবান ঝর্ণার সঙ্গে তুলনা করে বলছেন আমি যাঁর কোলে এসেছিলাম তিনি "গিরি কন্যা"। আমি যেখান থেকে "পলাতকা শিশু" তের বছর বয়সে পালিয়ে এসেছিলাম ঝর্ণার মত মহাসমুদ্রে মিলবার জন্য। অর্থাৎ জনগণের সাথে ক্ষুদ্র গৃহকোণ ছেড়ে অসীম গতিময় প্রাণের মধ্যে মিলবার জন্য ঘর ছেড়েছিলাম। কিন্তু এই প্রাণবান ছেলেকে ছোট্ট সংসারের ক্ষুদ্রতার মধ্যে আটকে রাখতে তাঁর মা চান বলেই তিনি "বুকে না ধরিতে চকিতে ত্বরিতে আসিলাম ছুটে চলে"[৫] বলে ঘর ছাড়ার কৈফিয়ৎ দিলেন।

এই পথচারী কবিতাটির মধ্যেই কবি তার নিজের জীবন কথা অতি স্পষ্ট ভাবে বলে গেছেন। তাই আমরা হয়তো কোনদিনই কবি ও তাঁর মায়ের প্রচণ্ডতম অভিমানের সত্য ঘটনা জানতে পারব না, তবুও মা ও ছেলের মধ্যে যে একটা সামুদ্রিক ফারাক ঘটে গিয়েছিল তা অকাট্য সত্য। তাকে যতই "শাক দিয়ে মাছ ঢাকা"র মত চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলুক, তাকে কেউ চেপে রাখতে পারবে না।

নজরুলই বলেছেন—"ওরে সত্য যে চিরস্বয়ম প্রকাশ
রোধিবে কি তারে কারাগার ফাঁস।"
(বিষের বাঁশী)

কবি তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের কাছে এক চিঠিতে লেখেন ঃ "ছেলেবেলা থেকে পথে পথে মানুষ আমি। যে-স্নেহে, যে-প্রেমে বুক ভরে উঠে কাণায় কাণায়—তা' কখনো কোথাও পাই নি। শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা—শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ও নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব ? তাই হয়তো অল্পেই অভিমান হয়।"[৬]

নজরুলের এই ঘটনাটা সকলে জানবার জন্য কেন এত উৎসুক ? কারণ, নজরুল তথাকথিত মানব সাধারণের মত একটা গতানুগতিক মানুষ নয়। তিনি অসাধারণ, সেই জন্যই তাঁর এই অসাধারণত্বের কোথায় উৎস, তারই সন্ধানের জন্য। অসাধারণ মানুষেরই জীবনী লেখা হয়, সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্য। তাঁর হাসি কান্না, তাঁর বেদনা চেতনা, দুঃখের ও সুখের উৎস অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় অনাগত মানুষের জন্য। তাই কবি নজরুলের

(৫) চক্রবাক—পথচারী—পৃঃ ২৬
(৬) নজরুল প্রেমের এক অধ্যায়—সৈয়দ আলী আসরফ (ঢাকা) পৃঃ ৪৯

কাব্য, সঙ্গীত সৃষ্টির প্রেরণার মূল অনুসন্ধানের দরকারের তাগিদেই এইসব লেখার প্রয়োজন। নজরুলের জন্মস্থানের মধ্যেই রয়েছে তার মূল। কিন্তু সেই মূল আজ চুরুলিয়ার মাটিকে ছাড়িয়ে বিশ্বের মানব সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। নজরুলের জন্মক্ষণ থেকে তার তের বছর বয়স পর্যন্ত গ্রামস্থ সকলের উদাসীনতার মধ্যে বেদনার সঙ্গে নজরুলের জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। আজ বিশ্ববাসী যখন স্বীকৃতি দিচ্ছে; তখন তাঁর জন্মস্থান তাঁর গৌরবের অংশীদার হতে চাইছেন। কিন্তু অসত্য ভাষণে কি তাঁকে আপন করা যাবে? তাঁর সাধনা, তাঁর কর্ম, তাঁর মর্মের সিংহ-দুয়ারকে খোলাব যদি চোখ, মন আমরা না পাই, তা হলে শুধু অহঙ্কার প্রকাশে তাঁকে পাওয়া যাবে না। তাতে তাঁকে বেদনাই দেওয়া হবে। অসম্মানই করা হবে। তাঁকে ছুঁড়ে ফেলা হবে অগৌরবের পঙ্কে।

জীবনেব প্রথমে তিনি একটি গান লিখেছিলেন—

> "দিয়া বেদনাব পবে বেদনা
> নাথ! দিলে একি এ বিপুল চেতনা।" (ছায়ানট)

আমরা নজরুলেব এই "বিপুল চেতনাব" উৎস সন্ধানের জন্যই প্রত্নতত্ত্বের কাজ কবতে চাই। সত্যকে উদ্ঘাটন করে মিথ্যাকে জঞ্জালের মত অপসারিত করতে। নজরুলের এই ঝডেব গতি কি তার মায়ের কাছে আঘাত পাওয়ার মধ্যে? তাঁর এই প্রচণ্ড অভিমানের মধ্যে নিহিত রয়েছে। কবি পথচারীতে বলেছেন ঃ

> "জননীরে ভুলি 'যে পথে পলায় মৃগ-শিশু বাঁশী শুনি,
> যে পথে পলায় শশকেরা শুনি ঝর্ণার ঝুনঝুনি;
> পাখী উড়ে যায় ফেলিয়া কুলায় সীমাহীন নভোপানে
> সাগর ছাড়িয়া মেঘের শিশুরা পলায় যানে;
> সেই পথ ধরি পলাইনু আমি। সেই হতে ছুটে চলি
> গিরিদরী মাট পল্লীর বাট সোজা বাঁকা শত গলি।".

যে বাঁশীর স্বর শুনে হরিণ শিশু নিজের মাকে ভুলে বংশীধারীর কাছে ধরা দিতে চায়; কবি নজরুল কি সেই বাঁশীর সুরের টানেই তের বছর বয়সে মৃগ শিশুর মত ছোট গ্রাম, ছোট্ট গৃহকোণ ছেড়ে অসীমের পথ ধরেছিলেন? এই বাঁশীর সুর শুনবার উৎস কি মায়ের সঙ্গে প্রচণ্ড অভিমানের আঘাতে খুলে গিয়েছিল?

প্রেমের প্রথম অধ্যায়

"নারীর বিরহে নারীর মিলনে নর পেল কবি প্রাণ,
যত কথা তার হইল কবিতা শব্দ হইল গান।"
(নারী, সর্ব্বহারা, পৃষ্ঠা ৪১)

নজরুল এই বাস্তব সত্য অনুভব করেছিলেন কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে। ১৯১২ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তাঁর জীবন ছিল উদ্‌ভ্রান্ত। এই সময় থেকেই তিনি বারবার চুরুলিয়ার নিস্তরঙ্গ সমাজ থেকে বাইরে চলে গেছেন (পালিয়ে), আবার ফিরে এসেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল কি করে পড়াশুনা করে মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠবেন সেইদিকে। কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য স্বগৃহের ওপর ভরসা না করতে পেরে নিজের চেষ্টায় তিনি জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন।

তাঁর শরীরের গঠন ছিল তাঁর বয়সের চেয়ে পুষ্ট, দেহ ছিল অটুট, সুন্দর ও স্বাস্থ্যে ভরা জোয়ারে টইটম্বুর। নজরুল যেমন অনন্ত যৌবন বেগের অধিকারী ছিলেন, তেমনি তাঁর কৈশোর-যৌবন সন্ধিক্ষণের মন ছিল উপলব্ধির ও অনুভূতির রত্ন ভাণ্ডাব স্বরূপ। এই বয়সে এইরূপ ঐশ্বর্যময় হৃদয়ের যিনি অধিকারী, তাঁকে "বিষয়-বিষ-বিকারাচ্ছন্ন" লোকেরা বুঝে উঠতে পারেননি। তাই নজরুলকে বার বার গৃহ ছাড়তে হয়েছিল। অবশেষে তিনি চুরুলিয়াকে একেবারে বর্জন করলেন। কেন করলেন? এই প্রশ্নটা আমার মনে অনেকদিন থেকেই ছিল। তাই এ নিয়ে আমি সমানে অনুসন্ধান করে এসেছি। ১৯২৪ সালে নজরুল হুগলীতে আসার পর তাঁর "রিক্তের বেদন" গ্রন্থটি ছাপা হয়। তাতে লক্ষ্য করলাম "শহীদা খানম" ছদ্মনামে একটি মেয়েকে উদ্দেশ্য করে কবি লিখেছেন, "...তাই এ নিশীথে একটা পৈশাচিক হাসি হেসে গাইছি—'নিঠুর, এই করেছ ভালো! এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দাহন জ্বালো। এই করেছ ভালো!' কি হয়েছে তাই বলছি। যেদিন চিঠি পেলুম, শহীদার, আমার গোপন ঈপ্সীতার, বিয়ে হয়ে গেছে—সে সুখী হয়েছে। মনে হল, যেন এক বন্ধন হতে মুক্তি পেলুম।" আবার লিখেছেন[১] "ভুলে যাও শহীদা, ভুলে যাও, নতুনের আনন্দে পুরাতনকে ভুলে যাও। তোমাদের কোন ব্যক্তিত্বকে ভালোবাসার অধিকার নেই, জোর করে স্বামীত্বকে ভালোবাসতে হবেই।" কবি "রিক্তের বেদন" লিখেছিলেন সৈনিক জীবনে। তখন তাঁর বয়স উনিশ কিংবা কুড়ি হবে। এ বিষয়ে

(১) রিক্তের বেদন-পৃঃ ২৩-২৪, ১ম সংস্করণ

আমি ব্যক্তিগত ভাবে আর অনুসন্ধানের চেষ্টাও করিনি তেমন সুযোগও আসেনি। ১৯৬৫ সালে শ্রদ্ধেয় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথায় লিখলেন—"অনেক দিন পরে আমারই কারণে নজরুল ইসলামের এই গ্রন্থখানা, আরও কিছু পুস্তক, কিছু চিঠিপত্র, অনেক দিনের পুরানো কবিতার খাতা, বিছানা, কিট্‌ব্যাগ সুটকেশ এবং "ব্যাথার দান" পুস্তকের উৎসর্গে বর্ণিত *মাথার কাঁটা* খোয়া যায়। মিউজিয়ামে রক্ষিত মূল্যবান বস্তুর মত নজরুল এই *কাঁটাটি*ও রক্ষা করে আসছিলেন।

উৎসর্গে লেখা ছিল—
"মানসী আমাব !
মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে
ক্ষমা করনি,
তাই বুকের কাঁটা দিয়ে
প্রায়শ্চিত্ত করলুম।"

কে ছিলেন *এই কাঁটার মালিক* তাঁব নাম সে আমায় কোনদিন বলেনি। কি করে জিনিসগুলি খোয়া গেল সেই কথা হয়তো আমার রাজনীতিক জীবনের স্মৃতিকথায় কোন দিন বোলব।"২

"কে ছিলেন এই কাঁটার মালিক?" এই প্রশ্ন বহুদিন থেকেই আমার মনের মধ্যেও ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যখনই কোন নজরুল-বন্ধুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তখনই এ বিষয় নিয়ে নানা রকমে অবতারণা করেছি আভাস মাত্র পাওয়ার আশায়। কিন্তু সে আশা আমার পূর্ণ হচ্ছিল না। তাই "ব্যাথার দান" গ্রন্থে যখন দেখলাম কবি লিখছেন—"জীবনের অনেকগুলো দিন তোমার বিরহে কেটে গেল, তাতে তোমাকে না হারিয়ে আরও বড় করে পেয়েছি। তোমায় যে আমি হারিয়েছিলাম সে তোমাকে এত সহজে পেয়েছিলাম বলেই।"...... "দুনিয়ার যত রকম আনন্দ আছে তার মধ্যে এই বিচ্ছেদের ব্যথাটাই হচ্ছে সব চেয়ে বেশি আনন্দময়।" যে ভাগ্যবতীর খোঁপার কাঁটা সম্বল করে পল্টনে নাম দিয়ে সৈনিক বৃত্তি নিয়ে কবি চুরুলিয়া ত্যাগ করেছিলেন—তিনি কে? তাঁর দেওয়া বেদনাই কবিকে সৃষ্টি করেছে। দীর্ঘজীবন নজরুলের সঙ্গে কাটিয়েও তাঁর মুখে নিজের কথা চেষ্টা করেও শুনতে পাইনি কখনও। তবুও "সত্য যে চির স্বয়ম্ প্রকাশ"।

এই যুগের এক নজরুল ভক্ত, যিনি নজরুলকে দেখেছেন নিঃশেষিত আগ্নেয়গিরির মত। তিনি কোন কাজে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা হতে হতে পেলাম হদিস। কিন্তু হদিস পেলাম বললেই তো হবে না, তার কিছু প্রমাণও তো চাই। এই নজরুল-জীবন-সন্ধানী,

(২) কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা—মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-পৃঃ ৪৪

নজরুলের দিওয়ানা হয়ে যাওয়ার কারণটি বললেন, সেই সঙ্গে নাম ও বাসস্থানও বললেন।

আমি এই সংবাদ শুনে নজরুলের জন্মস্থানে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। উনিশশো আটষট্টি সালের চোদ্দই অক্টোবর সপরিবারে আমার আকাঙ্ক্ষিত তীর্থে যাত্রা করলাম। সেখানে কবির এক আত্মীয়র সঙ্গে আমার আলাপ হল। তিনি ঐদিন বহু যত্নে আমাকে সব কিছু দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়ে আপ্যায়িত করলেন। আমরা তাঁকে আমার আস্তানায় নিমন্ত্রণ করে এলাম।

তিনি নির্দিষ্ট দিনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর, নজরুলের বাল্য জীবনের বহু বিষয়ের উপর আলোচনা হল। দেখলাম তাঁরা নজরুল সম্বন্ধে কিছু যেমন জানেন না, তেমন নজরুলের সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধেও পড়েছেন খুব কম। অতঃপর সেই ভদ্রলোককে নজরুল-জীবনের প্রথম প্রেমিকার নামটি বলে আমি কবি-প্রিয়ার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তাতে তিনি বিস্মিত হয়ে আমাকে বললেন যে, "হ্যাঁ, এই নামের একটি মেয়ে গ্রামে ছিলেন, তাঁর বিবাহ হয়েছে পাশের গ্রামে। তিনি এখন এক বিরাট পরিবারের গৃহিণী।"

আমি বললাম "তা তো হবেনই, সেকি আজকের কথা, সে তো ১৯১৬।১৭ সালের কথা।"

তখন কবির আত্মীয় বললেন—এসব বাজে কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না। একি হতে পারে? কবির তখন বয়সই বা কি? আমি বললাম—দেখুন, 'রিক্তের বেদন' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন "একটি মেয়ের জন্য আমার উদ্দেশ্য, দেশের স্বাধীনতার আদর্শকে বিসর্জন দেব।" আবার বলেছেন—"ঘরের মায়ের জন্য আমার দেশমাতাকে কি ভুলতে পারি? তাঁকে বাঁধন মুক্ত করতেই হবে।"

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভদ্রলোক বললেন—"কবিরা সব বেশি কথা বলে কল্পনার ওপর, সেখানে বাস্তব কথা কমই থাকে।" নজরুলের দেশের লোক বলে তিনি বিশ্বের সাহিত্যিক, কবি শিল্পীদের সম্বন্ধে কিছু না জেনেও বিশারদ হয়ে ওঠার দাবি করার মত করে কথাটা বললেন। আমি প্রতিবাদ করে বললাম, কবিরা যা লেখেন তার সঙ্গে বাস্তবের একটা নিকটতম সম্পর্ক থাকেই। তাঁদের জীবন গড়ে ওঠে বাস্তব ঘটনার ওপর। তা না হলে যে তাঁরা মিথ্যাবাদী হয়ে যান। মিথ্যাবাদী কি জগতে শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারেন? তিনি তাঁর নারী কবিতায় লিখেছেন:

"নারীর বিরহে নারীর মিলনে নর পেল কবি প্রাণ
যত কথা তার হইল কবিতা শব্দ হইল গান।"

আর একটি কবিতায় বলেছেন:

"তল কেবা পায় অথই নদীর জল।"

কবির মানস-লোক যে কত গভীর তা তাঁর চারপাশে যাঁরা "বিষয়-বিষ-বিকারে" অন্ধের মত আছেন তাঁরা ধরতে পারবে বলুন? এই দেখুন তিনি তাঁর কবিতায় আর এক স্থানে বলেছেন ঃ

"সবাই যখন তোমায় ঘিরে করবে কলরব,
আমি দূরে ধেয়ান-লোকে করবো তোমার স্তব!"[১]

আমি কবির আত্মীয়কে আরো বললাম—কবিদের জীবনে প্রেরণার উৎস নারীর প্রেম ও প্রত্যাখ্যানের মধ্যেই। কবি যখন যুদ্ধে যান, তখন যাঁর মাথার কাঁটা নিয়ে পাড়ি জমিয়েছিলেন, সেইখানেই বিদ্রোহী কবির কাব্য-জীবন-উৎস। সেই উৎসের মূল ভিত্তি-ভূমি এই চুরুলিয়ায়। তাই নারী পড়ে থাকে পিছনে, নর প্রেরণা পেয়ে হয় কবি, শিল্পী, জগৎপূজ্য। আপনার দেশেরই কবি চণ্ডীদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি এমনি করেই নারী প্রত্যাখ্যাত হয়ে হয়েছেন জগৎপূজ্য মহাকবি। আপনারা যেটাকে লজ্জার কথা মনে করছেন, যেটা জগতের কাছে হয়েছে পূজ্যা প্রতিমা-স্বরূপা। যাঁর গ্রহণের আনন্দে, বর্জনের ব্যথায়, কবি দিওয়ানা হয়ে দেশে দেশে ঘুরলেন। তিনি কবির জীবনে সত্য, সুন্দর, মহীয়সী। সেইরূপ জাতির জীবনে তিনি বর্তমানে যেমন, দূর কালেও তেমন সত্য সুন্দরের মতো মহীয়সী রূপেই পূজা পাবেন। সেদিন তাঁর সন্ধান না পেলেও কবির কথায় তাঁকে বলা যাবে—

"যে দিন আমি থাকব নাক থাকবে আমার গান,
বলবে সবাই, "কে সে কবির কাঁদিয়েছিল প্রাণ?"

আমরা এযুগের লোকেরা যা জানলাম না পর যুগে যাঁরা জিজ্ঞাসা করবেন, "কে সে কবির কাঁদিয়েছিল প্রাণ?" তারই জন্য আমরা কবি জীবনের উৎস সন্ধানে প্রয়াসী। কবির জীবনের ক্লেদকে আমরা ছড়িয়ে দিতে চাইছি না। নজরুল জীবন যাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে ব্যথা পেলেন, প্রত্যাখ্যাত হলেন, তাতে তিনি জগতে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন তার মূল কোথায় প্রসারিত? এই জিজ্ঞাসাই আমাদের। এ যেন হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতা আবিষ্কারের আনন্দের মতো।"

তাতে এই ভদ্রলোক বললেন—"না, না, আমি আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে, যে নজরুলের ঐ অত ছোট বয়সে কি এটা সম্ভব হয়েছিল?"

আমি বললাম—"সাধারণ বুদ্ধিতে দেখলে আশ্চর্য লাগে বটে কিন্তু নজরুল তো ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধির লোক। মাত্র ২০-২১ বছর বয়সে যিনি

(১) চক্রবাক—কাজী নজরুল ইসলাম 'এ মোর অহঙ্কার' কবিতা পৃঃ ৩৮ (১ম সংস্করণ)

ভারত বিখ্যাত হয়েছিলেন এবং ঐ বয়সেই বিদেশেও তাঁর কিছু কিছু খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁকে আরও বলি, আপনি তো নজরুলের থেকে বয়সে কিছু বড়ই হবেন, তাই আমরা যা শুনেছি তাও আপনাকে বলতে চাই। নজরুল যে ভাগ্যবতী, দেশপূজ্যা মেয়েটিকে ভালবেসেছিলেন, তিনি ছিলেন ধনী কন্যা। নজরুল খানদানি বংশের ছেলে হলেও তাঁরা দরিদ্র। এই ছিল মূল কথা। কবির বাড়ির লোকেরাও এর বিরুদ্ধাচরণ করেন। যুবক কবি গৃহ ছাড়লেন, গ্রাম ছাড়লেন। শুধু কবি প্রিয়ার মাথার খোঁপার একটি কাঁটাকে সম্বল করে সৈনিক ব্রত নিয়ে চিরকালের মত সব ছেড়ে গেলেন। সেদিন তাঁর এক হাতের সম্বল কাঁটা আর হাতে সম্বল করলেন রাইফেল। নজরুলের ভাষায় বলা যায়,

"একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী
আর হাতে রণ-তূর্য্য"

(বিদ্রোহী, অগ্নিবীণা)

তিনি আরও লিখেছেন,

"তোমায় কুলে তুইলা বন্ধু
আমি নামলাম জলে।
আমি কাঁটা হইয়া রই নাই বন্ধু
তোমার পথের তলে।
আমি তোমায় ফুল দিয়াছি কন্যা
তোমার বন্ধুর লাগি
যদি আমার শ্বাসে শুকায় সে ফুল
তাই হইলাম বিবাগী।
তুমি বুকের তলায় আছো আমার গো
পইরা শুকাইছি না গলে।"

নজরুল-জীবনে প্রেম কোথাও কলঙ্কিত হয়নি। তিনি সব সময়ই তাঁর পবিত্রতার মর্যাদা দিয়েই নিজে জগৎপূজ্য হতে পেরেছেন।

বিপ্লবী নজরুলের বিপ্লবী শিক্ষক নিবারণ ঘটক

বর্ধমান জিলাব সিয়ারশোল-এব নাম এখন প্রায় সকলের মুখেই, কারণ এইখানে নজরুল বেশ কিছুদিন ছিলেন। সিয়ারশোলে বাজস্টেটের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে পডতেন, তাব নাম ছিল সিয়ারশোল বাজ হাই স্কুল। ১৯১২ সালে দারোগা রফিকউদ্দিন সাহেব নজরুলকে আসানসোলেব রুটিব কারখানা থেকে উদ্ধাব কবে তাঁব দেশ মৈমনসিংহে নিয়ে গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দেন। নজরুল সেখানে স্থিব চিত্তে থাকতে পাবেননি। মৈমনসিংহ থেকে চলে এসে সিয়াবশোলেব উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯১৪ সালে ভর্তি হন।

এই স্কুলে তখন যুগান্তব দলেব একনিষ্ঠ কর্মী শ্রীনিবারণ ঘটক ছিলেন শিক্ষক। সিয়াবশোলের রাজারাও ছিলেন এসব কাজের উৎসাহদাতা। নিবাবণ ঘটক শিক্ষকতাব সঙ্গে বিপ্লবী দলেব কর্মীও সংগ্রহ করতেন। নজরুলেব জীবন তখন মহান কোন কাজ পাওয়ার জন্য টগবগ করে ফুটছে। নিবাবণবাবুব অনুসন্ধানী দৃষ্টি তাঁর দিকে দ্রুত আকৃষ্ট হয়েছিল।

নজরুল ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সাল, এই চাব বৎসর ঐ স্কুলে পড়েন। এর মধ্যে যে সকল ঘটনা ঐ সিয়ারশোল রাজ স্কুলে ও সিয়াবশোলে ঘটে তা অনুধাবন করলে এটাই স্পষ্ট মনে হবে যে নজরুল যুগান্তব বিপ্লবী দলের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁর শিক্ষক নিবারণ ঘটকের দ্বারা। নিবারণ ঘটক আবার এই সিয়ারশোলেরই ছেলে।

সে সম্বন্ধে লিখেছেন বিপ্লবী জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী তাঁর "নমামি" গ্রন্থে, "বর্ধমান জেলার সিয়ারশোলের ছেলে বিপ্লবী নিবারণ ঘটক। তিনি ছাত্র ছিলেন বীবভূম জেলার নলহাটি থানার ঝাউপাড়া গ্রামেব মাইনিং স্কুলের। তাঁর মাসীমা, প্রথম নারী বিপ্লবী দুকড়ি বালার বাড়িও ছিল ঐ গ্রামে। নিবারণ বাবুর কিছু পরিচয় পাওয়া দরকার। তাই তাঁর জীবন বৃত্তান্ত কিছু বলছি। তিনি ছিলেন বিপ্লবী যুগান্তর দলের বিশেষ সভ্য। মাইনিং স্কুলে পড়বার সময় যুগান্তরের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে নিখিল ভারত বিপ্লবী সংগঠনের কাজে কায়মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে, সংগঠনের উদ্দিষ্ট কর্মের জন্যও বটে, তিনি মাঝে মাঝে তাঁর মাসীমার বাড়ি যেতেন। উদ্দেশ্য ছিল মাসীমার সাহায্যে বিপ্লবীদের সাময়িক আশ্রয় ঠিক করা এবং অস্ত্রশস্ত্র তাঁর সাহায্যে সংগোপনে সুরক্ষিত স্থানে রাখার ব্যবস্থা করা। একাজ তো একদিনে হয় না। মাসীমা প্রথম দিকে খুব কড়ালোক ছিলেন, কিন্তু নিবারণ বাবুর যাতায়াতে ও মাসীমার কাছে খুব ভালো ছেলে হয়ে থাকার জন্য মাসীমা ক্রমশঃ তাঁর প্রতি স্নেহপরায়ণ হয়ে ওঠেন। কিন্তু নিবারণের চালচলতিতে তাঁর মনে ক্রমশঃ সন্দেহ ঘনিয়ে ওঠে। তিনি ভাবেন, নিবারণ কি বিপ্লবী দলে গিয়ে জুটেছে

নাকি ? তিনি তাঁকে অনেক বোঝান। নিবারণ তাঁকে বোঝায় যে তিনি মাইনিং-এর ছাত্র, পাশ করে খনির বড় অফিসার না হয়ে এসব দলে যোগ দেব কি আখের নষ্ট করতে ?

এমনি করে দিন যেতে যেতে একদিন নিবারণ মাসীর কাছে ধরা পড়ে গেলেন একটি বইকে কেন্দ্র করে। ওঁর হাতে ছিল একখানা বই। মাসীমা বইটা দেখতে চাইলে তিনি বলেন যে ওটা একটা মাইনিং-এর বই, কিন্তু ধরা পড়ায় মাসীমা দেখলেন বইখানা সখারাম গণেশ দেউস্করের বিখ্যাত বই "দেশের কথা"।

মাসীমা বেশ ভাল করেই জানতেন যে এ বই একমাত্র বিপ্লবীরাই পড়ে আর বৈপ্লবিক পথে টানবার জন্য ছেলেদের পড়ায়। এমনি করে ধীরে ধীরে নিবারণ মাসীমাকে করলো যুগান্তর দলের সভ্যা। সংগঠন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, দলের দেহও অসংখ্য সভ্য সংগ্রহে পুষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিন এমনি অবস্থায় মাসীমার বাড়িতে মাষ্টার মশাইকে নিয়ে এলেন নিবারণ। "মাষ্টার মশাইয়ের" ব্যবহারে ও কথায় মাসীমার দেহ ও মনের ওপর বৈপ্লবিক বিদ্যুৎ সঞ্চার হল। এই মাষ্টার মশাই হলেন বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। এ পরিচয় মাসীমা বহুদিন পরে পেয়েছিলেন, যখন তিনি অস্ত্র আইনে গিরিফ্‌তার হয়ে যান তখন নিবারণকে জিজ্ঞাসা করে।

সিয়ারশোল রাজবাড়িতে রণেন গাঙ্গুলী বলে একজন নূতন কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি যেমন খুব ভালো লাঠি, মুষ্টিযুদ্ধ, ছোরা ও তলোয়ার খেলায় পারদর্শী ছিলেন তেমনি শেখাতেনও। তিনি পুরাদমে যুবকদের মধ্যে কাজ করে চলেছেন। এই সময় ক্ষুদিরামের গিরিফতারকারী নন্দলাল ব্যানার্জীকে কলকাতায় কে খুন করে। সেই সম্পর্কে পুলিস খোঁজ করতে করতে সিয়ারশোল রাজস্টেটের নবনিযুক্ত কর্মচারী রণেন গাঙ্গুলীর খবর পান। এই রণেন গাঙ্গুলী আর কেউ নন, ইনি হলেন সেই যুগের বিখ্যাত যুগান্তর দলের নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ; মুরারী-পুকুর বোমার মামলার পলাতক। এমনি করে নিবারণের চলল বিপ্লবী সংগঠনের কাজ জোর কদমে।

"তারপর 'রডা কোম্পানি'র থেকে লুট করা বহু পিস্তলের এক অংশ (এক বাক্স পিস্তল) নিবারণ এনে মাসীমার জিম্মায় রাখেন। মাসীমা তাঁর কাছে পিস্তল খোলা, গুলি ভরা, আটকান ও ছোঁড়ার কায়দা শিখে নিয়ে সেগুলি গুপ্তস্থানে রেখে দেন। পরে পুলিসের অদম্য চেষ্টায় এই বাক্সসুদ্ধ মাসীমা ধরা পড়েন। তখন তার কোলে একটি শিশু। এই শিশুটিকে রেখে তিনি জেলে যান। এজলাসে দেখা হয় নিবারণ ও অন্যান্যদের সঙ্গে। নিবারণের হয় পাঁচ বছর জেল আর মাসীমার হয় তিন বছর, ১৯১৭ সালে। মাসীমার ছিল ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, স্বামী, পিতা ও ভাই। তিনি জেলে যাবার সময় বাড়ির সবাইকে ডেকে বলেন, আমার ছেলেদের দেখো তোমরা, ওরা 'মা' 'মা' বলে কাঁদলে ওদের বুঝিয়ে বোলো

তোদের মাকে ব্রিটিশ সরকার ধরে নিয়ে গেছে।"[১] দুকড়ি বালার সঙ্গে আর একজন মহিলা ধরা পড়েন। তিনি "রাজসাক্ষী হওয়ায় ছাড়া পেয়েছিলেন, তাঁর নাম সুরধনী মোল্লানী।"[২] এ হেন নিবারণ ঘটক মহাশয়ের ছাত্র হবার সৌভাগ্য হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলামের। বিপ্লবীরা যে যেখানেই জীবিকার অছিলায় যে কাজ নিয়েই থাকুক না কেন তাঁরা সব সময়েই শুদ্ধমন, অটুট দেহ, ভাবপ্রবণ যুবকদের সুবিধা পেলেই নানা কৌশলে দলে টেনে নেবার চেষ্টা করতেন। নজরুল ঐ স্কুলের যখন ছাত্র তখন নানা প্রবন্ধ, কবিতা ও নাটিকা লিখতেন এবং তা মাষ্টার মশাইকে দেখাতেন ও শোনাতেন। মাষ্টারমশাইও নানাভাবে নজরুলের ভাবকে, ভাষাকে পুষ্ট করার নির্দেশ দিতেন। সিয়ারশোল তখন বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের একটি বিশিষ্ট স্থানে পরিণত হয়েছিল। লক্ষ্য করার বিষয় ১৯১৭ সালে নিবারণ ঘটক সিয়ারশোল থেকে গিরিফ্‌তার হলেন, আবার ঐ সালেই সিয়ারশোল রাজস্টেটের কর্মচারী হিসাবে সারা ভারতের বিপ্লবী যুগান্তর দলের নেতা মুরারীপুকুর ডাকাতির পলাতক রণেন গাঙ্গুলী ওরফে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী (বর্তমানে কলিকাতা বহুবাজার স্ট্রীট যাঁর নামে) গিরিফ্‌তার হন। আবার ঐ সালেই নজরুলও যোগ দেন ৪৯নং বাঙালী পল্টনে।

নিবারণ ঘটক মহাশয়ের ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয় এবং মুক্তি পান ১৯২০ সালের ২০শে ডিসেম্বর প্রেসিডেন্সি জেল থেকে। সাধারণ হিসাবে নিবারণবাবুর ১৯২২ সালে মুক্তি পাওয়ার কথা। কোন কোন লেখক এত আগে কেন নিবারণবাবু মুক্তি পেলেন, এ-কথায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু জেলের কয়েদীদের বছরে তিনমাস করে শাস্তির সময় মৌকুফ্‌ হয়; তাতে হিসেব করে দেখা যায় নজরুল-শিক্ষক বিপ্লবী নিবারণবাবু অতি শুদ্ধ ব্যক্তিই ছিলেন। ১৯২০ সালে নজরুল কলকাতায়। ১৯২১ সালে নজরুল "বিদ্রোহী" কবিতা লিখে সহসা খ্যাতির উচ্চশিখরে। নিবারণ ঘটক তখন ঝাউপাড়া, সিয়ারশোল, নলহাটি করছেন। নিশ্চয়ই তার ছাত্রের কৃতিত্বের সংবাদও পাচ্ছেন।

নিবারণবাবু কারা মুক্তির কয়েক বছর পর চুঁচুড়ায় যাতায়াত শুরু করেন। কারণ, তাঁর বিপ্লবী গুরু অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, গুরুভাই ভূপতি মজুমদার, মহাকাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করা।

হুগলীতে যখন নজরুল আসেন তখন কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রবল ঢেউ যেমন বয়ে যাচ্ছিল তেমনি বিপ্লবী সংগঠনও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছিল। হুগলীর বিপ্লবীরাই নজরুল ও তাঁর পরিবারবর্গকে সাদরে নিয়ে আসেন। তখন হুগলীতে "জাতীয় বিদ্যামন্দির" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিবারণ ঘটক মহাশয়ের শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ তখন উক্ত

(১) এই কাহিনীর সাহায্য নিয়েছি বিপ্লবী জিতেশচন্দ্র লাহিড়ীর "নমামি" গ্রন্থের ৬১ থেকে ৬৯ পৃষ্ঠা।

(২) কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা—মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ পৃঃ ৪৩।

বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক। নজরুল তখন থাকেন বিদ্যামন্দিরের অতি কাছে মোগলপুরা লেনের একতলা একটি বাড়িতে সপরিবারে। আমরা অনেকেই বিদ্যালয় ছেড়ে ঐ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র ছিলাম। কৃষ্ণনগরের অনন্তহরি মিত্র, যিনি পরে শহীদ্ হন তিনিও কিছুদিন ছিলেন, এবং তিনি ছিলেন নজরুলের অতি প্রিয়ভাজন। তখন শ্রীরামপুরে শহীদ্ গোপীনাথ সাহাও বিদ্যামন্দিরের ছাত্র। তিনি নজরুলের কাছে প্রায়ই থাকতেন এবং নজরুলও তাঁকে অপার স্নেহ করতেন। তাঁর ফাঁসি ও দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে নজরুল লিখেছিলেন—

"ফাঁসির গোপীতে দেখেছিলে তুমি
বাঁশীর গোপীমোহন।" (ইন্দ্রপতন)

বিপ্লবী নিবারণ ঘটক তখন চুঁচূড়ায় মাঝে মাঝেই নলহাটী থেকে আসতেন পূর্বেই বলেছি। হুগলী জেলার যুগান্তর দলের সঙ্গে তিনি বিশেষ যোগাযোগ রাখেন। তাই আমার সঙ্গেও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্ক গড়ে ওঠার কারণ শুধু স্বদলীয় তরুণ বলেই নয়, নজরুলের সঙ্গে আমার গভীর অন্তরঙ্গতার জন্যও বটে।

নিবারণ ঘটক আসা-যাওয়া করছেন চুঁচূড়া, হুগলীতে; তখন হুগলীর যুগান্তর সংগঠন খুব বৃদ্ধির দিকে। এই সময় হুগলীতে আসেন নজরুল, ১৯২৪ সালে। নিবারণবাবু থাকেন তখন চুঁচূড়া কামারপাড়ার বলরাম গলিতে তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি। তখন তিনি বেকার। এই সময় তৎকালীন শিক্ষক ৺দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় ও নিবারণ ঘটক আমার সঙ্গে একদিন নজরুলের বাড়ি যান। নজরুল তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁর মাস্টার মহাশয়কে বহু সমাদর করেন। এইদিন নিবারণবাবু নজরুলের সান্নিধ্যে আমাদের বলেন যে, 'আমি যে বছর গিরিফ্‌তার হই সে বছর নজরুল সিয়ারশোল রাজ স্কুলের ফার্স্ট ক্লাসের ফার্স্ট বয় ছিল। ও যে আবার যুদ্ধে গেল তা আমি জানি না।'

এ বিষয়ে আরও পরিচয় পরবর্তীকালে পেয়েছিলাম যখন নিবারণ ঘটকের সঙ্গে ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরে নজরুলের দেখা হয়েছিল। কৃষ্ণনগরে নজরুল অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকারের বাড়ি থেকে কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কের "গ্রেস কটেজ" নামক বাড়িতে সপরিবারে বাস করছেন। ঐ সময় যুগান্তর দলের এক গুপ্তসভায় আমি, নিবারণবাবুর সঙ্গে যাই। সেই সময় তিনি ও আমি একসঙ্গে নজরুলের বাড়িতে উঠি। তখন তাঁদের মধ্যে যে সব কথা হয় তাতে ঘটক মহাশয়ের কাছে বিপ্লবী দীক্ষার কথা বলেন নজরুল। আরও বলেছিলেন দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য লেখার প্রেরণাও নাকি তিনি ঐ সিয়ারশোল রাজস্কুলে তাঁরই কাছে পেয়েছেন।

শ্রদ্ধেয় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব লিখেছেন যে—"পল্টন হতে ফেরার

পরে নজরুল নিজেই আমার নিকটে স্বীকার করেছিল যে সে শ্রীঘটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।"[১] নজরুল তাঁর কাছে একথা স্বীকার করেছিলেন। আর আমরা হুগলীর মানুষ ও যুগান্তর দলের সভ্য হিসাবে এটা ভাল করেই জানতাম দুজনকেই, নজরুল ও নিবারণবাবুকে। তাঁরা তখনকার পরিস্থিতিতে সব কথা খোলাখুলি যেমন নজরুলও বলতেন না, ঘটক মশাইও ব্যক্ত করতেন না। তবুও আমি দুজনেরই কাছের মানুষ হিসাবে এটা বুঝেছিলাম যে নজরুল যুগান্তর দলের কর্মী ছিলেন কিন্তু কাজ করবার মুখেই নিবারণ ঘটক হয়ে গেলেন গিরিফ্‌তার। কে জানে ঐ পরিস্থিতি না হলে নজরুলের গতি কোন দিকে হত!

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়-এর "আমার বন্ধু নজরুল" গ্রন্থে বলছেন— "এয়ার গানে হাতবশ করতে হলে বড় পেঁপে হচ্ছে সব চেয়ে ভাল।"

"তিনদিন লাগল নজরুলের হাত ঠিক করতে।"

"প্রথম যেদিন লাগল পেঁপের গায়ে, নজরুলের সেদিন সে কী আনন্দ। যেন একটা বড় ভূখণ্ড জয় করল। সেই পেঁপে গাছটাই হল বড় লাট।"

"তার পরের গাছটা ছোট লাট তার পরেরটা ম্যাজিস্ট্রেট, তার পরেরটা এস ডি ও, তারপর থানার দারোগা, ছোট দারোগা ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রেণী অনুযায়ী সব সাজানো।"[২] শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় নজরুলের যে চিত্রটি এঁকেছেন তা' ইংরেজ শত্রু নিধনের আকুল আগ্রহ এয়ারগানে হাতের লক্ষ্য স্থির করে ইংরেজ ও তাঁর তাবেদারদের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করার সংকল্পরই সুস্পষ্ট প্রকাশ। এই ঘটনাটিতে শৈলজানন্দ যখনকার কথা বলেছেন, তখন নজরুল পড়েন সিয়ারশোল রাজ স্কুলে—বিপ্লবী শিক্ষক নিবারণ ঘটক যেখানে আছেন। পলাতক বিপ্লবী নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী রণেন গাঙ্গুলী নামে যেখানে লাঠিখেলা, ছোরা খেলা প্রভৃতি শিক্ষায় বিপ্লবী প্রেরণা দিয়ে কিশোর ও যুবকদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এক বৈপ্লবিক পরিবেশ। নজরুল তখন বন্দুক চালাবার জন্য ব্যাকুল, শৈলজাবাবুর এই তথ্য সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে নজরুল তখন তাঁর প্রেরণাদাতাদের দ্বারা বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত। শৈলজাবাবু তখন রাণীগঞ্জ স্কুলের ছাত্র। তিনি নিবারণ-বাবু সম্বন্ধে কিছুই বলেননি। হয়তো যুগান্তর দল, রায়বাহাদুরের নাতি বলে শৈলজাবাবুকে দলে টানতে ভরসা করেননি। নজরুলও তখন বিপ্লবী মন্ত্রগুপ্তির শিক্ষায় দৃঢ় চিত্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু শৈলজানন্দকে কিছুই বুঝতে দেন নি। নজরুল বিপ্লবী শিক্ষক নিবারণ ঘটক ও তাঁর মাসীমার অস্ত্র আইনে গিরিফ্‌তার, পলাতক রণেন গাঙ্গুলীর ও অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের গিরিফ্‌তারে সমস্ত পরিবেশের গুরুতর পরিবর্তনের আকস্মিক আঘাতের ফলে স্বাধীনতার সংগ্রামে নিজেকে যোগ্য করে তোলার উন্মাদনায়

(১) কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা—পৃঃ ৩৯
(২) আমার বন্ধু নজরুল—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়-পৃঃ ৩৭, অধ্যায়-৩।

স্কুলের প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র হয়েও আসন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা উপেক্ষা করে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলেন বলেই উল্লেখ করা বোধহয় সঠিক মূল্যায়ন করা হবে।

পরবর্তীকালে নিবারণ ঘটক আমাদের চুঁচুড়ার দেশবন্ধু হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন, ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত। এ বিষয়ে চুঁচুড়া দেশবন্ধু হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীসুধীরচন্দ্র বসু ৩রা জুলাই ১৯৬৮ তারিখে লিখে জানিয়েছেন—"৺নিবারণবাবু ১৯৩০ সালে দেশবন্ধু বিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ছিলেন। অবশ্য শেষের দিকে প্রায় দেড় বৎসর শারীরিক অসুস্থতার জন্য ছুটিতেই ছিলেন—তবে খাতায় তাঁর নাম ছিল।"

এই সময় নজরুল কলকাতায়, নিবারণবাবু চুঁচুড়ায়। নিবারণবাবু সাধারণ ভাবেই আন্দোলন বহির্ভূত জীবন যাপন করছিলেন, নজরুলও ধীরে ধীরে অধ্যাত্মরাজ্যের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন। আজ নজরুল মৌনতায় মগ্ন। তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষকও নেই, তিনি "১৯৬০ সালের ২১শে বা ২২শে ডিসেম্বর তাঁর ঝাউগ্রামের বাস ভবনে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন, আর ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৬৫ সালে ভারতের "প্রথম বিপ্লবী নারী" শ্রীযুক্তা দুকড়িবালা দেবী ৭৮ বৎসর বয়সেও জীবিত ছিলেন।"[১] এখানে দেখছি নজরুল জীবনের প্রথমে যুগান্তর দলের প্রেরণা প্রভূত পরিমাণে পেয়েছিলেন। করাচী থেকে পল্টন ফেরত এসে পেলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গ, শুধু সঙ্গই নয়, একই সঙ্গে বাস করতে লাগলেন ও "নবযুগ" সম্পাদনায় উভয়ে হলেন সহকর্মী অর্থাৎ সম্পাদক। নজরুল লিখতেন কৃষক ও শ্রমিকদের কথা। তৎকালীন সংবাদপত্রে কৃষক ও মজুরের কথা নজরুল ও আহ্‌মদ সাহেবই লিখতে শুরু করেন। কারণ "লাল জুজুর" ভয়ে ভদ্রলোকের কাগজগুলো প্রায় ব্রিটিশ ঘেঁষা লেখা লিখতেন। নজরুল ও আহ্‌মদ সাহেবেই প্রথম শুরু করেন "নবযুগে-এ"। নজরুলের লেখার কশাঘাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে মাঝে মাঝে কাগজের সংখ্যা কিছু কিছু বাজেয়াপ্তও হত। নবযুগের সম্পাদকীয় বাছাই করে নজরুল "যুগবাণী" গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। পরে সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করে দেয়। নজরুলের এই সময়ে আহ্‌মদ সাহেবের প্রেরণায় ধীরে ধীরে বিশ্বের শ্রমিক কৃষকদের দিকে মন ছুটে চলল। তাঁর জীবনের প্রেরণাদাতা দুজন হলেন—কৈশোরে বিপ্লবী শ্রীনিবারণ ঘটক ও যৌবনে শ্রমিক কৃষকের স্বাধীনতার উদ্গাতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ।

(১) কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা—মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-পৃঃ ৪৪

পল্টনে ও পরে কলকাতায়

সতেরো বছর বয়সে নজরুল ইংরাজদের কবল থেকে ভারতকে মুক্ত করে পূর্ণ স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন, সাথী ছিলেন শৈলজানন্দ। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাংলা সাহিত্যে মজুর শ্রেণীর ব্যথা, বেদনা ও অভাব অভিযোগের কথা গল্প সাহিত্যে আনেন। দুজনে মিলে দেশের স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন। বহু জল্পনা কল্পনার পর স্থির হল অস্ত্র-শস্ত্র চালনা ভাল না শিখলে ইংরাজকে তাড়ান যাবে না। অতএব ইংরাজদের সৈন্য দলে ঢুকে, সব কিছু উত্তমরূপে শিখে দেশের তরুণদের শিখিয়ে ইংরাজকে ঘা দিতে হবে। এই সংকল্প নিয়ে ১৩২৩ সালে (১৯১৬) উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালী পল্টনে যোগ দিলেন। শৈলজানন্দের মাতামহ ছিলেন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, অত্যন্ত ইংরাজ ঘেঁষা। তাঁরা নানা চেষ্টা করে তাঁর পল্টনে যোগ দেওয়ার প্রতিবন্ধক হলেন, তিনি ঘরে ফিরে এলেন বন্ধুকে বিদায় দিয়ে। দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সঙ্কল্প নিয়ে নজরুল চিরশত্রু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সৈন্যদলে যোগ দিয়ে করাচী চলে গেলেন। করাচীতে গিয়ে নজরুল বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে প্যারেড ও অস্ত্রশিক্ষায় মনসংযোগ করলেন।

করাচীর গ্যাজা লাইনে সৈন্যদের ব্যারাক ছিল। এই ব্যারাকে কবির সঙ্গে প্রবেশ করার দিন থেকে যেদিন সবাই পল্টন ছেড়ে চলে আসে (অর্থাৎ উনপঞ্চাশ বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট উঠে যায়) সেদিন পর্যন্ত অটুট বন্ধুত্ব হয় শ্রীশম্ভু রায়ের সঙ্গে। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে এই দুইটি বন্ধু করাচীর সাত হাজার বাঙালীর দলকে আনন্দে রেখে-ছিলেন। নানারকম বিপদ থেকে নব নব উন্মেষশালিনী উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা নজরুল সকলের মন হরণ করেছিলেন। শম্ভুবাবু ছিলেন নজরুলের সহায়ক হিসাবে। করাচীর গ্যাজা লাইনে এই শম্ভুবাবু ও নজরুলকে সকলেই চিনত, কি রেজিমেণ্টে কি রেজিমেণ্টের বাইরে। করাচীতে শম্ভুবাবু ও কলকাতায় মুজফ্ফর সাহেব কবি নজরুলের আত্মার আত্মীয় ছিলেন।

শম্ভুবাবু ছিলেন জমাদার ডিসিপ্লিন-ইন-চার্জ। আর নজরুল কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার। সোজাসুজি সৈনিকদের চড়াতেন শম্ভুবাবু; আর নজরুল ছিলেন পোষাক প্রভৃতি জিনিসের সরবরাহকারী।

গানবাজনার মাধ্যমে নজরুলের বন্ধুত্ব হয় শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। নজরুল যখন স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন মণিভূষণও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কবির গান গেয়ে বেড়াতেন। নজরুলের আর একটি বন্ধু ছিলেন হুগলী ঘুটিয়াবাজার নিবাসী জমাদার নিত্যানন্দ দে মহাশয়। এঁর কাছে নজরুল 'অরগ্যান' বাজাতে শেখেন।

কাজী নজরুল করাচীতে গিয়ে প্যারেড-এর হাত থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে কোয়ার্টার মাস্টার হয়ে লেখাপড়ায় ডুবে গেলেন। তখনকার দিনে যতরকম মাসিকপত্র 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ, 'ভারতী', 'মানসী' ও 'মর্মবাণী' 'সবুজপত্র' ইত্যাদি সবই তিনি রাখতেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ চন্দ্রের গ্রন্থ সবসময়েই তাঁর সঙ্গে থাকত। সিডিসাস কমিটির রিপোর্ট, তাও একখানি তিনি রেখেছিলেন। এই রিপোর্টে বাংলার বিপ্লবীদের বিষয়ে নানাভাবে ইংরাজ সরকার লিখেছিলেন। কাজীর এই গ্রন্থটি বিশেষ প্রিয় ছিল। আর ছিল রুশ বিপ্লবের পত্রিকা। সেসব নজরুল নানা কৌশলে হাত-সাফাই করে আমদানি করতেন। তাঁর কাছে ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বরলিপিও। নজরুল ডানপিটে হয়েও স্বাধীনতার ব্রত নিয়ে সমস্ত আইন কানুন মেনে চলতেন। কিন্তু শুনেছি তাঁর বন্ধু মণিভূষণ অবাধ্য ছিলেন বলে তাঁব প্রতি নানারকম শাস্তিরও ব্যবস্থা হয়েছিল। কবি নজরুল সেই জন্যই মণিবাবুর প্রতি বন্ধুত্বের হৃদয় উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। মণিবাবু খুব দুঃসাহসী ও নির্ভীক ব্যক্তি ছিল। তিনি "যুগান্তর" দলের একজন কর্মী। ভাল গাইতে ও বাজাতে পারতেন। সৈন্য বিভাগ থেকে ফিরে এসে বেঙ্গে চাকুরি পান।

পরে অসহযোগ আন্দোলনে চাকরি ছেড়ে দিয়ে মণিবাবু হুগলী বিদ্যামন্দিরে আসেন এবং নজরুলের গান গেয়ে তরুণ দলকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। মোক্ষানন্দগিরি নাম নিয়ে তারকেশ্বরে সন্ন্যাস আশ্রম করেছিলেন[১]। কবি নজরুল ডানপিটে দুরন্ত এবং বাঁধন ছেঁড়া সাহসী যুবক হলেও মণিবাবুব ঠিক উল্টো ছিলেন। তাঁর ভিতর একটা জানবার, বুঝবার একনিষ্ঠ প্রবৃত্তি ছিল। যাই হোক ব্যারাকের মধ্যে নানা সুবিধা অসুবিধার সংঘাতে দুটি বন্ধুব দিন চলে যাচ্ছিল গানে, আবৃত্তিতে, প্যারেডে ও কোর্টমার্শালের হুমকিতে। করাচীতে গান বাজনার সমস্ত ব্যবস্থাই ছিল। বেঙ্গল রেজিমেন্টে বেঙ্গলী ভলান্টিয়ার কমিটির দৌলতে আইন সম্মত কোন জিনিসেরই অভাব ছিল না। ভাঁজ করা অরগ্যান (এটি কাজীর বড় প্রিয় ছিল) থেকে আরম্ভ করে ব্যাঞ্জো, ক্ল্যারিওনেট, বেহালা প্রভৃতি সবরকম বাজনাই ছিল। আর এসব বাজনাই জমা থাকত কোয়ার্টার মাস্টার নজরুলের জিম্মায়। গাইয়ে বাজিয়েদের অভাব ছিল না রেজিমেন্টে। বেপরোয়া ডানপিটে বাঙালীর ছেলেরা জীবন-মরণ তুচ্ছ করে গুলি-বারুদের পিছনে উন্মাদ হয়ে ছুটেছে মরণ খেলা খেলতে। তাদের মধ্যে প্রতি সন্ধ্যাবেলা নজরুলের ঘরের সামনে কী আনন্দ, কি হুল্লোড়ই না হত। জীবন-মরণ খেলায় আত্মভোলা

(১) মণিবাবু নজরুল সম্বন্ধে একটি জীবনী লিখেছিলেন সন্ন্যাস অবস্থায়। প্রকাশকের অভাবে সেই অমূল্য গ্রন্থখানি ছাপাতে পারেন নি। তাঁর আশ্রমে চেষ্টা করে বইটি পাওয়া গেলে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে।

সাত হাজার তরুণ ছেলে করাচীর নৈশ আকাশ-বাতাসকে সুরতরঙ্গে যেমন মাতিয়ে তুলতেন, তার সঙ্গে আনন্দের বেগ সামলাতে না পেরে "দে গরুর গা ধুইয়ে," "চালাও পানসি বেলঘরিয়া" আরও নানা শব্দে আন্দোলিত করে তুলতেন নজরুল। এই উদ্দামতায় নজরুলের ডানপিটে সাথী ছিলেন মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।[২]

কাঠখোট্টা সৈন্যদলে থেকেও কবি সাহিত্য সাধনা ছাড়েননি। গান তো তাঁর নিত্য সঙ্গী। নিত্য নূতন গান লিখে, সুর দিয়ে গান গেয়ে সকলের মনকে তাজা রাখতেন। নজরুল করাচীতে ছিলেন মধ্যমণি-স্বরূপ, তাঁর অরগ্যান বাজনার গুরু শ্রীনিত্যানন্দ দে ছিলেন হাবিলদার। দে মশাই নানাপ্রকার বাজনায় ছিলেন সুপণ্ডিত। কাজী যখন যে গান ধরতেন, তখন শেষ না করা পর্যন্ত শান্তি পেতেন না। করাচীতে যেসব গান তাঁর প্রিয় ছিল তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় গান ছিল ঃ

"কি হল আমার বুঝিবা সজনী
হৃদয় আমার হারিয়েছি।
সকাল বেলাতে, গেছিনু খেলাতে ;
ফুল কুড়াইতে ফুল ছড়াইতে
ফুলের মাঝারে খেলি বেড়াইতে
সহসা সজনী দেখিনু চাহিয়া
ঐ রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় আমার হারিয়েছি।"

করাচীতে কাজী নজরুল ঠিক চুম্বকের মতো বাস করতেন। তাঁর সহৃদয়তার ও দরদবোধের জন্য সবাই তাঁকে ঘিরে থাকতো। তাতে তাঁর লেখাপড়ার সাধনায় বড় ব্যাঘাত হত। তাই তিনি কম্বল, বুট, পট্টি, মোজা প্রভৃতির স্তূপের আড়ালে কোনরকমে একটু স্থান করে প্রায় সময়ই পালিয়ে সেখানে লেখাপড়ার সাধনায় মশগুল হয়ে থাকতেন। সবাই যখন "কোথায় কাজী, কোথায় কাজী," করে খুঁজত সেই সময় বন্ধু শম্ভু রায় কাজের গুরুত্ব বুঝে নজরুলকে নিজে খবর দিয়ে হাজির করতেন। তিনি কাজীর সাধন-গুহার সংবাদ কাহাকেও বলতেন না।

করাচীর গ্যাজা লাইনের বাঙালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী ছিলেন। রেজিমেন্টের মধ্যে বাঙালী হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সৈন্য ও শিখদের মধ্যে খুব গভীর মিল ছিল। এই মিলন ব্রিটিশ সরকারের বেশ ভাল লাগেনি ; তাই এই দুইয়ের মধ্যে বিভেদ ঘটাবার জন্য এদের রান্নার ব্যবস্থা, থাকার ব্যবস্থা সবই আলাদা করে দেয়। কিন্তু মরণ খেলায় যারা প্রাণ উৎসর্গ করতে

(২) সর্বত্যাগী দেশভক্ত মণিভূষণ ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে ইহলোক ত্যাগ করেন।

এসেছে তারা এসব মেনে চলবে কেন? মেনে চলেনি বলে শেষ পর্যন্ত ধর্মের গোঁড়ামী যাতে বাঙালী মুসলিম সৈনিকদের ভেতর জাগে, তার জন্য সরকার এক মৌলবীকে নিযুক্ত করলে। এই মৌলবীসাহেব যেমন উদার ছিলেন, তেমনি তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিল অগাধ। আরবী ও ফার্সী ভাষায় সর্বপ্রকার সাহিত্য, কাব্য ও ধর্মপুস্তকের তিনি ছিলেন একটি জাহাজ বিশেষ। ফার্সী ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিল। একটা ঘটনায় কবির মন তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাঁর কাছে ফার্সী ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। পরে একে একে ফার্সী ভাষার প্রায় সকল অমূল্য কাব্যই পড়ে শেষ করেন। কবি তাঁর "রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ" গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখেন ঃ

"আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরেজী ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী থাকতেন। একদিন তিনি দিওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি এমন মুগ্ধ হয়ে যাই, যে সেইদিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি। তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি।"৩

করাচী ব্যারাকে থাকবার সময়েই 'রিক্তের বেদন' বইখানি লেখা হয়। বইখানিতে কয়েকটি গল্প আছে। প্যারেড শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কাব্য চর্চা, ফার্সী ভাষা শেখা, কবিতা, গান ও গল্পলেখা, গান গাওয়া সমানে চালাতেন। অনাবিল প্রাণরসে মৌজ হয়ে থাকাই নজরুলের স্বভাব ছিল।

করাচীতে থাকাকালীন যেসব গান ও কবিতা লিখতেন, হাফিজের অনুবাদ করতেন সেসব লেখা মাঝে মাঝে বাংলাদেশের কাগজে পাঠাতেন। এই সময় "বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি" নামে মুসলিম সাহিত্যিকদের একটা আড্ডা ছিল। এই আড্ডার একটা পত্রিকা ছিল। নজরুল করাচীতে এসে হদিস পেয়ে সেখানে লেখা পাঠতে লাগলেন। মুসলিম সাহিত্য সমিতির ম্যানেজার ছিলেন শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেব। নজরুল লেখা পাঠিয়ে মুজফ্ফর সাহেবের সঙ্গে পত্রালাপ করতে লাগলেন। নজরুলের জীবনের বিপুল প্রাণস্রোতের রুদ্ধ পথ কেটে দিয়ে মুজফ্ফর সাহেব বাংলা সাহিত্যকে ও বাঙালীজাতিকে ধন্য করেছেন। নজরুলের লেখার মূল্য সর্বপ্রথমে মুজফ্ফর সাহেব বুঝেছিলেন এবং লেখা প্রকাশ করে কবিকে উৎসাহিত করে তোলেন।

এই সময় শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের "সবুজপত্র" বাঙলা সাহিত্যের নেতৃত্ব নিয়েছিল। শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় উক্ত পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নজরুল করাচী থেকে হাফিজের গানের একটি অনুবাদ পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে। প্রমথবাবু অনুবাদে রবীন্দ্রপ্রভাব দেখে লেখাটি প্রত্যাখ্যান করেন। পবিত্রবাবু উক্ত লেখাটি চারুবাবুকে দিয়ে "প্রবাসী" পত্রিকায়

(৩) দিওয়ান-ই-হাফিজ—নজরুল ইসলাম।

প্রকাশ করেন[৪]। চিঠির মাধ্যমে পবিত্রবাবুর সঙ্গে নজরুলের পরিচয়ের সূত্রপাত।

সৈন্যদলে তিনি তিন বছর ছিলেন। ১৩২৬ সালে (১৯১৯ খৃঃ) কলকাতায় এসে প্রথমে ওঠেন শৈলজানন্দের বাগবাজারের মেসে। সেখান থেকে শৈলজানন্দের সঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বাসায় ওঠেন। আহ্‌মদ সাহেব তখন ৩২ কলেজ স্ট্রীটের বাসায় থাকতেন মুসলিম সাহিত্য পত্রিকার অফিসে। "বিদ্রোহী" কবিতা নজরুল লেখেন "৩/৪সি, তালতলা লেনের বাড়িতে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে।" তখন মুজফ্‌ফর সাহেব ও নজরুল থাকেন একই সঙ্গে। 'বিদ্রোহী' কবিতাতেই তিনি সহসা বাঙালীকে চমক লাগিয়ে দেন এবং একদিন সুপ্রভাতে, দেশজোড়া তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। পরে সাপ্তাহিক "বিজলী" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅবিনাশ ভট্টাচার্য বিদ্রোহী কবিতাটি উদ্ধৃত করেন[৫]। এই 'বিদ্রোহী' কবিতাকে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার জার্মানী ও ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করে জার্মানি ও ইংলণ্ডের পত্রিকায় প্রকাশ করে কবিকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

মুজফ্‌ফব আহ্‌মদ সাহেব কবি নজরুলকে নানাভাবে সাহায্য করে তাঁকে পালন করেছেন। আহ্‌মদ সাহেব দৈনিক "নবযুগ" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন[৬]। কবিকে তিনি সহকাবী সম্পাদক রূপে গ্রহণ করে কাজ চালাতে থাকেন। এইখানে বাংলার শ্রমিক নেতা মৌলবী কুতুবুদ্দিন আহ্‌মদের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়। কুতুবুদ্দিন ও মুজফ্‌ফর সাহেবের স্নেহের আশ্রয় পেয়ে নজরুলের সাহিত্য সাধনা পুষ্ট হয়ে উঠে। পরবর্তীকালে "ছায়ানট" কাব্যগ্রন্থ উক্ত দুজনকে কবি উৎসর্গ করেন।

(৪) কল্লোল যুগ।

(৫) বিদ্রোহী কবিতা প্রথম কে নিয়ে গিয়ে কোন কাগজে প্রথম ছাপেন এই নিয়ে একটা বিতর্কের সৃষ্টি করেন হাসির গায়ক নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়। মোসলেম ভারতের সম্পাদক জনাব আফ্‌জাল উল হককে প্রথম নজরুল ছাপতে দেন। কিন্তু তাঁর কাগজ নিয়মিত ছেপে বের হত না বলে সাপ্তাহিক "বিজলী" পত্রিকার ম্যানেজার শ্রদ্ধেয় অবিনাশ ভট্টাচার্য হক সাহেবের কাছে একসর্তে কবিতাটি নিয়ে গিয়ে ছাপেন। (কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা—মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ২২৯)

(৬) উক্ত নবযুগ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শের-ই-বাঙাল ফজলুল হক সাহেব। এই পত্রিকার অফিস ছিল 'টার্নার স্ট্রীটে"। বর্তমানে এর নাম হয়েছে "নবাব বাহাদুর রহমান স্ট্রীট"। পরে এই পত্রিকাই নবপর্যায়ে পুনঃপ্রকাশ হয় লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে কবি নজরুলের সম্পাদনায়।

উৎসর্গে লেখেন ঃ

"আমার শ্রেয়তম রাজলাঞ্ছিত বন্ধু
মুজাফ্ফর আহ্মদ
ও
কুতুবুদ্দিন আহ্মদ
করকমলে—"

কবি কলেজ স্ট্রীটের ঘরে বাস করবার সময়ে ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে সাব-রেজেস্টারী কাজের জন্য চিঠি পান। কিন্তু তখন কবির মনে নিখিল ভারতের মুক্তি আন্দোলনের রঙ লেগেছে। মুজফ্ফর আহ্মদের মত জন্ম বিপ্লবীর স্পর্শ পেয়েছেন, হাতে কলমে স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজের নির্দেশ ও সুযোগ পেয়েছেন। তখন কি আর গোলামির নিয়মিত কাজের ধরাবাঁধার মধ্যে চিরচঞ্চল কবি ধরা দিতে পারেন ? তাই কবি সেই সরকারী চাকুরি প্রত্যাখ্যান করে চির দুঃখময় বিপ্লবের পথ বেছে নিলেন এবং চিঠিখানি ছিঁড়ে ফেলে দেশের কাজে মন দিলেন।

বাংলা দেশে এই সময় গান্ধীজীর অসহযোগ ও সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন পাশাপাশি সমস্রোতে বয়ে চলেছিল। কবি এই প্রবাহে ভগীরথের মত শঙ্খবাদকের কাজ নিয়েছিলেন। ১৯২২ সালের ১২ই আগস্ট তিনি "ধূমকেতু", অর্ধ সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে শ্রদ্ধেয় ডাঃ ভূপেন দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল "যুগান্তর", ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "সন্ধ্যা" এবং বিদ্রোহী কবি নজরুল প্রকাশ করলেন "ধূমকেতু" পত্রিকা। এই তিনটি পত্রিকাই বাংলা দেশে "স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার" একথা দেশবাসীর মনে চিরকালের জন্য দাগ কেটে দেয়। বিদেশে পলাতক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "যুগান্তর" পত্রিকার জন্যই ভারতবর্ষে প্রবেশ ঘটে। ব্রহ্মবান্ধব জেলে মৃত্যু বরণ করেন। নজরুল কারাবরণ করে জেল কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে অনশন করে মৃত্যুপণ করেছিলেন।

বিচারালয়ে

১৯২১ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের বিপুল তরঙ্গ দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ শাসনের স্তম্ভকে শিথিল করে দিয়েছিল। সেই সময় নজরুল অগ্নিবীণার সুর-ঝঙ্কারে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার প্রাণে দেশের প্রতি কর্তব্যের চেতনা জাগিয়ে আন্দোলন সফল করবার প্রেরণা জুগিয়েছিলেন।

বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার, জেল, ফাঁসি প্রভৃতিতে নজরুলের কবি-মন বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিকারের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বাঙলার বিপ্লবীদের তিনি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের বিপ্লববাদ প্রসারের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই "অগ্নিবীণা" বিপ্লবী নেতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন ঃ

অগ্নিঋষি অগ্নিবীণা তোমায় শুধু সাজে
তাই তো তোমার বহ্নিরাগেও 'বেদন বেহাগ বাজে'

এই সব নূতন ধারার বলিষ্ঠ লেখায় কবির বিপ্লববাদের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ বেগবান অনুভূতিতে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। এই আনন্দে বিভোর হয়ে কবি "প্রলয়োল্লাস" কবিতায় লেখেন ঃ

"তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখির ঝড়"।

কবি শিল্পীরা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। তাই নূতন দিনের বিজয় কেতন কবি নজরুল তাঁর ধ্যানের মধ্যে দেখে সকলকে বরণের জন্য আহ্বান করলেন। তাকে বরণ করবার জন্য বললেন ঃ

"আসছে এবার অনাগত প্রলয় নেশার নৃত্য পাগল,
সিন্ধু পারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাংল আগল,
মৃত্যুগহণ অন্ধকূপে
মহাকালের চণ্ডরূপে
ধূম্রধূপে
বজ্র শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর
ওরে ঐ হাসছে ভয়ঙ্কর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।"

বিপ্লবীদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে মহাকালের জয়ের কেতন দেখিয়ে দিলেন। তাদের এগিয়ে গিয়ে সিন্ধু পারের সিংহদ্বারের আগল ভেঙে মহাকালকে বরণ করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যজ্ঞের আসনে বসবার আবেদন জানালেন; মরণ পাগল বিপ্লবীরাও কবি নজরুলকে সময় বুঝে যাত্রার "নকীব"রূপে স্বীকার করে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল।

১৯১৮ সালের শেষের দিকে শোনা গেল ৪৯নং বাঙালী পল্টন ভারত সরকার এবার তুলে দেবার মনস্থ করেছেন। এমনি সময় কবি নজরুল কি করবেন তাই নিয়ে বহু জল্পনা কল্পনা করে মুজফ্‌ফর সাহেবের সঙ্গে পত্রালাপ করতে লাগলেন। বছর কেটে গেল। এলো ১৯২০ সালের শেষের দিক। এমনি সময় নজরুল চুরুলিয়ার বাড়িতে মা-ভাইদের সঙ্গে দেখা করার জন্য ছুটি পান। এই ছুটিতে এসে কবি বাড়িতে মা-ভাইদের সঙ্গে দেখা করে "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির" ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে সমিতি সম্পাদক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এতদিন চিঠির মাধ্যমে আহ্‌মদ সাহেবের সঙ্গে ভাব বিনিময় চলেছিল।

কত কল্পনাই না করেছিলেন ঐ মানুষটার সম্বন্ধে কবি নজরুল। যখন দেখা হল, তখন কবি স্থির সমুদ্রের মতো মানুষটিকে দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ তো হলেনই, বহু পরামর্শ করবার পর স্থির হল রেজিমেন্ট থেকে ফিরে এসে তাঁর ওখানেই নজরুল আশ্রয় নেবেন। করলেনও তাই। ১৯২০ সালের শেষের দিকে ৪৯নং বেঙ্গলী রেজিমেন্ট পুরোপুরি ভেঙ্গে গেল। পরে সমিতির ৩।১ সি তালতলা লেনের বাড়িতে মুজফ্‌ফর সাহেব ও নজরুল উঠে গেলেন। সমিতির অফিস ঐখানেই রইল। ঐ বাড়িতেই রাতজেগে একদিন তিনি "বিদ্রোহী" কবিতাটি লেখেন। খুব সকালে উঠে নানা গুণে গুণী ও অপার স্নেহশীল স্বল্পভাষী মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে উক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান। শুনে তিনি ভাল কাগজে ছাপতে বলে চুপ করে থাকেন। ঐ দিন আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী তরুণ নেতা শ্রীঅবিনাশ ভট্টাচার্য সাপ্তাহিক "বিজলী" পত্রিকার কর্মী ঐখানে আসবার পর নজরুলের কবিতা শোনেন ও "বিজলী" পত্রিকার জন্য নিয়ে যান। নজরুল অবিনাশবাবুকে দেন ও পরে মাসিক "মোসলেম ভারতের"[১] সম্পাদক আফজল উল্ হক সাহেবকেও দেন। কিন্তু 'বিজলীই" বিদ্রোহী কবিতা প্রথম প্রকাশ করে। "বিজলী"র পরে মোসলেম ভারত ঐ কবিতা প্রকাশ করে। "বিজলী" সাপ্তাহিক পত্রিকাই কবিতাটি মোসলেম ভারতের আগেই ছাপাবার সুযোগ ও গৌরব লাভ করেছিল। তখন কবি সুবোধ রায় উক্ত পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। কবি নজরুলের সঙ্গে কবি সুবোধ রায়ের পরিচয় এইখানেই হয়। পরে অচ্ছেদ্য বন্ধুরূপে দুই কবিকে দেখা গেছে।

(১) মোসলেম ভারতের অফিস তখন ৩নং কলেজ স্কোয়ারে (বর্তমানে বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট) ছিল।

বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশ হবার পর গোলামিতে চির অবনত বাঙালী-সমাজ মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবার প্রেরণা লাভ করে। কবি লেখেন :

"বলবীর
বল উন্নত মম শির।
শিব নেহারি আমারি নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির"।

মানুষের মন যদি ন্যায়নিষ্ঠ হয়, তবে সে নির্ভীক হতে বাধ্য। যদি নির্লোভ হয় তবে লোভীকে সে কখনও ভয় করে না। সে রাক্ষস বৃত্তি সম্পন্ন মানুষের কাছে এত মহান যে সেখানে হিমাদ্রির শিখরও তার কাছে মাথা নিচু করতে বাধ্য। এই শিক্ষা কবি নজরুল চির গোলাম বাঙালী হিন্দু মুসলিম্‌কে দিয়ে বলালেন যে ঃ

"আমি বেদুইন আমি চেংগিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিস।"

কোর্‌নিস করব তাকেই যে মহান্‌, যে প্রেমিক, যে সকলের কল্যাণকামী। তাছাড়া এই স্বার্থপর রাক্ষস বৃত্তিধারী মানুষেরা যে সব আইনের বেড়ি গড়েছে সেই কুশাসনকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। কবি বললেন ঃ

"আমি মানি নাকো কোন আইন
আমি ভরা তরী করি ভরা ডুবি
আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন।"

এই সব অত্যাচারীদের জগতে আমি গোপন অস্ত্র "টর্পেডো" ও "মাইনের" মত কাজ করি।

এই ভাবে তিনি "বিদ্রোহী" কবিতার ভিতর দিয়ে আমাদের মানব জন্মকে সার্থক করে তোলার আহ্বান জানিয়ে বললেন ঃ

"আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব আনিব শান্তি শান্ত উদার—
আমি হল বলরাম স্কন্ধে
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে
—নব সৃষ্টির মহানন্দে।"

অতএব যে পর্যন্ত পৃথিবী রাক্ষস বৃত্তিধারীদের হাতে প্রপীড়িত হবে সে পর্যন্ত এই আমার প্রতিজ্ঞা যে আমি লড়াই করে যাবই। কিন্তু যেদিন—

"উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপান ভীম রণভূমে রনিবে না
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।"

এই প্রতিজ্ঞা জাতিকে তিনি দিয়েছিলেন। বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম দেশের চিত্তাকাশে একটি নবোদিত জ্যোতিষ্কের মত ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। দেশের বিপ্লবী নেতারা তাঁকে বরণ করে নিলেন। বিশেষ করে হুগলীর বিপ্লবী নেতা শ্রীভূপতি মজুমদার ও যুগান্তর দলের তরুণেরা। এই সময় নজরুল একটি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা করলেন দেশের কর্মী ও জনসাধারণকে স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রেরণা দেবার জন্য। ৩২নং কলেজ স্ট্রীটের বাসায় কবির কাছে তখন শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, রেজাউল করিম, কবি মঈনুদ্দীন, মঈনুদ্দিন হোসায়েন প্রমুখ কবির বন্ধুরা তাঁকে ঘিরে থাকেন।

তাঁদের কাছে এই ইচ্ছা নজরুল প্রকাশ করলে সকলেই সম্মতি দিয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেন। কিন্তু কোথায় টাকা? কবি নজরুল "দে গরুর গা ধুইয়ে" বলে কয়েক রিম কাগজ যোগাড় করে মেটকাফ প্রেসের শ্রীমণি ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় সানন্দে ছাপাবার ভার নিতে রাজি হলেন।

কবি নজরুলের বুকে তখন আগ্নেয়গিরির আসন্ন বিদারণের বেদনা টন্‌টন্ করছে। পত্রিকার নাম ঠিক হল "ধূমকেতু"। "ধূমকেতু"র অগ্নিময় পুচ্ছ তাড়নায়, দেশের সুখী ও শৌকীন্ মন নিয়ে যারা আরামের শয্যায় দিন কাটাচ্ছে তাদের আঘাত দেবার ব্রত নিয়েছেন। বিশ্ব কবির এই কটা কথা তখন তাঁকে কেবলই দোলা দিচ্ছে—

"ঝড়ের গর্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে,
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল,
যাত্রা কর যাত্রা কর যাত্রী দল,
এসেছে আদেশ,
বন্দরের কাল হল শেষ।"

সুখী, আয়েসী ব্রিটিশতাঁবেদারদের বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা করলেন। তাঁরা তখন তাঁকে বিষ নজরে দেখতে লাগলেন। পত্রিকা বার হবার সব ঠিক হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথকে আশীর্বাণী পাঠাবার জন্য টেলিগ্রাম করা হল। কবি আশীর্বাণী পাঠান ঃ

"আয় চলে আয়রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধা অগ্নি সেতু ;
দুর্দ্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্দ্ধচেতন।"

বিশ্বকবি তখনও নজরুলকে ভাল করে চেনেন নি। কিন্তু তাঁর যতটুকু পরিচয় পেয়েছিলেন, তাতেই নজরুলকে যে আশীর্বাণী পাঠালেন তাতে তিনি কবির কর্ম ও কর্মময় জীবনের ভবিষ্যত কর্মের সম্পূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। একথা বিশ্বকবি বুঝেছিলেন যে তিনি যে কর্তব্যের কথা লিখলেন তা কবি নজরুল সার্থক করে তুলবেই।

ফুলস্কেপ সাইজের চার পৃষ্ঠায় ধূমকেতুর লেখা থাকবে। প্রথম পৃষ্ঠার মাথায় ব্লক করে একটা জ্বলন্ত ধূমকেতুর ছবি দেওয়া হল। ছবির গতিটা ছিল যেন ধূমকেতু ভীষণ তাড়া করে চলেছে গ্রহ-উপগ্রহদের। ধূমকেতুর পুচ্ছের ধাপে ধাপে ডমরু বাজাতে বাজাতে নটরাজ উঠছেন। তাঁর জটা উর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত, এক পায়ের পাশে ধ্বংস আর এক পায়ের তলায় পদ্ম ফুটে উঠছে। কবির ভাষাতেই বলি,

"সব শ্মশানে শিব নাচে ঐ
ফুল ফুটানো পা ফেলে।"

আর রবীন্দ্রনাথের আশির্বাণীর ব্লক করে প্রত্যেক সংখ্যার সম্পাদকীয়ের মাথায় ছাপা হতে লাগল। মনে পড়ে প্রথম সংখ্যার ধূমকেতুর রূপ ও তার আবির্ভাবের কী প্রয়োজন, এই নিয়ে জ্বালাময়ী ভাষায় একটা প্রবন্ধ ছিল। আর ছিল কবির "ধূমকেতু" কবিতা ঃ

"আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই শ্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।"

কবিতার শেষে দুইটি লাইনে লিখলেন,

"আজিও ব্যথিত সৃষ্টির বুকে ভগবান কাঁদে ত্রাসে।
স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টি পাছে বা বড় হয়ে তারে গ্রাসে।"

এই দুটো লাইনে তিনি আমাদের এই বোঝাতে চাইলেন যে সমাজের ধনী, অভিজাতরা আমাদের 'বোকা করে' রেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে এই

ভেবে যে, যদি কখনও এই দুর্বলদের চোখ ফোটে, জ্ঞান হয়, তা হলেই যে ওদের শোষণের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এই সংখ্যায় শ্রীনৃপেন্দ্র-কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় "ত্রিশূল" নাম দিয়ে রাক্ষস বৃত্তিধারীদের বিদ্ধ করতে লাগলেন। পবিত্রবাবু, কবি সুবোধ রায় প্রভৃতিও এতে লেখেন। ধূমকেতুর ম্যানেজারের ভার নেন শ্রীশান্তিপদ সিংহ। ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় কাগজের অফিস হয় ৭নং প্রতাপ চাটুজ্জ্যে লেনে। ধূমকেতুর অফিস ঘরে সর্বদাই লোকের ভীড় থাকতো। কাগজ যা ছাপানো হত তার চেয়েও তার চাহিদা ছিল প্রচুর। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী ছাপান সম্ভব হত না। কলকাতায়, মফঃস্বল শহরে ও গ্রামের মোড়ে মোড়ে নানা বয়সী লোকেরা জটলা করত ধূমকেতু কেনবার জন্য। কাড়াকাড়ি হুড়োহুড়ি লাগত যখন কাগজ এসে পৌঁছাত।

ধূমকেতুর অফিস ঘরে টাকা আসত, থাকতো একটা খোলা আর ভাঙ্গা বাক্সে। কে কখন কিসে খরচ করছে তার খোঁজ বড় থাকতো না। ম্যানেজারবাবু ছাপানোর দায়িত্ব ছাড়া এসব ক্ষ্যাপার দলকে এঁটে উঠতেও পারতেন না। এখানকার সংখ্যার পর সংখ্যা প্রকাশ হত আর দেশবাসীর মনকে নির্ভীক ও সচল করে তুলত অসহযোগ ও বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য।

এই ধূমকেতুর পুচ্ছ তাড়নায় অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকদের চোখ কপালে উঠল ভয়ে ; এই কবির কণ্ঠরুদ্ধ করে দেবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগল। তৎসত্ত্বেও কবি নজরুল নির্ভীক ভাবে জ্বালাময়ী ভাষায় প্রবন্ধ, কবিতা, হাস্য-কৌতুক, সম্পাদকীয় মন্তব্য মুসলিম জাহান, দেশের খবর, বিদেশী খবরের কলমে ও গল্পের মধ্য দিয়ে সরকারকে হিন্দু-মুসলমান সমাজপতি, ধর্মীয় নেতা ও ভণ্ড একচেটিয়া ধর্মব্যবসায়ীদের প্রবল আক্রমণ করতে লাগলেন। কয়েক সংখ্যা প্রকাশ হবার পর এল আশ্বিন মাস, পূজার হিড়িক। পূজা সংখ্যা ধূমকেতুতে লিখলেন "আনন্দময়ীর আগমনে" কবিতা।

এই কবিতায় কবি জাতিকে প্রত্যক্ষরূপে মায়ের দশপ্রহরণধারিনী অসুরনাশিনী রূপ নিজের নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করবার আহ্বান জানালেন। মাটির ঢেলার প্রথাগত পূজা ছেড়ে মহিষাসুররূপী ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ প্রভৃতিকে দুর্গার দশপ্রহরণ শক্তিসম্পন্ন 'দেশবাসীর দশ দিকের লোকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে, অসুর বধ করবার আহ্বান জানালেন। অদ্ভুত তাঁর ব্যাখ্যা, উপমা, ভাষা ও ছন্দ। ভাষায় লালিত্যে, তীব্রতায়, যুক্তিতে কবিতাটি অনবদ্য হয়ে উঠেছিল। দেশীয় ব্রিটিশ গোয়েন্দার দল ওৎ পেতে বসেই ছিল। প্রকাশের পরেই তারা এটি বাজেয়াপ্ত করে দেয়। কিছুকাল পূর্বেও কবিতাটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছিল। অত্যাচারী পুলিসের দৌলতে এর চিহ্নও আর পাওয়া যাচ্ছিল না।

অনেক অনুসন্ধানের পর কবিতাটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত "ধূমকেতু" থেকে সংগ্রহ করে দিতে পারা গেল।

কবি পলাতক হয়ে কলকাতায় রইলেন কিছুদিন ৩২নং কলেজ ও ৭নং প্রতাপ চাটুজ্জ্যে লেনে। ধূমকেতুর অফিসে বাঙ্গালী গোয়েন্দা ও সিভিল পুলিস তাণ্ডব নৃত্য করে সব তছনছ করে চলে গেল উক্ত পূজা সংখ্যাটির জন্য। হায়েনার মতো কবি নজরুলকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু ধূমকেতু নিয়মিত তেমনি ভাষা আর তেমনি জোরের সঙ্গে প্রকাশ হতে লাগল। পুলিস কবিকে খুঁজে পায় না। ধূমকেতু অফিসের সামনে পুলিসের দল ও পুলিসের আডকাটির দল সাদা পোষাকে যায় আসে। এমনি ভাবে কিছুদিন বাদে এল দেওয়ালী উৎসব। নজরুল এই সংখ্যায় "ম্যায় ভূখাহু" নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সে প্রবন্ধের ভাষা যেমনি তীব্র তেমনি গাঁথুনি ছিল। তা পড়ে শত্রুপক্ষের আই সি এস কোম্পানীর হাড়ে কাঁপন ধরল; দেশবাসীর মনের মধ্যে প্রবাহিত হল আগ্নেয় গিরির তরল অগ্নিস্রোত। প্রবন্ধে কালীপূজার যে ভয়ঙ্কর বর্ণনা কবি নজরুল করেছিলেন তা পডলে মনে হবে কবি যেন কাপালিক ধর্মী ছিলেন। কালী কে? তার হাতে চণ্ডাসুরের মুণ্ডেরই বা কী অর্থ? রাতুল চরণে জবা ফুলই বা কী? বরাভয় হস্তের মুদ্রার মানেই বা কি? পায়ের নিচে শিবই বা কেন? সর্বশেষে খাঁড়ার অর্থ লিখে ঘোর অমাবস্যায় পূজার কারণ লেখেন। এইসব লিখে ইংরেজ শাসন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে রাবণ প্রভৃতি অসুর ও রাক্ষস ভাবাপন্ন রাজ কর্মচারী চরিত্রের তুলনা করে প্রকাশ্য সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বান জানান। সমস্ত প্রবন্ধটা পড়লে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় যে কবি নজরুল বাহ্য পূজার আচরণকে পুঙ্খানুপুঙ্খ লক্ষ্য করে জাতির সামনে সত্যকার পূজার রূপ তুলে ধরেছিলেন। ৫নং প্রতাপ চাটুজ্জ্যে লেনের বাড়িটি আনন্দমঠ ও বন্দেমাতরম সঙ্গীত প্রণেতা ঋষি বঙ্কিমের নিজস্ব বাড়ি। ঐ বাড়িতেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন। তার দুখানা বাড়ি পরে নজরুলের ধূমকেতু অফিস। ঋষি বঙ্কিমের মৃত্যুর পূর্বে বহু-বার বহু তান্ত্রিক গোপনে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। একথা "বঙ্কিম প্রসাদ" গ্রন্থে আছে। তাছাড়া তৎকালীন বিপ্লবী ভাবাপন্ন ছাত্ররাও ঐ বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। প্রতাপ চাটুজ্জ্যে লেনের একটা ঐতিহাসিক গুরুত্বও রয়েছে। সেই গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে নজরুলের যুগান্তকারী ধূমকেতু পত্রিকার অফিসের জন্য। বাড়িটির সামনে প্রস্তর খণ্ডে লেখা আছে—

Here laid
Bankim Chandra Chatterji
The novelist
Born 1838—Died 1894

বর্তমানে ঋষি বঙ্কিমের ঐ বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে। দোতলার দক্ষিণে যে খোলা ঘরটিতে বসে তিনি লিখতেন সেটি এখনও আছে। বঙ্কিমের ঠাকুর ঘরের সামনে ভেঙ্গে ফেলে কর্পোরেশন রাস্তা চওড়া করে একটা স্থায়ী ডাস্টবীন বসিয়েছে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি পুরানো যুগের জাতীয় সাহিত্য গুরুর ঐতিহাসিক স্থানে নূতন যুগের বেদী রচনা করলেন কিন্তু স্বাধীন-ভারত সরকারের এ দুটি বাড়ির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার দিকে নজর দেওয়া কি উচিত নয়? ইউরোপ হলে এত দিন এর একটা বিহিত হয়ে যেতে[২]।

এই দেওয়ালী সংখ্যা যে বাজেয়াপ্ত হবে একথা আগে থেকেই বুঝে প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য পথে বিলীন হয়ে গিয়েছিল—গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদের মধ্যে। পুলিস অফিসে এসে এক কপিও পায়নি। কবি তখনও ফেরার। ফেরার অবস্থায় কবিকে কুমিল্লা থেকে কোমরে, হাতে দড়ি বেঁধে ও হাতকড়ি পরিয়ে ধরে এনে হাজতে রাখা হয়। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের ললাটে যে "অলক্ষণের তিলক রেখা" এঁকে দিয়েছিলেন, কবি দিনের পর দিন সেই আশীর্বাদের জোরে দেশের দুর্দিনের "দুর্গ শিরে বিজয় কেতন" দৃঢ় মুষ্টিতে তুলে ধরে ধূমকেতুর বুকে জাতীয় বিপ্লবের জয় ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলতেন "মাথা যদি কেটেও ফেলে তবু মাথা নীচু করব না।"

'মোহর্‌রম্‌" কবিতায় লেখেন ঃ

"শির দেগা নেহি দেগা আমামা।"

অর্থাৎ শত্রু যদি আমার মাথা নিতে চায় তা দেব, কিন্তু জাতির সম্মান-চিহ্ন পাগড়ী দেব না। রবীন্দ্রনাথও তাঁর "প্রতিদান" কবিতায় বলেছিলেন। ঃ

"যদি দিতে হয়ত দোবো
বেণীর সঙ্গে মাথা।"

খুব ঘটা করে রাইফেলধারী বাঙালী পুলিস ঘেরা অবস্থায় বাঙলা দেশের জাতীয় কবিকে সুদূর কুমিল্লা থেকে বীরদর্পে কলকাতায় এনে ১৯২৩ সালের ১৫ই জানুয়ারি চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট সুইন হো সাহেবের এজলাসে হাজির করে। ১২৪ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেট সুইন হো কবিকে ১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি বিচারে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। প্রথম দিকে কবিকে শহীদ-তীর্থ আলিপুরের সেন্‌ট্রাল জেলে রাখা হল।

কবির বিচারক নাকি নিজেও একজন কবি ছিলেন। বিচারক কবি সুইন হো কবি নজরুলকে "কিছু বলবার আছে কিনা" জিজ্ঞাসা করলে

---

(২) পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঙ্কিম-এর স্মৃতি রক্ষার জন্য বাড়িটি কিনে নিয়ে বঙ্কিম স্মৃতি রক্ষা সমিতির হাতে দিয়েছেন। জীর্ণ বাড়িটি ভেঙে নতুন করে তৈরির ব্যবস্থা হচ্ছে।

বিদ্রোহী কবি যে জবানবন্দী দেন তা বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। তিনি ব'লেছিলেন, "শুনেছি আমার বিচারকও একজন কবি। শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার বিচারক কবির নিকট। কিন্তু বেলা শেষের শেষ খেয়া এ প্রবীণ বিচারককে হাতছানি দিচ্ছে। আর রক্ত ঊষার নব শঙ্খ আমার অনাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা করছে। তাঁকে ডাকছে মরণ, আমায় ডাকছে জীবন, তাই আমাদের উভয়ের অস্ত তারার আর উদয় তারার মিলন হবে কিনা বলতে পারি না"।

জবানবন্দীর শুরুতে বললেন,—

"আমার উপর অভিযোগ আমি রাজ বিদ্রোহী, তাই আজ রাজ কারাগারে অভিযুক্ত। একধারে রাজার মুকুট, আর একধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড, আর একজন সত্য, হাতে ন্যায় দণ্ড। রাজার পক্ষে রাজার নিযুক্ত রাজ-বেতন-ভোগী রাজকর্মচারী। আমার পক্ষে সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক আদি অন্তকাল ধরে সত্য জাগ্রত ভগবান।

সত্য স্বয়ম্ প্রকাশ। তাঁকে কোন বক্র আঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না। আমি সেই চিরন্তন স্বয়ম প্রকাশের বীণা, যে বীণায় চির সত্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল। আমি ভগবানের হাতের বীণা। বীণা ভাঙলেও ভাঙতে পারে, কিন্তু ভগবানকে ভাঙবে কে? একথা ধ্রুব সত্য যে, সত্য আছে—চিরকাল ধরে আছে এবং চিরকাল ধরে থাকবে। যে আজ সত্যের বীণাকে রুদ্ধ করেছে, সত্যের বীণাকে মূক করতে চাচ্ছে সেও তারই এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের সৃষ্টির অনু। তাঁরই ইঙ্গিতে আভাসে ইচ্ছায় সে আজ আছে কাল হয়তো থাকবে না। নির্বোধ মানুষের অহঙ্কারেব অন্তরেই, সে যাহার সৃষ্টি, তাকেই সে বন্দী করতে চায় শাস্তি দিতে চায়। কিন্তু অহঙ্কার একদিন তার চোখের জলে ডুববেই ডুববে।"[৩]

বিচারকের সামনে গর্দান খাড়া করে উন্নতশিরে কবি এই রকম যুক্তিপূর্ণ জবানবন্দী দিয়েছিলেন। এই জবানবন্দী পড়তে পড়তে মনে হবে বিদ্রোহী কবির লিখিত কোন কবিতা পড়ছি। এই জবানবন্দীর পর বিচারক তাঁকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। বিদ্রোহী নজরুল প্রদীপ্ত মুখে মাথা উঁচু করে এই শাস্তি দেশ মাতৃকার নামে মাথা পেতে নিলেন। কবিকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী করা হল।

বিদ্রোহী কবি জেলে যাবার পর বোধ হয় আরও দুই তিন সংখ্যা ধূমকেতু বেরিয়েছিল কোন এক অখ্যাত লোকের সম্পাদনায়।

---

(৩) এই "রাজবন্দীর জবানবন্দী" বর্মন পাবলিসিং হাউসের আন্দামান বন্দী মানিক বন্ধুবর ৺ব্রজবিহারী বর্মন পুস্তিকা আকারে বাহির করেছিলেন। ধূমকেতু প্রথম বর্ষ শনিবার ১৩ই মাঘ—১৯২৯, ২৭শে জানুয়ারি ১নং সংখ্যায় প্রকাশিত।

"আনন্দময়ীর আগমনে"

আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্ত্তি আড়াল,
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল ;
দেব-শিশুদের মারছে চাবুক বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসী,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা আসবি কখন সর্ব্বনাশী ?
দেব সেনা আজ টানছে ঘানি তেপান্তরের দ্বীপান্তরে
রণাঙ্গণে নামবে কে আর তুই না এলে কৃপাণ ধরে ?
বিষ্ণু (১) নিজে বন্দী আজি ছয়-বছরী ফন্দী-কারায়,
চক্র তাহার চরকা বুঝি ভণ্ড হাতে শক্তি হারায়।
মহেশ্বর (২) আজ সিন্ধুতীরে যোগাসনে মগ্নধ্যানে
অরবিন্দ চিত্ত (৩) তাঁহার ফুটবে কখন কে সে জানে।
দম্ভ-অসুর গ্রাসচ্যুত ব্রহ্মা-চিত্ত রক্ষজনে হায়
কমণ্ডলুর শান্তি-বারি সিঞ্চি যেন চাঁদ-নদীয়ায় (৪)।
শান্তি শুনে তিক্ত এমন কাঁদছে আরও ক্ষিপ্তরবে।
মড়ার দেশে মড়-শান্তি ; সেত আছেই কাজ কি তবে
শান্তি-কথায় ?—শান্তি 'কোথায়' কেউ জানি না-
মাগো 'তোর' ঐ দনুজ-দলন সংহারিণী মূর্ত্তিবিনা।
দেবতারা (৫) আজ জ্যোতিহারা ধ্রুব তাঁদের যায়না জানা,
কেউ বা দৈব-অন্ধ মাগো, কেউ বা ভয়ে দিনে কানা।
সুরেন্দ্র (৬) আজ মন্ত্রণা দেন দানব রাজার অত্যাচারে
দম্ভ তাঁহার দম্ভোলি ভীম বিকিয়ে দিয়ে পাঁচ হাজারে।
রবির শিখা ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে আজ দিগন্তরে
সে কর শুধু পশল না মা অন্ধ কারার বন্ধ-ঘরে (৭)
গগন-পথে রবি রথের সাত-সারথি হাকায় ঘোড়া,
মর্ত্তে দানব মানব-পিঠে সওয়ার হয়ে মারছে কোঁড়া (৮)।
বারি-ইন্দ্র বরুণ আজি করুণ সুরে বংশী বাজায় (৯),
বুড়ি গঙ্গার পুলিন-বুকে (১০) বাঁধছে ঘাঁটি দস্যু রাজায়।
পুরুষগুলোর ঝুঁটি ধরে বুরুস করায় দানব জুতো,
মুখে ভজে আল্লা হরি, পুজে কিন্তু ডাণ্ডা গুঁতো।
দাড়ি নাড়ে, ফতোয়া ঝাড়ে, মসজিদে যায় নমাজ পড়ে,
নাই কো খেয়াল গোলামগুলোর হারাম এ-সব বন্দী-গড়ে।
'লানত' (১১) গলায় গোলাম ওরা সালাম করে জুলুমবাজে
ধর্ম্ম-ধ্বজা উড়ায় দাড়ি 'গলিজ' (১২) মুখে কোরাণ ভাজে।
তাজ-হারা (১৩) যার নাঙ্গা শিরে গরমাগরম পড়ছে জুতি
ধর্ম্ম-কথা বলছে তারাই পড়ছে তারাই কেতাব-পুঁথি।

উৎপীড়কে প্রণাম ক'রে শেষে ভগবানে নমি,
হিজরে ভীরুর ধর্ম্মকথায় ভণ্ডামীতে আসছে বমি।
টিকটিকির ঐ ল্যাজুড় সম দিকবিদিকে উড়ছে টিকি,
দেব্‌তার আগে পূজে দানব, তাদের কাছে সত্য শিখি।
পুরুষ ছেলে দেশের নামে চুগ্‌লি (১৪) খেয়ে ভরায় উদর
টিকটিকি হয়; বিষ্ঠা কি নেই—ছি ছি এদের খাদ্য ক্ষুধোর।
আজ দানবের রংমহলে তেত্রিশ কোটি খোজা গোলাম
লাথি খায় আর চেচায় শুধু—'দোহাই' হুজুর মলাম মলাম।
মাদীগুলোর আদি দোষ ঐ অহিংসা বোল নাকি নাকি
খাঁড়ায় কেটে কর মা বিনাশ, নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি। (১৫)
হান তরবার, আন্ মা সমর, অমর হবার মন্ত্র শেখা,
মাদীগুলোয় কর মা পুরুষ রক্ত দে' মা রক্ত দেখা।
লক্ষ্মী সরস্বতীকে তোর আয় মা রেখে কমল-বনে,
বুদ্ধিবুড়ো সিদ্ধিদাতা গণেশ টনেস চাই না রণে।
ঘোমটা পড়া কলা বৌ-এর গলা ধরে দাও করে দূর—
ঐ বুঝি দেব-সেনাপতি ময়ূর-চড়া জামাই ঠাকুর?
দূর করে দে' দূর করে দে' এ সব বালাই সর্ব্বনাশী;
চাই নাকো ঐ ভাং খাওয়া শিব নিক গিয়ে তায় গঙ্গামাসী,
তুই একা আয় পাগ্‌লী বেটি তাথৈ তাথৈ নৃত্য করে
রক্ত-তৃষায় 'ময়ভূখা হুঁ'র কাঁদন কেতন কণ্ঠে ধরে।
'ময়ভূখাহুঁ'র রক্ত-ক্ষেপী ছিন্নমস্তা আয় মা কালী
গুরু বাগের শিখ-সেনা তোর হুঙ্কারে ঐ "জয় আকালী"।(১৬)
এখনো তোর মাটির গড়া মৃন্ময়ী ঐ মূর্ত্তি হেরি
দু-চোখ পুরে জল আসে মা আর কত কাল করবি দেরী?
মহিষাসুর বধ করে তুই ভেবেছিলি রইবি সুখে,
পারিসনি তা' ত্রেতাযুগে টল্‌ল আসন রামের দুখে।
আর এলিনে রুদ্রাণী তুই জানিনে কেউ ডাক্‌ল কিনা,
রাজপুতনায় বাজল হঠাৎ "ময়ভুখাহুঁ"র রক্ত বীণা।
বৃথাই গেল সিরাজ টিপু মীর কাসিমের প্রাণ-বলিদান,
চণ্ডী! নিলি যোগমায়া-রূপ, বলল সবাই বিধির বিধান।
হঠাৎ কখন উঠল ক্ষেপে বিদ্রোহীণী ঝান্সী-রাণী, (১৭)
ক্ষ্যাপা মেয়ের অভিমানেও এলিনে তুই মা ভবানী।
এমৃনি করে ফাঁকি দিয়ে আর কত কাল নিবি পূজা?
পাষাণ বাপের, পাষাণ মেয়ে, আয় মা এবার দশভূজা।
বছর বছর এই অভিনয়-অপমান (১৮) তোর, পূজা নয় এ,
কি দিস আশীষ কোটি ছেলের প্রণাম চুরির বিনিময়ে। (১৯)
অনেক পাঁঠা মোষ খেয়েছিস, রাক্ষসী তোর যায় নি ক্ষুধা;
আয় পাষাণী; এবার নিবি আপন ছেলের রক্ত-সুধা।

দুর্ব্বলদের বলি দিয়ে ভীরুর এ-হীন-শক্তি-পূজা
দূর করে দে, বল্ মা, ছেলের রক্ত মাগে মা দশভূজা।
সেদিন হবে জননী তোর সত্যিকারের আগমনী,
বাজবে বোধন-বাজনা সেদিন গাইব নব-জাগরণী।
"ময় ভূখাহুঁ মায়ী" বলে আয় মা এবার আনন্দময়ী
কৈলাস হতে গিরি-রাণীর মা-দুলালী কন্যা অয়ি।
আয় মা উমা আনন্দময়ী*

কাজী নজরুল ইস্‌লাম
ধূমকেতু, ১ম বর্ষ মঙ্গলবার ; ৯ই আশ্বিন ১৩২৯
২৬শে সেপ্টেম্বর ; ১৯২২—১২শ সংখ্যা।

* "আনন্দময়ীর আগমনে" কবিতাটির বিষয় বিশেষভাবে পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।
(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

কারা-জীবন

১৯২৩ সালেব ১৬ই জানুয়ারি বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ঐ সময়ে বাজনৈতিক কয়েদীদের কোন শ্রেণী বিভাগের নিয়ম ছিল না। যাকে পারত তাকেই ধবে নিয়ে এসে বন্দী করত। পবে বিচার প্রহসনের দ্বারা দণ্ড দিয়ে কয়েদীব ছাপ দিয়ে দিত। বিচারক সুইন হো নিজে কবি হযেও বিদ্রোহী কবির বেলাতে কোন শ্রেণী বিভাগ না করেই তাঁকে সাধারণ কয়েদীরূপে গণ্য করেছিল। ডোরাকাটা হাফ্ পাঞ্জাবী, উক্ত কাপড়েব ইজের, আব ঐ কাপড়েরই গামছাব মত গা'মোছা চাদব, বিষম কুটকুটে খোঁচা খোঁচা লোমের কাঁটা কম্বলসহ এই অপরূপ পোষাকে জেল কর্তৃপক্ষ বাঙলার জাতীয় জাগরণের কবিকে সাজিয়ে কয়েদীর গাদিতে ছেড়ে দিলে। কারাদণ্ডের পর তাঁকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি ১৬ই জানুয়ারি থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত থাকেন। সময় প্রায় চার মাস। এই চার মাসের মধ্যে নজরুল জীবনের পরম আনন্দলাভের একটি মধুর ঘটনা ঘটে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এই ঘটনার দূতরূপে সেণ্ট্রাল জেলে নজরুলের কাছে উপস্থিত হন। যতদূর জানা যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে তাঁর লিখিত "বসন্ত" নাটক নজরুলকে উৎসর্গ করে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়ে সেণ্ট্রাল জেলে তাঁকে দেবার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন।

কবি ১৯২৩ সালের ১৪ই এপ্রিল সেণ্ট্রাল জেল থেকে হুগলী জেলে এলেন[১]। কবিকে আনা হয়েছিল কোমরে দড়ি বেঁধে। জেলখানায় ঢুকেই তিনি উদাত্ত স্বরে "দে গরুর গা ধুইয়ে" বলে হাঁক ছাড়লেন। রাজনৈতিক বন্দীরা সচকিত হয়ে শুনল বিদ্রোহী কবি নজরুল হুগলী জেলে পদার্পণ করেছেন। সকলেই কবির আগমনে বন্দীদশার একঘেয়েমিতে বৈচিত্রের আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

বিভিন্ন জেলার অহিংস ও বিপ্লবী যুব ও ছাত্রসমাজ, বিশেষ করে হুগলীর যুব ও ছাত্র সমাজের একটা বড় অংশ তখন আন্দোলনের সৈনিকরূপে "হুগলী বিদ্যামন্দিরে" স্বেচ্ছাসেবকরূপে সমবেত হয়েছিলেন। হুগলী জেল তখন বিভিন্ন জায়গার রাজনৈতিক বন্দীর সমাগমে গমগম করছিল। কবি নজরুলকে পেয়ে বন্দীরা গানে, আবৃত্তিতে, হাসির হুল্লোড়ে খুব হৈচৈ করে কাটাত। বাইরে থেকে ছাত্রের দল হুগলীঘাট স্টেশনের উপর থেকে জেলের কয়েদীদের দেখত এবং নানারকমে উৎসাহিত করত। বিপ্লবী তরুণ নেতা সিরাজুল হক তাঁর দল নিয়ে হুগলীঘাট স্টেশনের উপর থেকে

---

(১) পরিশিষ্টে হুগলী জেলের জেলর শ্রী এ. কে. মুখোপাধ্যায়ের পত্র দ্রষ্টব্য।

তাক বুঝে, কাপড়, গামছা, তোয়ালে, সাবান, বিড়ি, সিগারেট, খবরের কাগজ প্রভৃতি ছুড়ে ছুড়ে দিত। কবি সুবোধ রায়, সিরাজুল হক, হামিদুল হক, বিজয় মোদক, হৃদয় মোদক, জনার্দন চক্রবর্তী, প্রাণতোষ, পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন ঘোষ প্রভৃতি এই সব কাজের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করতেন। কারণ এ ব্যাপারটা যাতে জেল কর্তৃপক্ষ ধরতে না পারে। জেল কর্তৃপক্ষও নানারূপ বাধার সৃষ্টি করত। বন্দীরাও তাঁদের খবরাখবর পাঠাবার জন্য চিঠি প্রভৃতি ঢিলের সঙ্গে ছুড়ে এদিকে পাচার করতেন। তাই জেল কর্তৃপক্ষ যখন প্রায় হার মানল তখন সাদা পোষাকের পুলিসের আড়কাঠি টিকটিকি নিযুক্ত করতে বাধ্য হল হুগলীঘাট স্টেশনে, কারণ জেলের অনেক গুপ্ত তথ্য প্রকাশ হয়ে যাচ্ছিল। এইভাবে বাইরের লোকের সঙ্গে বন্দীদের যোগাযোগ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, শত চেষ্টাতেও কাজটি সমানেই চলেছে এই সংবাদ কর্তৃপক্ষের কানে ভালভাবে যেতেই স্টেশনের উপরে বন্দুকধারী পুলিস পাহারার ব্যবস্থা হল। কিন্তু দুঃসাহসী ছেলেদের এততেও ঠেকানো গেলো না। পরে সেজন্য স্টেশনের দক্ষিণ দিকের অনেকটা জায়গা করোগেটেড টিন দিয়ে খুব উঁচু করে বেড়া দিয়ে আড়াল করে দেয়। তবুও দুর্দান্ত কয়েকটি ছেলে জীবন বিপন্ন করে চেষ্টা করায় শেষ পর্যন্ত বিদ্যামন্দিরের নেতাদের নিষেধে ছেলেরা হাত গুটিয়ে নিল।

যতগুলো জেল আছে তার মধ্যে হুগলী জেলটা সবচেয়ে ওঁচা জেল। এর "জেলর" যেমনি অভদ্র তেমনি অশিক্ষিত। চোর, ডাকাত পকেটমারদের সঙ্গে যে ব্যবহার করত, বিশিষ্ট ও সম্মানিত রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গেও জেলর ও জেলসুপার সেই ব্যবহার করত। চিঠি লেখার কাগজ, খবরের কাগজ তো দিতই না। কলম-পেন্সিলও অফিসে জমা নিয়ে নিত জোর করে। কবি নজরুলের এইসব ব্যাপারে মনটা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এই সময় হুগলী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিল এক ইংরেজ। লিকলিকে চেহারা, রসকষ শূন্য শরীর, রংটা ছিল একেবারে বিশ্রী রকমের সাদা, লোকটার নাম ছিল "থাসচিন"। রাজনৈতিক বন্দী দেখলেই কারণে অকারণে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠত। বন্দীরাও মজা দেখবার জন্য তাকে চটাবার আয়োজন করে রাখত। কবি নজরুল এই ইংরেজ জেল সুপারটির নাম রেখেছিলেন হার্সটোন ; কারণ গলার আওয়াজটা ছিল ভারী কর্কশ। কবি একে চটাবার জন্য 'সুইপার বন্দনা' নামে একটি গান লেখেন। গানটি এই—

সুইপার বন্দনা (সুপার)

"তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে
তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমারই গান তোমারই ধ্যান
তুমি ধন্য ধন্য হে,

রেখেছ সান্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার কক্ষে জানাই আদরে
বেঁধেছ শিকল প্রণয়-ডোবে
তুমি ধন্য ধন্য হে।
আঁকাড়া চালেব অন্ন লবণ
করেছো আমার রসনালোভন
বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা 'লপসী' শোভন
তুমি ধন্য ধন্য হে।
ধর ধব খুড়ো চপেটা মুষ্টি
খেয়ে গয়া পাবে সোজা সগুষ্টি
ওল-ছোলা দেহধবল কুষ্ঠ
তুমি ধন্য ধন্য হে।" (ভাঙাব গান পৃঃ ৮)

কবি ববীন্দ্রনাথেব "তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে" গানটিব লালিকা অর্থাৎ প্যাবডি। "বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা" কথাটির একটা ব্যাপাব আছে। তা এই যে হুগলী জেলে কি সাধাবণ কযেদী কি রাজনৈতিক কয়েদীদের দিয়ে খুব বড কবে একটা তবকাবি ও ফুলেব বাগান করা হয়েছিল। কয়েদীদের রসনাতৃপ্তিব ব্যবস্থা হত সপ্তাহে একদিন মাছ, একদিন মাংসের ববাদ্দেব মধ্যে কাঁটা ও হাড দেখা যেত, বাকি বস্তুব গতি যে কি হত তা কয়েদীবা সবাই বুঝতো। আব তবকাবিব খোসা। কিন্তু তখনকাব দিনে ভাল ভাল তরকাবি, ভাল ভাল ফুলের থোকাগুলি জেল কর্তৃপক্ষের ঘবে চলে যেত। আব বুড়ো ডাঁটা, কপির শুকনো পাতা, ফুটে যাওয়া ফুলকপি, দরকচা ধরা বেগুন, ঝিঙে, আধপচা লাউ-কুমড়ো আর তরকারির খোসা প্রভৃতিতে ক্ষুদ ও ধানের 'কুন' মিশিয়ে মিশিয়ে সেদ্ধ করে ভোরের দিকে সানকি থেকে সানকিতে ঢেলে দিয়ে যেত "ফালতুরা"। তার রং ছিল কালো, আস্বাদের তো কোন বালাই ছিল না। জেল-জীবনে হুগলীর কয়েদীদের ঐটাই ছিল পরম পদার্থ 'লপসী' ব্রেকফাষ্ট। কবি নজরুল ঐ অপদার্থকেই "বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা লপ্‌সী শোভন" বলেছেন। বলতেই হবে, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের 'লপসী' ছিল খুব লোভনীয়। কারণ ডালের আর চালের ক্ষুদের সঙ্গে পেয়াজের কুঁচো লঙ্কা দিয়ে সেদ্ধ করা হত। সুপার "হার্সটনের" গায়ের রঙ্‌টা ছিল বিশ্রী রকমের সাদা। কবি একটি লাইনেব ভিতব তাঁর অনবদ্য ভাষায় লিখেছিলেন "ওল-ছোলা দেহ ধবল কুষ্ঠি"। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তারা এর রসটা বেশ ভালভাবেই নিতে পারবেন। এই গানটি শুনলেই সাহেব-পুঙ্গব ক্ষ্যাপা কুকুরের মত কি করবে ঠিক্‌ করতে পারত না। সাধারণ কয়েদীরা তো স্বদেশী কয়েদীবাবুদের বেশ ভক্ত হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে নজরুলের। তৎকালীন জেলর সাধারণ কয়েদীদের মন-ভঙ্গের একটা চক্রান্ত করল। ঘটনাটা যেমন হাস্যকর তেমনি মজারও।

ব্যাপারটা হল এই যে, স্বদেশী কয়েদীরা যখন উদাত্ত কণ্ঠে "কারার

ঐ লৌহ কবাট" গানটা গাইতেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ কয়েদীরাও গানে যোগ দিত। ক্রমশঃ এই গানের মাধ্যমে সাধারণ ও স্বদেশী কয়েদীদের মধ্যে একটা বেশ একতার সৃষ্টি হয়েছিল। যারা বাগান করছে, ঘানি ঘরে, তাঁত ঘরে যে যেখানেই থাকুক না কেন, যে কাজই করুক না কেন, সারা জেলে সবাই একসঙ্গে গান গেয়ে উঠত। এই একতাকে ভাঙবার জন্য সাধারণ কয়েদীদের বোঝান হয় যে 'বাবু কয়েদীরা তোদের "শালা" বলে গাল দিচ্ছে আর তাই তোরা মেনে নিবি ?

ব্যাপারটা হচ্ছে 'ভাঙার গানে' একটি লাইন আছে "যত সব বন্দীশালা" তার মানে জেলর ওদের বোঝাল যতসব বন্দীরা সবাই হল 'শালা', এই নিয়ে অশিক্ষিত বন্দীরা বাবুকয়েদীদের উপর ভীষণ খাপ্পা হয়ে হাঙ্গামা বাঁধাবার উপক্রম করলে। তখন সতীন সেন, ধরানাথ ভট্টাচার্য, দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় নেতারা তাদের বোঝালেন "শালা" শব্দের মানেটা গালাগালের নয়। এই 'শালা' শব্দের মানে হল "বাড়ি" বা "ঘর"। তখন সাধারণ কয়েদীরা খুবই খুশি হয়। তারপর সরকারের বদ মতলব বুঝে, আরো চটে যায় জেলর ও সুপারের উপব। তারা প্রাণপণ করে স্বদেশী কয়েদীদের কাজের সঙ্গে যোগ দিয়ে জেল আর জেলের শাষকদের অসুবিধায় আর বেকায়দায় ফেলে। কবির 'ভাঙার গান' নামক গ্রন্থে এই গানটি আছে। তার ফুট নোটে কবি এই কথা কটি লিখেছেন—

"হুগলী জেলে কারারুদ্ধ থাকাকালীন জেলের সকল রকম জুলুম আমাদের উপর দিয়ে পরখ করে নেওয়া হয়েছিল। সেইসময় জেলের মূর্ত্তিমান জুলুম বড কর্ত্তাকে দেখে এই গান গেয়ে অভিনন্দন করতাম।"

কয়েদীরা খবরের কাগজ পড়ে তবু মনকে সান্ত্বনা দিত। কারণ বন্দীদের কাছে দৈনিক আনন্দবাজারের কী যে কদর ছিল এখনকার লোকদের তা বুঝানো অসম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় স্তম্ভ ছিল আন্দলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার স্টার্টার স্বরূপ। সহস্র বিপদ মাথায় করেও বিদ্যামন্দিরের স্বেচ্ছাসেবকরা জেলের মধ্যে উক্ত পত্রিকাকে সরবরাহ করত। সরবরাহ করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেল ভোগও করেছে দু'একজন, শুধু তাই নয় অনেক ওয়ার্ডারদেরও শাস্তি পেতে হয়েছে। বন্দুকধারী পুলিস পাহারার চাপে শেষে কাগজ তো বন্ধ হলই, নিতব্যবহার্য সাবান-সোডা ইত্যাদিও বন্ধ হয়ে গেল।

দেশভক্ত বন্দীদের প্রাণ হাঁফিয়ে উঠল। সরকার মনোনীত পত্রিকাগুলোও 'হার্সটন' বন্ধ করে দিল। আগেই জেলের খাবারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলেছি। এবার বিহারের কথা বলব। পূর্বে নূতন নূতন বন্দী এলে সকালে বিকালের নির্দিষ্ট সময়ে বন্দীদের জেলের উঠোনে, মাঠে বেড়াতে দিত। কিন্তু পরে তাও বন্ধ করে দিল। বন্দীদের মধ্যে প্রাণবন্ত যারা ছিল তাদের এক-একটা ঘরে কোথাও দুজনকে, কোথাও একজনকে আটকে রেখে সমস্ত রকম অধিকার হরণ করে নিল। নির্দিষ্ট সময়ে যেটুকু বাইরের হাওয়া উপভোগ করত তাও বন্ধ হয়ে গেল; বন্দীর সঙ্গে বন্দীরা কথাও বলতে

পারতো না। কবি নজরুলকে জেলের পশ্চিম অংশে পূর্বমুখী সারবন্দী সেলগুলির ভিতর ৫নং সেলে বন্দী করা হল[২]। এই সেলের পরিসর লম্বায় ছয় ফুট এবং চওড়ায় চার ফুট। চারদিকে দেওয়াল। সারবন্দী ছটা সেল। ছোট্ট ঘরের দরজাটি ছিল মোটা মোটা লোহার গরাদের। তা বন্ধ করে দিলে সামনে একটু বারান্দা। তারপরই একটু ফালি পাকা উঠোন। তারপর লোহার পাত দিয়ে মোড়া বড দরজা। সেই দরজা বন্ধ করে দিলে নজর একেবারে ছয় ফুট চার ফুট ঘরের মধ্যে আটকে পড়ে। এইরকম একটা বিশ্রী ঘরে কবিকে বাস করতে হয়েছিল দীর্ঘ দিন। বাংলার কোন কবি সাহিত্যিক এমন একটি ঘরে জাতির মুক্তির জন্য বাস করেছেন কিনা শুনিনি। এমন অবস্থাতেও কবি নজরুল গান না গেয়ে থাকতে পারতেন না ; তিনি গান ধরতেন ঃ

"কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল পূজার পাষান বেদী
ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিষান
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচীর প্রাচির ভেদী।" ইত্যাদি

গানগুলি শুনে বিক্ষুব্ধ বন্দীদের শিরদাঁড়া সোজা হয়ে উঠত। তারা জেল কর্তৃপক্ষের এই অত্যাচারের উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত হত। কবি, সতীন সেন এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট বন্দীকে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ী দিয়ে "সেলে" বন্দী করে অন্যান্য কয়েদী থেকে দূরে সরিয়ে রেখে দিল। কবি তখন "শিকলপরার গান" খানি হাতকড়া বাঁধা হাত ডুটি সেলের লোহার গরাদের সঙ্গে ঘা দিয়ে দিয়ে বাজিয়ে গাইতেন ঃ

"(এই) শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল,
(এই) শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল !
(তোমার) বন্দীকারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
(ওরে) ক্ষয় করতে আসা মোদের সবাব বাঁধন ভয় !
(এই) বাঁধন পরেই বাঁধন ভয়কে করবো মোরা জয়,
(এই) শিকল বাঁধা পা' নয় এ শিকল ভাঙ্গা কল।"

বন্দীজীবনে ভয়শূন্য হবার জন্য কবি অপূর্ব যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি গানের মধ্য

(২) পরিশিষ্টে হুগলী জেলের জেলর শ্রী এ. কে. মুখোপাধ্যায়ের চিঠি দ্রষ্টব্য।

দিয়ে প্রকাশ করেছেন। কাগজ নেই, কলম-পেন্সিল, তাও নেই, কবি শূন্য হাতে শুধু স্মৃতিশক্তির জোরে এই সব গান শত বাধা সত্ত্বেও সুর ও দরদ দিয়ে ভাবাবেগের সঙ্গে গেয়ে বন্দীদের প্রাণে প্রাণে প্রতিকারের জন্য, প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত প্রতিবাদের জন্য আগুণকে বন্দীদের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর বিখ্যাত "সেবক" কবিতা উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে বন্দীদের সংগ্রাম-শক্তি বাড়িয়ে তুলেছিলেন। কবির সান্নিধ্যে এসে সাধারণ কয়েদীরা পর্যন্ত দেশকে ভক্তি করতে শিখেছিল আবৃত্তির মাধ্যমে—

"সত্যকে হায় হত্যা ক'রে অত্যাচারীর খাঁড়ায়
নাই কিরে কেউ সত্য-সেবক বুক খুলে আজ দাঁড়ায় ?
শিকলগুলো বিকল করে পায়ের তলায় মাড়ায়
বজ্রহাতে জিন্দানের (জেলখানার) এই ভিত্তিটাকে নাড়ায় ?"

এই প্রশ্ন বারে বারে বন্দীদের কাছে তুলে ধরলেন।

জেলেব অবস্থা খুব ঘোরালো হয়ে উঠলো। জেলে যতরকম শাস্তি দেওয়ার ফন্দী ছিল, জেলার আর সুপার সকলের উপর তাই প্রয়োগ করতে লাগলো। অনমনীয় বন্দীরা, অনমনীয় বিদ্রোহী কবি, অনমীনয় সাধারণ কয়েদীরাও এবই প্রতিবাদের জন্য মিলিত ভাবে সবাই অনশন ধর্মঘটের প্রস্তাব দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে সকলে প্রস্তুতির দিকে এগিয়ে চলে। এই সময় কবি নজরুল "মরণবরণ" গানখানিও গেয়ে দেশভক্ত বিপ্লবী ও সাধাবণ কয়েদীদের প্রাণবন্যা বইয়ে দিতেন—

"এস এস এস ওগো মরণ
এই মরণভীতু মানুষ মেষের ভয় করগো হরণ।
না বেরিয়েই পথে যারা পথের ভয়ে ঘরে
বন্ধ করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাদের বুকের পরে
ভীমরুদ্রতালে নাচুক তোমার ভাঙ্গন ভরা চরণ।"

এই সঙ্গে "বন্দী-বন্দনা" নামে আব একটি গানও গাইতেন। ভোরবেলায় রাজনৈতিক বন্দীদের "ফাইলে" দাঁড়াতে হত। স্কুলে ড্রিলের সময় যেমন দাঁড়াতে হয় সেইরকম দাঁড়ানোকে "ফাইল" বলে। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, বন্দীদের রাম দুই ক'রে হেড জমাদার গুনতো। গোনা হয়ে গেলে জেলার তার বিকট ভুঁড়ি দুলিয়ে মূর্তিমান দম্ভের মতো ঢুকতো বোকা বোকা মুখের ভাব নিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে জমাদার বীভৎস চীৎকার করে বলে উঠত "সরকার সেলাম"। এই সরকার সেলাম কবি, কবির বন্ধু মঈনউদ্দীন, সতীন সেন, হুগলীর দুর্গাদাস ও অন্যান্য বন্ধুরা বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে একটি করে ঠ্যাং সামনের দিকে তুলে দিতেন। পরে এই

নিয়ে অনেক মারপিট হয়েছিল। মনে পড়ে, এই পদ্ধতিটা হুগলী বিদ্যা-মন্দিরের প্রাণস্বরূপ শিক্ষক দধিচী ✓দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় সবাইকে শিখিয়ে-ছিলেন। ভোববেলার এই ব্যাপাবটার সঙ্গে উপরিউক্ত "বন্দীবন্দনা" গানটির যোগাযোগ ছিল। ভোরের সুরমণ্ডিত এই প্রভাতী গান গেয়ে কবি নজরুল সকলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন। গানটি এই—

"আজি বক্ত নিশিভোবে
একি এ শুনি ওবে
মুক্তি কোলাহল বন্দীশৃঙ্খলে
ঐ কাহাবা কাবাবাসে
মুক্তি হাসি হাসে
টুটেছে ভয় বাধা স্বাধীন হিয়াতলে।
ওবা দুপায়ে দলে গেল মরণ শঙ্কাবে
সবাবে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কাবে
বাজিল নভতলে
স্বাধীন ডঙ্কাবে
বিজয় সঙ্গীত বন্দী গেয়ে চলে,
বন্দীশালা মাঝে ঝঞ্ঝা পশেছেবে
উতল কলবোলে॥
আজি কারাব সাবাদেহে মুক্তি ক্রন্দন
ধ্বনিছে হাহাস্বরে ছিঁড়িছে বন্ধন
নিখিল গেহ যেথা বন্দীকাবা, সেথা
কেনরে কাবা ত্রাসে মবিবে বীব দলে ?
"জয় হে বন্ধন" গাহিল তাই তাবা
মুক্ত নভতলে॥" ইত্যাদি (বিশেব বাঁশী)'

এরপর শুরু হল অনশন ধর্মঘট। এবং বন্দীরা জোরগলায় জানিয়ে দিল "সম্মানজনক অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের চলা থামবে না।" প্রথম প্রথম এই ধর্মঘটের কথা বাইরে প্রকাশ হয়নি। তারপব জেলকর্তৃপক্ষ, হুগলির শাসক ঘটনাকে আঁচল চাপা দিয়ে এই আগুন আর চেপে রাখতে পারল না। "সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে।" এই অনশন ধর্মঘট নিয়ে সারা বাংলা দেশ ও নিখিল ভারতের নরম ও চবমপন্থী নেতারা, ছাত্র ও যুবকরা এমন কি সাধারণ লোকেরাও ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এমন কি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও খুব বিচলিত হয়েছিলেন। কবি নজরুল নিজে সৈনিক পুরুষ, একরোখা লোক, যা করবেন তা করবেনই, কিছুতেই তাঁকে রোখা যেত না। এই অনশনের সময় সমস্ত বন্দীরই অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। হাত-পা-মাথা চেপে ধবে জেলওয়ার্ডার চামুণ্ডার দল জোর করে নলের মাধ্যমে নাকের মধ্য দিয়ে খাওয়ানোর জন্যই বেশির

ভাগ বন্দীরা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন শুধু তাই নয় কারুর কারুর জীবনও সংশয় হয়েছিল। সকল বন্দীর জন্য, বিশেষ করে বিদ্রোহী কবির জন্য দেশবাসী উদ্বেগে অধীর হয়ে উঠে। সভাসমিতি, প্রস্তাব পাশ, নানারকম চেষ্টা চলতে থাকে। কবিকে দেশের বড় বড় নেতারা অনশন ত্যাগের অনুরোধ করে চিঠিও পাঠান। কবি "মরণবরণ" গান গেয়ে সকলকে মৃত্যুভয় শূন্য হয়ে অনশনের পথে ডেকেছেন, তিনি হয় সকলকে নিয়ে মরবেন, নয় সকলকে নিয়েই সাফল্যের মধ্য দিয়ে অনশন ত্যাগ করবেন এই তাঁর জিদ্। পরে স্বয়ং বিশ্বকবি যখন তাঁকে টেলিগ্রাম করে জানালেন ঃ—**Give up hunger Strike, our literature claims you—Rabindranath.** কবি নজরুল হুগলী জেলে আসেন ১৪. ৪. ২৩ তারিখে, হুগলী জেল থেকে বহরমপুর জেলে যান ১৮. ৬. ২৩ তারিখে। সর্বসাকুল্যে নজরুল হুগলী জেলে ছিলেন দুই মাস চার দিন। তাহলেও নজরুলকে পেয়ে তখনকার দিনে হুগলী ও নানা জেলার যে-সব রাজনৈতিক কয়েদী ছিলেন এবং সাধারণ কয়েদীরাও আইনতঃ যা কয়েদীদের পাওয়া উচিত তাই দাবি করে অনশন শুরু করলেন। অনশন অন্তে নজরুলকে ১৮. ৬. ২৩ তারিখে বহরমপুর জেলে পাঠান হয়, সর্বপ্রকার দাবি পূরণ করে।

অনশন যখন তুঙ্গে ওঠে তখন রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম করেন আলিপুর জেলে। কিন্তু সেই টেলিগ্রাম নজরুলকে হুগলী জেলে পাঠিয়ে ফেরত পাঠান হয়েছিল। "বসন্ত" নাটক পেয়ে নজরুল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে যে আনন্দলাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন, এই অনশনের সময় রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম হস্তগত হলে তিনি আরও প্রেরণা লাভ করতেন ও দেখতেন যে রবীন্দ্র-পরিষদের শত বিরূপতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কত ভালবাসেন। তাঁর মঙ্গল চিন্তা শতসহস্র কর্মব্যস্ততার মধ্যেও করে থাকেন। কিন্তু নজরুল রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রামের কোন কথাই জানতে পারলেন না। পরে অবশ্য এইজন্য নজরুলের রবীন্দ্রনাথের উপর অভিমানও হয়েছিল। যাই হোক নজরুলের অনশনের সংবাদে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন যে রথীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখে নজরুলের শুভসংবাদ সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। তিনি লেখেন—

কল্যাণীয়েষু,

রথী, নজরুল ইসলামকে **Presidency Jail** ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলুম ; লিখেছিলুম **'Give up hunger strike, our literature claims you'**। জেল থেকে **Memo** এসেছে—**"The addressee not found".** অর্থাৎ ওরা আমার **Message** ওকে দিতে চায় না ; কেননা, নজরুল প্রেসিডেন্সী জেলে না থাকলেও ওরা নিশ্চয় জানে সে কোথায় আছে। অতএব নজরুল ইসলামের আত্মহত্যায় ওরা বাধা দিতে চায় না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিগুরু নজরুলকে গভীর স্নেহ করতেন এবং তাঁর কবিত্বের দ্বারা যে

দেশ সমৃদ্ধ হবে এ বিশ্বাসও গুরুদেবের ছিল। তাই নজরুলের আমরণ অনশনের সংবাদ পেয়েও তৎকালীন সরকারের অমানুষিক দুর্ব্যবহারের জন্য চিন্তায় আকুল হয়ে শেষ পর্যন্ত রথীন্দ্রনাথকে খবর জানাবার জন্য চিঠিও দিয়েছিলেন।

(দৈনিক বসুমতী—১৩৫৮, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার)

কবি নজরুলের বাংলা সাহিত্যের জন্য এবং ভারতের ভবিষ্যতের জন্য বেঁচে থাকা দরকার একথা বিশ্বকবি স্বীকার করলেও তৎকালীন অন্যান্য সাহিত্যিকরা স্বীকার না করে দেশবাসীদের কাছে হেয় হয়ে আছেন। এর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটকখানি নজরুলকে উৎসর্গ করেন, আলিপুর জেলে। পবিত্রবাবুর হাত থেকে 'বসন্ত' নাটকখানি হাতে নিয়ে নজরুল দেখলেন কবিগুরু 'বসন্ত' নাটকের উৎসর্গ পৃষ্ঠায় ছাপা অক্ষরে "শ্রীমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কল্যাণীয়েষু" লিখে নিচে তাঁর নাম কালি দিয়ে সই করেছেন।

অনশনের সময়ে বাইরের আন্দোলনের চাপে, ও রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে বন্দীদের দাবি মেনে নেবে বলে সরকার স্বীকার করল। তখনও চির-অবিশ্বাসী ব্রিটিশ সরকারকে বন্দীরা বিশ্বাস করতে পারলেন না। অনশন ধর্মঘট চলছে, এমন সময় একদিন কলকাতা থেকে পবিত্রবাবুর সংগে বিরজাসুন্দরী দেবী, হুগলী বালির ৺চারুশীলা মিত্র প্রভৃতি হুগলী জেল গেটে এসে উপস্থিত হলেন। এদের সঙ্গে হুগলীর বিপ্লবী নেতা সিরাজুল হক্, হামিদুল হক্, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়; বিজয় মোদক আরও দু'একজন ছিলেন। বিরজাসুন্দরী দেবীকে কবি নজরুল 'মা' বলে ডাকতেন। এঁকে "সর্বহারা" নামক শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থখানি উৎসর্গ করেছিলেন। তাতে লিখে-ছিলেন—

"সর্ব্বংসহা সর্ব্বহারা জননী আমার।
তুমি কোনদিন কারো করনি বিচার,
কারেও দাওনি দোষ। ব্যথা বারিধির
কূলে বসে কাঁদ মৌনা কন্যা ধরণীর
একাকিনী। যেন কোন্ পথ-ভুলে আসা
ভিন-গাঁর ভীরু মেয়ে! কেবলি জিজ্ঞাসা
করিতেছ আপনারে, এ আমি কোথায়?—"

বিশ্বকবির হস্তক্ষেপে ও বিরজাসুন্দরীর বহু সাধ্যসাধনায় ও সরকার পক্ষের দাবি মিটিয়ে দেবার স্বীকৃতিতে মায়ের হাতের লেবুর রস পান করে কবি নজরুল অনশন ভঙ্গ করলেন। অনশন যখন চলছে, তখন নজরুলের মা তাঁর গ্রামের একটি ছেলেকে ও বড় ছেলে সাহেবজানকে নিয়ে হুগলীতে আসেন। কিন্তু একেবারে নূতন জায়গা। কোথায় যাবেন? তখন ছেলে স্বদেশী করে জেলে গেছে; ভেবে বুদ্ধি করে তাঁরা ১৯২৩ এর মে মাসের প্রথম দিকে হবে, হুগলী কংগ্রেসের বিদ্যামন্দিরে

এসে আমাদের কাছে পরিচয় দিয়ে রাত্রবাস করে নজরুলের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য অনুরোধ করেন। সেই হিসাবে নজরুলের মাকে আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে থাকবার ব্যবস্থা করে দি। অতঃপর কয়েকদিনের চেষ্টায় নজরুলের মা তাঁর ছেলের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলেন। সঙ্গের যুবকটিকে হুগলী জেলার গোয়েন্দা বিভাগ দেখা করবার অনুমতি দেয়নি। নজরুলের মা ঐ একদিনই দেখা করবার অনুমতি পেয়েছিলেন। কিন্তু নজরুল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি মার সঙ্গে দেখা করবেন না[৩]। হুগলী জেলের প্রাচীন বিপ্লবী শ্রীভূজঙ্গ ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শান্তি ঘোষ হুগলী জেলখানার কাছেই থাকতেন। বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ ছিল। কবি যখন জেলে থাকতেন তখন এই মহিলাটি চিঠি ও নানারূপে খবরাখবর সরবরাহ করে কবিকে সাহায্য করেছেন। অনশনভঙ্গ হবার পর কর্তৃপক্ষ বন্দীদের সমস্ত দাবিই মিটিয়ে দিল, কিন্তু সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা কেটে তারপর পড়তে দিত।

কবি নজরুল ইতিমধ্যে কবিখ্যাতির চরমে উঠেছেন। এতে করে তৎকালীন বাঙলাদেশের ছিদ্রান্বেষী সাহিত্য-ব্যবসায়ী সাহিত্যিকদের বুকে হিংসার বিষ উথলে উঠল। এরা শুধু হিংসা করেই ক্ষান্ত হননি। প্রতিহিংসা নেবার জন্যেও কলমকে শানিয়ে শূল করে তুললেন। সুবিখ্যাত বিদ্রোহী কবিতাকে ব্যঙ্গ করে মোহিতলাল মজুমদার "কবি বিদ্রোহী" লিখলেন। সজনীরা "শনিবারের চিঠিতে" লিখলেন "ব্যাঙ" নাম দিয়ে কবিতা। এঁরা মনে করেছিলেন এইভাবে কবি নজরুলকে বাংলা কাব্য জগত থেকে সরিয়ে দেবেন! কিন্তু এদের নাম এরই মধ্যে প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে, কিন্তু নজরুল জনগণের মনে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এর কারণ কবি হয়ে তিনি জাতির স্বাধীনতা অভিযানের সঙ্গে পা মিলিয়ে, গলা মিলিয়ে, জানকবুল করে, মৃত্যুকে ভয় না করে চলেছিলেন। পলায়নী বৃত্তি তাঁর ছিল না—তাই কবি নজরুল শত বাধা বিরোধীতাকে ঠেলে উন্নত শিরে ছাতি চিতিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

(৩) নজরুল ও তাঁর মা অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কারাজীবন (বহরমপুর)

উনিশশো তেইশ, আঠারই জুলাই (১৮. ৭. ২৩) তারিখে নজরুলকে হুগলী জেল থেকে বহরমপুর জেলে বদলী করা হয়। উক্ত তারিখের সন্ধ্যার পর এই খবর হুগলী বিদ্যামন্দিরে এসে পৌঁছল। সেখানকার যুগান্তর দলের সভ্যরা নজরুলকে হুগলীঘাট ষ্টেশনে বিদায় সংবর্ধনা দেবার জন্য প্রস্তুত হল। যাতে সরকার পক্ষ না জানতে পারে তার জন্য সতর্কতাও অবলম্বন করা হল। কারণ সরকার পক্ষ তা হলে নজরুলকে হুগলীঘাট দিয়ে না নিয়ে অন্যপথ ধরবে। কবিকে ব্যাণ্ডেল নৈহাটির ব্রাঞ্চলাইনের গাড়িতে নৈহাটী জংশনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এমনি একটা খবর দিয়েছিলেন তখনকার থানার দারোগা অতুল কর। মালা নিয়ে স্টেশনে নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যামন্দিরের যুগান্তর দলের হামিদুল, সিরাজুল হক, বিজয় মোদক প্রভৃতি তরুণ সভ্যরা উপস্থিত হয়ে দেখল যে কবিকে নিয়ে আর্ম-পুলিস, সাধারণ কনস্টেবল, একজন গোয়েন্দা ও একজন সার্জেন, কবির কোমরে দড়ি বেঁধে, হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে, ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। কবিকে খুব রোগা দেখালেও মুখে চোখে খুব সতেজ ভাব ছিল। কবির সঙ্গে আরো দু'তিনজন বন্দী ছিলেন।

ছেলের দল গোয়েন্দা অফিসারের কাছে কবিকে মালা পরিয়ে দেবার কথা বলায় লোকটি কোন আপত্তি করল না। কবিকে মালা পরিয়ে জয়ধ্বনি করা হল, কবিও ছেলেদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন। বন্দী কবিকে বিদায় করে সকলে চলে এল। বিদ্রোহী কবি, বিপ্লবের কবি; প্রথম-সংবর্ধনা পেয়েছিলেন হুগলীর বিপ্লবীদের কাছে। এর পরের ঘটনা আমার জানা ছিল না। হুগলীর বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ যোগ থাকায় 'হুগলীর কারাজীবন' আমি লিখেছিলাম। বর্তমানে শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয় 'নজরুলের সঙ্গে কারাগারে' গ্রন্থে বহরমপুর জেলের কথা লিখেছেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে উক্ত গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু বিষয় নিয়ে এই অধ্যায় লেখা হল।

সতের বৎসর পূর্বে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 'কবি নজরুল' নামে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "সেই দিনই বহরমপুর জেলে এসেছি হুগলী জেল থেকে। খাওয়া দাওয়ার পর শুয়েছি। ১৯২৩ কি ১৯২৪-এর বর্ষাকাল। দক্ষিণে বামে পাশাপাশি অনেকগুলি লোহার খাট পাতা। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্। খোলা জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। নিবিড় অন্ধকার। সেই বন্দীশালার অন্ধকারের মধ্যে প্রথম শুনলাম নজরুলের গান।"[১]

(১) বঙ্গশ্রী, বিংশবর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ৪৯৯, ১৩৬০।

শ্রদ্ধেয় বিজয়লাল কবি। তিনি লিখেছেন বহরমপুর জেলে হুগলী জেল থেকে একই দিনে গিয়ে পৌঁছলেন। সময়টাও ঠিক ওঁর মনে নেই (১৯২৩/২৪), আবার বলছেন যে সেই দিনই তিনি নজরুলের কণ্ঠে গান প্রথম শুনলেন। হুগলী জেলে যাঁর গানের অগ্নিসঞ্চারে দেশশুদ্ধ তোলপাড় হয়ে গেল, তাঁর গান হুগলী জেলে থাকতে শ্রদ্ধেয় বিজয়লাল শোনেননি ?

অথচ একই জেলে ছিলেন, বদলী হলেন একই সাথে। হুগলী জেলে নজরুলের সঙ্গে ছিলেন শ্রদ্ধেয় সতীন সেন এবং আরো অনেকে, তাঁরা হুগলী জেলেই রয়ে গেলেন। সতীন সেনের কথা উঠলে নজরুল বলতেন যে, "সতীনদা লোহার মানুষ। যেমন আদর্শে কঠিন, তেমনি স্নেহশীল।"

বিজয়লাল উক্ত প্রবন্ধে বলেছেন যে, "পূজার সময় বহরমপুর জেলের তদানীন্তন 'সুপার' বসন্ত ভৌমিক মহাশয় হারমোনিয়াম পাঠিয়ে ছিলেন। হাবমোনিয়াম পেয়ে নজরুলের কি আনন্দ। কবির কণ্ঠ থেকে গানেব ফোয়ারা ছুটতে আবম্ভ হল। পূজার দিনগুলি গানের মধ্যে দিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলে গেল। ইংরেজের জেলখানা সুরের ইন্দ্রলোকে রূপান্তরিত হয়ে গেল।"

জেল রেকর্ডে দেখছি বিচারের সময়ই বিচারক নজরুলকে স্পেশাল ক্লাশ কয়েদীর নির্দেশ দিয়েছিলেন ; অনশন ভঙ্গের পর হুগলী জেলেই নজরুলকে বিশিষ্ট শ্রেণীর কয়েদী করে (Special class prisoner)[২] বহরমপুর জেলে পাঠান হয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বহরমপুর জেলে গিয়েও জেলরের ব্যবহারে সকল বন্দীর সঙ্গে আবার অনশনের জন্য নজরুল প্রস্তুত হচ্ছেন।

আলিপুর জেল থেকে হুগলী জেল পর্যন্ত নজরুলের সঙ্গে জেল কর্তৃপক্ষ খুবই দুর্ব্যবহার করেছে। আলিপুর জেল থেকে যখন হুগলী জেলে কবিকে বদলী করা হয়, কবি তখন স্পেশাল ক্লাশ কয়েদী। তবুও কোমরে দড়ি বেঁধে, হাতকড়ি দিয়ে, পরণে ডোরাকাটা জাঙ্গিয়া, গায়ে ডোরাকাটা কামিজ পরিয়ে পাঠানো হয়। আবার বহরমপুর জেলে পাঠাবার সময়ও তাই— অথচ কোর্ট থেকে তাকে স্পেশাল ক্লাশ কয়েদীর অধিকার দিয়েছিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ বলছেন ঃ "পর্বত প্রমাণ চুরি চামারির ব্যূহ ভেদ করে সেদিনকার সাধারণ কয়েদীর ভাগ্যে যে আহার্য জুটতো—তা শুধু অখাদ্য ছিল না, ছিল পশুরও অযোগ্য। সেই খাদ্যই দেওয়া হলো কাজীকে। এবং সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক জুলুম ও দুর্ব্যবহারের অবধি রইল না।…কারাগারে প্রায়োপবেশন শেষ প্রতিবাদ পন্থা। কয়েদীর জীবনে আর কোন অস্ত্র নেই, যা দিয়ে প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সে লড়াই করতে পারে।"[৩]

বহরমপুর জেলে পৌঁছে প্রথম দিকে বেশ আরামেই ছিলেন। 'সুপার' বসন্ত ভৌমিক ভালমানুষ ছিলেন। নজরুল আসবার পরই তিনি একটা

(২) হুগলীর জেলরের চিঠি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য

(৩) নজরুলের সঙ্গে কারাগারে—পৃঃ ২৬

হারমোনিয়াম পাঠিয়ে দেন। তাতে নজরুল যেমন খুশি হয়ে ওঠেন তেমনি সর্বক্ষণ গান গেয়ে, গান, কবিতা লিখে সকলকে জেলের দুঃখ ভুলিয়ে আনন্দের মধ্যে দিন কাটাতে থাকেন।

নরেন্দ্রবাবু লিখছেন—"এই বন্দীশালার সীমাবদ্ধ ও শাসন-সংযত পরিবেশেও কত সহজেই না কাজী গান লেখেন, সুরারোপ করেন, লেখেন দীর্ঘ কবিতা। অতি সাধারণ আলাপ আলোচনার মধ্যেও কথায় কথায় কেমন ছন্দ মিলের খেলা দেখান।"[৪]

এই আবহাওয়ার মধ্যে পূর্ণদাস, নরেন্দ্রনারায়ণ ও কাজী এক পরিকল্পনা করলেন: "কাজী পালা গাঁথিবেন, গানের সুর দিবেন ও গান গাইবেন। আমাব উপর থাকিবে অভিনয়ের দায়িত্ব, পরিচালনার ভার থাকিবে পূর্ণ-বাবুর উপর।"[৫]

মুকুন্দদাসের যাত্রার কথাই তখন নরেন্দ্রনারায়ণের মনে জেগেছিল। কাজীকে দিয়ে তিনি এই রকম একটি স্বদেশী যাত্রার দল গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন।

বসন্ত ভৌমিকের মত সজ্জন সুপার থাকার জন্য কাজী ও অন্যান্যরা বেশ সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁরা জেলখানার ভিতর "বালেশ্বর বলিদানের" স্মৃতি পূজার ব্যবস্থা করলেন। এই সম্বন্ধে নরেন্দ্রনারায়ণ বলছেন: "বিকেল ৫টায় আরম্ভ হইল অপরাহ্নের অনুষ্ঠান—সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন মওলানা সুফী। আরম্ভ হইল কাজীর গান দিয়া। 'বিদায় দে মা ঘুরে আসি।' সকলের মন বিষাদে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। ইহার পর পূর্ণবাবু বালেশ্বর কাহিনী বিবৃত করিলেন। অমরেশবাবু (কাঞ্জিলাল) মৃত্যুঞ্জয়ী যতীন্দ্রনাথের (বাঘাযতীন) জীবনী আলোচনা করিলেন"[৬]। সভাপতির ভাষণের পর সভা ভঙ্গ হলেও নজরুল নতুন করে সভা জাঁকিয়ে বসলেন। গাইলেন তাঁর স্বরচিত গান, রবীন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের গান।

নরেন্দ্রবাবু বলছেন: কি আলিপুর কি বহরমপুর জেলে নজরুলের লেখা জমেনি। যা' লিখেছেন তা' গুপ্ত পথ দিয়ে বাইরে কোন কোন কাগজে প্রকাশ হয়েছে।

বসন্ত ভৌমিক সুপার থাকার সময় অনেকেই জেল আইন ভঙ্গ করতে দ্বিধা করত না। বিশেষ করে কাজী নজরুল ও মাদারীপুরের পূর্ণদাসবাবু। তাঁরা গোপনে গোপনে চিঠি লিখে সুড়ঙ্গপথে বাইরে পাঠাতেন, ও বাইরে থেকে তাঁদের কাছেও চিঠি আসত এ সংবাদ জেল কর্তৃপক্ষ জানতে পারলেও বসন্তবাবুর জন্য কেউ কিছু বলতো না বা আইনগত প্রশ্নও তুলতো না। কিন্তু যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল তখন বসন্তবাবুই একদিন নজরুলদের আস্তানায় এসে হাজির হলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভাল

(৪) নজরুলের সঙ্গে কারাগারে—পৃঃ ৪৮
(৫) ঐ —পৃঃ ৪৬
(৬) ঐ —পৃঃ ৬২

মানুষ। অত্যন্ত ভদ্রভাবে ঘরটা তল্লাসী (সার্চ) করবার কথা বলায় নরেন্দ্রবাবু প্রতিবাদ করায় "দায়সারা গোছের" সার্চ করে সরকারী হুকুম তামিল করে চলে গেলেন। এই ব্যাপারেই বসন্তবাবুর ওপর সরকারও খুব অসন্তুষ্ট হয়ে পড়লেন।

বসন্তবাবুর দায়সারা গোছের সার্চেই এটা মিটলো না। এরপর একদিন নরেন্দ্রনারায়ণ বলছেন, "আমার খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল লণ্ঠনের আলো, টিম্‌টিমে। অতবড় ঘরটার আঁধার কাটত না। লণ্ঠনের কাছে যা একটু আলো। সেই আলো আঁধারে মস্‌মস্ করে ঘরে ঢুকে পড়ল দু-তিনজন ইউরোপিয়ান একেবারে আমার সামনে। আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। পেছনে ছিলেন সুপার বসন্তবাবু।[৭]

"আমার মনে তখন তুফান, একগাদা অবৈধ চিঠি আমার ড্রয়ারে। একখানাও নষ্ট করিনি। সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম, কৃপনের ধনের মত[৮]।......

"গা আমার আদুল ছিল। নিজের টেবিলের ধারে গেলাম। মশারির ডাণ্ডায় ঝোলান ছিল গেঞ্জি। টেনে নিয়ে গায়ে দিলাম। আড়নয়নে দেখে নিলাম সাহেবটাকে। অপলক তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ওর দৃষ্টি আড়াল করে খুব সন্তর্পনে খুললাম ড্রয়ার, চিঠির তাড়া গুঁজে নিলাম তলপেটের খাঁজে[৯]।......

"কাজ শেষ করে অমরেশবাবুর ফরাসে গিয়ে বসলাম। পান একটা মুখেও দিলাম।......

"সেই অবকাশে চাপা গলায় বল্‌লাম, কাজীর চিঠি, যা' করবার করে ফেলুন[১০]।......

পান দোক্তার পিক্ ফেলবার ছুতো করে অমরেশবাবু কাজীর চিঠির বাণ্ডিলটা ফেলে এলেন জলের ড্রামের ভিতরে।" পুলিসের অত্যাচারের জন্য বাংলার অমূল্য সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল চিরকালের মত।

শরৎকাল। পূজা এসে গেছে। সকল বন্দীরা জেলখানায় মাতৃপূজা করবার জন্য মেতে উঠলেন। নরেন্দ্র নারায়ণ লিখছেন "হোলামই বা আমরা বন্দী। মুখ কালি করে বসে থাকতে হবে নাকি তাই বলে। মেতে উঠলাম সবাই। কাজী এলেন ফর্দ নিয়ে, অষ্টমী আর বিজয়ার সন্ধ্যায় হবে উৎসব। গানে, অভিনয়ে, আবৃত্তি দিয়ে ভরে দিতে হবে সবার মন। ভুলিয়ে দিতে হবে বন্ধন-বেদনা। কাজী লিখতে বসলেন ছোট একটি নোটিশ। পাত্র-পাত্রীর ভীড় নেই। কাজী একাই একশো।

(৭) নজরুলের সঙ্গে কারাগারে—পৃঃ ৭৩
(৮) ঐ —পৃঃ ৭৪
(৯) ঐ —পৃঃ ৭৫
(১০) ঐ —পৃঃ ৭৫

সুপার দিলখোলা লোক নয়, ছিলেন দিল-দরাজ লোক।"[১১]

বন্দীরা সকলেই তাঁদের দুর্গাপূজার মতলব পেশ করলেন তাঁর কাছে। তিনি রাজী হয়ে গেলেন। অফিস থেকে সিপাই, ফালতুরাও পর্যন্ত প্রাণ খুলে পূজায় আনন্দ করলেন। নাটকও হল। নাটকের বিষয়বস্তু—"যবনিকার পিছনে ছিল আর একখানি পর্দা। তারই আড়ালে কাজী। মার মার শব্দ আর লাঠির ঠকাঠক আওয়াজ উঠল সহসা। পর্দা উঠল। মঞ্চে পড়ে আছে গোটা কতক লাশ। পাশে ছোট্ট শিশু একটি। বুকে তার আমূল-বিদ্ধ ছোরা। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দস্যু সর্দার একা দাঁড়িয়ে। নির্নিমেষ দৃষ্টি তার পড়ে আছে শিশুর মুখে। কোন কথা নেই। উচ্ছ্বাস নেই। ধীরে দস্যু বসে পড়ে হাঁটু ভেঙে। শিশুকে তুলে নেয় বুকে। শিশু কঁকিয়ে উঠে। পর্দা পড়ে যায়। দস্যুর হাতে ছোরার বদলে ওঠে বীণা। গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে। গান গায় আর দস্যু কাঁদে, হাসে, নাচে। জীবনের রূপান্তর।"[১২]

ভালো মানুষ, সুপার বসন্ত ভৌমিক বন্দীদের শত সহস্র আবদার পালন করে এসেছেন। এবার এসে গেল কালীপূজা। কালীপূজাও হল সমারোহে। পূজায় আইন ভঙ্গ করে জেলের মধ্যে বলিও হয়েছিল। হয়েছিল পুরোপুরি উৎসবও। তারপর জেল আইন ভঙ্গ করার জন্য কাজী ও পূর্ণদাস মশাইয়ের নামে মামলা রুজু হয় কোর্টে। তাতে নজরুল ও পূর্ণবাবুর একমাস করে অতিরিক্ত শাস্তিও হয়েছিল। পূর্ণবাবুর আর কাজীর মুক্তির দিনও এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁদের মুক্তির সময় গেল পিছিয়ে। নরেন্দ্র-নারায়ণ আগেই মুক্তি পেয়ে বাইরে চলে এলেন। সুপার বসন্ত ভৌমিক বদলী হয়ে গেলেন। এল নূতন ইংরেজ সুপার। ভারী কড়া আর অভদ্র। ঠিক হুগলী জেলের সুপারেরই জাত ভাই। বন্দীদের সঙ্গে তাঁর খুব খটাখটি লেগে উঠেছিল। অবশ্য নরেন্দ্রনারায়ণেরই গ্রন্থ পড়ে জানা যায় যে এই জেল সুপারকে তিনি খুব সায়েস্তা করে ছেড়ে ছিলেন।

নজরুল বহরমপুর জেলে অনেক গান ও কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু একটি মাত্র কবিতাই পেয়েছি, যেটি বহরমপুর জেলে বসে লিখেছিলেন। কবিতাটি বিয়াল্লিশ লাইনের। কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করলাম। কবিতার নিচে লেখা আছে, "বহরমপুর জেল, শ্রাবণ, ১৩৩০ সাল"।

ইন্দু প্রয়াস

(কবি শরদিন্দু রায়ের অকাল মৃত্যু উপলক্ষে)

"বাঁশীর দেবতা! লভিয়াছ তুমি হাসির অমর-লোক,
হেথা মর-লোকে দুঃখী মানব করিতেছি মোরা শোক।
অমৃত পাথারে ডুব দিলে তুমি ক্ষীরোধ-শয়ন লভি,
অমৃতের শিশু মোরা কেঁদে বলি, মরিয়াছ তুমি কবি।

(১১) নজরুলের সঙ্গে কারাগারে পৃঃ ৭৮
(১২) ঐ পৃঃ ৭৯

হাসির ঝঞ্ঝা লুটায়ে পড়েছ নিদাঘের হাহাকারে,
মোরা কেঁদে বলি, কবি খোয়া গেছে অস্ত-খেয়ার পারে!

"ভালই করেছ ডিঙ্গিয়া গিয়াছ নিত্য এ কারাগার
সত্য যেখানে যায় নাক বলা, গৃহ নহে সে তোমার!
গিয়াছ যেখানে শাসনে সেখানে নহে নিরুদ্ধ বাণী,
ভক্তের তরে রাখিও সেখানে আধেক আসন খানি।
বন্দী সেখানে শুনিবে তোমার মুক্ত বন্ধ সুর,—
গঙ্গার কূলে চাই আর ভাবি কোথা সেই সুর-পুর!"[১৩]

বহরমপুর জেল থেকে মুক্তি লাভ করে, কিছুদিন তিনি উক্ত শহরেই ছিলেন। তাঁর বন্ধু নলিনাক্ষ সান্যালের বাড়ি। নজরুল যখন উক্ত জেলে অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে অনশন শুরু করেন ফিরিঙ্গী জেলারের ব্যবহারে এবং কদর্য আহার সরবরাহের জন্য, তখন নলিনাক্ষবাবু সর্বত্র আন্দোলন শুরু করেন। তাই ছাড়া পাওয়ার পর কবিকে সান্যাল মশাই তাঁর আস্তানায় সাদরে আশ্রয় দেন। নলিনাক্ষবাবু গোবরডাঙ্গার বিখ্যাত ঘটক পরিবারের ছিলেন গৃহ শিক্ষক, সেই সূত্রে নজরুল উক্ত পরিবারের আত্মীয় হয়ে ওঠেন। ঘটক পরিবারের সকলেই গান বাজনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। জগৎ ঘটক, তাঁর মা শ্রীযুক্তা সুনীতিবালা দেবী, তাঁর ছোট ভাই নিতাই ঘটক ও বোন শ্রীমতী গৌরী সকলেই নজরুলকে পেয়ে খুশি হলেন। পরবর্তীকালে শ্রীজগৎ ঘটক ও নিতাই ঘটক নজরুলের গানের স্বরলিপি করে খ্যাতিলাভ করেছেন। বহরমপুরের কথা বলতে হলে ঘটক পরিবারের কথা না বললে নজরুল-জীবন-কথায় বিরাট ফাঁক থেকে যায়।[১৪]

(১৩) ফনিমনসা—কাজী নজরুল—১ম সংস্করণ, পৃঃ ২৬
প্রকাশক বর্মন পাব্‌লিশিং হাউস, ১৯২৭ সাল।

(১৪) নজরুলপরিক্রমা- পৃঃ ৩৯১

হুগলীতে

১৯১৯ সালে ভারতবর্ষ রক্তে প্রাতঃস্নান করে উঠল। জালিয়ানওয়ালাবাগে ও'ডায়ারের অত্যাচারে দেশবাসী মনে প্রাণে বুঝতে পারল যে, ইংরেজকে ভারত ছাড়া না করলে আর নিস্তার নেই। আপসপন্থী কংগ্রেস কর্তব্য স্থির করতে না পেরে

"আবেদন আর নিবেদন থালা
বহে বহে নতশির"

হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল। এই সময় আফ্রিকায় সত্যাগ্রহে কৃতকার্য হয়ে গান্ধীজী কংগ্রেসে যাতায়াত শুরু করেছিলেন। এই যাতায়াতের ফলে 'অসহযোগ' ও 'বিলাতী বর্জন' আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। পাঞ্জাবে ও'ডায়ারের ডায়ার্কীর জন্য ১৯২১ সালে উক্ত আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়ে গান্ধীজী পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে দেন। অসন্তুষ্ট দেশবাসী মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ শাসনের স্তম্ভকে শিথিল করে দেবার উপক্রম করেছিল।

ঠিক এই সময়েই নজরুলের আবির্ভাব। বিপ্লবী ও অহিংসদল এক-যোগে হুগলীতে কংগ্রেস শাখা প্রতিষ্ঠা করেন ১৯২১ সালে, এপ্রিল মাসে। যে সব ছেলেরা স্কুল কলেজ ছেড়ে স্বেচ্ছাসেবকের কাজের জন্য কংগ্রেসের পতাকার তলায় ভীড় জমিয়েছে, তাদের দেশসেবার সঙ্গে যাতে শিক্ষার যোগ থাকে সেজন্য গান্ধীজী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হুগলী জেলা কংগ্রেস তখন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি বিদ্যা-মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করলেন।

এই বিদ্যামন্দিরের প্রধানদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান ছিল শ্রীভূপতি মজুমদারের। নজরুলকে মজুমদার মহাশয় একবার নিয়ে আসেন ১৯২১ সালের শেষের দিকে। বিদ্যামন্দিরের বিরাট হলঘরের মধ্যে প্রতিভা-দীপ্ত পৌরুষ ও লাবণ্যময় এক খাঁটি পুরুষকে দেখে, তাঁর গান ও আবৃত্তি শুনে, তরুণ বিপ্লবী স্বেচ্ছাসেবকদলের মন দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হল এবং কবিকে তাঁরা আত্মীয় বলে সেই দিনই স্বীকার করে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে লাগলেন। এই যোগাযোগকারীদের অগ্রণী ছিলেন বিজয় মোদক, বীরেন ঘোষ, হামিদুল, সিরাজুল হক এবং প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। বালকদের মধ্যে পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়, হৃদয় মোদক এবং আরো অনেকে।

এর পরই কবি কলকাতা থেকে "ধূমকেতু" সাপ্তাহিক প্রকাশ করলেন রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণীর জয়টিকা ললাটে নিয়ে। "ধূমকেতুর" সম্পাদকীয় বাংলার তরুণদের মনে বৈপ্লবীক চেতনা জাগিয়ে দিয়েছিল নিঃসন্দেহে। এর লিখন ভঙ্গিমা, অগ্নিস্রাবী ভাষার বেগে কি সরকারী দল, কি সাধারণ

পাঠক সমাজ, সকলেই সচকিত হয়ে উঠেছিল। কবি নজরুল প্রথমবার হুগলীতে আসবার পর কলকাতা থাকার সময় থেকেই শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন। "ধূমকেতু" বার হবার পরই তাঁর ইচ্ছা হতে লাগল যে, কবি নজরুলকে হুগলীতে নিয়ে গেলে হুগলী জেলার আন্দোলনের কাজে বিশেষ সাহায্য হবে।

এই সময়েই দেশবন্ধুব পরিচালনায় তাবকেশ্বরের মোহন্তকে তাড়াবার আন্দোলন শুরু হয়। তখন কবি এই আন্দোলনের উপর গান লিখে জায়গায় জায়গায় গেয়ে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহে সাহায্য করে ছিলেন[১]। গানের দুটো লাইন এই,

"জাগো আজ দণ্ড হাতে চণ্ডবঙ্গবাসী
ঐ ডুবালো পাপ চণ্ডাল
তোদের বাংলাদেশেব কাশী।"

বাংলাদেশের কাশী বলতে তারকেশ্বরকে বলেছেন।
বললেন—

"মোহের যাব নাইকো অন্ত
পূজারী সেই মোহন্ত
মা-বোনের সর্বস্বান্ত,
করছে বেদীমূলে।

তোদের পূজার প্রসাদ বলে খাওয়ায় পাপ-পুঁজ সে গুলে
তোরা তীর্থে গিয়ে দেখে আসিস্ পাপ ব্যভিচার রাশিরাশি।"

মোহন্ত অপসারণ আন্দোলনের স্রষ্টা ছিলেন দেশবন্ধু। দেশবন্ধু নজরুলকে অত্যন্ত কাছে টেনে নিলেন ও তাঁকে আন্দোলনের প্রচার সচিব নিযুক্ত করলেন। সময়োপযোগী এই গানে দলে দলে সেচ্ছাসেবক পাওয়া গিয়েছিল।

কবি নজরুল বিদ্রোহী, তাই তিনি সমাজের চিরাচরিত নিয়মকে ভেঙে হিন্দুকন্যাকে বিবাহ করেন[২]। তখন হিন্দু-মুসলমানের গোঁড়া সমাজ তাঁর উপর মারমুখো হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় হুগলীর যুগান্তর দলের বিপ্লবী শাখার তরুণ সম্প্রদায় নজরুল পরিবারকে রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত দুঃসাহস নিয়ে এগিয়ে যায়। বর্তমানে যারা নজরুলকে ভাঙিয়ে অনেক মনগড়া

(১) "তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ ও নজরুল অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(২) শ্রীযুক্তা আশালতা সেনগুপ্তা বা প্রমীলা দেবীকে ১৯২৪-এর প্রথম দিকে বিবাহ করেন এন্টালী অঞ্চলের ৬নং হাজী লেনের বাড়িতে। এই বিবাহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। হক সাহেব, দেশবন্ধু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। মঈনুদ্দীন হোসায়েন ছিলেন বিবাহের পুরোহিত।

কথা লিখে বাহাদুরি করছেন, তাদের তখন নজরুলের সাহিত্যকে, নজরুলের পরিবারকে বাঁচানোর জন্য দরদী হয়ে এগিয়ে আসতে দেখিনি।

এই সময় নজরুলের গোঁড়া আত্মীয়, জ্ঞাতি, অসংখ্য বন্ধু-বান্ধবদের তো এগিয়ে আসতে দেখিইনি, বরং তারা তাঁর এবং তাঁর পরিবারের নামে কুৎসার পাঁক ছিটিয়ে দেশের হাওয়া বিষাক্ত করে তুলেছিলেন। নজরুলের এমন অবস্থা হয়েছিল যে তিনি মাথা গোঁজার জন্য বাড়িও পাননি। তাই এই সময় হুগলীব বিপ্লবী কর্মী হামিদুল হক, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য সভ্যরা সাদরে নজরুলকে দুঃসাহসের সঙ্গে হুগলীতে নিয়ে এলেন। সবাইতো ছেলেমানুষ, সকল সময়ের কর্মী। কোথায় তুলবেন কবিকে তা ঠিক না কবেই কবি ও তাঁর পরিবারকে নিয়ে আসা হোল।

১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বব-অক্টোবর মাসে ভূপতিবাবু ১৮১৮ সালের রেগুলেশন তিন আইনে বাজবন্দী হয়ে জেলে চলে গেলেন। হুগলীতে এসে কবি মহা সমস্যায় পড়লেন। কাবণ তাঁকে কেউ বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না। হুগলীর বিপ্লবী কর্মী বীরেন ঘোষ তাঁর দাদা কংগ্রেস কর্মী শ্রীখগেন ঘোষের কাঠঘড়াব বাড়িতে কবিকে কিছুদিনেব জন্য রাখবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কবি সেখানে একটু অসুবিধায় বাস কবার জন্য কবিকে হামিদুল নবি মোক্তার সাহেব তাঁর মোগলপুরাব গলির এক বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা করে দেন। বিদ্যামন্দিব ও কংগ্রেস অফিসেব উত্তর দিকের গা ঘেঁসে এই গলি। এই বাড়িতে এসে কবি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন ও লিখবার সুযোগও পান। এখানেই কবির প্রথম পুত্র "কৃষ্ণ মহম্মদ" জন্মাষ্টমীর দিন ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু স্বল্পায়ু হয়ে সে এসেছিল, কয়েক মাস পরেই ছেলেটি মারা যায়। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর নাগাদ।

এই বাড়িতেই সাহিত্যিক, শিল্পীরা কলকাতা থেকে আসতেন। প্রথম ছেলের আঁকিকার জন্য তিনি এই বাড়িতে স্থানীয় গণ্যমান্য তরুণ ভক্তদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কল্লোলদলের সবাইকে, শৈলজানন্দ, অচিন্ত্য, প্রেমেন, দিনেশরঞ্জন, গোকুল নাগ, প্রমুখ আরো অনেককে উক্ত নিমন্ত্রণে দেখেছিলাম। শহীদ গোপীনাথ সাহার মত ছেলেরাও এই বাড়িতে কবির স্নেহ, যত্ন ও প্রেরণা লাভ করত। হাওড়ার খ্যাতিমান দেশকর্মী ও গায়ক ৺হরেন্দ্র ঘোষ কবির এই বাড়িতে এসে কবির "জাতের বজ্জাতি" ও "যুগান্তরের গান" দুখানির সুর রপ্ত করে "হিজ মাস্টার্স ভয়েস"-এ রেকর্ডে গান করেন। নজরুলের নাম তখন চেপে যাওয়া হয়েছিল, কারণ এ গান দুটি বাজেয়াপ্ত "বিষের বাঁশী"র গান বলে।

দেশবন্ধু যখন মারা যান তখন কবি এই বাড়িতেই ছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদ শুনে কবি কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল থেকে দশ মিনিটের মধ্যে একটা "অর্ঘ্য" বলে গান লিখে সুর দিয়ে বিদ্যামন্দিরে এলেন।

গানটি এই—

"হায় চির ভোলা ; হিমালয় হতে
অমৃত আনিতে গিয়া

ফিরিয়া এলে যে নীল কণ্ঠের
মৃত্যু গরল পিয়া
কেন এত ভাল বেসেছিলে তুমি
এই ধরণীর ধূলি ?
দেবতারা তাই দামামা বাজায়ে
স্বর্গে লইল তুলি।"

এই গানটি লেখেন ১৩৩২ সালের ৩রা আষাঢ়। দেশবন্ধুর শবাধারে রচনাটি মালার সঙ্গে অর্ঘ্যস্বরূপ জুড়ে দেওয়া হয়েছিল নৈহাটি স্টেশনে। ঐদিনই বিশেষ কারণে আড়িয়াদহের একটি উৎসবে যোগদান করার জন্য রওনা হন। শ্রীফণিভূষণের সঙ্গে পরে আরও একটি গান লেখেন "অকাল সন্ধ্যা" নাম দিয়ে ৬ই আষাঢ়। ওখান থেকে ফিরেই দেখেন হুগলীর নেতৃস্থানীয় ও স্বেচ্ছাসেবকরা শোকে স্তব্ধ হয়ে আছেন। কবি খালি পায়ে ঢুকে আবেগের সঙ্গে গানটি গাইতে লাগলেন খালি গলায়—

"খোলো মা দুয়ার খোলো
প্রভাতেই সন্ধ্যা হলো,
দুপুরেই ডুবলো দিবাকর গো।"

তারপরই খালি পায়ে মিছিল বার করে সারা হুগলী ও চুঁচুড়া শহর পরিক্রমা করলেন।

১৬ই আষাঢ় "সান্ত্বনা" বলে একটি কবিতা লিখলেন একটি ঘরোয়া শোকসভার জন্য। 'সান্ত্বনা'র কয়েকটি লাইন এই—

"চিত্ত-কুঁড়ি হাস্নাহানা মৃত্যু সাঁঝে ফুটলো গো।
জীবন বেড়ার আড়াল ছাপি, বুকের সুবাস টুটল গো॥
এইত কারার প্রাকার টুটে
বন্দী এলো বাইরে ছুটে
তাইত নিখিল আকুল হৃদয় শ্মশান মাঝে জুটল গো"—ইত্যাদি

এরপর খুব বড় করে দেশবন্ধুর জন্য এক শোকসভার আয়োজন হয়, ১৮ই আষাঢ় তারিখে। ঠিক হয় হুগলী ও চুঁচুড়াবাসীরা একযোগে এই সভার আহ্বায়ক হবেন। চুঁচুড়ার সেই সময়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উৎসাহদাতা ৺রমেশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় এবং হুগলীর ইমামবাড়ির মুতওল্লী, মহম্মদ জাফরী সাহেব এই দুজন হলেন আহ্বায়ক। শোকসভার ব্যবস্থা হয় চুঁচুড়ার কৈরী টকী হাউসে। সভাপতি ৺রমেশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় এবং প্রধান অতিথি মতওল্লী সাহেব। কবি এই সভার জন্য লেখেন বিখ্যাত "ইন্দ্রপতন", ১১ই আষাঢ়। "রাজভিখারী" গান লেখেন ১৭ই আষাঢ়। "ইন্দ্রপতন" কবিতাটি

মস্ত বড়, প্রায় দুইশত লাইনের কবিতা। নজরুল কবিতার শুরু এইভাবে করেন—

"তখনো অস্ত যায়নি সূর্য্য সহসা হইল শুরু
অম্বরে ঘন ডম্বরু ধ্বনি গুরু গুরু গুরু গুরু।
আকাশে আকাশে বাজিছে এ কোন ইন্দ্রের আগমনী ?
শুনি, অম্বুদ কম্বু নিনাদে ঘন বৃংহিত ধ্বনি।
বাজে চিক্কুর-হ্রেষা-হর্ষন মেঘ মন্দুরা মাঝে,
সাজিল প্রথম আষাঢ় আজিকে প্রলয়ঙ্কর সাজে।"

এই সুবৃহৎ কবিতায় দেশবন্ধুর প্রতি কবির ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাভক্তি ও ভালবাসার রূপ এবং দেশবাসীর দেশবন্ধুর উপর আপনার জনের মত নির্ভরতা ও বিশ্বাস অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে। ফুটে উঠেছে দেশবন্ধুর মৃত্যুতে দেশবাসীর অসহায়ভাব, পড়তে পড়তে যেমন চমৎকৃত হয়ে যেতে হয়, তেমনি বুক অসহায়তায় দুরু দুরু ও হাহাকার করতে থাকে। আবার কখনও আশায় ও আনন্দে দেশেব ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র চোখেব ওপর ভেসে ওঠে।

বাজভিখারী গানটিতে লেখেন—

"কোন ঘর ছাড়া বিবাগীর বাঁশী শুনে উঠেছিলে জাগি
ওগো চির বৈরাগী।
দাঁড়ালে ধূলায় তব কাঞ্চন-কমল-কানন ত্যাগি
ওগো চির বৈরাগী।
'দেহি ভবতি ভিকসাম্' বলি দাঁড়ালে রাজভিখারী
খুলিল না দ্বার, পেল না ভিক্ষা, দ্বারে দ্বারে ভয় দ্বারী।
বলিলে, দেবে না? লহ তব দান—
ভিক্ষা পূর্ণ আমার এ প্রাণ।
দিলনা ভিক্ষা নিলে নাকো দান, ফিরিয়া চলিল যোগী
যে জীবন কেহ লইলনা তাহা মৃত্যু লইল মাগি।"

কবি ইন্দ্রপতন কবিতা আবৃত্তি করে সভার উদ্বোধন করেন। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে সেদিন যে আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, তাতে সভাস্থ সমস্ত লোক স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে কবির কণ্ঠ কান্নায় রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল, কখনও শঙ্খ নিনাদে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। আবৃত্তির শেষে সভা বেশ কিছুক্ষণ নিরবতায় স্তব্ধ হয়ে থাকে। কারণ দেশবন্ধুর প্রয়াণে সকলে আগে থেকেই শোকে অভিভূত হয়েছিল। এরপর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কয়েকজনের বক্তৃতার পর কবি "রাজভিখারী" গানটি অপূর্ব অবেগময় কণ্ঠে গাইলেন। এই কবিতা ও গান কয়টি "চিত্তনামা" গ্রন্থে প্রকাশ করেন। বইখানি মাতা বাসন্তী দেবীকে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। বইটির প্রচ্ছদপটে ৺হীরেনচন্দ্র

দাশের আঁকা একটি অতি করুণ ছবি ছিল। ভারতের মানচিত্রে একটি নারী আলুলায়িত কেশে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদছেন, হাতের ফাঁক দিয়ে টস্ টস্ করে চোখের জল পড়ছে।

১৯২৪ সালের মাঝামাঝি গান্ধীজী হুগলীতে আসেন। হুগলীর কর্মী ও নেতারা একটা মহাসভার ব্যবস্থা করেছিলেন। হুগলী চাঁদনী নামক ঘাটে গঙ্গার চড়ায় মস্ত বড় শামিয়ানা খাটানো হয়েছে। কলকাতা থেকে মস্ত মস্ত নেতারা এসেছেন। বিশেষ করে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর কথাই মনে পড়ছে; ভাবে আত্মভোলা কবি নজরুল গান্ধীজীর অভ্যর্থনার জন্য এক গান লেখেন—

"আজ না চাওয়া পথ দিয়ে কে এল?
কংসকারার দ্বার ঠেলে।
শব শ্মশানে শিব নাচে ঐ
ফুল ফুটানো পা ফেলে
আজ জাত বিজাতের বিভেদ ঘুচি,
এক হল ভাই বামুন মুচি।"
"প্রেম গঙ্গায় নেয়ে সবাই শুচি রে
আমরি হায় রে……
আয় প্রেম গঙ্গায় ঝাঁপদিবি কে
"বন্দেমাতরম" বলে"
ইত্যাদি

গান্ধীজীর গানটি খুব ভাল লেগেছিল। "চরকার গানটি" গেয়ে কবি গান্ধীজীকে শোনান।

"ঘোর
ঘোররে আমার সাধের চরকা ঘোর
ঐ স্বরাজ রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর।
তোর ঘোরার শব্দে ভাই
সদাই, শুনতে যেন পাই
ঐ খুল্‌লে স্বরাজ-সিংহদুয়ার আর বিলম্ব নাই
ঘুরে আসল ভারত ভাগ্যরবি, কাটল দুঃখের রাত্রি ঘোর
ঘর ঘর তুই ঘোররে জোর
ঘর্ঘর ঘর ঘুর্ণীতে তোর
ঘুচুক ঘুমের ঘোর
তুই ঘোর ঘোর ঘোর।
তোর ঘুর চাকেতে বলদর্পী তোপকামানের টুটুক জোর"।

এই গানটি কবির মুখ থেকে গান্ধীজী অনেকবার ঐ সভাতেই শোনেন। কিন্তু বাংলা ভাষা তিনি ভাল করে বুঝতেন না। সেই না বুঝবার অবস্থাটা

নজরুলের কবি বন্ধু চুঁচুড়ার শ্রীসুবোধ রায় পাশে থেকে বুঝতে পেরেছিলেন। সেই জন্য কবি সুবোধ রায় উক্ত "চরকার গানটি" অতি যত্নে ইংরাজীতে অনুবাদ করে রেখে দেন। কবি সুবোধ রায় এই সময় সাপ্তাহিক "বিজলী" পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। এক কালে শান্তিনিকেতনে ছাত্র থেকে শিক্ষকও হয়েছিলেন। গান্ধীজী এই সময় শান্তিনিকেতন আশ্রমে কোন একটি উৎসবে যোগ দেবার জন্য রওয়ানা হয়েছিলেন, শ্রীসুবোধ রায় তাঁর সঙ্গে উক্ত গাড়িতে ছিলেন। শান্তিনিকেতনে যাবার পথে ট্রেনে সুবোধ রায় "চবকার গানের" ইংরাজী অনুবাদখানি গান্ধীজীর হাতে তুলে দেন।

সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে কবি দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজনীতি যাঁরা কবেন তাঁদের সঙ্গে তাল রেখে কবি-শিল্পী কেমন করে চলবেন? তাই ধীঁরে ধীরে নজরুলকে প্রয়োজনের বেশি এঁরা আমল দিতেন না। তবুও তাঁব নিজের অব্যাহত গতিতে তিনি চলেছিলেন। কারণ তিনি যে "পথচারী"।

হুগলীতে তিনি চারজন সার্থক সাথী পেয়েছিলেন। প্রথম ভূপতি মজুমদার, দ্বিতীয় গীস্পতি ভট্টাচার্য, তৃতীয় সুবোধ রায় ও চতুর্থ মনিভূষণ মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্ধুদের মধ্যে প্রাণতোষ, হামিদ, সিরাজ প্রভৃতি। ভূপতিবাবু বৈপ্লবিক চেতনা সঞ্চারিত করে কবিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। গীস্পতি ভট্টাচার্য সংস্কৃত, ইংরাজী প্রভৃতি কাব্য শুনিয়ে তাঁর মনকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। সুবোধ বায় কবিবন্ধু হিসাবে সাহচর্য দিয়ে এসেছেন, মণিভূষণ ছিলেন বিদ্রোহী কবির গানের একনিষ্ঠ প্রচারক। হুগলীতে নজরুলের থাকার কথা বলতে গেলে এঁদের কথা স্বীকার না করলে কথা অপূর্ণই থাকে।

মোগলপুরা লেনের বাড়ি থেকে উঠে এসে কবি চকবাজারের "রোজ-ভিলার" একটা অংশে বাস করতে শুরু করেন। এইখানেই সুবোধ রায়ের সঙ্গে নজরুল ভক্তদেরও আলাপ হয়। এই আলাপের পর কবি সুবোধ রায় প্রায় প্রত্যহই এখানে আসতেন। কবি নজরুলের এই বাড়িতে প্রত্যহ যে রকম লোক সমাগম হত আর তিনি তাঁর স্বাভাবিক সহৃদয়তা ও উদারতার সঙ্গে সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানাতেন এবং চা, সরবৎ প্রভৃতিতে আপ্যায়িত করতেন তাতে আড্ডা প্রায় সব সময়েই জম-জমাট ছিল। এই আড্ডায় কবি সুবোধ রায় না থাকলে যেন আ-লুনি বোধ হত। কথায় কথায় নজরুলের ও সুবোধবাবুর আকাশ ফাটানো হাসির ফোয়ারা সকলকে সচকিত করে তুলত। কবি নজরুল গান করে, কবিতা লিখে, আবৃত্তি করে শোনান, আর হাস্য কৌতুকের চোটে সকলকে হাসিয়ে জীবন্ত করে তোলেন। তাঁর হাসি যেন অচল পর্বতের পাথরকে ফাটিয়ে জলের তোড় নিয়ে নেমে এসে বড় ছোট সবরকম পাথরকে ঠেলতে ঠেলতে চলত আনন্দ-মহাসাগরের দিকে। এই হাসির সঙ্গে উচ্চ হাসির শব্দ মেলাতেন মণিবাবুও। এই ত্রয়ীর হাস্য, আলাপ, গান, কবিতা, প্রবন্ধ পাঠে ও ব্যঙ্গ কৌতুকে এই আড্ডাটি একটি অনবদ্য রূপ নিয়েছিল। এই আড্ডায় মাঝে মাঝে আবদুল হালিমকেও

দেখা যেত, দেখা যেত পবিত্রবাবু ও বিপ্লবী নলিনী গুপ্ত, হুগলীর বিপ্লবী পবিত্র দত্ত, নিবারণ ঘটক প্রভৃতিকে। এই আড্ডাতে আসতেন শিক্ষাব্রতী কবি গোলাম মোস্তাফা সাহেব। এখানে এসেই তিনি লিখেছিলেন,

“কাজী নজরুল ইসলাম
তার বাড়ীতে একদিন গিস্‌লাম
ভায়া গান গায় দিন রাত
—হেসে লাফ দেন তিনহাত।”

এই বাড়িতে মুস্‌লিম লেখিকা মিসেস এস. রহমানকে দেখি। এই সময় কবির ভাব যেমন জমাট বেঁধেছে, ‘আকাশ-ভাঙা অভাবও তেমনি তাঁকে পেয়ে বসেছে। কোনদিন হাঁড়ি চড়ে, কোনদিন চড়ে না। কিন্তু অতিথি-অভ্যাগত আছেই। একমাত্র লেখার দক্ষিণার উপর তাঁব সংসার চলছে। আর কয়েকটি একান্ত ভক্তের সদা জাগ্রত সযত্ন দৃষ্টি তাঁর আত্মসম্মান রক্ষার জন্য উন্মুখ ছিল। এমনি করে বিদ্রোহী কবির দিন কেটে যাচ্ছিল। শত অভাবেও তাঁর প্রাণখোলা উদাত্ত হাসি, আবেগময় সুরোল্লাস, অগ্নিস্রাবী কবিতার স্রোত ব্যাহত হয়নি। এই অভাবের সময়টার কথা স্মরণ হলে হতভম্ব হয়ে যাই, যে কী করে কবি অভাবের তাড়নাতে জর্জরিত হয়েও শ্রেষ্ঠ কবিতা ও গানগুলি লিখে চলেছিলেন। হুগলীর অভাবের দিনের একান্ত বন্ধু ছিলেন প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, সিরাজুল হক, ধীরেন মল্লিক, বীরেন ঘোষ, সৌরী পাল, পরিতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

মৃত্যু ভয়ে ভীত জাতিকে অমৃত ও আলোর বাণী শুনিয়ে মৃত্যুঞ্জয় হবার আহ্বান জানাতেই নজরুল সাধারণের মধ্যে এসেছিলেন। শোক, দুঃখ, অন্নকষ্ট ও অর্থাভাব কিছুতেই কবিকে দমাতে পারেনি।

এই বৎসরই কবি কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা ও গান লেখেন। তারমধ্যে “ঝড়” (পশ্চিম তরঙ্গ) কবিতাটি অন্যতম। কারণ এই কবিতাটিতে প্রকৃতিকে সূক্ষ্ম ভাবে দেখবার ক্ষমতা, তাকে জাতীয় জীবনের জাগরণের উপযোগী করে তোলার নিপুণতা, তার মধ্যে ভবিষ্যত আন্দোলনের অপূর্ব ইঙ্গিত যে ভাবে যোগ করা হয়েছে তা অনুভব করলে বিস্মিত হতে হয়। এই কবিতাটি “বিষের বাঁশী” গ্রন্থের শেষের দিকে আছে। বহুকাল বইটি বাজেয়াপ্ত থাকায় এই কবিতাটি অনেকেরই নজরে পড়েনি।

এই সময় কবি গ্রাম-গ্রামান্তর ও শহর-শহরান্তরে গান গেয়ে, কবিতা আবৃত্তি করে তরুণ দলকে উদ্বুদ্ধ করে চলেছিলেন। এদিকে গান্ধী-আন্দোলনে ভারতব্যাপী চাঞ্চল্য, আর একদিকে বিপ্লবীদল গান্ধী-আন্দোলনের সঙ্গে সমতালে ও খর-গতিতে ও বিচক্ষণতার সঙ্গে দলপুষ্ট করে চলেছিলেন, আর এই দুই ধারাকে খরস্রোতা করে তুলেছেন কবি নজরুল ভগীরথের মতো শঙ্খধ্বনিতে। এই সব আন্দোলনের পাশে শ্রীমুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, আবদুল হালিম এবং আরো অনেকে ফল্গু ধারায় কমিউনিস্ট দলের

সংগঠন করে চলেছেন পরবর্তী যুগের মানুষের শোষণমুক্ত জীবনের আন্দোলন রূপে। কবি এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। কবির অবসর নেই। প্রতিটি ঘরে, পাড়ায়, গ্রামে, শহরে তাঁর ডাক পড়েছে, তাঁর সংসারের কটি প্রাণী কি খেল, কিভাবে তাদের দিন কাটছে, সেদিকে কবির নজর নেই। এমনি ঘুরে ঘুরে কবি ঘরে ফিরে এলেন অসুস্থ শরীর নিয়ে বৈশাখের মাঝামাঝি। একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে দেশের ত্রিধারা আন্দোলন কি করে সফল হয়ে উঠবে তার দিকে।

অনিয়মে ঘুরে ঘুরে কবির ব্যসিলরি ডিসেন্ট্রি হল। প্রবল জ্বর ও বক্ত আমাশয়ে কবি প্রায় নির্জীব হয়ে পড়েছেন। এই রকম অবস্থায় একদিন বৈকালে আকাশ পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে থমথমে হয়ে আছে। চোখ বুঁজে পড়ে আছেন কবি নজরুল, দক্ষিণের দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে পিঙ্গল বিহ্বল আকাশ ; আমি তখন তাঁকে পরিচর্যারত ; হঠাৎ চোখ খুলে আকাশের ঐ রূপ দেখে কলকণ্ঠে শিশুব মত উল্লসিত হয়ে দৌড়লেন ছাদের দিকে। আমি তো প্রথমে বুঝতে পারিনি, কী ব্যাপার। দীর্ঘ পল্লবায়ত চোখ আপ্রাণ ছড়িয়ে দিলেন উদার আকাশে, ঘন কৃষ্ণ গুচ্ছ গুচ্ছ বাবরি চুল উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল হাওয়ায় সাপেব মত। "জটাটবী গলজ্জল প্রবাহপাবিত স্থলে, গলেহ্ লম্বলম্বিতাং ভূজঙ্গ তুঙ্গ মালিকাম" (শিবতাণ্ডব স্তোত্র)-এর মতই কবিকে তখন জীবন্ত শিবের মতই মনে হচ্ছিল। আমি কোন রূপটা দেখব স্থির করতে পারছিলাম না। পরক্ষণেই শুরু হল ঝড়।

পশ্চিম দিকের মেঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল পূবেব দিকে। থমথমে স্থির আকাশের কোলে। প্রবল জ্বর নিয়ে কবি শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির এই ভয়ঙ্কর রূপসুধা আকণ্ঠ পান করলেন। আর মাঝে মাঝে স্বগোতোক্তি করে বলতে লাগলেন "ঝড—আমি ঝড, আমি ঝড়।" যখন ঝড়ের শেষে জল এসে পড়ল তখন আমরা তাঁকে টেনে হিঁচড়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলাম। না হলে হয়ত ধ্যানমগ্ন কবি প্রবল জ্বর নিয়ে ভিজে ভিজেও বাইরেই থাকতেন।

ঘরে এসে কাগজ পেন্সিল টেনে নিয়ে কবি 'ঝড়' কবিতা লিখতে বসলেন। দীর্ঘ আট পৃষ্ঠা কবিতা ব্যাসিলরী ডিসেন্ট্রি ও প্রবল জ্বরের মধ্যে তিন চার ঘণ্টা ধরে একাগ্র মনে লিখে আমাদের শুনিয়ে তবে তিনি বালিশে মাথা রেখে চোখ বুঝলেন।

কবি নজরুল অবাস্তব কিছু লেখেন নি। যা দেখেছেন, যা শুনেছেন তারই বাস্তব রূপ দিয়েছেন মানবমাত্রের কল্যানবোধে, প্রেমবোধে। কবি গ্রামের ছেলে, প্রকৃতির দুলাল। তাই তার মধ্যে বুনো (wild) ভাবের অপ্রতিহত গতিই তাঁকে গণকবি করে তুলেছে। মার্জিত শহরের গজ মেপে চলা, বলা ও হাসা তাঁর মধ্যে ছিল না। তাঁর মধ্যে ছিল বুনো ঘোড়ার মতো বন চিরে চলার গতি। তাই কবির গান, কবিতা গ্রামের লোকেরও যেমন ভাল লাগতো, তেমনি শহরের লোকেরও সমান ভাল লেগেছে, প্রেরণা জুগিয়েছে ; আজও জোগায়, ভবিষ্যতেও জোগাবে।

শহরের লোকদের অবশ্য বলতে শুনেছি যে নজরুল কাব্য ও গানে "গুরু-চণ্ডালী" দোষ আছে। কিন্তু গুরুচণ্ডালী দোষযুক্ত গ্রাম্যরা তাঁকে অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়েছে, শহর নগরের লোকেরাও কি তাঁর বুনো ঘোড়ার গতিকে, তাঁর প্রাকৃতিক উদ্দামতাকে বরমাল্য দেন নি, দিচ্ছেন না ?

কবি নজরুলের "ঝড়" কবিতাটি যেন একটি ক্ষিপ্ত বুনো ঘোড়ারই অপ্রতিহত গতির ছন্দের উপর লেখা। ছন্দটিও অসম। কখনও দ্রুত কখনও বিলম্বিত, ভাষাও কঠোরে মধুরে মিশ্রিত। মাধুর্যের মধ্যেও পৌরুষ রয়েছে। হিন্দু, মুসলিম, খৃস্টান পুরাণের উপমার ভিতর দিয়ে যখন যেমন প্রয়োজন বোধ করেছেন ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে তাই ব্যবহার করেছেন। ঝড় যেমন সমস্ত আবর্জনা ঝেঁটিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি কবি নজরুল এই 'ঝড়' কবিতায় আমাদের মলিনতা মুছে নিয়ে পৌরুষের চূড়ায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। বুনো গতি ও গুরুচণ্ডালী দোষটুকু না থাকলে এই কবিতার মহিমা এত বাড়ত না।

তিনি জাতির মনের মধ্যে বিদ্রোহী রূপকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। জাতি নিয়েও তা নিলে না, "যতনে সাজা হুকায় তামাক সেজে, মাদুর পেতে জন কয়েক জটলা করে তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল," এই বিচারেই মেতে রইল। এই অবসরে শাকুনিব্রতীরা দুর্গতির মড়ক জীবাণু ছড়িয়ে চলেছে। তাই কবির আফ্‌সোস বাণী মনে পড়ে—

"গান শুনে সবে ভাবে ভাবনা কি ? দিন যাবে এবে পান খেয়ে।"

কিন্তু তারপরই মনে হয় হায়, দুর্ভাগা দেশ মৌতাতেই মেতে রইলে

এদিকে—

"ঘরে আগুন বাইরে যে তুফান
চারদিক হতে ঘিরে মারে এজিদ রাজার দল।"

কেউ প্রাণ দিয়ে কাজ চায় না, কাজ করেও না। আন্দোলন আসে, আবার ঠাণ্ডা হয়, আবার আসে আবার চুপচাপ। তাই কবির কথা বলতে গেলে কাজের কথাই মনে হয়, সঙ্কল্প বাক্যে হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে। কবির উদাত্ত কণ্ঠের প্রমত্ত সুর শুনতে পাই—

"ঝড় কোথা ? কই ?
বিপ্লবের লাল ঘোড়া ঐ ডাকে ঐ—
ঐ শোন, শোন তার হ্রেষার চিক্কুর
ঐ তার ক্ষুর হানা মেয়ে।
না না আজ যাই আমি
আবার আসিব ফিরে
হে বিদ্রোহী বন্ধু মোর
তুমি থেকো জেগে।

তুমি রক্ষি এ-রক্ত অশ্বের
হে বিদ্রোহী অন্তর দেবতা।''

উক্ত 'ঝড়' কবিতা লিখবার পর কবি ''পূর্ব তরঙ্গ'' পূবের হাওয়া বলে একটি কবিতা লেখেন ১৩৩১ সালের ৩রা শ্রাবণ। এই কবিতাটি পশ্চিম তরঙ্গ ঝড়ের মত ততটা প্রচণ্ড না হলেও এই কবিতায় কবি ছন্দের নিপুণতা দেখিয়েছেন। কবি নজরুল সংস্কৃত ছন্দের দুরূহতাকেও যে আয়ত্তে এনেছিলেন তার পরিচয় এতে আছে। মেঘ ও বৃষ্টির যখন-যেমন রূপান্তর হচ্ছে সেই অনুপাতে দৃপ্ত সংযোগে কবিতার সৃষ্টি করেছেন। প্রথম দিকে অমিত্রাক্ষরে বললেন—

''আমি ঝড় পশ্চিমের প্রলয় পথিক
অসহ যৌবন দাহে লেলিহান শিখা
দারুণ দাবাগ্নি মন নৃত্য ছায়া পটে
মাতিয়া ছুটিতে আছিনু; চলার দাপটে
ব্রহ্মাণ্ড ভণ্ডুল করি। অগ্রে সহচরী
ঘূর্ণা হাতছানি দিয়া চলে ঘূর্ণীপরী
গ্রীষ্মের গজল গেয়ে পিলু বরোঁয়ায়
উসীরেব তার বাঁধা প্রান্তর বীণায়''

এর পরই জল ঝুপ ঝুপ করে আসে আবার থমকে যায়, কবি এই অবস্থাটাকে কাজরী ছন্দের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করলেন।

"আমি তাই পূবের হাওয়া
বাঁচনের নাচন পাওয়া
কারফায় কাজরী গাওয়া
নটিনীর পা'—ঝিন্ ঝিন্।''

এর পরে বজ্রে, মেঘে আর বৃষ্টিতে চলল কুচকাওয়াজ, সেই অবস্থাকে "শার্দূল-বিক্রীড়িত'' ছন্দে প্রকাশ করলেন। পরে সিংহবিক্রীড়, অনঙ্গশেখর প্রভৃতি ছন্দে এই পূবের হাওয়ায় লিখলেন। কবির "পশ্চিমতরঙ্গ ঝড়'' কবিতার থেকে এই কবিতাটি কবির ছন্দ নৈপুণ্য ও শৈল্পিক ক্ষমতা অপূর্ব ফুটে উঠেছে। যদিও ঝড়ের রূপ এক, ঝড়ের পর বৃষ্টির রূপ আর একরকম।

এর পর নজরুল ভক্ত হুগলীর খ্যাতিমান বিপ্লবী কবি শ্রীদয়াল কুমারকে হুগলী জেলে আশীর্বাদ পাঠান—

কল্যাণীয় বিপ্লবী কবি
শ্রীমান দয়াল কুমার

আজ সন্ধ্যার গোধূলী আলোকে
বলাকাদল
শুভ্র পাখায় সচকিত করি
তিমির তল
অন্ধ আকাশে পথ দেখা
রচি সেথা ছায়াপথরেখা।

কল্যাণার্থী
কাজীদা

চুঁচুড়ার কবি শ্রীসুবোধ রায়, শ্রীগীষ্পতি ভট্টাচার্য, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় হুগলীর কাজী নজরুল ইসলাম, শচীন কর, নৈহাটীর কবি শ্রীখগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীবিজকৃষ্ণ ঘোষ (ইনি বঙ্গভাষায় প্রথম ওমর খৈয়ামের 'রুবাই' অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লাভ করেন। এর অনেক পরে শ্রীকান্তি ঘোষ ও নরেন দেব অনুবাদ করেছিলেন), বেলঘরিয়ার কবি শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র, কলকাতার সুনির্মল বোস প্রভৃতি 'খেয়ালী সংঘের' সভ্য ছিলেন। নৈহাটীবাসী শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ডাক নাম ছুলুটির সঙ্গে নজরুলের এইখানেই পরিচয় হয়। পরবর্তীকালে নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে বাংলা দেশে নজরুলের গানের একটি বিশিষ্ট স্থান প্রমাণ করেন। পরে এই মৃণালকান্তি কালীভক্ত হয়ে সন্ন্যাস নেন এবং শ্মশানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কাজীর আর এক ভক্ত তাঁর স্বদেশী গানের প্রচারক, 'লাঙ্গল' পত্রিকার Jail Editor শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও সন্ন্যাস নিয়ে মোক্ষদানন্দ গিরি নাম নিয়ে তারকেশ্বরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিন হল তিনিও মারা গেছেন।

বেলঘরিয়ার কবি শ্রীচণ্ডী মিত্র প্রায় রবিবার নজরুলের হুগলীর বাড়িতে এসে আড্ডা জমাতেন। শ্রীচণ্ডী মিত্র মহাশয়ের চেহারাটি বেশ লম্বা চওড়া। স্বপ্নালু ছিল দুটো চোখ, সুরেলা কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করতেন। গায়ে জামা পরতেন খাকি শার্ট, বুকে ডবল বোতাম আঁটা পকেট, মিলিটারি ধরনের, ভারি স্নেহময় ছিলেন মানুষটি। নজরুল তাঁকে 'লালফৌজ ক্যাপ্টেন' বলে ডাকতেন। তাঁর ঐ পোষাক আর চেহারার জন্য। এই চণ্ডী মিত্রের বেলঘরিয়ার বাড়িতে একবার "খেয়ালী সংঘের' (২) সাহিত্য সভা হয়েছিল। সে সভায় নজরুলের যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যেতে পারেননি। তবে ঐ সভায় কলকাতা থেকে এসেছিলেন কবি ও সাংবাদিক শ্রীকিরণ রায়, তিনি রবীন্দ্রনাথের গান শুনিয়েছিলেন, একটি গানের সুর এখনও কানে লেগে আছে। "ফুল ফোটানোর আশা মোরা মোটেই রাখিনি''। এই কিরণ রায় নজরুল বন্ধু শম্ভু রায় মহাশয়ের সহোদর।

(২) নৈহাটীতে নজরুল অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কবি চণ্ডী মিত্র ও নজরুল উভয়েই "মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা"তে কবিতা লিখতেন। সেই লেখার মাধ্যমেই দুই কবির পরিচয় হয়েছিল। উক্ত পত্রিকার কর্মসচিব ছিলেন শ্রীমুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

হুগলীর আর একটি কথা বলার আছে তা হল শ্রীশচীন কর ও আমি একটি "মুসায়েরা" প্রতিষ্ঠা করি। নজরুল এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাঁর লেখা গান কবিতা কিছু কিছু পাঠিয়ে আমাদের উৎসাহিত করতেন। এই সময় নজরুল কৃষ্ণনগরের 'গ্রেস কটেজে' থাকতেন।

৺শ্রীশচন্দ্র মল্লিক মহাশয় হুগলী বিদ্যামন্দিরকে পঞ্চাশ বিঘা জমি চাষ আবাদের জন্য দেন। ধরমপুব নামক স্থানে এই জমিটি ছিল। ধূ ধূ করছে মাঠ, আশে পাশে কোন ঘর বাড়ি ছিল না। এই জমির পাশে শ্রদ্ধেয় বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সহকর্মী মানিকতলার বোমার মামলার শ্রীপবিত্র দত্তের "ডেয়ারী ফার্ম" ছিল। জমির তদারক করতেন হুগলীব খ্যাতিমান বিপ্লবী সিবাজুল হক। তাঁকে নজরুল বিশেষ স্নেহ কবতেন। সিরাজুল নিজের হাতে চাষ করে, নিজের মাথায় কবে হুগলীর মল্লিক কাসিম হাটে তরকারি বিক্রী করতেন। মাঠে প্রবেশ করার মুখেই ছোট সাঁওতালী ধরনের একখানি ছোট গোলপাতার ঘর ছিল, এইখানে সিরাজ ও তৎকালীন ট্রেড ইউনিয়নিস্ট অবনী চৌধুরী থাকতেন। কোন কোন দিন পলাতক রাজ-নৈতিক আসামীরাও মুহূর্তের জন্য এখানে আশ্রয় নিয়ে অন্যত্র চলে যেতেন। এই মাঠে কয়েকটি খেজুর গাছ ছিল। এতে প্রচুর রস হত। বেশ মনে পড়ে, কবি নজরুল শীতকালে সন্ধ্যার পব চটি পায়ে গবম একটি গায়ের কাপড়ে মাথা ঢেকে প্রায়ই নির্জন স্থানে পাড়ি মারতেন আমাদের সঙ্গে। হুগলী জেলা কংগ্রেসের প্রাণস্বরূপ শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও ঐ সময়ে থাকতেন ঐ কৃষিক্ষেত্রে। কবি গেলেই নগেনবাবু একটি খেজুর পাতার চাটাই বাইরে বিছিয়ে দিয়ে তাঁকে সাদরে বসাতেন। খেজুর রস খাওয়াতেন, আর কবি ঠাণ্ডায় বসে মনের আনন্দে দুহাতের আঙুলে এক রকম শব্দ করে তাল দিয়ে দিয়ে একটার পর একটা মেঠো সুরে গান গেয়ে যেতেন, কখন কখন মুখে মুখে ঝুমুর প্রভৃতি সুরে গান রচনা করেও গাইতেন। শীতকালে অন্ধকার রাতে ঘন হয়ে কুয়াশা পড়ছে। তার মধ্য দিয়ে বন, আকাশ, নারকেল, তাল প্রভৃতি গাছ আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। তাই দেখে কবি সদ্য গান তৈরি করে গেয়ে যেতেন আপন মনে। আবার শীতের চাঁদনী রাতের কুয়াশায় অপরূপ দৃশ্য দেখে কত শক্ত শক্ত সুরে গানও সদ্য তৈরি করে গেয়ে যেতেন, কিন্তু সেই সব গান কখনও ঘরে এসে লেখেননি।

যতদূর মনে পড়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই বিদ্যামন্দিরের এগ্রিকালচারাল ফার্মটি ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে উদ্বোধন করে ছিলেন। তখন কবি হুগলীতে আসেননি। এই ফার্মের প্রধান স্বরূপ সিরাজুল হক জেলে যাবার পর এটি উঠে যায়।

১৯২৫ সালের মাঝামাঝি হুগলীতে বিদ্যামন্দিরের বিপ্লবী যুবকদের চেষ্টায় "মুকুন্দদাসের যাত্রা" অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল, চকবাজারের

বারোয়ারী তলায়। যাত্রা হয় একাধিক্রমে প্রায় সাত দিন। এই সময় নজরুল ছিলেন চকবাজারের বাড়িতে, সেই সময় মুকুন্দদাসের সঙ্গে তাঁর শিষ্য কালীকৃষ্ণ নট্টও অভিনয় করতেন।

নজরুলের সঙ্গে মুকুন্দদাসের এই সময় দেখা হয়। নজরুল তাঁদের বিরাট দলবলদের একদিন নিমন্ত্রণ করেছিলেন। যে কদিন মুকুন্দদাস হুগলীতে ছিলেন, সে কয়দিনই তিনি প্রত্যহ সকাল বেলা নজরুলের বাড়িতে গিয়ে কবির সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে নানা বিষয়ের আলোচনা করতে করতে মশগুল হয়ে যেতেন। বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের আলোচনা থেকে, ভারতীয় দর্শন ও সাধনার গূঢ় তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে করতে মুসলিম সাধনার সাধারণ ও গুঢ় পদ্ধতির বিষয় নিয়েও আলোচনা করতেন। তখন তাঁর বয়সই বা কি, ছাব্বিশ বৎসর মাত্র।

নজরুল মুকুন্দদাসকে তাঁর "পল্লীসেবা" নাটকের জন্য জাতের বজ্জাতি গানখানি তাঁর অনুরোধে গাইবার জন্য দিয়ে ছিলেন। চরকার গানখানাও উক্ত গ্রন্থে দেন। এরকম অনেক গানই তিনি তাঁর যাত্রার পালায় নিয়েছেন, কিন্তু কোথাও স্বীকৃতি নেই।[৪]

মুকুন্দদাস মহাশয় নজরুলকে একদিন তাঁর যাত্রার কয়েকটি বাছাই করা কবির লেখা বৈপ্লবিক গান গাইবার জন্য অনুরোধ করেন। এই দিন বারোয়ারী তলা ছাপিয়ে যায় জনসমাগমে। সে দিন নজরুল মুকুন্দদাসের মতো গেরুয়া রঙের জামা, পাগড়ী, কাপড় পরে আসরে অবতীর্ণ হয়ে যে প্রাণবন্যা ও উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিলেন তা বর্ণনাতীত। একদিকে মুকুন্দদাস, তাঁর উপযুক্ত শিষ্য কালীকৃষ্ণ নট্ট[৫], আর একদিকে নজরুল, এই দিনটা হুগলীর লোকেদের মানসপটে এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

নজরুল বলতেন যে "মুকুন্দদাসের জীবন ছিল মাতৃভক্তের প্রতীক"। আমি তাঁর মতো সাধকেব কাছ থেকে অনেক প্রেরণা পেয়েছি।

---

(৪) মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী—বসুমতী সাহিত্যমন্দির প্রকাশিত, পৃঃ ১৬ ও ৪৩ দ্রষ্টব্য।

(৫) মুকুন্দদাসের মৃত্যুর পর কালীকৃষ্ণ নট্টই স্বদেশী যাত্রা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

নৈহাটিতে

(১)

১৯২১ সাল। এই বছরের ডিসেম্বর মাসের শেষে নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিতা লেখেন। বিদ্রোহী কবিতা প্রথমে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক "বিজলী" পত্রিকায়। এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ; সহকারী সম্পাদক ছিলেন নলিনীকান্ত সরকার ও কবি সুবোধ রায়। কবি সুবোধ রায় ঐ সময়ে বাস করতেন নৈহাটির মিত্রপাড়া লেনে। তাঁর বাড়ি ছিল সারা বাঙলার সেরা সাহিত্যিকদের জমাটি আড্ডা। এই আড্ডায় আসতেন নৈহাটির কবি খগেন্দ্রনাথ ঘোষ, মাদ্রালের কালিদাস ঘোষাল, ওমর খৈয়ামের কবি বিজয় ঘোষ, অ্যাডভোকেট যতীন্দ্রনাথ মজুমদার (ইংরাজি বাংলা পত্রিকার রিপোর্টার ও প্রবন্ধকার) ও মন্মথ ভট্টাচার্যের মত তরুণ সাহিত্যিকরাও।

এই ১৯২১ সাল নানা কারণে নিখিল ভাবতের সুবর্ণমণ্ডিত বৎসর। এই বছরে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারে সারা দেশে যৌবন টগবগ করছে। তার পাশে চলেছে বিপ্লবীদেব চরম খরস্রোত। এরমধ্যে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশ হওয়ায় কবির খ্যাতি গ্রাম-গ্রামান্তর, শহর শহরান্তরে ছড়িয়ে পড়ল।

কবি সুবোধ রায় নজরুলকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে এলেন সাদরে। সেখানে নৈহাটির সাহিত্যিকদের সাথে পরিচয় হল। সেই দিনই তাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের রাখিবন্ধনে আত্মীযতার সৃষ্টি হল। সে আত্মীয়তা কখনও শিথিল হয়নি।

বঙ্কিম, হরপ্রসাদ, কবি বিজয় ঘোষ, খগেন ঘোষ ও সুবোধ রায়ের নৈহাটি নজরুলকে বুকে তুলে নিল। এদের সঙ্গে তাঁর এমন ঘনিষ্ঠতা হল যে সময় সুযোগ পেলেই নজরুল নৈহাটিতে সুবোধ রায়ের বাড়িতে এসে দু'তিন দিন করে থেকে যেতেন। দিনরাত গানে, আবৃত্তিতে, নূতন নূতন লেখায় মেতে থাকতেন ও নৈহাটির বাসিন্দাদের মাতিয়ে রাখতেন। তাঁকে সবাই তাঁদের বাড়িতে সাদরে নিয়ে গিয়ে নরনারী নির্বিশেষে আদর করত, খাওয়াত। তাঁর কথা, গান ও আবৃত্তি শুনবার জন্য সবাই উদগ্রীব হয়ে থাকত। নৈহাটির যারা স্থায়ী বাসিন্দা তাদের মধ্যে একটা সহজাত সাহিত্যপ্রিয়তা ছিল। নজরুলকে পেয়ে যেন তাঁদের উৎসাহ শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

এখানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। তা হল নজরুলের ক্রীড়া-প্রীতি। নৈহাটি-ভাটপাড়ার তরুণ ও ছাত্ররা নজরুলকে অত্যন্ত আপনার করে গ্রহণ করেছিল। সময়টা ১৯২৪ সাল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন ও সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন তখন পাশাপাশি সমান গতিতে চলেছে।

খেলার জগতেও তখন একটা নতুন আন্দোলনের ঢেউ ওঠে। তা হল, দেশীয় খেলার প্রচলন করে খেলোয়াড়দের মধ্যে ও দর্শকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগান। দেশীয় নানা খেলার মধ্যে প্রধান স্থান লাভ করে 'হা-ডু-ডুডু' খেলা।

হুগলী জেলার চন্দননগরের সন্তান সঙ্ঘ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব নেয়। এই সময় নৈহাটী-ভাটপাড়ার তরুণ সঙ্ঘ সন্তান সঙ্ঘকে হা-ডু-ডুডুর ম্যাচে আহ্বান করেন। এই ম্যাচ খেলা নৈহাটি কুমোরপাড়ার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। নজরুলকে তাঁরা এই অনুষ্ঠানের সভাপতি করেন। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে নজরুলকে তারা মিছিল করে সভায় নিয়ে আসেন। খেলা হবার পরে নজরুল এমন উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন যে সভাপতির গাম্ভীর্য ভুলে হা-ডু-ডুডু খেলায় ছেলেদের সঙ্গে মাঠে নেমে পড়েন। পরে এই দেশীয় খেলার উপরে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। তখন অবশ্য তাঁর বয়স পঁচিশ বছর।

মিত্রপাড়ার অদূরে শ্যামাসুন্দরীতলা। কবি খগেন ঘোষের বাড়ি ঐ পল্লীতে। নজরুল তাঁর কবি বন্ধুর বাড়িতে গেলে তাঁদের পরিবার খুশিতে মেতে উঠতেন। মেতে উঠত তরুণ সাহিত্য সংস্থা 'খেয়ালী' পত্রিকার তরুণ সাহিত্যিকের দল। 'খেয়ালী' সংস্থার আড্ডা ছিল বাড়ুয্যে পাড়ার অ্যাডভোকেট যতীন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়ি। নজরুল সেখানেও যেতেন। তাদের পরিচালিত 'খেয়ালী' পত্রিকায় লেখা দিয়ে উৎসাহিত করতেন, তার সঙ্গে আড্ডাতো জমাতেনই। এই পত্রিকার সম্পাদক প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে কবি লিখেছিলেন:

কবি শ্রীমান প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
কল্যাণীয়েষু,

আয় রে পাগল আপন বিভোল
খুশির খেয়ালী
হাতে নিয়ে বর বেণু
রঙীন পেয়ালী।
ভোজপুরীদের প্রমত্ততায়
মাতুক ওরা রাজার সভায়।
আঙিনাতে জ্বালরে ও তুই
অরুণ-দেয়ালী
ওরে খুশির খেয়ালী।

হুগলী
২০ ১০.

শুভার্থী
নজরুল ইসলাম

এই পত্রিকার অন্য দুজন সম্পাদক ছিলেন মন্মথ ভট্টাচার্য ও ডাঃ নরেন্দ্রনাথ মল্লিক। যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, খগেন ঘোষ ও সুবোধ রায় ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক। আড্ডা বসত মজুমদার মহাশয়ের বাড়িতে।

এই পত্রিকায় সুনির্মল বসুও নিয়মিত তাঁর লেখা ও আঁকা দিয়ে উৎসাহিত করতেন। কবি চণ্ডী মিত্র, কবি হেম বাগচী প্রমুখ অনেকেই লেখা দিয়ে ও আসরে যোগ দিয়ে উৎসাহিত করতেন।

কবি খগেন্দ্রনাথ ঘোষও কবিতা, প্রবন্ধ লিখতেন, কিন্তু নিজের প্রচারে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। বেশির ভাগ লেখাই খাতার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকত।

খগেন ঘোষের সঙ্গে নজরুলের একটা কারণে খুবই হৃদ্যতা জন্মেছিল। নজরুল ও খগেন ঘোষ দুজনেই জন্মেছিলেন ১৮৯৯ সালে। নজরুল ২৫শে মে, খগেনবাবু ২৪শে জুন। নজরুল তাঁর হাত দেখে বলতেন জুন মাসে জন্মেছ বলে তুমি ঘর বাঁধতে পারবে না। আমি মে মাসে জন্মে গৃহী হব। কথাটা খুবই ফলে গেছে—খগেনবাবু অকৃতদারই রয়ে গেলেন। সমাজ সেবা, শিক্ষাব্রত নিয়ে জীবন কাটিয়ে আজ জীবন সন্ধ্যায় এসে তিনি দাঁড়িয়েছেন।[১]

সুবোধ রায় ১৯৩৬ সালে খগেন বাবুর দুখানা কবিতার খাতা নজরুলকে দেখতে দিলেন আর একটা ভূমিকা সমেত বইটির নামকরণ করতে অনুরোধ করলেন। নজরুল বইটির নামকরণ করলেন "চিত্রলেখা"[২] এবং সেই সঙ্গে একটি ভূমিকাও লিখে দিলেন। বইটি ছাপা হল ১৩৪৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে (ইংরেজি ১৯৩৮ সাল)। বইটির প্রকাশক ছিলেন শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, এম্ সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা, মূল্য দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থখানি সম্পর্কে একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। এতে মোট ছাপ্পান্নটী কবিতা আছে। পাঁচটি সুবৃহৎ কবিতা। কবিতাগুলি এত সাবলীল, প্রাঞ্জল, সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য যে একটু নমুনা দিলে বোঝা যাবে নজরুলের ভূমিকার প্রতিপাদ্য বিষয়।

"উৎসর্গ" নামক কবিতার তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখলেন ঃ

"যদি কোন দিন না পারি বুঝিতে
যার সে ছায়ার অর্থ খুঁজিতে
সঙ্গে তোমরা যেও না ডুবিতে
হারায়ো সহজ জ্ঞান,

যদি কোন কথা ভালো নাহি লাগে,
বাঁকায়ো না মুখ মনের বিরাগে,
দীনের অর্ঘ্য করুণ-সোহাগে
কোর না প্রত্যাখ্যান।”

“প্রথম চিঠি” কবিতায় (পৃষ্ঠা পঞ্চম) লিখলেন,

“পূর্ণিমার চন্দ্রমার ধেয়ানে চকোর
যেমন মগন রহে আঁধার নিশায়,
তেমনি তোমার রূপে হয়ে আছি ভোর
তব ধ্যানমূর্ত্তিখানি ধরি কল্পনায় ;”

“যৌবনের ব্যথা” কবিতায় লিখলেন (পৃঃ ৭),

“জগতের কারো আসা জানাতে আপনায়,
কেহ বা আসে হেথা যোগাতে নীরবতা,
কেহ বা ফুটে উঠে কেহ বা ঝ'রে যায়।

* * *

জগতে দুই সুর ভাষা ও নীরবতা ;
বলার মত যাহা প্রকাশ হোক তাহা
লুকান থাকিবে যা, থাকরে লুকান তা।

তবুও ব্যথা জাগে, হল না বলা মোর ;
বেদনা ঠিকরিয়া বাঁধিল কি করিয়া
ভাষারে আজি দিয়া সজল আঁখি লোর।”

“প্রভাব” কবিতা (পৃঃ ১৯),

“তুমি যবে মোর পানে চাও আঁখি তুলে,
ভূমিকম্পে দৃঢ়ভিত্তি অট্টালিকা যথা
প্রচণ্ড দুলিতে থাকে ; ভাবাবেগে তথা
মুহূর্ত্তে হৃদয়মন মোর ওঠে দুলে।”

“জ্ঞানীর সাধনা” কবিতায় (পৃঃ ৩৫),

বিত্তবিহীন চিত্তের কাজ
সাধিতে মানব বাসিবেনা লাজ
ভিত্তিক্ষয়িত ধনগৌরব
সহসা পড়িবে ধ্বসি ;
একের পিছনে ছুটিছে বিশ্ব—
কেহ হেরিবে না আর এ দৃশ্য.
একাধিপত্য—ধরা প্রভুত্ব
ধনীর যাইবে খসি।

এক হয়ে যবে হবে একাকার,
একটী সমাজ একটী আচার
একটী মহান মানবের জাতি
গড়িয়া উঠিবে ভবে ;
সেই মহাজাতি করিবে গঠন
মহাভবিষ্য শান্তি-সদন
এক মহা আশা করিবে বহন
প্রদীপ্ত গৌরবে

এই সহজবোধ্য সরল ও প্রাঞ্জল গতিতে ছাপ্পান্নটী কবিতাগুচ্ছে 'চিত্রলেখা' কবিতাগ্রন্থটি সাজান আছে। এরই পরিচয় নজরুল তার লিখিত ভূমিকায় সুন্দররূপে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।

সেই ভূমিকাটী সম্পূর্ণ এখানে নিবেদন করছি ঃ

পরিচায়িকা

আমার বন্ধু খগেনবাবুর সঙ্গে বহুদিন আগে যে দিন আমার প্রথম আলাপ হয় রসগ্রাহী সুন্দরের রূপতৃষ্ণাতুর তরুণরূপে, সেদিন তার হৃদয় বনভূমিতে দেখেছিলাম রসের তরঙ্গ—পুষ্পপল্লবের সমারোহ দেখি নি। তার পরেও বহু বৎসর ধরে আলাপ-পরিচয়ের মাঝেও জানতে পারি নি তাঁর সেই বিজন বনভূমিতে কুমারী বনলক্ষ্মীর মধুর আবির্ভাবের বার্ত্তা।

সহসা আমার প্রিয় কবি-বন্ধু সুবোধ রায় দুটী অযত্নরক্ষিত খাতা নিয়ে দেখতে দিলেন। ভয় পেয়ে গেলাম! আবার বুঝি কোন অনিদ্রা ব্যাধিগ্রস্ত তরুণের উত্তপ্ত মস্তিস্কপ্রসূত দুশ্চিন্তাপ্রবাহ গলাধঃকরণ করতে হবে। কিন্তু এক চুমুক পান করেই দেখলাম এ গরল নয়, বেদনার সমুদ্রমন্থন শেষের অমৃত ; আমার মনপ্রাণ জুড়িয়ে গেল। আমার বিদায় চাওয়া যৌবন যেন মাঝপথ থেকে ফিরে এল অসীম উদগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। রাত্রিদিন নানা সাময়িকী পত্রিকায় কবিতার যে আগাছা দেখেছিলাম, তার মাঝে বিচরণ করে ক্লান্ত হয়ে যেন সহসা নন্দনের মঞ্জু-বনশ্রীকে দেখতে পেলাম। নয়নমন সার্থক হয়ে গেল।

শাশ্বত হোক ২৪শে আশ্বিন! এই শতাব্দীর কোন এক বৎসরে ঐ শুভদিনে ধরায় ধরা দিলেন আমার কবি বন্ধুর তপস্যা, বিগত জন্মের বিস্মৃতা বাণী। কবির চিত্তলোকে এল অনন্ত বসন্তের উৎসব। অসীম বেদনার দহন সুখ। যত ফুল, তত কাঁটা—যত সঙ্গীত, তত ক্রন্দন।

বিরহের মহাসিন্ধুর তীরে প্রিয়াহারা একা কবি যে-গান গাহিলেন তাতে সমুদ্রে উঠ্‌ল কল্লোল, বাতাসে জাগলো ঝঞ্ঝার হিল্লোল, জ্যোৎস্নার আঁচল ছড়িয়ে পূর্ণিমা-বিভাবরী উঠল কেঁদে। সে কি ভাষা, সে কি উপমা। সত্যকার ভাল না বাসলে, প্রেমের তপস্বী না হলে এ বাণী, এ ভাব ব্যাকুলতা লেখনী মুখে আসে না। শতঃ উৎসারিত ঝর্ণাধারার

মত সচ্ছন্দ সতেজ এই গতি আসতে পারে না মহারাণীর কৃপা ছাড়া। যে দেবী কবির হৃদয়ে জ্বালিয়েছিলেন বিরহের দীপশিখা, তাঁকে নমস্কার। মিলনের উন্মুক্ত প্রান্তরে যেন সে দীপশিখা নিভে না যায়। মাঝে থাক বিরহের মহাপারাবার—অনন্ত রাত্রি, দুই কূলে কাঁদুক দুই চখাচখী—নইলে এই গান, এই মধুর ক্রন্দন শুনতে পাবো না। কবি বাণীর জয়মাল্য গলায় নিয়ে এসেছেন, কাজেই কোন কবিরই পরিচয়পত্রের প্রয়োজন নাই। তার এই কবিতাগুলিই তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। বাঙলার কাব্যগগনে এতদিনে এক নূতন জ্যোতিষ্কের উদয় হল, এই জ্যোতিষ্ককে আমার সঙ্গে সকলেই সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করবেন, সন্দেহ নাই

নজরুল ইসলাম

(২)

১৯২৫ সাল। এই সময় পরম শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী মহাশয় নৈহাটি-ভাটপাড়ায় যুগান্তর দলের সংগঠন নূতন করে গড়ে তোলেন—সঙ্গে ছিলেন সংগঠক বোঁচাদা (রায়)। নৈহাটির শান্তিকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নির্মল সুর প্রমুখ ও ভাটপাড়ার হরনাথ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক নরোত্তম দাশঘোষ প্রমুখ ভাটপাড়ায় 'তরুণ সঙ্ঘ' নাম দিয়ে একটি নূতন সংস্থা গড়ে তোলেন। এই সংস্থার কাজ ছিল বৈপ্লবিক কার্যধারা সম্বন্ধে আলোচনা ও শরীর চর্চা। দেশের তরুণদের চরিত্র গঠনে উৎসাহ দেওয়া। এঁদের একটি সুন্দর ব্যায়ামাগার ছিল আর ছিল গঙ্গায় নৌকা পরিচালনা দ্বারা স্বাস্থ্য গঠনের কাজ। ভাটপাড়া-নৈহাটির তৎকালীন তরুণদের দেখলেই চেনা যেত তরুণ সঙ্ঘের সভ্য বলে। বিপিনবিহারী ছিলেন এই দলের সশস্ত্র বিপ্লবের নেতা। শান্তিকুমার মুখোপাধ্যায়, বোঁচাদা (রায়) প্রভৃতি ছোরা, লাঠি ও তলোয়ার অস্ত্র-শিক্ষক। আগ্নেয়াস্ত্রাদির শিক্ষক নির্মল সুর ছিল নজরুলের বৈপ্লবিক গানের গায়ক ও তরুণ মনের প্রেরণাদাতা।

এঁরা কয়েকবার নজরুলকে তাদের সঙ্ঘে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের নৌকায় চাপিয়ে নজরুলকে হুগলী থেকে ভাটপাড়া-নৈহাটিতে নিয়ে যেতেন, ও তাঁর বৈপ্লবিক নানা-কবিতা শুনতেন ও পল্লীর সবাইকে শোনাবার সুযোগ করে দিতেন। বলা বাহুল্য, পল্লীবাসী নরনারী নজরুলকে খুবই সমাদর করতেন।

ভাটপাড়া প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত অঞ্চল। এখানের ব্রাহ্মণেরা বৈদিকশ্রেণীর ও অতি প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র চর্চায় বিখ্যাত। ধর্মরক্ষায় অতি গোঁড়া। এঁদেরই ছেলেরা বিপ্লবী সংস্থা গড়ে গোঁড়ামী পরিহার করে নজরুলকে নিয়ে মাতামাতি করায় গোঁড়া ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিশেষ বিরোধী আলোড়ণের সৃষ্টি হয়েছিল।

এই বৎসরে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস 'হীনজাতির জলচল আন্দোলন' প্রস্তাব সমর্থন করে। সেজন্য সারা দেশে প্রচণ্ড সাড়া পড়ে যায়। বাংলা দেশে 'নমঃশূদ্র' (চণ্ডাল)-রা চিরকালই অবহেলিত। তারা সমাজের সব রকম কাজ করে সমাজসেবার সঙ্গে জীবিকা উপার্জন করে থাকে। অথচ তারা ব্রাত্য ও অচ্ছুৎ। তাই কংগ্রেসের এই প্রস্তাবকে বাংলা দেশের বিপ্লবী নেতা ও কর্মীরা আন্দোলনের মাধ্যমে নমঃশূদ্রের ও ব্রাত্যদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন।

এই ঢেউ ভাটপাড়া ও নৈহাটির তরুণ বিপ্লবীদের মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি করল। এই আলোড়নের জন্য দুটি দলের সৃষ্টি হয়। একটি প্রাচীন গোঁড়া মতাবলম্বী ও দ্বিতীয়টি পুরোপুরি নবীনের দল। কিন্তু কালের স্রোতের টানই কালজয়ী হল। সে ঘটনার কথাই এখানে বলব

সময়টা গ্রীষ্মকাল। একই দিনে পাশাপাশি দুটি সম্মেলন ডাকা হয়। গোঁড়া ব্রাহ্মণ নেতৃবৃন্দ বিরাট সামিয়ানা খাটিয়ে "নিখিল ভারত ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলনের" ব্যবস্থা করেন ভাটপাড়া নৈহাটির মাঝখানে, গঙ্গার ধারে। ঠিক তার পাশেই বলরাম সরকারের ঘাটে তরুণেরা ডাকেন '২৪-পরগণা জাতীয় সম্মেলন'। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক নরোত্তম দাশঘোষ। আর ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলনের সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় লক্ষণ শাস্ত্রী। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্টদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রমুখ।

তরুণদের সম্মেলন উদ্বোধন করেন নজরুল। ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলন তিন-দিনব্যাপী হয়েছিল। এই সভার তৃতীয় দিন 'নমঃশূদ্রের জলচল' প্রস্তাব নিয়ে আসেন তরুণের দল। এঁদের সহায়ক হন চুঁচূড়ার 'বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর' প্রাচীন বয়সের অধ্যক্ষ স্বর্গগত মহাপণ্ডিত সীতানাথ বেদান্ত শাস্ত্রী। তিনি তাঁর ছেলে পণ্ডিতপ্রবর গীষ্পতি ভট্টাচার্যের[৩] হাত দিয়ে শাস্ত্রবাক্য দিয়ে উক্ত 'নমঃশূদ্রের জলচল' সমর্থন করে একটি 'পাঁতি' লিখে পাঠিয়ে দেন। তৃতীয় দিনে গীষ্পতি ভট্টাচার্য ও ভাটপাড়ার তরুণ ব্রাহ্মণ দল ঐ পাঁতি, সভাপতি মহামহোপাধ্যায় লক্ষণ শাস্ত্রীর কাছে পেশ করেন। তিনি এই প্রস্তাব সমর্থন করায় ভাটপাড়ার পণ্ডিত-মণ্ডলী তাঁর বিরোধিতা করেন। এতে গণ্ডগোলের ফলে সম্মেলন ভেঙে যায়। তখন তরুণ দলের সম্মেলনে নজরুল ও অধ্যাপক নরোত্তম গান কবিতা দিয়ে সদ্য ভেঙে যাওয়া পণ্ডিত মণ্ডলীকে মানুষের অধিকার হরণ পাপ এটা বোঝান। বহিরাগত বহু পণ্ডিত নজরুলের গান শুনে সন্তোষ প্রকাশ করেন ও তাঁর কথাকে স্বীকৃতি দান করেন।

(৩) গীষ্পতি ভট্টাচার্য হুগলী চুঁচূড়ার ছেলে। তিনি ছিলেন বিপ্লবী কবি, প্রবন্ধকার, চিত্রকর, বহুভাষাবিদ ও নজরুলের ...... বন্ধু বর্তমানে তিনি দেহরক্ষা করেছেন।

তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ

১৩৩১ সালের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে চার পাঁচ মাস ব্যাপী তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলন দুর্বারগতিতে চলেছিল। এই আন্দোলনের সভাপতি ছিলেন স্বামী সচ্চিদানন্দ। পরিচালকদের মধ্যে স্বামী বিশ্বানন্দ, আসানসোলের ট্রেড ইউনিয়নের নেতা। প্রচারে ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল তখন হুগলী শহরে মোগলপুরা লেনের বাসায় থাকেন। এই আন্দোলনের ইতিহাস জানতে হলে পুরাতন ঘটনার কথা না জানলে এর তাৎপর্য বোঝাই যাবে না। আরও বোঝা যাবে না নজরুল ইসলাম এই আন্দোলনের সঙ্গে কেন যুক্ত হলেন? নজরুল যে "মোহ-অন্তের" গান রচনা করেছেন তা কতখানি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার ওপর নির্ভর করে লেখা হয়েছিল, এই ঘটনা পড়লেই বোঝা যাবে। এই জন্যই এই গানটি সেই সময়ের লোককে কেন এত আকৃষ্ট করেছিল তাও বোঝা যাবে। তাই একালের পাঠকদের জন্য স্বল্পস্থানে মোহন্তের কিঞ্চিৎ অপকীর্তির কথা নিচে লিখলাম।

ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশকে "হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপালের রামনগর নামক স্থানের রাজা ভারামল্ল তারকেশ্বরের সেবার জন্য এক হাজার তেইশ বিঘা জমি অর্পণ করেন।"

"তারকেশ্বরের মোহন্তগণ দশনামা সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীরূপে দেবসেবা করিবেন ইহাই ভারামল্ল নির্দেশ দিয়া যান। তাঁহারা বিবাহ করিয়া সংসার করিতে পারিবেন না এবং মোহন্ত গতায়ু হইলে তাঁহার প্রধান শিষ্য মোহন্তপদে অভিষিক্ত হইবেন। ইহাই চিরাচরিত প্রথা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু মোহন্ত সন্ন্যাস ধর্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া স্ত্রী (বিবাহিত নয়) সংসর্গের কদাচারে নিযুক্ত হইয়া উক্ত পদের অমর্যাদা করেন। ধর্মের আবরণে মোহন্তগণ যে অধর্মের খেলা খেলিতেন, দরিদ্র প্রজাগণ সে অনাচারের প্রতিকারের চেষ্টা করিতে কোনদিন সাহসী হয় নাই। ১৩৩১ সালে স্বামী বিশ্বানন্দ নামক এক সন্ন্যাসী সর্বপ্রথমে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রহৃত হন। কিন্তু তিনি তাহাতে ভীত না হইয়া স্বামী সচ্চিদানন্দের সহযোগিতায় দ্বিগুণ উৎসাহে ইহা লইয়া আন্দোলন করেন। অতঃপর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তারকেশ্বরের যাবতীয় ব্যাপার নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহযোগে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন।"[১]

ফলে তারকেশ্বরের পুরাতন নিয়ম হাইকোর্ট থেকে বিলুপ্ত হয়ে ট্রাস্টিদ্বারা পরিচালিত করার হুকুম হয়।

(১) হুগলী জেলার ইতিহাস—সুধীর মিত্র, পৃঃ ৮২৩-৮২৪ দ্রষ্টব্য



নজরুল ও তাঁর বন্ধু প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়



১৯৬৭ সালে ১০ই জ্যৈষ্ঠ
নজরুলকে মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন শ্রীমতী সুষমা চট্টোপাধ্যায়



পিছনেঃ (বাম হইতে দ্বিতীয়) প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। বসেঃ নজরুল, নগেন্দ্রনাথ, তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের মূল সভাপতি স্বামী সচ্চিতানন্দ, শচীনন্দন, মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও মোহান্তের তহ্‌শীলদার মহিম দাস।

১৮২৪ সালে শ্রীমন্তগিরির ফাঁসী হয়। সে সংবাদ "সমাচার দর্পণে" প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

"তারকেশ্বরের মোহন্তর পূণ্য প্রকাশ"

'শোনা গেল যে তারকেশ্বর নিবাসী শ্রীমন্তগিরি সন্ন্যাসী স্বীয় ধর্মকর্ম সংস্থাপনার্থ এক বেশ্যা রাখিয়াছিলেন। তাহাতে জগন্নাথপুর নিবাসী রামসুন্দর নামক এক ব্যক্তি ঐ বেশ্যার সহিত কি প্রকারে প্রসক্তি করিয়া ছদ্মভাবে গমনাগমন করিত। পরে সন্ন্যাসী জানিতে পারিয়া ২রা চৈত্র (১২৩০) শনিবার রাত্রিযোগে সন্ধানপূর্বক হঠাৎ যাইয়া বেশ্যাকে কহিল যে একটু পানীয় জল আন...তাহাতে বেশ্যা জল আনিতে গেলে সময় পাইয়া ঐ ব্রাহ্মণেব বক্ষস্থলের উপর উঠিয়া তাহাব উদবে এমত এক ছুরিকাঘাত করিল যে তাহাতে তাহার মঙ্গলবারে প্রাণবিয়োগ হইল পরে তথাকার দারোগা ঐ সমাচার শুনিয়া ঐ সন্ন্যাসীকে গ্রেফতার করেন (১৬ই চৈত্র ১২৩০)"। এই ব্যাপারে ঐ মোহন্তের ফাঁসী হয়।[২] এরপর আর একটি ঘটনা। "মোহন্ত মাধবগিরি এলোকেশী নামক এক মহিলার সতীত্ব-নাশের অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করেন"।[৩] এই এলোকেশী কুরুমঙ্গল গ্রামের নীলকমল মুখোপাধ্যায়েব সুন্দরী কন্যা ছিলেন। তাঁহাব বিবাহ হয় নবীন নামক এক যুবকের সঙ্গে। নবীন ছিলেন দবিদ্র ব্রাহ্মণ। এই দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মোহন্ত এলোকেশীর পিতা নীলকমলকে হাত করেন এবং এই অপমানেও স্বামী নবীন স্ত্রীকে ক্ষমা করে কোলকাতায় পালিয়ে যাবাব ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মোহন্তের নিয়োজিত লাঠিয়ালবাহিনীর জন্য নবীন পালিয়ে যেতে পারেন না। অবশেষে আঁশবটি দিয়ে স্ত্রীকে হত্যা করে থানায় আত্মসমর্পণ করে সব বলেন; নবীনের যাবৎজীবন দীপান্তর হয়, আর পরস্ত্রীর সতীত্ব নাশের জন্য মাধবগিরির হয় কারাদণ্ড। পবে দেশের বহু গন্যমান্যদের চেষ্টায় নবীন কারামুক্ত হয়।

তারকেশ্বরের মোহন্তদের ধারাবাহিক অপকীর্তির জন্য সেই সময়ে নাট্যালয়ে, সংবাদপত্রে, সমাজের নানাস্তরে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে ওঠে কিন্তু সরাসরি কেউই এর প্রতিবাদে এগিয়ে এসে কিছু করতে সাহস পায় না। কারণ মোহন্তের রাজা ভারামল্লের দেওয়া তৎকালের দেড লক্ষ টাকা আয়ের দাপট, গুণ্ডা ও লাঠিয়ালবাহিনীর প্রতাপ। মোহন্তদের এই নীরন্ধ্র প্রতাপ ভেদ করে এ থেকে সমাজকে মুক্ত করবে—কে "আছে জোয়ান?"— এই জোয়ানের মধ্যে বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার সন্ন্যাসী ট্রেড ইউনিয়নিস্ট বিশ্বানন্দের হল আবির্ভাব তারকেশ্বরের সিংহদ্বারে। তিনি নিজের চোখে নানা ঘটনা দেখে তার তীব্র প্রতিবাদ করায় মোহন্তের লাঠিয়ালদের হাতে প্রচণ্ড মার খেলেন। সিংহগর্জনে মোহন্তের ধ্বংসের কথা সে স্থানে প্রচার

(২) হুগলী জেলার ইতিহাস—সুধীর মিত্র পৃঃ ৮২৫
(৩) ঐ ঐ পৃঃ ৮২৭

করে এসে দেশবন্ধুর কাছে মোহন্ত অপসারণের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রস্তাব পেশ করায় দেশবন্ধু তাঁর হাতে আন্দোলন পরিচালনার ভার তুলে দিলেন।

ভার নিয়েই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মাধ্যমে একটি "অনুসন্ধান কমিটি" গঠন করেন। এই কমিটিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ জে, এম, সেনগুপ্ত, অনিলবরণ রায়, পণ্ডিত ধরানাথ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঢাকা) এবং মৌলানা আক্রাম খাঁ সভ্য হিসাবে নির্বাচিত হন।"[৪] তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের সময় সতীশগিরি ছিলেন মোহন্ত। প্রথমে শুরু করেন ধরানাথ ভট্টাচার্য ও স্বামী বিশ্বানন্দ। বিশ্বানন্দ মার খাওয়ার পর ধরানাথ ভট্টাচার্য তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান প্রতিবাদের জন্য। ধরানাথ ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং যুগান্তর দলের সশস্ত্র বিপ্লবী; হুগলী জেলার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁর হাতে বহু বিপ্লবী তরুণ ছিলেন। তাঁদের দাপটও কম ছিল না। নজরুল ছিলেন তাঁর প্রিয়ভাজন।

এই আন্দোলনের জন্য দেশবন্ধু ও ধরানাথ ভট্টাচার্য নজরুলকে অনুরোধ করেন চারণকবি রূপে প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে। কবি সানন্দে এঁদের অনুরোধকে আদেশ বলে মেনে নিয়ে একটি গান লেখেন। কবির এই গানটি প্রকাশিত হয় বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ 'ভাঙার গানে'। গানটির নাম "মোহ-অন্তের গান"। তৎকালে এই গানটি হুগলী জেলার গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে এবং সারা বাংলাদেশে নজরুল তাঁর বজ্রকণ্ঠে গেয়ে বেড়ান; যার ফলে সত্যাগ্রহে হাজার হাজার তরুণ, মধ্য বয়সী ও বৃদ্ধ স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলনের পতাকার নিচে এসে শামিল হয়েছিল। এই গানটির শুরু এই ঃ

"জাগো আজ দণ্ড হাতে চণ্ড বঙ্গবাসী।
ঐ ডুবালো পাপ চণ্ডাল তোদের বাংলা দেশের কাশী।
জাগো বঙ্গবাসী।

মোহের যার নাইকো অন্ত
পূজারী সেই মোহন্ত
মা-বোনের সর্বস্বান্ত,
করছে বেদী মূলে।
তোদের পূজার প্রসাদ বলে খাওয়ায় পাপ-পুঁজ সে গুলে
তোরা তীর্থে গিয়ে দেখে আসিস্ পাপ ব্যাভিচার রাশিরাশি।
জাগো বঙ্গবাসী।"

ধর্মধ্বজী ভণ্ডরা ধর্মকে ব্যবসায়ে পরিণত করে, লোক ঠকিয়ে টাকার পাহাড়ের ওপর বসে গুণ্ডা ও লাঠিয়ালবাহিনী দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করে বলে কবি লিখলেন ঃ

(৪) হুগলী জেলার ইতিহাস—পৃঃ ৮২৯-৩

"পুণ্যের ব্যবসাদারী
টাকায় সব এই ব্যাপারী;
জমাচ্ছে হাঁড়ি হাঁড়ি টাকার কাঁড়ি ঘরে।
হায় ছাই মেখে যে ভিখারী শিব বেড়ান ভিক্ষা করে।
ওরে তাঁর পূজারী দিনে দিনে ফুলে হচ্ছে খোদার খাসী।
জাগো বঙ্গবাসী

এই রকম ভণ্ড, দুশ্চরিত্র পূজারি সেবাইত মোহন্তের সকল সংবাদ জানা সত্ত্বেও 'তাঁরই কাছে আশীর্বাদ লাভের জন্য নিজের ঘরের ইজ্জত (মেয়ে, বৌ, বোন প্রভৃতিদের) বিকিয়ে দিতে কসুর করে না যে দেশের লোক তাঁদের সাবধান করে লিখলেন :

"এই সব ধর্ম ঘাগী।
দেবতায় করছে দাগী;
মুখে কয় সর্বত্যাগী ভোগ-নরকে বসে।
সে যে পাপের ঘণ্টা বাজায় পাপী দেব দেউলে পশে
আর ভক্ত তোরা পূজিস্ তারেই যোগাস্ খোরাক সেবাদাসী।
জাগো বঙ্গবাসী।'

এই রকমভাবে যে ভণ্ড মোহন্তরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মান-মর্যাদা, ইজ্জৎ-ঈমান্ সব হরণ করে সমাজের বে-ইজ্জৎ করছে তীর্থযাত্রীরা দেখেও দেখে না, বুঝেও বোঝে না; দুর্ভোগ ভুগেও তার প্রতিকারের চেষ্টা করে না। তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে নজরুল গাইলেন :"

"দিয়ে নিজ রক্ত বিন্দু।
ভরালি পাপের সিন্ধু—
ডুব্‌লি তায় ডুবালি হিন্দু; ডুবালি দেবতারে!
দ্যাখ্ ভোগের বিষ্ঠা পুড়ছে তোদের বেদীর ধূপাধারে।
পজারীর কমণ্ডলুর গঙ্গা জলে মদের ফেনা উঠছে ভাসি।
জাগো বঙ্গবাসী।"

শুধু পূজার দক্ষিণা সোনা রূপা হীরে জহরত পেয়ে কি এই মোহন্তরা খুশি হত? নারী মাংস—বিশেষ করে ভদ্র ঘরের মেয়ে বৌ-এর সর্বনাশ কি তাদের ধর্মের গরম টাকার গরম শীতল হত? তারা চাইত ভোগের চরম স্তরে উঠতে তাই কবি বললেন

"দিতে যায় পূজা আরতি
সতীত্ব হারায় সতী।
পূণ্য দাতার কাতি দেখায় ভক্তি দিয়ে

এই লাইন কটির অর্থ হ'ল অসংখ্য মেয়েদের সর্বনাশ করেছিল যে মোহন্তরা তাদের জন্য দেব-সেবার টাকায় তাদের রক্ষিতা-স্বরূপ রাখত। মন্দিরের একটা চত্বরই ছেড়ে দিয়েছিল এই সব রক্ষিতাদের বসবাসের জন্য। মোহন্তর প্রসাদী-জীবন বলে তারা মাসহারা পেত আর মোহন্তের দুরাচারী মুসাহিবদের ভোগ্য-পাত্র স্বরূপ বাস করত। কবি আবার লিখলেন :

তার ভোগ মহলে জ্বলছে প্রদীপ তোদের পুণ্য ঘিরে।
তোদের ফাঁকা ভক্তির ভণ্ডামীতে মহাদেব আজ ঘোড়ার ঘাসী
জাগো বঙ্গবাসী।"

নজরুল গানের মধ্যে তারকেশ্বরের মোহন্তদের অত্যাচারের ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার ফেহ্‌রিস্ত দিয়ে বলার পর জানালেন দেশবাসীর কাছে এই পাপী মোহন্ত-গোষ্ঠীর অপসারণের জন্য আহ্বান :

"তোরা সব ভক্তিশালি
বুকে নয়, মুখে খালি।
বেড়ালকে বাছতে দিলি মাছের কাঁটা যেরে।"

ধর্মধ্বজী মোহন্ত মার্জার এর হাতে ভক্ত জীবনকে তীর্থযাত্রীরা মাছের নিরাপত্তার ভার দিয়েছিলো। মোহন্তের স্বরূপ কি আর ভক্তদেরই বা কি স্বরূপ? হৃদয়ের গভীরে ভক্তির স্থান, কিন্তু দেশবাসীর ভক্তি প্রচার মুখেই, তাই কবি গাইলেন :—

"তোরা পূজারীকে করিস পূজা পূজার ঠাকুর ছেড়ে।
মার অসুর শোধরা সে ভুল আদেশ দেন মা সর্বনাশী।
"জয় তারকেশ্বর" বলে পড়বিরে নয় গলায় ফাঁসী।
জাগো বঙ্গবাসী।"

এই দীর্ঘ গানটির কথা বিস্তৃত ভাবে বললাম এই জন্য যে নজরুলের এই গানটির কথা কেউ এ পর্যন্ত বলেন নি। তারকেশ্বরের অত্যাচারী মোহন্তদের দাপট যে বিলুপ্ত হয়েছে, তাতে নজরুলের কী যবরদস্ত হাত ছিল এ ইতিহাস নব-যুগের নবীনদের কাছে তুলে ধরবার জন্য।

এই অমিত শক্তি সম্পন্ন অগ্নিময়ী বাণীতে শিবের ত্রিশূলচ্ছটা যেন বিচ্ছুরিত হত শ্রোতাদের মধ্যে। শ্রোতারা শিরদাঁড়া খাড়া করে শপথ নিত মোহন্ত নিধনের।

মোহন্তের সহস্রাধিক লাঠিয়াল ছিল। এর সর্দার শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ছিলেন যেমন দুর্বার চরিত্রের লোক, তেমনি নিষ্ঠুর। মোহন্তের জন্য

তিনি করেন নি এমন কাজ ছিল না। কিন্তু দেশবন্ধু ও নজরুল সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে এমন করেছিলেন যে তিনি পরে মোহন্তের পরম শত্রুতে পরিণত হয়েছিলেন। যার লাঠি মোহন্তদের নির্দেশে খুন করতে দ্বিধা করত না, গুম করে ফেলতে কুণ্ঠাবোধ করত না সেই সত্যবাবু শেষ পর্যন্ত মোহন্ত সতীশগিরির আতঙ্কের কারণ হয়েছিলেন। সেই কথাই এখন বলব। তারকেশ্বর মন্দিরের বিরাট মাঠে সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি সভা। উপস্থিত ছিলেন দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, স্বামী বিশ্বানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ, নজরুল প্রমুখ। আমরা স্বেচ্ছাসেবকেরাতো আছিই। দেশবন্ধু নজরুলকে উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইবার জন্য আহ্বান জানালেন। ওদিকে সহস্রাধিক লাঠিয়ালসহ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় সভাকে ঘিরে রয়েছেন। লাঠিয়ালরা মন্দিরের নির্দেশের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে সভায় ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। সভাস্থ সকলেই সঙ্কিত হয়ে আছে কখন লাঠিয়ালরা ঝাঁপিয়ে পড়ে সভাকে তছনছ করে দেবে। এর পূর্বে এই আন্দোলন সংক্রান্ত সভা এখানে কেউই করতে পারেন নি। নজরুল দৃপ্ত ভঙ্গিমায় কেশর ফুলিয়ে, ঝাঁকিয়ে (বাবরি) গান ধরলেন "জাগো আজ দণ্ড হাতে চণ্ড বঙ্গবাসী" বলে। লাইনের পর লাইন গেয়ে যাচ্ছেন, সভাস্থ লোকদের চোখে মুখে দুঃসাহসিকতার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চের এক কোণে দাঁড়িয়ে। দেশবন্ধু মাঝে মাঝে তাঁর দিকে তাকাচ্ছেন কিন্তু সত্যবাবু কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে। গান শেষ হলে সত্যবাবুই বললেন, "কাজী গানটা আবার গাও", আবার নজরুল গান ধরলেন। উদ্দীপনাময় সভায় উৎসাহের জোয়ার বয়ে গেল। নজরুলের কণ্ঠের দৃঢ়তায় সুর দ্বিগুণ হয়ে উঠল, লাঠিয়ালরা হতবাক। গান শেষ হলে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় নজরুল ও দেশবন্ধুর পায়ের কাছে নিজের হাতের লাঠি রেখে ঐ সভায় মোহন্তের সর্বনাশের শপথ নিলেন। আন্দোলনের মোড় ঘুরে গেল, বেশির ভাগ লাঠিয়াল নিয়ে সত্যবাবু বাল্মীকির মত সত্যাগ্রহে শামিল হলেন।

এই সত্যাগ্রহে নজরুলের কবি বন্ধু, হুগলীর প্রখ্যাত ছাত্রনেতা গীস্পতি ভট্টাচার্য চিররঞ্জন দাশ (দেশবন্ধুর ছেলে) স্বামী বিশ্বানন্দ ও আরও অনেকে এই আন্দোলনে কারাবরণ করেন।

এরপর সতীশগিরির বিরুদ্ধে মামলা হয়। মামলায় মোহন্তর দেবত্তর সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নিয়ে দশনামী সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসীকে মোহন্ত নিযুক্ত করে তাঁকে গদি থেকে অপসারিত করা হয় এবং একজন প্রথমশ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে তদারকির ভার দেওয়া হয়। এই ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন তাহলে নিযুক্ত মোহন্তকে অপসারিত করে নূতন মোহন্ত নিযুক্তও করতে পারবেন এমন নির্দেশ দেন বিচারকেরা। শত বৎসরের অত্যাচারী পাপিষ্ঠের দ্বারা কলঙ্কিত তারকেশ্বর এমনি করে মুক্তি লাভ করল। এই মুক্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে নজরুল যে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন তা জানার দরকার আছে নজরুল ভক্তদের।

বাঁকুড়ায়

১৩৩২ সালের আষাঢ় মাসে বাঁকুড়ার যুব ও ছাত্র সমাজ থেকে কাব্ নজরুল নিমন্ত্রণ পেলেন। ঠিক এই সময়েই নিমন্ত্রণ পেলেন বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাঁটি জাতীয় বিদ্যালয় থেকে। দুই জায়গা থেকেই ছেলের দল কবিকে আগে চায়। কিন্তু অনেক আলোচনার পর ঠিক হয় কবি প্রথমে বাঁকুড়া কলেজে ও পরে গঙ্গাজলঘাঁটি জাতীয় বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করতে যাবেন। গঙ্গাজলঘাঁটি জাতীয় বিদ্যালয়েব একটু পরিচয় দেওয়া উচিত কারণ ঐ বিদ্যালয়টিকে "অমব" বলে একটি স্বেচ্ছাসেবক জীবন পণ করে গড়ে তোলেন। ধূ ধূ করছে পাহাড়ী প্রান্তব নদী, পাহাড় ও বনে ঘেরা। এই জাতীয় বিদ্যালয় বাঁকুড়ার একটি গৌরবের বস্তু হয়ে উঠেছিল। আন্দোলনের যাত্রা পথে এটি ছিল একটি পান্থশালার মত। কত বিপ্লবীর ছিল এটা আশ্রয় স্থল। এই আশ্রয় বা বিদ্যালয় যে অমরের চেষ্টায় হয়েছিল সেই অমরের অকালমৃত্যু হয় এই আশ্রমেই। এই দেশে কোন মহৎ কাজ করতে হলে যে একক পবিশ্রম করতে হয় তাতে কর্মীর বাঁচার মত আর সামর্থ্য থাকে না। অমরের এই আত্মদানে সহকর্মীরা এর নাম রাখে "অমর কানন"। অমর কাননের উদ্বোধনের জন্য তরুণ প্রিয় কবি নজরুলের ডাক পড়ে। কবিও প্রস্তুত হলেন সেখানে রওনা হবার জন্য। যাবার পূর্বে "অমর কানন" নাম দিয়ে একটি গান লেখেন। এই গানটি "ছায়ানট" নামক বইতে আছে। গানটি এই,

"অমর কানন
(মোদের) অমর কানন !
বনকে এলরে ভাই, আমাদের তপোবন ॥
আমাদের তপোবন ॥
(এর) দক্ষিণে "শালী" নদী কুলু কুলু বয়,
(তার) কূলে কূলে শাল বীথি ফুলে ফুলময়,
(হেথা) ভেসে আসে জলে ভেজা দখিনা মলয়,
(হেথা) মহুয়ার মউ খেয়ে মন উচাটন ॥
প্রহরী মোদের ভাই "পুররী" পাহাড়,
"শুশুনিয়া" আগুলিয়া পশ্চিমী দ্বারা,
(ওরে) উত্তরে উত্তরী কানন বিথার,
(দূরে) ক্ষণে ক্ষণে হাতছানি দেয় তালীবন।

এই গানটি আশ্রমের ছেলেদের জন্য লিখেছেন। এই সময় প্রত্যেকটি সভায় তাঁর ডাক পড়ছে, গান গাইবার, আবৃত্তি ও বক্তৃতা করবার জন্য

নজরুলও নরম-চরমপন্থী নির্বিশেষে সকলের সভায় যোগদান করেছেন। যে কালের কথা বলছি, সে কালে দলাদলি থাকলেও ইংরেজ তাড়ানর উদ্দেশ্য ছিল সবারই মুখ্য লক্ষ্য। তাই দলমাত্রের সভ্যই যে কোন সভায় যোগ দিত, বেশির ভাগ বিপ্লবী দলগুলো। যোগ দেওয়ার সুফল হত এই যে ভাল দৃঢ়নিষ্ঠ যুবকদের দলে টানার সুযোগও আসত। কবি নজরুল এই সুযোগটা গ্রহণ করতেন। একদলের লোক আর এক দলের কাজ করে দিতে আজকের মতো দ্বিধা বোধ করত না। এখন হয়েছে "বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি।"

বাঁকুড়া স্কুলডাঙ্গায় বাঁকুড়া কলেজ। প্রিন্সিপাল ছিলেন ব্রাউন সাহেব। ছাত্রদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন তিনি। তাঁর স্ত্রী মিসেস ব্রাউন ছিলেন ছাত্রদের কাছে মায়ের মত। এই ইংরেজ দম্পতি বাঁকুড়াবাসীদের আন্তরিক ভালবাসা পেয়েছিলেন। তাঁরা সুন্দর বাংলা বলতে ও পড়তে পারতেন। কবি প্রথমে গঙ্গাজলঘাঁটি গিয়ে তারপর বাঁকুড়া স্কুলডাঙ্গায় কলেজ প্রাঙ্গনের যুব ও ছাত্র সম্মেলনে যোগ দেবেন ঠিক করে গঙ্গাজলঘাঁটিতে রওনা হলেন। যতদূর মনে পড়ে, মনমোহন বলে একটি যুবক হুগলী চকবাজারের বাড়িতে এসে নজরুলের বাঁকুড়া যাবার ব্যবস্থা ঠিক করে গেছলেন।

নজরুল নির্দিষ্ট দিনে রওনা হন। তিনি তাঁর সঙ্গে আমাকে (প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়) নিয়ে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আমরা যাত্রা করি। সারারাত কবি গানে গানে মাতিয়ে রাখেন যাত্রীদের। বাঁকুড়া স্টেশনে যখন গাড়ি আসে তখন বেলা প্রায় আটটা। সারিবদ্ধ তরুণ সৈনিক মালকোছা মারা, প্রত্যেকের হাতে বড় লাঠি। ছাত্রদের সামনে সৌম্যমূর্তি ব্রাউন ও তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। কবি যখন স্টেশনে পদার্পণ করলেন তখন প্রথমেই ব্রাউন দম্পতি হাত জোড় করে তাঁকে নমস্কার জানালেন। ব্রাউন সাহেবের পিছনে জাতীয় পতাকা হাতে বাহিনীর নেতা ছবির মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। ব্রাউন সাহেব হাসিমুখে কবির হাতে হাত দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতেই পতাকা বাহক পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে বন্দেমাতরম ধ্বনি করলেন, সারিবদ্ধ বাহিনী হাতের লাঠি তুলে কাঁধের উপর রেখে দু'পা এগিয়ে এসে বন্দেমাতরম ধ্বনির সঙ্গে কবিকে স্বাগত করল। কবির মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম বড় বড় চোখ দুটি চক চক করছে আর মুখখানি রক্তাভা ধারণ করেছে।

ব্রাউন সাহেবের হাতে বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ "বিষের বাঁশী" খানা দেখলাম। আর শ্রীমতী ব্রাউনের হাতে ছিল বাজেয়াপ্ত "ভাঙ্গার গান"।

স্বামী-স্ত্রী কবিকে বলেছিলেন, "আপনি বাংলা ভাষায় এমন দরদের সুর এনেছেন যে, আমরা এ বই দুখানি সব সময়ই পড়ে তৃপ্ত হই।" তখনকার দিনে এই বই দুখানিকে ইংরেজ সরকার বোমা, রাইফেল, রিভলবারের চেয়েও বিপজ্জনক বলে মনে করত। এরপর কবিকে স্টেশনের বিশ্রামাগারে নিয়ে গিয়ে জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়। ভিতর থেকে শুনতে পাচ্ছি গেটের বাইরে মন্ত্র গুঞ্জনের মতো স্বেচ্ছাসৈনিকেরা বারে বারে আবৃত্তি করছে।

"ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের
দামাল ছেলে কামাল ভাই"

অপূর্ব আহাওয়া সৃষ্টি করে তুলেছে যুবকদল। কবি সৈনিক-জীবন যাপন করেছেন, তাঁরই লেখা "কামাল পাশা" কবিতার লাইন ছেলেরা বারবার আবৃত্তি করছে। ভাবপ্রবণ কবি ভিতরে বসে শুনছেন আর উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। তিনি নিজেকে আর সামলাতে না পেরে বাইরে ছুটে এসে ছেলেদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

"ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই
অসুরপুরে শোব উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই।
কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই
হো হো কামাল! তুনে কামাল কিয়া ভাই॥"

অপূর্ব ভাবাবেগের সঙ্গে বারংবার জোর দিয়ে আবৃত্তি চলল। বীর যুবকরা এসে উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল। সে এক অপূর্ব পরিবেশ। সকালের স্নিগ্ধ রৌদ্র এসে বীর বালকদের ললাটে আলোকোজ্জ্বল তিলক পরিয়ে দিয়েছে।

এই সময় মাতৃসমা এক মহিলা রক্তচন্দনের ফোঁটা নজরুলের ললাটে পরিয়ে দিলেন। কবি উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলেন। একটি তরুণ যুবক কবিকে একছড়া জবা ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিতেই স্টেশনের সকলে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়ে উঠল।

বাইরে ব্রাউন সাহেবের মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, কবি গাড়িতে না উঠে ছেলেদের সঙ্গে হেটে যাবেন স্থির করলেন। ছেলেরা তখনও 'কামাল পাশা' কবিতাটির লাইন কটা বলে যাচ্ছে। উত্তেজিত যুবকরা হঠাৎ কাঁধে কাঁধে লাঠি দিয়ে মাচা বেঁধে তার উপর কবিকে বসিয়ে উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল—

"ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের
দামাল ছেলে কামাল ভাই" ইত্যাদি।

দাঘ একটানা রাস্তা এইভাবে গিয়ে মিছিল ছাত্রাবাসে শেষ হল। ছাত্রাবাসে যাবার পর উৎসাহী কর্মী ও বিপ্লবীদলের মনমোহন, নরেন সরকার, দেবেন সরকার, ধীরেন ঘোষ প্রমুখের সঙ্গে কবির পরিচয় হয়, শেষে তাঁদের সঙ্গে কবির খুব ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। নরেন সরকার দীর্ঘকাল রাজবন্দীরূপে জেলে কাটিয়েছেন, দেবেন সরকার রাইফেল ফ্যাক্টরি থেকে রাইফেলের অংশবিশেষ সরিয়ে ফেলার অভিযোগে জেল ভোগ করেন। নজরুল সাথী প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় একটি বড় বাক্স ভর্তি

করে বাজেয়াপ্ত 'বিষের বাঁশী', ও 'ভাঙার গান' সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তাঁর বিপ্লবী বন্ধুদের দিয়ে ওখানে প্রায় আটশত কপি বিক্রয় করিয়েছিলেন।

সম্মেলন শেষ হবার পর কবি বিষ্ণুপুর দর্শনে গেলেন। বিষ্ণুপুরের রাজারা এককালে পূর্ণ স্বাধীন রাজা ছিলেন। তাঁদের গড়, কামান, দীঘি প্রভৃতি এখনও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে অপূর্ব স্থাপত্য শিল্পের অলঙ্কারে সুসজ্জিত হয়ে। কবি নজরুল স্বাধীন রাজার রাজবাড়িতে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে মৃত্তিকা চুম্বন করলেন। পরে মাটির তিলক ললাটে নিজের হাতে এঁকে দিলেন। গড়ের অদূরে বিরাট "দলমাদল" (ভাল নাম বোধ হয় "দনুজমর্দন") কামান দেখে তাকে আলিঙ্গন করে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করলেন। পরে রাজা তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করে এক সভার আয়োজন করেন। সেখানে কবি গান ও আবৃত্তির পর সুন্দর একটি বক্তৃতা করেন। 'দলমাদল' কামানে হেলান দিয়ে একটি ফটো তোলান। ছবিটি 'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থে ছাপা হয়।

কৃষ্ণনগরের জীবন

নজরুল যখন হুগলীতে ছিলেন তখন তিনি ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন। সেখানে দর্শক ও আগন্তুকের এত বেশি সমাবেশ হত যে তিনি তাঁদের আতিথ্য করতে গিয়ে খরচ কুলিয়ে উঠতে পারতেন না। পুস্তক প্রকাশকগণও তাঁকে মুষ্টি-ভিক্ষা দিয়ে তাঁদের কর্তব্য সমাধা করতেন। কোন্ প্রকাশক কখন কত টাকা দিলেন তার হিসেব রাখা কবির স্বভাবে ছিল না। হুগলীতে থাকার শেষের দিকে কলকাতার ৩৭নং হ্যারিসন রোডের দোতলায় উত্তর কোণের ঘর থেকে ১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর সাপ্তাহিক "লাঙল"-এর প্রথম সংখ্যা বার হয়। রবীন্দ্রনাথ লাঙল পত্রিকার জন্যও আশীর্বাণী লিখে পাঠান। "ধর হাল বলরাম, আন তব মরুভাঙা হাল। "বল দাও, ফল দাও, —স্তব্ধ হোক্ ব্যর্থ কোলাহল।" ঐ পত্রিকার পরিচালক ছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কৃষ্ণনগরের তৎকালীন তরুণ কংগ্রেস নেতা ৺হেমন্ত কুমার সরকার এবং এঁদের সাথে আবদুল হালিমকেও সেখানে দেখেছি তখন। কবি নজরুল হুগলীর বিপ্লবী চক্র থেকে ধীরে ধীরে সরে গিয়ে সাম্যবাদী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। হুগলীর কর্মী ও নেতাদের প্রয়োজন তখন ফুরিয়ে যাওয়ায় কবির দিকে তাঁরা আর তত নজর দিচ্ছিলেন না। তাই ১৯২৫-এর শেষের দিকে তাঁর হুগলীর চকবাজারের বাড়িতে হেমন্ত সরকার, আবদুল হালিম প্রমুখকে তখন বেশি করে দেখা যাচ্ছিল।

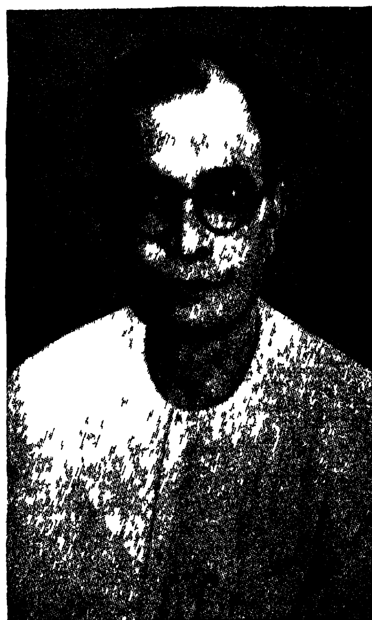
মনে পড়ছে এর পূর্বেই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে হেমন্ত বাবু নির্বাচিত হয়েছিলেন। নদীয়ার কৃষকদের ভোটে তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন।

পরে "১৯২৬ সালে কুতবুদ্দীন আহমদ্, হেমন্ত কুমার সরকার ও শামসুদ্দীন হোসায়নের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে স্থির হয় যে, তাঁদের উদ্যোক্তা হয়ে একটি দল গঠন করবেন। ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে এই দলটি কলকাতায় গঠিত হয়। প্রথমে তার নাম হয় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত লেবর স্বরাজ পার্টি (The Labour Swaraj Party of the Indian National Congress)।"[১] হুগলীতে থাকতে গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে, বক্তৃতা দিয়ে ম্যালেরিয়ায় ভুগে কবি নজরুলের স্বাস্থ্যের হানি হয়। সেই জন্য তার স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাই হেমন্তবাবু কবির স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য এবং আর্থিক অভাবের পীড়ন থেকে তাঁকে মুক্ত করবার জন্য কবিকে হুগলী থেকে কৃষ্ণনগরে সপরিবারে বাস করার আমন্ত্রণ জানান। কবি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যান। সেইজন্য নজরুল ১৯২৬ সালের ৩রা জানুয়ারী হুগলী ত্যাগ করে কৃষ্ণনগরে রওনা হন। কৃষ্ণনগরে নজরুল

(১) কাজী নজরুল ঃ স্মৃতি কথা—মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, পৃঃ ৩৪৪



আম্রকুঞ্জে গজল গান রচনায়



নজরুল বন্ধু

কবি দার্শনিক চিত্রশিল্পী সাহিত্যিক

শ্রী জীস্পতি ভট্টাচার্য



শ্রীমতী প্রমীলা নজরুল



শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী

প্রথমে হেমন্তবাবুদের গোয়ালপটি মহল্লার মদন সরকার গলিতে তাঁদের পুরাতন বাড়িতে সপরিবারে ওঠেন। হেমন্তবাবু নিজে একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রায় চাঁদ প্রেম চাঁদ পাশ করেন এবং নেতাজী সুভাষের সহপাঠী, সহকর্মী ও দেশবন্ধুর কর্মসচিব ছিলেন। দেশবন্ধু কৃষ্ণনগরে বেশ কয়েকবার গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে গেলে হেমন্তবাবুর বাড়িতে উঠতেন, খেতেন ও থাকতেন। হেমন্তবাবু নিজে ছিলেন তৎকালের সুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক, তাই নজরুলের মূল্য দরদী বন্ধুর মত হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।

হেমন্তবাবু তাই নজরুলকে বলেছিলেন—

"তোমার লেখার ভাবনা, সংসারের ভাবনা ভাবতে হবে না, সে ভাবনা আমার।" হেমন্তবাবু শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ বেশ কয়েক বৎসর তাঁর কথা রেখেছিলেন, ঠিক অভিভাবকের মন নিয়ে। দীর্ঘদিন হেমন্তবাবু বিদ্রোহী কবিকে আপন একান্নবর্তী পরিবারের মতই দেখেছিলেন। নজরুলের বন্ধুদের মধ্যে হেমন্তবাবু ছাড়া এমন করে নজরুলকে উপবাসের হাত থেকে আর কেউই বাঁচাননি।

হেমন্ত সরকার ঘন ঘন হুগলীতে এসে বহু চেষ্টা করে নজরুলের ঋণের হিসাব নিয়ে গেলেন। তিনি কবি ভক্তদের সঙ্গে মিলেমিশে তাদের বেশ প্রিয় হয়ে উঠলেন। আপন করে নেবার এই ক্ষমতাটা হেমন্তবাবুর খুবই ছিল। পরে টাকা সংগ্রহ করে কবির সমস্ত দেনা পরিশোধ করে কবিকে কৃষ্ণনগর নিয়ে গেলেন।[২]

যেদিন কবি কৃষ্ণনগরে রওনা হলেন সেদিন হুগলীর কোন নেতা বা কর্মী তাঁকে গাড়িতে তুলে দিতে স্টেশনে এলেন না। কারণ রাজনৈতিক প্রয়োজন মিটে যাবার জন্য তাঁদের কবির প্রতি আকর্ষণ কমে গিয়েছিল। শুধু দেখেছিলাম কবি সুবোধ রায়ের পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ পিতা ডাঃ ৺গুরুপ্রসন্ন রায়কে। তিনি নৈহাটীতে গিয়ে কবির সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন নৈহাটীর কবি শ্রীখগেন ঘোষ ও হুগলীর তরুণ ভক্তদের মধ্যে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। আমি কবি নজরুলকে হুগলী থেকে হারাচ্ছিলাম বলে ব্যথায় মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিলাম। বৃদ্ধ গুরুপ্রসন্ন রায় মহাশয় ছিলেন পরম ধৈর্যশীল, জীবনের ঘাত প্রতিঘাতেও তিনি থাকতেন অবিচল, কিন্তু সেদিন তিনিও ভাবাবেগে সজল চোখে কবিকে বিদায় দিয়েছিলেন।

কবি কৃষ্ণনগরে এলেন হেমন্তবাবুর সঙ্গে। হেমন্তবাবুর মাতা ৺নীরদবরণী দেবী নজরুল ও তাঁর পরিবারের লোককে মায়ের মত ব্যবহার দিয়ে অভ্যর্থনা করে তাঁর বাড়িতে বরণ করে নিলেন। তারপর তারই গোয়ালপটির বাড়িতে কবিকে আশ্রয় দিলেন। শুনেছি কবিকে ঐ বাড়ির ভাড়াও দিতে হত না। খাবার খরচাও সরকার বাড়ি থেকে সরবরাহ করা হত।

(২) কবি সুবোধ রায়ের কাছে শুনেছি হেমন্তবাবুকে এই টাকাটা হুগলী জেলার উত্তর পাড়ার জমিদার শ্রীঅমর মুখোপাধ্যায় দিয়েছিলেন।

কবি কৃষ্ণনগরে এসে উঠলেন। এই সময় সাপ্তাহিক 'লাঙলে'র সম্পাদনা করেন কবি। পরিচালক ছিলেন হেমন্তবাবু ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। তাঁরা কৃষক আন্দোলনকে সেই সময়ে প্রসারিত করে চলেছিলেন। নিখিলবঙ্গ ধীবর আন্দোলনের সৃষ্টি এই সময়ে বেশ জমে উঠেছিল। ১৩৩২ সালের শেষের দিকে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরে "নিখিল বঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক ধীবর সম্মেলন" হয়েছিল। এই সম্মেলনের সভাপতি কে হয়েছিলেন মনে নেই, কিন্তু উদ্বোধক হিসাবে নজরুলকে দেখতে পাই। তিনি ধীবরদের জন্য ১৯৩২ সালের ২৪শে ফাল্গুন এই গানটি লেখেন।[৩]

"আমরা নীচে পড়ে রইব না আর
শোনরে ও ভাই জেলে
এবার উঠবরে সব ঠেলে।
ঐ বিশ্ব সভায় উঠল সবাই রে
ঐ মুটে মজুর হেলে।
আজ সবার গায়ে লাগছে ব্যথা
সবাই আজি কইছে কথা রে।
আমরা এমনি মড়া পাইনে কিছু
মড়ার লাথি খেলে।"

দীর্ঘ চার পৃষ্ঠায় লেখা এই গানটিতে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের জেলেদের মধ্যে বেশ একটা একতার সাড়া জেগেছিল।

এর একমাস আগে অর্থাৎ ২০শে মাঘ 'শ্রমিকদের গান" লেখেন। এ গানটিও বেশ বড়। এতে লেখেন।

"ওরে ধ্বংস পথের যাত্রীদল্
ধর্ হাতুড়ি তোল্ কাঁধে শাবল।
হাতের সুখে গড়েছি ভাই
পায়ের সুখে ভাঙব চল্।

* * *

ও ভাই আমরা কলিকালের কুলি
কলুর বলদ চক্ষে ঠুলি
হীরা পেয়ে রাজ শিরে দিই তুলি রে
আজ মানব কুলের কালি মেখে
আমরা কালো কুলির দল্

---

(৩) নজরুল পরিচালিত "সাপ্তাহিক লাঙলের" ১২শ সংখ্যা, ৪ঠা চৈত্র, ১৩৩২ অর্থাৎ ১৯২৫ সালে মার্চ মাসে প্রকাশিত।

ঐ শয়তানী চোখ কলের বাতি
নিবিয়ে আয়রে ধ্বংস-সাথী।
ধর হাতিয়ার, সাম্‌নে প্রলয় রাতি রে!
আয় আলোক-স্নানের যাত্রীরা আয়
আঁধার নায়ে চড়্‌বি চল্‌।
ধর্‌ হাতুড়ি, তোল্‌ কাঁধে শাবল।।"

"১৯২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত কৃষ্ণনগরে অনেকগুলি সম্মেলন হয়েছিল। তার প্রথমটি ছিল "নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলন।"[৪] এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। নজরুল এই সভায় "শ্রমিকের গান"-খানি গেয়ে সভা উদ্বোধন করেন। শ্রমিক আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলন সবই তখন কংগ্রেসের ছত্রছায়াতলে চলত। কিন্তু কৃষ্ণনগরের এই নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলনেই প্রথম শ্রমিক আন্দোলনকে কংগ্রেসের কব্জা থেকে মুক্ত করে "দি ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজেন্টস্‌ পার্টি" নাম দিয়ে ব্যাপক সংগঠন তৈরি হয়। নজরুল এই পার্টির কার্যকরী সমিতির সভ্য হয়েছিলেন। এই সময় কৃষ্ণনগরের কংগ্রেস সভ্যরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন কৃষ্ণনগরে করার ব্যবস্থা করলেন। নজরুল তখন কংগ্রেস সভ্যই হননি, তার কর্মকর্তা রূপে কাজ করছিলেন। বিশেষ করে সেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগঠন পরিচালনায়।

এই প্রাদেশিক সম্মেলনের পূর্ব বৎসরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরলোক গমন করে[৫] বাংলাকে দেউলে করে যান। দেশবন্ধু-শূন্য বাংলায় তখন দুই দিকপাল নেতা—যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্র। দুজনের মধ্যে তখন অসম্ভব দলাদলি। এদিকে "বৃহৎ পঞ্চক" (Big five)[৬] দলাদলিতে উসকানি দিচ্ছেন। বাংলার বাহিরের নেতারা এই সুযোগে বাংলার শক্তিকে পঙ্গু করবার চেষ্টা করছেন। ইংরাজ সরকার এই অবস্থা দেখে উল্লসিত। এক কথায় বাংলার রাজনৈতিক জগতে মাৎস্যন্যায়ের ষড়যন্ত্র চলছে।

এরই মধ্যে বিশেষ তোড়জোর করে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের ব্যবস্থা হল।

প্রাদেশিক সভার সভাপতি হলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল।

১৯২৬ সালের মে মাসে অর্থাৎ ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি কৃষ্ণনগরে ছাত্র ও যুবকদের প্রাদেশিক সম্মেলনও হয়েছিল। এই সম্মেলনের সভানেত্রী ছিলেন কবি সরোজিনী নাইডু। কবি নজরুল এই সম্মেলনেরও সেচ্ছাসেবক বাহিনীর পরিচালক ও সভা-উদ্বোধক ছিলেন। তার বিখ্যাত

(৪) কাজী নজরুল ঃ স্মৃতি কথা—মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।
(৫) ১৯২৫ সালের ১৫ই জুন বৈকাল ৫টায়।
(৬) Big five—শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীকিরণশঙ্কর রায়, বাবু তুলসী গোস্বামী ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

ছাত্রদলের গানটি এই সভারই উদ্বোধনী সঙ্গীত। এই সভা অবশ্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের পূর্বদিনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভার প্রধান অতিথি ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। যথারীতিতে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শ্রীশাসমল উদ্বোধনী বক্তৃতা করতে উঠে বর্তমান ছাত্রদের উপর কিছু কটূক্তি করেন।

নজরুলের 'সর্বহারা' প্রথম সংস্করণ গ্রন্থে দেখেছি, "ছাত্রদলের গান" তিনি লিখেছিলেন "কৃষ্ণনগরে, ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ সালে" আর "কাণ্ডারী হুশিয়ার" ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্বোধন সঙ্গীত। এর রচনা কাল হল "কৃষ্ণনগর, ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩।" এই লেখাব অনুপাতেই আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে প্রাদেশিক জাতীয় সম্মেলন ও প্রাদেশিক ছাত্র ও যুব সম্মেলন আগে পরেই হয়েছে। অনেকে এ বিষয় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে প্রাদেশিক জাতীয় সম্মেলনের অনেক পরে ছাত্র সম্মেলন হয়েছিল।

প্রাদেশিক সভার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল বাজবাড়ির মস্তবড় পূজা মণ্ডপে। ছাত্র-যুব সভা হয়েছিল টাউন হলে। মনমোহন ঘোষের বাড়িতে অতিথিদের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। ছাত্র ও যুব সম্মেলনেব জন্য নজরুল লেখেন "ছাত্রদলের গান"—

"আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
(আমবা) তাজা খুনে লাল করেছি
সরস্বতীর শ্বেত কমল।" ইত্যাদি

১৩৩৩ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ এই গানটি লেখেন। বক্তা বীরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতায় যুবকের দল অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে তাঁর উপর মারমুখো হয়ে উঠে। তখন কবি নজরুল ও সরলা দেবীচৌধুরানী তাঁকে গোলমালের ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে যান। সেই সময় দেখেছিলাম যুবকদের উপর কবির কি অপূর্ব প্রভাব।

কৃষক সভার একটি লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। যার কথা আজও ভুলতে পারিনি। তিনি হলেন বহুদিন পূর্বের লুপ্ত "কমরেড" পত্রিকার সম্পাদক কুতুবউদ্দিন আহমদ। তাঁর ছিল মস্ত বড় দেহ, বিরাট ভুঁড়ি আর তার সঙ্গে স্নেহময় উদার প্রাণ। তাঁকে দেখলে মৌলনা সৌকত আলীর কথা আমার মনে পড়ে যেত। আহমদ সাহেবকে কবি নজরুল রসিকতা করে "কুম্ভীর মিঞা" বলে ডাকতেন। এই সভায় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদও ছিলেন। মুজফ্‌ফর সাহেব তৎকালীন কৃষক আন্দোলনের ছিলেন মধ্যমণি। প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার প্রয়োজনে এবং নজরুলের গোয়ালপটির বাসা ঠিক হয়ে যাওয়ার জন্য আমি হুগলি থেকে রওনা হয়ে নৈহাটী স্টেশনে গিয়ে শ্রদ্ধেয় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, কুতুবউদ্দীন আহমদের সঙ্গে এক সঙ্গে কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই নজরুলের সঙ্গে প্রাদেশিক

সম্মেলনে গিয়েছিলাম। এই সময় ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর শয়তানিতে বাংলার আকাশ বাতাস সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল।

রাজবাড়ির পূজার দালানে লোক গম্‌গম্‌ করছে। কিন্তু সকলেরই মুখ থম্‌থমে। সম্মেলন হবে কি হবে না তা বোঝা যাচ্ছে না। মাৎস্যন্যায়ের কল্যাণে তখন সকলেই নেতা। কেউ কারুর কথা শুনতে চায় না। এই অবস্থার মধ্যে নজরুলের উদ্বোধন সংগীত শুরু হল। চিত্তরঞ্জন নেই। দেশ-নেতা শূন্য। এই অবস্থার সঙ্গে খাপখাইয়েই কবি গানটি লিখেছিলেন।

নজরুল তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে গান শুরু করলেন—

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।
দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত?
কে আছো জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারি দিতে হবে পাড়ি নিতে হবে তরী পার।"

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাংলার রাজনীতির রূপ কবির এই গানের মধ্যে অপূর্ব রূপে ফুটে উঠেছে। শ্রোতারা সচকিত হয়ে শুনল। অশান্ত জন সমাগম নজরুলের গান স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। কিন্তু দলাদলির বিষের অস্থিরতার একটা প্রকাশ মাঝে মাঝে সর্পিলগতির মত ঝেঁকে ঝেঁকে উঠছিল। কবি গেয়ে চললেন—

"অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরন
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি-পণ।
"হিন্দু না ওরা মুসলিম" ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।"

কবি 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গানটি বারংবার গেয়ে আবেদন জানালেন সকলকে।

কিন্তু হায় দেশবন্ধুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তখনকার মত কাণ্ডারী শূন্য হয়েছিল বাংলা দেশ। হুঁশিয়ার করবে কাকে? গান শেষ হবার পর সভার মূল সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ শাসমল বলতে উঠলেন। বাধার পর বাধা এল। শাসমল মহাশয় সভা ছেড়ে চলে গেলেন। গোলমালের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে কাজ চালিয়ে নেবার জন্য সভাপতিত্বে বরণ করলেন। কিন্তু তিনিও হার মানলেন।[৭] "দেশপ্রিয়" যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার সভাপতি। "দৈনিক নবযুগ" পত্রিকার

(৭) Indian Annual Register, January to June 1926—পৃঃ ৮-১২ National Library থেকে নেওয়া।

সম্পাদক মৌলনা আহমদ আলীও তাঁর সরস ভাষায় আবেদন করে গোলমালকারীদের শান্ত করতে পারলেন না। কোথা থেকে কি যে হল, সম্মেলন ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। শূন্য সভাস্থলে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রইল ছাতা, রকমারি জুতো, লাঠি, গান্ধীটুপি প্রভৃতি।

আত্মত্যাগী শহীদ অনন্তহরি চক্রবর্তী, সন্তোষকুমার মিত্র, গোবিন্দ দত্ত, আবদুল মান্নান প্রমুখের কাজ দেখে কর্মী ও নেতার রূপে কত প্রভেদ তা তখন বুঝেছিলাম। এই সময় তারক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল, তখন তাঁর একটা "খদ্দর ভাণ্ডার" ছিল। সম্মেলনে নজরুলের বিখ্যাত বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ "বিষের বাঁশী" ও "ভাঙার গান" প্রায় হাজার দেড়েক বিক্রি করেছিলাম। বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবার পর নজরুল আমার কাছে প্রায় দুহাজার কপি বই গোপনে রেখেছিলেন। আমি সম্মেলেন যাবার সময় নিয়ে যাই।

সম্মেলন চুকে গেল, নির্বাচনের হিড়িক আগেই শেষ হয়েছে। হেমন্তবাবু কলকাতায় এলেন। নজরুল কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় যাওয়া আসা করেন। ৩৭নং হ্যারিসন রোডের বাড়িতে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের আড্ডা রয়েছে। "লাঙল" বন্ধ হয়ে গেছে। তার বদলে বার হচ্ছে সপ্তাহিক "গণবাণী"। ১৯২৬ সালের আগস্ট মাসে গণবাণী প্রকাশিত হয়। এই কাগজে নজরুল "রক্ত পতাকার গান" লেখেন ও "ইণ্টারন্যাশন্যাল সঙ্গীতে"র অপূর্ব অনুবাদ এবং "জাগর সূর্য্য" প্রভৃতি গান প্রকাশ করেন। তারপর তিনি হুগলীর কংগ্রেসী বালক নেতা শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের "অগ্রদূত" কাগজের আশির্বাণী "পথের দিশা" লিখে দেন। গণবাণী অফিসেই শ্রীসৌমেন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে শচীন্দ্রের আলাপ হয়। সৌমেনবাবু স. ন. ঠ নাম দিয়ে গণবাণীতে দুএকটা প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন বলে মনে পড়ছে। যতদূর মনে পড়ে সৌমেন্দ্রবাবু তখন খালি পায়ে থাকতেন ও খদ্দরের মোটা ধুতি ও গেরুয়া রঙের চাদর, পাঞ্জাবী পড়তেন। এই গণবাণী অফিসে আরও দুটি লোককে দেখেছিলাম—সামসুদ্দীন সাহেব ও বিপ্লবী নলিনী গুপ্তকে। অল্পদিন পরেই সামসুদ্দীন সাহেব মারা যান। তিনি একনিষ্ঠ দেশভক্ত ছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট নেতা হালিমের বড় ভাই। নলিনী গুপ্ত হালিম সাহেবের সঙ্গে নজরুলের হুগলীর বাড়িতেও যেতেন। তখন বঙ্গবাণীতে ধারাবাহিক "পথের দাবী" প্রকাশিত হচ্ছিল। দল বেঁধে 'পথের দাবী' নজরুলের হুগলীর বাড়িতে পড়া হত।

হেমন্তবাবুর বাড়িতে নজরুলের অভাবের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়। এই সময় থেকে পূজার সানাই চারিদিকের আকাশ বাতাসকে মাতিয়ে তুলেছে। কবির অভ্রভেদী অভাব কবির মনকে পীড়িত করে তুলেছে। নিজের অভাবের সঙ্গে দেশের অভাবি লোকেদের অবস্থা ভেবে পূজার আনন্দ আর তাঁকে খুশি করতে পারছে না। তাঁর প্রকাশকরাও এই সময় সবাই হাতগুটিয়ে বসেছে। ২৪ শে আশ্বিন ১৩৩৩ সালে তিনি "দারিদ্র্য" কবিতা লিখলেন—

"হে দারিদ্র্য তুমি মোরে ক'রেছ মহান
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
কণ্টক মুকুট শোভা। দিয়াছ তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস ,
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি, বাণী ক্ষুরধার
বীণা মোর শাপে তব হল তরবার।

* * *

পুষ্পাঞ্জলী ভরি দুটি মাটি-মাখা হাতে
ধরণী এগিয়ে এসে দেয় উপহার।
ও যেন কনিষ্ঠ কন্যা দুলালী আমার।
সহসা চমকি উঠি! হয়ে মোর শিশু
জাগিয়া কাঁদিছ ঘরে খাওনিক কিছু
খালি হাতে সারা দিন তাপস নিষ্ঠুর
কাঁদ মোর ঘরে নিত্য তুমি ক্ষুধাতুর

পারি নাই বাছা মোর , হে প্রিয় আমার
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে—মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি। দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি। কে বাজাবে বাঁশী ?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি ?
কোথা পাব পুষ্পাসব ?—ধুতুরা গেলাস
ভরিয়া করেছি পান নয়ন নির্য্যাস।
আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই
ও যেন কাঁদিছে শুধু—নাই কিছু নাই।"

যখন নজরুলের দিকে আর কেউ বড় ফিরে তাকায় না, তখন কৃষ্ণনগরের স্নেহশীল অধ্যাপক শ্রীহেম দত্তগুপ্ত কবিকে তাঁর বাড়ির কাছে নিয়ে আসেন। সে বাড়িটার নাম ছিল "গ্রেস কটেজ"। বর্তমানে বৈদ্যুতিক সরবরাহের কারখানা হয়েছে। অধ্যাপক শ্রীহেম দত্তগুপ্ত তাঁকে গোপনে সাহায্যও করতেন। সরকারী কাজ করতেন বলে প্রকাশ্যে কোন কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা। সুভাষচন্দ্র ও হেমন্তবাবুকে তাঁর ছাত্র থাকা কালীন দত্তগুপ্ত খুব স্নেহ করতেন। প্রিয় ছাত্র দুটিকে নিয়ে নিজের খরচায় কয়েক-বার তীর্থ ভ্রমণেও গিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র দত্তগুপ্তের স্নেহের আকর্ষণে মাঝে মাঝে কৃষ্ণনগরে যেতেন।

এই গ্রেস্ কটেজেই কবি লেখার একটা নূতন পথ ও নূতন সুর পান, তা হল 'গজল গান'। বাংলা শব্দকে ফারসী ভঙ্গিতে উচ্চারণ করার রীতি তিনিই সুষ্ঠু ভাবে আনেন। অবশ্য এর আগেও কবি সত্যেন দত্ত চেষ্টা করেছিলেন। কবি নজরুল দেখান, বাংলা এমন একটা ভাষা যাকে প্রয়োজন বোধে যে কোন রূপ দেওয়া যায়। "বাগিচায় বুলবুলি তুই", "আমারে চোখ ইসারায় ডাক দিলে হায়" ইত্যাদি ধরণের গান লিখতে লাগলেন। কৃষ্ণনগরের অভাব সম্বন্ধে শ্রীব্রজবিহারী বর্মনকে লেখা নজরুলের কতক-গুলি চিঠি "অভ্যুদয়" মাসিক এ বেরিয়েছিল। তা পড়লেই বোঝা যাবে প্রকাশকদের কাছে টাকা পাওনা সত্ত্বেও তিনি কত কষ্ট পেয়েছেন। অবশ্য ব্রজবাবু তাঁর সাধ্য মত কবিকে টাকা দিয়েছেন, আর অধ্যাপক দত্তগুপ্তের সাহায্যে তাঁর কৃষ্ণনগরের দিন একরকম করে কাটছিল।

এত অভাব সত্ত্বেও নজরুল দমে যাননি! অসুখ ও অভাবের মধ্যেও গান গাওয়া, লেখা, সভা সমিতি করা কোনটাই থেমে যায়নি।

একদিন কবির সঙ্গে ঘুর্নীনদীর ধারে সাহিত্যিক চন্দ্রশেখর করের বাড়ি যাই। সেখানে গান ও আবৃত্তির পর কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প দেখবার জন্য কবি উৎসাহিত হয়ে উঠেন। নব্বই বৎসর বয়স্ক মৃৎশিল্পী যদুপালের বাড়িতে আমরা আসি। এই শিল্পীকে রানী ভিক্টোরিয়া বিলাতে নিয়ে যেতে চান, কিন্তু শিল্পী দেশ ছেড়ে যান নি।[৮] শিল্পী যদুপাল কবির আবৃত্তি, গান ও উদাত্ত কণ্ঠ শুনে তাঁকে মাতৃভক্ত সাধুদের সঙ্গে তুলনা করেন। ঐ বয়সেও শিল্পী যদুপাল কথা বলতে বলতে ঘন্টাদ্বয়েকের মধ্যে কবির একটি আবক্ষ মূর্তি গড়ে দেন। কবি নজরুলও তাঁকে "প্রণামী" নামে একটি আট লাইনের কবিতা লিখে দেন। সেই সুন্দর কবিতাটি কোথাও দেখি না। অতঃপর দুই পথের শিল্পী ভক্তিমূলক চিত্র ও মূর্তি শিল্প নিয়ে আলোচনায় তন্ময় হয়ে যান। বিদায় নেবার সময় নজরুল যদুপালের পায়ের ধুলো নিয়ে আর্শীবাদ চান।

কৃষ্ণনগর থেকে কবি প্রায় ছন্নছাড়া অবস্থায় সপরিবারে কলকাতায় আসেন "মাসিক সওগাত" এর সম্পাদক নাসির উদ্দীনের আশ্রয়ে তার ১১ নং ওয়েলেসলি স্ট্রীটের ছাপাখানার একতলার একখানি ঘরে।

(৮) যদুপাল মহাশয় দশ মিনিটের মধ্যে কাঁচা মাটির তাল নিয়ে ভিক্টোরিয়ার একটি মূর্তি গড়ে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। এঁরই নাতি প্রখ্যাত শিল্পী জি. পাল নজরুলকে পরবর্তী কালে তাঁর হরি ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িস্থত কালী মূর্তি তৈরি করে নজরুলকে উপহার দিয়েছিলেন। জি. পাল নজরুলের ছেলেবেলার বন্ধুও ছিলেন।

(চিঠিপত্র)

কৃষ্ণনগর
১০-২-২৬

কল্যানীয়েষু,

স্নেহের শচীন! তোর কোন চিঠিও পাইনি, এলিও না। এলে খুব খুশী হতুম। আমার সব কথা প্রাণতোষের কাছে শুনবি।

মার্চ্চে গীষ্পতি আস্‌বে—তখন অবশ্য আসিস্‌। তুই নাকি খুব ভাল কবিতা লিখেছিস আবও কতকগুলো। আসবার সময় সবগুলো নিয়ে আসিস্‌। ভুলিস্‌নে যেন।

যে জোয়ালে গর্দান দিয়েছিস, সেটার প্রতি যেন অশক্তি না জন্মে তোর—এই আমার বড আশীষ। আমাদের সকলের স্নেহাশীষ নে। ইতি—

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
কাজী দা

কৃষ্ণনগর
৯-১০-২৬

পবম স্নেহভাজনেষু,

স্নেহের ব্রজ! আজ সকাল ছয়টায় আমার একটি পুত্র সন্তান হ'য়েছে। তোমার বৌদি আপাততঃ ভাল আছে। আমিও আজ সকালে ফিরে এলাম যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, দৌলতপুর পভৃতি ঘুরে। টাকার বড্ড দরকার। যেমন ক'রে পার পঁচিশটি টাকা আজই টেলিগ্রাম মণিঅর্ডার ক'রে পাঠাও। তুমিত সব অবস্থা জান। বলেও এসেছি তোমায়, কেবল "সঞ্চিতার" প্রুফ পেলাম—সর্ব্বহারা'র শেষ প্রুফ কই? "সর্ব্বহারা" কখন বেরুবে, যেদিন বেরুবে অন্ততঃ ৫০ কপি আমায় পাঠিয়ে দেবে।

ভুলোনা যেন। টাকা কর্জ্জ ক'রেও পাঠাও। স্নেহাশীষ নাও। পত্র দিও। ইতি—

তোমার কাজী দা

২০-১২-২৬

স্নেহের ব্রজ।

আজও আমি শয্যাগত, বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি রোগের ও অন্যান্য চিন্তার জ্বালায়। চিন্তার মধ্যে অর্থ চিন্তাটাই সব চে'য় বড়। কী করে যে দিন যাচ্ছে ভগবান জানেন। তোমার প্রেরিত ··নর টাকা পেয়েছি। পঁচিশ টাকা চেয়েছিলুম অবশ্য, তোমারও বিপদ আপদের কথা শুনলাম। আরোও

যদি পাঠাতে পার আমার এই দুর্দ্দিনে বড় উপকৃত হ'ব। তুমি ছোট ভায়ের মত, তোমাকে বেশী কি লিখব। তোমার অন্যান্য খবর দিও। "সর্বহারা" কাটছে কেমন ?

তোমার কাজীদা

কৃষ্ণনগর
৩-১-২৭

স্নেহভাজনেষু

স্নেহের হাবুল ! তুই এবার এলিনে, আসলে বড় খুশী হতুম। তোকে দেখবার ইচ্ছা ছিল, দেখিনি অনেকদিন তোদের ; কিন্তু তোর চেয়েও তোর মাঝে যে কবি শিশুটি দিনের দিন বড হ'য়ে উঠছে তাকে দেখবার বেশী ইচ্ছা ছিল। একদিন তাকে দেখবই, তখন হয়ত সে রীতিমত ঘোড় দৌড় করছে দেখব। কিন্তু মানুষের ঘোড়দৌড় দেখার চেয়ে শিশুর হাঁটি-হাঁটি পা-পা দেখতে অধিক ভাল লাগে। প্রাণতোষকে দেখলাম, তার মনের কবি বোধ হয় তোর অগ্রজ। তার কবি শিশু এখন বেশ চলতে শিখেছে, আগে পা পিছ্‌লাত এখন পা শক্ত হয়েছে। চলায় মিল ছিল না আগে, এখন দুইটা চরণই বেশ মিলে মিশে চলছে। ওর দুঃখের দিন ঘনিয়ে এল ব'লে। অর্থাৎ ও কবি ব'লে পরিচিত হ'ল ব'লে। কবি হওয়ার মত দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে আর নেই বলেই একথা বললুম। এদেশে কবির কবিতার সব শব্দ-গুলো পাট্‌কেল হয়ে ফিরে আসে, আর তা আঘাত করে তার বুকে। অবশ্য সব কবিই যে "ইট" লেখে, আর তা পাট্‌কেল হয়ে ফিরে আসে, তা নয়। যারা ফুল ফোটায় তাদের মাথাই সবচেয়ে অ-নিরাপদ।

তোদের একটা "মুশায়েরা"র বৈঠক বসে তোর অল্পপরিসর কামরাটিতে —শুনলুম। বড় খুশী হয়েছি শুনে। তোদের আরম্ভ এমনি করেই হোক। বিপুল জগৎকে জানবার আকাঙ্ক্ষা শিশুর দুরন্ত চলায় গোপন থাকে। পা যখন হবে শক্ত তখন সে আপনি টেনে নিয়ে যাবে শিশুকে বিরাট বিস্ময়ের অন্তরে। তোদের কাপের চায়ের রসটুকু প্রাণের চুয়ানরসে মদির হ'য়ে উঠে যে, একি কম সৌভাগ্যের কথা ? আরম্ভের এই আনন্দ মাঝখানে গিয়ে তিক্ত হ'য়ে ওঠে, ঈর্ষায় বিস্বাদ হ'য়ে ওঠে,—এ আমরা অনুভব করছি যারা মাঝখানে এসে পৌঁচেছি। আমাদের আরম্ভের আনন্দ তোদের চেয়ে কম ছিল না। অন্ততঃ দুরন্তপনা কম ছিলনা। ফুল ফোটার আনন্দ যদি বিশ্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয় তা হলে তার পরিণতি ট্র্যাজিডিতে। আনন্দ-লোকে দ্বন্দ্ব নেই ; প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। এ যারা ভুলে, তারা চালের গুদাম খুলুক গিয়ে, ফুলের বেসাতী না ক'রে। তোদের চলা আজও শুরু হয় নাই—আজো তোদের ফোটার আনন্দ কুঁড়ির প্রাকারে গুমরে মরছে—তাই এই সাবধান ক'রে দেওয়া। উপদেশের বেত উচাঁইনি আমি।

তোর খাঁটুনি দুনো। তোকে খুব আত্মরক্ষা করে চলতে হবে। এটা আমি খুব বুঝি যে, কবিতা গান লেখা যায় হয়ত দিনে একশোটা, কিন্তু হিসাব লেখা যায় না একপাতা। ফুল কুড়ান যায় ঝুড়িঝুড়ি, কিন্তু বেগুন

বোধ হয় এক ঝুড়ির বেশী তোলা যায় না। অবশ্য আমার এ মত তাঁদের জন্য নয়, যাঁরা কেয়া ফুলের চেয়ে ভুট্টাকে বেশী দামী মনে করে।...কবিতা লেখার একটা সোয়াস্তি আছে, কেননা তা লেখা যায় কাছা খুলে কিন্তু হিসাব লিখতে হয় কাছাকোছা এঁটে, যেন একটা পাইও এধার ওধার না হয়।

এই হিসাবের আর বে-হিসাবের দুটো বিপরীত মুখেই যে তুই কি ক'রে মিল খাইয়েছিস, তা ভেবে আমি অবাক হই। তার ওপর তুই পড়ছিস, লিখছিস, হিসাব লিখছিস এই তিন শঙ্কায় প'ড়ে ত্রিশঙ্কু হয়ে পড়িসনে যেন, এই আশির্ব্বাদ করি। তোর হিসেবের ফিরিস্তি গরমিল হোক বা চুলোয় যাক—আমার তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু কাব্যের ফেরেশ্‌তা বেঁচে থাকুক—এ প্রার্থনা আমি চিরকাল করব। অবশ্য ফেরেশ্‌তা কখনও পটল তোলেনি, তুলেছে মুদি বা বেনে। ফেরেশ্‌তা অমর কিন্তু অনেক পটলা বেনেকে পটল তুলতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

পড়া ছাড়িস নে তুই, তা হ'লে তোকে লেখায় ছাড়বে। অবশ্য পণ্ডিত হ'তে আমি বলছিনে, কিন্তু আমার আনন্দকে প্রকাশের পুঁজি ত আমার থাকা চাই। পণ্ডিত জমায়, সে কৃপণ; কবি বিলোয়, সে দাতা। কবি নেয়, কিন্তু সে দান করে নদীর মত সে চলে গাইতে গাইতে, দান করে করে দুপাশে ফুল ফুটিয়ে। পণ্ডিত নেয়, মাড়োয়ারীর ভুঁড়ির মত, ওর পরিধি শুধু বেড়েই চলে নিয়ে নিয়ে, ও আর দিতে চায় না, তাই ওর মরণং ধ্রুবঃ। মাড়োয়ারীর নিলে সে নালিশ করে, নদীর নিলে সে খুশী হয়। জরদ্‌গবের মত তোর পেটটা গজগজ করুক বিদ্যেয়, এ আমি বলছিনে, তাই বলে জানতে শুনতে যতটুকু জানা শোনার দরকার—তা থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখবি কেন? কত ফুল, কত পাখী, কত গান, কত রঙ্‌ এ আমি উপভোগ করব না?

চিঠিটা বড় হয়ে যাচ্ছে—অর্থাৎ এটা হয়ে উঠছে প্রবন্ধ—যাকে কবিরা ভয় করে। ক্লাসে ওর দরকার আছে, কিন্তু মুশায়েরায় ওর প্রবেশ নিষেধ। ফুলের ভাষা, কুঁড়ির ব্যথা, পাতার কথা, লতার আবেগ, তরুর বাণী আমরা শুনতে পাই বুঝতে পারি বলে—আচার্য্য জগদীশের ল্যাব্‌রেটরী দেখতে যাইনে। তরুলতাকে মেরে ছুঁচ ফুটিয়ে তাঁর হাসি কান্না দেখায় প্রবৃত্তি আমার নেই।

ক'দিন বেশ কাট্‌ল। প্রাণতোষটা আজ চ'লে যাচ্ছে। আবার প্রবেশ করব কাব্যলক্ষীর হারেম খানায়।

আমি শীগ্‌গীর কলকাতায় যাব, দেখা হবে। তোদের মুশায়েরার সব রস পিপাসু হৃদয় কটিকে অভিনন্দন করছি আমি। তোরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ ও স্নেহ ইচ্ছা নে। তোরা সুন্দর হয়ে ওঠ্‌।[১] ইতি।

নিত্য শুভার্থী

কাজী দা

---

(১) হুগলী বাবুগঞ্জের বন্ধুবর শচীন করকে লেখা। তিনি পোষ্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ অফিসের চাকরী থেকে অবসর নিয়েছেন এখন থিওসফিক্যাল সোসাইটির সেক্রেটারী।

১১-৩-২৭

স্নেহভাজনেষু

ব্রজ। আগামী পরশু রবিবার রাত্তিরে আমার খোকার মুখে ভাত দেওয়া উপলক্ষে বন্ধু বান্ধবদের আমন্ত্রণ করেছি। কলকাতারও অনেক বন্ধু আসবেন। তুমি সেই দিন অবশ্য এসো। না এলে দুঃখীত হব। হয় সকালে চট্টগ্রাম মেলে কিম্বা দুপুর ১টা ৩৪ মিনিটের সময় Calcutta-মুর্শিদাবাদ প্যাসেঞ্জারে আসবে। এই দুটি ছাড়া আর ট্রেন নেই। এলে অন্যান্য কথা হবে।

তোমার প্রেরিত টাকা চব্বিশটা পেয়েছি। 'ফণিমনসার' প্রুফ পেলাম আজ। স্নেহাশীষ নাও। ইতি—

শুভার্থী নজরুল

কৃষ্ণনগর
২০-৪-২৭

স্নেহের বঙ্কিন!

আমি বড বিপদে পড়িয়াছি। প্রায় প্রত্যহ Slow fever আসিতেছে। গোপালের টাকা পাঠাইবার কথা ছিল। আজও টাকা পাঠাইল না। বাড়ীতে একটা পয়সাও নাই। তুমি পত্রপাঠমাত্রেই অন্তত কুড়িটি টাকা T. M .O. করে পাঠাও। নইলে বড় মুসকিলে পড়ব। বাজার খরচের পর্যন্ত পয়সা নেই। টাকা না পাঠালে বড বিপদে পড়ব। বহু দেনা করেছি, আর টাকা পাওয়া যাবে না ধার এখানে।

তোমার কাজী দা

কৃষ্ণনগর
৯-১০-২৬

প্রিয় সুবোধ,[১০]

তুই বোধ হয় এতদিনে ফিরে এসেছিস তমলুক হতে। আমিও আজ ফিরলাম যশোর খুলনা প্রভৃতি ঘুরে। আজ সকালে আমাদের একটি খোকা হয়েছে।[১১] এবার বেশ মোটা তাজা হয়েছে খোকা, শ্রীমতীও ভাল। বাবা ও মাকে আশীর্ব্বাদ করতে বলিস। তুই কি একেবারে লেখা ছেড়ে দিলি নাকি? এবার না লিখলে কিন্তু মার খাবি। আমার ভালবাসা নে। ইতি

তোর

(১০) চিঠিখানি চুঁচুড়ার কবি শ্রীসুবোধ রায়কে লেখা।

(১১) বুলবুল দ্বিতীয় সন্তান। এর মৃত্যু হয়েছে ১৯৩০ সালের ১লা আষাঢ়।

১ নং

কৃষ্ণনগর
গ্রেস্ কটেজ
৯. ১০. ২৬

পরম কল্যাণীয় প্রাণতোষ!

আমি আজই খুলনা যশোর থেকে ফিরলাম। এসে শুনলাম তুই এর মধ্যে একদিন এসেছিলি। আজ সকালে আমাদের একটি খোকা হয়েছে। মা ও মাসীমাকে[১২] খবর দিস। তাঁরা যেন আশীর্ব্বাদ করেন। হাবুল, হামিদ, বিজয়, হৃদয়, সিরাজ[১৩] প্রভৃতিকেও জানাস।

তোর বৌদি ও মাসিমা[১৪] ভাল আছেন। আমার শরীরটা খুব ভাল নেই। এর মধ্যে একদিন আসিস। অনেক কথা আছে। স্নেহাশীষ নিবি ও শান্তিকে[১৫] দিস। ইতি—শুভার্থী

কাজ্‌দা

২ নং

গ্রেস্ কটেজ
কৃষ্ণনগর
৮. ৩. ২৭

স্নেহের প্রাণতোষ—

আগামী রবিবার রাত্তিরে খোকার মুখে ভাত উপলক্ষ্যে কলকাতার ও স্থানীয় বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণ করছি। তুই না এলে, হৈ হৈ আনন্দ করবে কে? তুই দুদিন আগে যাতে আসতে পারিস সে চেষ্টা করিস। তোকে আসতেই হবে। আসবার সময় হাবুল ও শান্তিকে পারিস তো সঙ্গে নিয়ে এলে আমরা খুব খুশী হব। আশীর্ব্বাদ জানিস।
মাকে প্রণাম দিস। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
নজরুল

(১২) মা—প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের মা ৺রাজরাজেশ্বরী দেবী
মাসিমা— ঐ হেমবরণী দেবী

(১৩) হাবুল—শচীন কর, হামিদুল হক, সিরাজুল হক, বিজয় মোদক, ডাঃ হৃদয় মোদক, হুগলীর বিপ্লবী দল।

(১৪) মাসিমা—প্রমীলা নজরুলের মাতৃদেবী, গিরিবালা দেবী।

(১৫) শান্তি—প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের ছোট ভাই।

প্রেমের আর এক অধ্যায়

১৯২৭ সাল। কৃষ্ণনগরে কবি তখন থাকেন। সময়টা যতদূর মনে পড়ে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। ঢাকা থেকে কবির বন্ধু অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন (নজরুল বলতেন "মোতিহার") সাহেব তাঁকে মুসলিম সাহিত্য সভায় যোগদানের জন্য আহ্বান জানালেন। কবি মনের আনন্দে ঢাকায় রওনা হলেন। এই অধিবেশনের উদ্বোধন সঙ্গীত কবি স্টীমারে বসেই লিখেছিলেন

"চল্ চল্ চল্
ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল।
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্।" ইত্যাদি।

কবি এখানে প্রায় আড়াই মাস ছিলেন অধ্যাপক মোতাহার সাহেবের বাড়িতে। "এই আড়াই মাসের নজরুল জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হল, তাঁর প্রেম এবং বন্ধুকে লেখা কয়েকখানি চিঠি। মিস ফজিলতুন্নেসাকে তিনি গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন।"[১] এই ফজিলতুন্নেসা তৎকালীন বাংলার বিদগ্ধ সমাজের ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রত্নস্বরূপা ছিলেন।

তাঁর পিতা আবদুল ওয়াহেদ খান করটিয়া জমিদার বাড়িতে চাকুরি করতেন। মিস্ ফজিলতুন্নেসাকে নিজের চেষ্টাতেই তাঁকে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। অল্প বয়স থেকেই কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করতে করতে অঙ্কশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে গৌরবের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এই এম্-এ পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন স্কলারশিপের টাকা দিয়ে। তিনিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কৃতি মুসলিম ছাত্রী। তাঁর রং ময়লা ছিল, কিন্তু চেহারায় দীপ্তি ছিল। সৌকর্য ছিল, এবং বুদ্ধিতে তরবারির তীক্ষ্ণতা ছিল। ৯২ নং দেওয়ান বাজারের বাসায় থাকতেন। কখনো বোরখা পরেন নি। তখনকার দিনের রক্ষনশীল ঢাকা সহরের বুকে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেয়ে পড়াশুনা করার মতো দুর্জয় সাহসও তাঁর ছিল। এঁর সাহসের আরো পরিচয় পাই যখন দেখি হিন্দু মুসলমান অনেককেই তিনি তাঁর বাসায় আসতে দিতেন, এমনকি অনেক রাত পর্যন্ত গল্প গুজব করার সুযোগও দিতেন।"[২]

---

(১) "নজরুল জীবনের প্রেমের এক অধ্যায়"—পৃঃ ১১ গ্রন্থকার সৈয়দ আলি আসরফ

(২) নজরুল জীবনের প্রেমের এক অধ্যায়—পৃঃ ১২

এহেন সাহসিকা, প্রগতিশীলা মহিলার সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়েছিল কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু অধ্যাপক কাজী মোতাহার সাহেবের মাধ্যমে। অধ্যাপক সাহেবও অঙ্কের বিশিষ্ট ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের। মিস্ ফজিলতুন্নেসাও ছাত্রী। মোতাহার হোসেনকে মিস্ ফজিলতুন্নেসা বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করতেন এবং সম্বোধন করতেন 'দাদা' বলে। সুতরাং নজরুল যাঁর বন্ধু, ফজিলতুন্নেসা হলেন তার ভগ্নী। নজরুল সেই সময় জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে যেমন চর্চা করতেন তেমনি হস্তরেখা বিচারও করতেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে। উচ্চাভিলাষিণী ও বিদূষী ভগ্নির ভাগ্য গণনাব জন্য অধ্যাপক সাহেব নজরুলকে পবিচয় করে দিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে। এখানে বলে রাখি যে নজরুল গণনা করে ও হাতের রেখা বিচার করে যাকে যা বলতেন তা প্রায়শই নির্ভুল হোত। নিজের হাতের রেখা বিচার করে একদা আমাদের বলেছিলেন যে "আমি ধ্যানলোকে চলে যাব।"

ফজিলতুন্নেসাই তাঁকে তাঁর বাড়িতে আসবার আমন্ত্রণ জানান।

নজরুলের প্রানখোলা হাসি, গান ও উচ্ছ্বাসে তাঁর ঘর প্রায়দিনই গম্‌গম্ করত। কিন্তু ধীরে ধীরে নজরুলের মন তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসতে লাগল। কবির স্বভাব খুব চাপা ছিল ; তাই কেউ বিশেষ বুঝতে পারত না। এমন কি কবির অন্তরঙ্গ-বন্ধু অধ্যাপক মোতাহার সাহেবও প্রথমটা ধরতে পারেননি। পেরেছিলেন অধ্যাপক পত্নী বেগম মোতাহার।

নজরুল এই সময়ে শুধু বানু সোমকেই স্বরচিত গান শেখাতেন না, ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রমোহন মৈত্রের মেয়ে উমা মৈত্রকেও গান শেখাতেন। এই সময়ে ঢাকার কিছু তরুণ যুবকেরা একদিন নজরুলকে লাঠিসোটা নিয়ে মারমুখী হওয়ায় নজরুল তাদের হাত থেকে লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে সিংহ বিক্রমে তাদের আক্রমণ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি শুধু কবি ও গায়কই নন, সৈনিক বৃত্তিতেও পারদর্শী। এরপর ঢাকায় কবির দৈহিক ও মানসিক শক্তি এবং সাহসেরও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কাজী মোতাহার হোসেন নজরুলের ঐ লাঠিটি বহুদিন সযত্নে তাঁর কাছে রক্ষা করেছেন এবং ব্যবহারও করেছেন। রানু সোমদের বাড়ি থেকে নজরুল গান শিখিয়ে অনেক রাত করে ফিরতেন। ঘটনাটি এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই ঘটে ছিল। রানু প্রায়ই চুঁচুড়ায় তাঁর পিশেমহাশয় হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে আসতেন তাঁর মায়ের সঙ্গে। তাঁর বড় ভাই পরিতোষ সোম (বাহাদুর), কাকা ফনী সোমও চুঁচুড়ায় ঐ বাড়িতে থেকে পড়তেন ও চাকুরি করতেন। নজরুল এই কিন্নরকণ্ঠীকে কি যত্ন আর আগ্রহ নিয়েই না সঙ্গীত জগতের তারকা রূপে গড়ে তুলেছিলেন, সে যারা দেখেছে তারাই বলবে গুণীর জন্য নজরুল জান দিতে পারে। রানুর বাড়ি ছিল বিক্রমপুর হাসাড়া গ্রামে ; "বনগাঁয়ে" নয়। বর্তমানে কবি বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী লেখিকা প্রতিভা বসু নামে বেশ খ্যাতি লাভ করেছেন। রানু সোমকে (প্রতিভা বসু) উদ্দেশ্য করে নজরুল কয়েকটি গান ও কবিতা লিখেছেন। একটি গানের বইও তাঁর নামে উৎসর্গ করেছেন।

নজরুল ঢাকা থেকে ফিরে এলেন কৃষ্ণনগরে। সেখান দিন নেই রাত নেই গান গাওয়ার চোট সামলাতে পারলনা তাঁর কণ্ঠ। কণ্ঠক্ষত রোগে অনেক-দিন ভুগলেন। জ্বরে ভুগতে শুরু করলেন, গলা দিয়ে রক্ত পড়ে নজরুলকে খুব কাহিল করে দিয়েছিল। সেই সময় বন্ধু মোতাহার হোসেনকে কয়েক-খানি চিঠি লেখেন, তাতেই তাঁর মিস্ ফজিলতুন্নেসাকে ভালবাসার কথা ব্যক্ত হয়ে পড়ে। আর একখানি চিঠি দেন ফজিলতুন্নেসাকে। এবিষয়ে মোট আটখানি চিঠি পাওয়া গেছে। আর কয়েকখানি মোতাহার সাহেবের ড্রয়ার থেকে চুরি যায়।[৩] তাতে বোঝা যায় তিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। এও বোঝা যায় ফজিলতুন্নেসা যতই সকলকে মিশবার ও আলাপ করবার সুযোগ দিন না কেন, তিনি ছিলেন খুব আত্মসমাহিতা মহিলা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের অঙ্কশাস্ত্র বিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার নলিনীমোহন বোসের কেয়ারে তিনি বাস করতেন। এই ডাক্তার বোস সব সময় তাঁকে রক্ষা করে এসেছেন। তাই নজরুল এই অবস্থাটাকে অপূর্বরূপে প্রকাশ করেছেন তাঁর এই গানটিতে-

সখি, বলো বঁধুয়ারে নিরজনে
দেখা হলে রাতে ফুলবনে।
যে করে ফুল চুরি জেনেছে ফুলমালী,
কে দেয় গহীর রাতে ফুলের কুলে কালি
যেনেছে ফুলমালী গোপনে। (বুলবুল ১ম খণ্ড)

কাঁটার আড়ালে গোলাবের বাগে
ফুটিয়াছে কুসুম কপট সোহাগে,
সে কুসুম ঘেরা মেহেদীর বেড়া,
প্রহরী ভ্রমরা সে—কাননে।
ওপথে চোর কাঁটা, সখি, তায় বলে দিও,
বেঁধেনা বেঁধেনালো যেন তার উত্তরীয়!
এ বন-ফুল লাগি না-আসে কাঁটা দলি'
আপনি যাব আমি বঁধুয়ার কুঞ্জ গলি'।
বিকাব বিনিমূলে ও চরণে।" (বুলবুল, পৃঃ ৩২)

নজরুল এই "ফুলমালী" "ভ্রমরা" বলেছেন ডাঃ বোসকে। কবি তাঁর এক চিঠিতে লিখেছেন "আমি বিশ্বাস করি যে, যে আমায় এমন করে চোখের জলে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সে আমার আজকের নয়, সে আমার জন্মজন্মান্তরের, লোক লোকান্তরের দুঃখ-জাগানিয়া বন্ধু। তার

(৩) নজরুল জীবনের প্রেমের এক অধ্যায়

সাথে নব নব লোকে এই চোখের জলে দেখা ও ছাড়াছাড়ি।"[৪] আবার বললেন—"আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি একসঙ্গে কবি ও নজরুল।" ঐ কথা বলে কবি খুশি হয়ে উঠে বললেন, "এই বেদনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ তুমি, তোমায় এর উর্দ্ধে নিয়ে যাব আমি, আমি তোমায় সৃষ্টি করব।"[৫] এই বিদুষী মহিলাকে নিয়ে অনেক গান, কবিতা ও চিঠি লিখলেন নজরুল। যথা, "গানগুলি মোর আহত পাখীর মত" "জাগিলে পারুল কিগো" "স্মরণ পারের ওগো প্রিয়," "ভুলি কেমনে আজো যে মনে," "এ বাসি বাসরে আসিলে কেগো ছলিতে," "নিশি ভোর হল জাগিয়া," "কে বিদেশী বন-উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে" ইত্যাদি কয়েকটি কবিতা লিখলেন; "হিংসাতুর," "কৌতুকময়ী," "রহস্যময়ী" "এ মোর অহঙ্কার" প্রভৃতি।

সৃষ্টিশীল কবির জীবনে দুটি বিষয়ের অনিবার্য প্রয়োজন। প্রথমটি প্রত্যাখ্যানের আঘাত ও বেদনা, দ্বিতীয়টি মৃত্যুর জন্য শোক। এরই মধ্যে রয়েছে কবির জীবন গতি। তাই তিনি "পথচারী" কবিতায় লিখলেন —

"কোন গ্রহ হতে ছিঁড়ি !
উল্কার মত ছুটেছি বাহিয়া সৌর-লোকের সিঁড়ি !
আমি ছুটে যাই জানি না কোথায়, ওরা মোর দুই তীরে
রচে নীড়, ভাবে উহাদেরি তরে এসেছি পাহাড় চিরে।
উহাদের বধূ কলস ভরিয়া নিয়ে যায় মোর বারি,
আমার গহনে গাহন করিয়া বলে সন্তাপহারী !
উহারা দেখিল কেবলি আমার সলিলের শীতলতা,
দেখে নাই জ্বলে কত চিতাগ্নি মোর কূলে কূলে কোথা !
হায় কত হতভাগী—
আমিই কি জানি—মরিল ডুবিয়া আমার পরশ মাগি' !
কোথা পাবি হেথা লোনা আঁখি জল, চল্ চল্ পথচারী !
করে প্রতীক্ষা তোর তরে লোনা সাত-সমুদ্র বারি।"

(চক্রবাক—পৃঃ ২৭)

কবির এই পথচারী জীবনে "কত মালা এলো কত বালা গেল" তাঁর চলার পথে, কিন্তু তিনিতো চেয়েছিলেন একটু স্নেহ, ভালবাসা। তা না পেয়ে, প্রত্যাখ্যাত হয়ে সুরের ছন্দের পথে ফিরে এসে করলেন জীবন সৃষ্টি। তিনি তাঁর এক পত্রে বলেছেন: "ছেলেবেলা থেকে পথে পথে মানুষ আমি। যে-স্নেহে ও যে-প্রেমে বুক ভরে ওঠে কানায় কানায়—তা কখনও কোথাও পাইনি। শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ও নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব ? তাই হয়ত অল্পেই অভিমান হয়।"[৫] ঠিক এই কথাই বলেছেন পথচারী কবিতায়—

(৪) ১নং চিঠি, পৃঃ ৩৫—নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়
(৫) চিঠি নং ৩,—পৃঃ ৪১—নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়

"আপনার বেগে আপনি ছুটেছি জন্ম-শিখর হতে
বিরাম বিহীন রাত্র ও দিন পথ হতে আন্ পথে।
নিজবাস হল চির-পরবাস, জন্মের ক্ষণ পরে
বাহিরিনু পথে গিরি পর্বতে ফিরি নাই আর ঘরে।"

তের বছর বয়স থেকে ঘর ছেড়েছেন, সেই ঘরে আর ফিরে যাননি। মায়ের স্নেহ, গ্রামস্থ কারো ভালবাসা তিনি কখনও পাননি। সেই অভিমানে চলে গেলেন যুদ্ধে, এলেন ফিরে, জীবন বিলিয়ে দিলেন সবার উপরে যে মানুষ তাকে ভালবেসে। সেই প্রেমের পাগল নজরুল ঢাকায় পেলেন দীপ-শিখা। ভাবলেন এর স্নেহ ভালবাসা পেলে হয়ত দগ্ধ হৃদয়ে শান্তির স্পর্শে ধন্য হবেন, মাটির প্রদীপের শান্ত আলোয় জীবন হবে দীপ্তিময়। সেই বিদুষী নারী ছিলেন উচ্চাভিলাষিনী, বিদগ্ধা। তাঁর লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত তিনি অন্যদিকে কি করে দৃষ্টি ফেরাবেন? তাই কবি অভিমানে ফিরে এলেন প্রমীলাকুঞ্জে, কৃষ্ণনগরে। কবির মনে শান্তি নেই, লিখলেন 'হিংসাতুর' কবিতায়—

"কবির কবিতা সে শুধু খেয়াল? তুমি বুঝিবে না, রানী,
কত জ্বাল দিলে উনুনের জলে ফোটে বুদবুদ—বাণী!
তুমি কি বুঝিবে, কত ক্ষত হয়ে বেনুর বুকের হাড়ে
সুর ওঠে হায়, কত ব্যথা কাঁদে সুর-বাঁধা বীণা-তারে!
সে দিন কবিই কেঁদেছিল শুধু? মানুষ কাঁদেনি সাথে?
হিংসাই শুধু দেখেছ, দেখনি অশ্রুনয়ন পাতে?
আজো সে ফিরিছে হাসিয়া গাহিয়া? হায় তুমি বুঝিবে না,
হাসির ফূর্তি উড়ায় যে—তার অশ্রুর কত দেনা?"
(চক্রবাক পৃঃ ৫৬)

তারপর "এ মোর অহঙ্কার" কবিতায় এর উল্টো সুর। সেখানে স্রষ্টা, তাঁর প্রেমিকার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বললেন—

"নাইবা পেলাম আমার গলায় তোমার গলার হার,
তোমায় আমি করব সৃজন এ-মোর অহঙ্কার।
এমনি চোখের দৃষ্টি দিয়া
তোমায় যারা দেখল প্রিয়া
তাদের কাছে তুমি তুমিই। আমার স্বপনে
তুমি নিখিল রূপের রাণী মানস আসনে!—"
(জিঞ্জীর—পৃঃ ৭৬)

তিনি চিঠির এক জায়গায় বলেছেন—

"আমার কথা স্বতন্ত্র, আমি একসঙ্গে কবি ও নজরুল।"
এখানে বলেছেন—"এমনি চোখের দৃষ্টি দিয়া
তোমায় যারা দেখল প্রিয়া
তাদের কাছে *তুমি তুমিই*।"

নজরুলের চোখ নিয়ে তারা তোমাকে দেখেনি যে তারা তোমাকে "নিখিল রূপের রাণী" করে সৃষ্টি করবে, সে এক নজরুলই পারে, কারণ নজরুল প্রেম করে ভোগের জন্য নয়, সৃষ্টির প্রেরণার জন্যই তার প্রেম-সাধনা।

প্রত্যাখ্যাত নজরুল ফিরে এলেন গানের সুরের ঝর্ণাধারার বেগ নিয়ে। "রহস্যময়ী" কবিতায় লিখলেন—

"অজানা বন্ধু তুমি কিগো সেই ;
জ্বালি দীপ গাঁথি মালা, যার আশাতেই
কূলে বসে একাকিনী যুগ যুগ ধরি ?
নেমে এসো বন্ধু মোর ঘাটে বাঁধো তরী।"

এরপর নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে বললেন—

"একি সে ইন্দিরা,
তোরি সে কবিতা-লক্ষ্মী !—বিরহ অধীরা
একি সেই মহাশ্বেতা চন্দ্রাপীড়-প্রিয়া!
উন্মাদ ফর্হাদ যারে পাহাড় কাটিয়া
সৃজিতে চাহিয়াছিল—একি সেই শিরী!
লায়লি এই কি সেই ; আসিয়াছে ফিরি
কায়েসের খোঁজে পুনঃ ? কিছু নাহি জানি।
অসীম জিজ্ঞাসা শুধু করে কানাকানি
এপারে ওপারে হায়।"

"৮.৩.২৮ (ইং) তারিখে লেখা মিস্ ফজিলতুন্নেসার ব্যঙ্গোক্তির দ্বারা তিনি যেভাবে আহত হয়েছেন বলে লিখেছেন"[৬] তাকে অবলম্বন করে লিখলেন "কৌতুকময়ী" কবিতা —

"তুমি বসে রবে ঊর্দ্ধে মহিমা শিখরে
নিষ্প্রাণ পাষাণ দেবী ? কভু মোর তরে
নামিবে না প্রিয়া রূপে ধরার ধূলায় ?
লো কৌতুকময়ী! শুধু কৌতুক লীলায়
দোলাবে আমারে লয়ে ? আর সবি ভুল ?

(৬) পৃঃ ২১—নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়

ভুল করে ফুটে ছিলো আঙিনায় ফুল ?
ভুল করে বলেছিলে "সুন্দর" ?—অমনি
ঢেকেছ দুহাতে মুখ ত্বরিতে তখনি !
বুঝি কেহ শুনিয়াছে, দেখিয়াছে কেহ
ভাবিয়া আঁধার কোণে লালায়িত দেহ"

এই প্রশ্নের সমাধান কবি তাঁর নিজের মধ্যেই খুঁজে পেয়ে বললেন—

"সুন্দর কঠিন তুমি পরশ পাথর
তোমার পরশ লভি হইনু সুন্দর—
তুমি তাহা জানিলে না।"

তাই যে বেদনার আগুনে আজ কবি শুদ্ধ ও সুন্দর হয়ে উঠলেন তার বন্দনা গানের মধ্যে নিজের শান্তির পথ খুঁজে পেয়ে বললেন —

"এবারে খোয়াব সব, করিয়াছি পণ !
হোক ভুল, হোক মিথ্যা, হোক এ স্বপন,
এইবার আপনারে শূণ্য রিক্ত করি
দিয়া যাব মরনের আগে।"

এই আঘাতে নজরুল সৃজন আনন্দে আনন্দলোকের বার্তা, কাব্যে, গানে, চিঠিতে, সুরের মাধ্যমে মেতে উঠলেন। তাই সৈয়দ আলী আসরফ তাঁর "নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়ে' বলেছেন 'রহস্যময়ী' কবিতার অর্থোদ্ধার করতে হলে নজরুল-মানসে প্রণয়জনিত বেদনার কথা স্মরণ রাখা উচিত।" (পৃঃ ২২) আমি বলি কবির সৃষ্টিকে বুঝতে হলে তাঁর মানস লোকের প্রেরণার উৎসকে বুঝতে পারলে কবির প্রতি সুবিচার করা হবে। তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর বেদনাময় মহান জীবন লুকিয়ে আছে। কবিকে নিয়ে অনেকে অনেক রকম আলোচনা করে থাকেন, কিন্তু কবি তাঁর কাব্যের মধ্যে তাঁর স্বীকৃতি রেখে গেছেন—

"নারীর বিরহে নারীর মিলনে নর পেল কবি প্রাণ
যত কথা তার হইল কবিতা শব্দ হইল গান।"

আবার বলেছেন—

"আদম হইতে সুরু করে এই নজরুল তক্ সবে
কমবেশী করে পাপের ছুরিতে পুন্যে করেছে জবেহ্।"

আবার দেখুন—

"পাপ করিয়াছ বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার ?
শত পাপ করি ক্ষুন্ন হয়নি দেবত্ব দেবতার।" (সর্বহারা, সাম্যবাদ)

অতএব দেখা যাচ্ছে, নজরুলের মানবিক প্রেম তাঁকে নিয়ে গেছে "রজকিনী প্রেম নিকষিত হেমের" অন্তর জগতের আনন্দময় পথে। এই আনন্দময় পথের যাঁরা যাত্রী তাঁদের প্রেমের বিশ্লেষণ করতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন—

"প্রেমের দুই বিরুদ্ধ পার আছে। একপারে চোরাবালী, আরেক পারে ফসলের ক্ষেত। একপারে ভালো লাগার দৌরাত্ম্য, অন্যপারে ভালবাসার আমন্ত্রণ। ...যে-প্রেম ত্যাগের দ্বারা মানুষকে মুক্তি দিতে জানে না, পরন্তু ত্যাগের বিনিময়ে মানুষকে আত্মসাৎ করতে চায় সে প্রেমতো রিপু।" ৭

মিস্ ফজিলতুন্নেসা ছিলেন ভাগ্যান্বেষী উচ্চাভিলাষিনী; তাঁব একমাত্র লক্ষ্য ছিল পৃথিবীতে সমাজের উচ্চস্থান লাভ করবার।

সেই লক্ষ্যেব পথে কোন বাধাকেই তিনি মেনে নেবেন না।

কবিতা, গান, সাহিত্য শিল্পের কোন মূল্য-বোধ তাঁর ছিল কি না, কে জানে? নজরুল, প্রেমে নিজেকে দিওয়ানা কবে দিয়েছিলেন, ভোগের জন্য নয়, মহান সৃষ্টির পরম প্রেরণার জন্য। তাই তাঁর প্রেমের পারে সুর, সঙ্গীত সৃষ্টির ফসলের সমাবোহে জমজমাট হয়ে উঠেছে। প্রেমে সম্ভোগ বৃত্তিকে পবিহাব করে ত্যাগে কবি মনুষ্যজাতিকে মহিমায় মণ্ডিত করে; নিজে হয়েছেন নমস্য।

কবি কৃষ্ণনগবে ফিরে এসে কণ্ঠক্ষতবোগে, বক্তপাতে, জ্বরে ভুগে খুব দুর্বল হয়ে পডলেন। স্থিব করলেন কলকাতায় গিয়ে ডাক্তার দেখাবেন। তাই ১৫নং জেলিয়াটোলা স্ট্রীট, কলকাতায় তার বন্ধু, হাসিব গায়ক শ্রীনলিনী সরকারের বাডিতে ৬.৩.২৮ তারিখে এসে উঠলেন। চিকিৎসা চলতে লাগল। এই সময় মিস্ ফজিলতুন্নেসা গৌরবের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে সংকল্প করলেন বিলেতে পড়তে যাবেন।

সৈয়দ আলী আসরফ্ লিখেছেন ঃ—"এই সাহস এবং বুদ্ধি কৌশলের তাৎপর্য বিশেষ ভাবে বুঝতে পারব যদি তাঁর বিলেত যাত্রার কাহিনী অনুধাবন করি। 'সওগাত' পত্রিকা এই সময়ে মুসলিম সমাজের প্রগতি এবং মুস্লিম নারীর অগ্রগতির কথা প্রচার করছেন। যদিও সম্পাদক নাসিরুদ্দীন সাহেবকে তিনি চিনতেন না, তাঁর সাহায্য কামনা করে মিস্ ফজিলতুন্নেসা চিঠি দেন। তিনি তাঁকে কলকাতায় আসতে বলেন। মিস্ ফজিলতুন্নেসা তাঁর বোন্ শফিকুন্নেসাকে নিয়ে কলকাতা আসেন। নাসিরুদ্দীন সাহেব 'সওগাত' অফিসের দোতলার একটি কামরায় তাঁদের থাকতে দেন। তখন কোন স্কলারশিপ ছিল না। মোহামেডান এডুকেশন এ. ডি. পি. ই. খান-বাহাদুর আবদুল লতিফের সঙ্গে পরামর্শ করে নাসিরুদ্দীন সাহেব শিক্ষামন্ত্রী নওয়াব মোশার্‌রফ হোসেনের সঙ্গে দেখা করে মিস্ ফজিলতুন্নেসাকে বিলেত পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানান। মোশার্‌রফ হোসেন সাহেব বলেন যে, মুসলমান মেয়েকে বিলেত পাঠালে সমাজে বদনাম হবে।

(৭) যাত্রী—পৃঃ ১০৪

নাসিরুদ্দীন সাহেব কিছুতেই যখন তাঁকে বোঝাতে পারলেন না তখন বললেন "ঠিক আছে, আমি মিশনারীদের কাছে তাঁকে যেতে বলব। তারা স্কলারশিপ দেবে এবং পরে একে খৃষ্টান বানাবে। সুতরাং কাগজে কাগজে এই ঘটনা রটনা করে দেব ,"

নওয়াব মোশার্‌রফ হোসেন বেকায়দায় পড়ে শেষ পর্যন্ত মিস্ ফজিলতুন্নেসাকে বিলেত পাঠাতে রাজি হন এবং শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষিত একটি ছেলের স্কলারশিপ কেটে মিস্ ফজিলতুন্নেসাকে দিতে বাধ্য হন।"৮

এহেন একজন উচ্চাভিলাষিনীকে সর্বত্যাগী আত্মভোলা নজরুল ভালবেসে ব্যথা পেয়েছিলেন ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। অবশ্য এই প্রত্যাখ্যানের ফলে যে সোনার ফসল জাতি পেয়েছিল বিভিন্ন কবিতায়, গানে, সুরে ও চিঠিতে তা অমর হয়ে থাকবে কবির জীবন ইতিহাসে।

এরপরে নাসিরুদ্দীন সাহেব তাঁর ১১নং ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীটের 'সওগাত' অফিসে মিস্ ফজিলতুন্নেসাকে বিলাত রওনা হবার আগে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে এই দুঃসাহসিকাকে অভিনন্দন করার ব্যবস্থা করেছিলেন। নজরুল তখন কলকাতায়। সেই সংবর্ধনা সভায় নজরুল একটি স্বরচিত গান গেয়ে শোনান। গানটি এই উপলক্ষেই লেখা হয়েছিল—যথা,

জাগিলে "পারুল" কিগো সাতভাই চম্পা ডাকে।
উদিলে চন্দ্রলেখা বাদলের মেঘের ফাঁকে।
চলিলে সাগর ঘুরে
অলকার মায়ার পুরে ;
ফোটে ফুল নিত্য যেথায়
জীবনের ফুল্ল শাখে।।
আঁধারের বাতায়নে চাহে আজ লক্ষ তারা, .
জাগিছে বন্দিনীরা, টুটে ঐ বন্ধ কারা।
থেকো না স্বর্গে ভুলে
এ পারের মর্ত্ত্য কূলে
ভিড়ায়ো সোনার তরী
আবার এই নদীর বাঁকে।" [বুলবুল (১ম)]

যতদূর মনে পড়ে মিস্ ফজিলতুন্নেসা বিলেত থেকে ফিরে এসে বড় চাকুরি নিয়ে কাইরো কি কোথাও গিয়েছিলেন। কিন্তু যতদিন দেশে ছিলেন, ততদিন নজরুলের সঙ্গে আর তেমন দেখাশুনা করেননি। নজরুলের জীবনের মোড়ও ঘুরে গিয়েছিল।—প্রেমে দিওয়ানা হয়ে নজরুল তার আগেই গেয়ে ছিলেন,—

(৮) নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়—পৃঃ ১৩

"মুসাফির মোছ্‌রে আঁখি জল
ফিরে চল্‌ আপনারে নিয়া।
আপনি ফুটেছিল ফুল
গিয়েছে আপনি ঝরিয়া।"

ভালবাসার কাঙাল নজরুল দ্বারে দ্বারে এমনি প্রেম ভিক্ষা চেয়ে ব্যর্থ হাতে যে ফসল সৃজন করলেন তা আমাদের অঞ্জলি ভরিয়ে দিয়েছেন গানে, সুরে, কবিতায়। নারীর প্রত্যাখানে হয়েছেন কবি। বুলবুলের শোকে হয়ে গেলেন সাধক। মর্ত্যে যাঁদের ভালোবেসে হলেন মুসাফির, শ্রদ্ধার শীর্ষে তিনি পেলেন স্থান, তিনি যাঁদের ভালবাসলেন তাঁরা হয়ে গেলেন পঞ্চভূতে বিলীন।

মিস্‌ ফজিলতুন্নেসাকে
লিখিত চিঠি ১

১১, ওয়েলস্‌লি ষ্ট্রীট
(সওগাত অফিস)
কলিকাতা
শনিবার—রাত্রি ১২টা

আজ ঈদ।— ঈদ মোবাবক।

অসহায় হইয়া আপনায় এই পত্র লিখিতেছি। যদি বিরক্ত করিয়া থাকি মার্জ্জনা করিবেন।

আজ ১৪ দিন হইল মোতাহাব সাহেবের কোনো চিঠি পাই নাই। তাঁহার শেষ চিঠি পাইয়াছি ১০ই মার্চ। তাহার পর আমি তাঁহাকে দুইখানা পত্র দিয়াছি ১০ই ও ১৮ই মার্চ। আজও কোন উত্তর না পাইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছি। জানিনা তিনি ঢাকায় আছেন কিনা, না অসুখ করিয়াছে— কত কি মনে হইতেছে। আপনার শারীরিক সংবাদটুকুও তাঁহার মারফতই পাইতাম। বড় উদ্বিগ্নে দিন কাটাইতেছি।

আপনি যদি দয়া করিয়া—জানা থাকিলে আজই দু'লাইন লিখিয়া তাঁহার খবর জানান, তাহা হইলে সবিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব।

তিনি আমার ঐ চিঠি দুইখানা পাইয়াছেন কিনা, জানেন কি? তিনি কি আমার উপর রাগ করিয়াছেন? না অন্য কারণ!— জানা না থাকিলে জানাইবার দরকার নাই।

আমি সওগাতের লেখা লইয়া বড় ব্যস্ত আছি। কলিকাতায় আরো দুই চারিদিন আছি। পত্র সওগাত অফিসের ঠিকানাতেই দিবেন।

আপনার শরীর খুবই অসুস্থ দেখিয়া আসিয়াছিলাম। কেবলি মনে হয়, যেন আপনার শরীর ভাল নাই। দু' দিনের পরিচয়ের এত বড় আস্পর্দ্ধাকে আপনি হয়ত ক্ষমা করিবেন না, তবু সত্য কথাই বলিলাম।

(১) এনভেলাপের উপর পোস্ট অফিসের ছাপ অনুযায়ী ২৮শে মার্চ, ১৯২৮ সনে এ চিঠি পোষ্ট করা হয়েছিল।

আপনাকে দিয়া বাঙলার অন্ততঃ মুসলিম নারী সমাজের বহু কল্যাণ সাধন হইবে—ইহা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। তাই আপনার অন্ততঃ কুশল সংবাদটুকু মাঝে মাঝে জানিতে বড্ডো ইচ্ছা করে। যদি দয়া করিয়া ২টি কথায়—শুধু কেমন আছেন লিখিয়া জানান—তাহা হইলে আমি আপনার নিকট চির ঋণী থাকিব। আমার ইহা বিনা অধিকারের দাবী।

আমি এখন বেশ ভালই আছি। আর একটি কথা। আপনি বার্ষিক সওগাতের জন্য একটি গল্প দিয়াছেন—"শুধু ২'দিনের দেখা" শীর্ষক। সওগাত-সম্পাদক আমায় তাহা দেখিয়া দিতে দিয়াছেন। কিন্তু আপনার অনুমতি ব্যতীত তাহার একটি অক্ষর বদলাইবারও সাহস নাই আমার। আমি লেখাটি পড়িয়াছি। যদি ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন—তাহা হইলে আমি উহার এক আধটু অদল-বদল করিয়া ঠিক গল্প করিয়া তুলিবার চেষ্টা করি। সামান্য এক আধটু বাড়াইয়া দিলেই উহা একটি ভাল গল্প হইবে। অবশ্য, এ স্পর্ধা আমার নাই যে, আপনার লেখার তাহাতে কিছুমাত্র সৌন্দর্য বা গৌরব বাড়িবে। মনে হয় গল্পটা বড্ড তাড়াতাড়ি লিখেছেন। উহা যেন আপনার অযত্ন লালিতা। অবশ্য আপনার অসম্মতি থাকিলে যেমন আছে তেমনটিই ছাপিবেন সম্পাদক সাহেব। আপনার অমত থাকিলে স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন, কিছুমাত্র দুঃখিত হইব না তাহাতে। আর আমার লিখিবার কিছু নাই, আপনাদের খবরটুকু পাইলেই আমি নিশ্চিত হইতে পারিব।

হ্যাঁ—আর একটা কথা, আমার আজ পর্যন্ত লেখা সমস্ত কবিতা ও গানের সর্বাপেক্ষা ভাল যেগুলি-সেইগুলি চয়ন করিয়া একখানা বই ছাপাইতেছি "সঞ্চিতা" নাম দিয়া। খুব সম্ভব আর এক মাসের মধ্যেই উহা বাহির হইয়া যাইবে।

আপনি বাঙলার মুসলিম নারীদের রাণী। আপনার অসামান্য প্রতিভার উদ্দেশ্যে সামান্য কবির অপার শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ "সঞ্চিতা" আপনার নামে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইতে চাই। আশা করি এজন্য আপনার আর সম্মতিপত্র লইতে হইবে না, আমি ক্ষুদ্র কবি, আমার জীবনের সঞ্চিত শ্রেষ্ঠ ফুলগুলি দিয়া পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা ব্যতীত আপনার প্রতিভার অন্য কি সম্মান করিব ?

সুদূর ভক্ত কবির এই একটা নমস্কারকে প্রত্যাখ্যান করিয়া পীড়া দিবেন না এই আমার আকুল প্রার্থনা। [২]

(২) কবি নজরুল শেষ পর্যন্ত "সঞ্চিতা" কবি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন। কি কারণে মিস ফজিলতুন্নেসাকে পরে উৎসর্গ করেননি তা জানি না। হয়ত এই চিঠি মিস্ ফজিলতুন্নেসা পান নি। কাজী সাহেব সঠিক বলতে পারলেন না, কিন্তু এই চিঠি কাজী সাহেবের কাছেই ছিল।

* মিস ফজিলতুন্নেসাকে লিখিত

অধ্যাপক সৈয়দ আলি আশ্রাফের সৌজন্যে

দুই একদিনের মধ্যেই আমার লেখা সব বইগুলি পাঠাইয়া দিব আপনায়। আপনার মত বিদুষী মহিলার পড়ার তাহা উপযুক্ত নয়, তবু দিব। আপনার আঙিনায় Season flower-এর গাছ দেখিয়াছিলাম যেন। তাহারও ত যত্ন নেন দেখিয়াছি। সুতরাং আমার লেখাও ফেলিবেন না ভরসা করি।

একটু কষ্ট করিয়া আজই পত্র দিবেন। আপনার ভগ্নিদেরে ও ভাইকে স্নেহাশীষ দিবেন।

ইতি
নজরুল ইসলাম

নভেম্বর বিপ্লব ও নজরুল

১৯১৭ সালের নভেম্বরে পৃথিবীর মানুষ মাত্রেরই স্বাধীন সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রুশ বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী। এই বিপ্লবের সাফল্যের সাথে সাথে লালফৌজ গঠন করে সোভিয়েট ভূমিকে যেমন সুরক্ষিত করেছিলেন, তেমনি দুনিয়ার মানুষের তীর্থভূমিতে পরিণত করেছিলেন রুশ বিপ্লবীরা।

তখন বিশ্বব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় ধ্বংসকার্যের আগুনের মধ্যে মানবতাকে প্রস্ফুটিত ফুলের হাসির মর্যাদা দিয়েছিল লালফৌজ। নৈরাশ্যের মধ্যে জীবনের গতি দান করে পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মত বাঁচবার আশ্বাস ও সুনির্দিষ্ট পথের নির্দেশ দিয়ে সঞ্জীবিত করেন।

নজরুলের কথায় বলা যায়—

"আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া
হাসি পুষ্পের হাসি।"

এই জাহান্নামের আগুন সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ; পুষ্পের হাসি হল দেশপ্রেম। সফল রুশ বিপ্লব বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের শোষনাগ্নির মধ্যে পুষ্পের হাসির মতই তখন প্রতিভাত হয়েছিল।

পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী মহল এই রুশ বিপ্লব ও বিপ্লবীদের নানাভাবে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন প্রচারের মাধ্যমে। তখন ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশের অধীনে। ক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট বিদ্রোহী ভারতবাসীরা যাতে রুশ বিপ্লবের সাফল্যের সংবাদ না পায় তার কঠোর প্রচেষ্টা ছিল ব্রিটিশ শাসকদের ও তথাকথিত ভারতীয় কোন কোন রাজনৈতিক দলেরও। অপপ্রচারের এমন কায়দা ছিল ব্রিটিশের যাতে ভারতবাসীরা রুশ-বিপ্লব-বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। কিন্তু যা সত্য তাকে কি কেউ আড়াল করে রাখতে পারে? কবি নজরুলের ভাষাতেই বলি—

"ওরে সত্য যে চির স্বয়ম্ প্রকাশ,
রোধিবে কি তারে কারাগার ফাঁস?
ঐ অত্যাচারীর সত্য পীড়ণ আছে তার আছে ক্ষয়!"

আপ্রাণ চেষ্টা করেও ভারতের ব্রিটিশ সরকার রুশ বিপ্লবের সাফল্যের কথা চেপে রাখতে পারল না। অনুসন্ধিৎসু ভারতের ও বাংলার বিপ্লবীরা নানাভাবে সংবাদ সংগ্রহ করে গোপন পথে দেশবাসীর কাছে প্রচার শুরু করেছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ তখন পৃথিবীতে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল, মানুষের মনে হতাশার ভাব এনে দিয়েছে। ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে দেশীয় সেনা রিক্রুট করতে শুরু করেছে। ভারতীয় বিপ্লবীরা বিদেশে ব্রিটিশ-বিরোধী পক্ষদের সঙ্গে ভারত সরকারকে এই সুযোগে ঘায়েল করার জন্য ভারতব্যাপী সশস্ত্র বিপ্লব বাধাবার জন্য ষড়যন্ত্র করছেন।

নজরুল এর কিছু আগেই ৪৯ নং বাঙালী পল্টনে প্রবেশ করে করাচীর গ্যাজা লাইনে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর সংকল্প ছিল যে সাম্রাজ্যবাদী পল্টনে প্রবেশ করে অস্ত্রচালনা শিক্ষা করে দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে হবে। এই মনোভাব নিয়েই তিনি সৈন্য দলে যোগ দিয়েছিলেন। কারণ, তাঁর ধারনা ছিল যে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া দেশের মুক্তি হতে পারে না। অস্ত্র চালনা শিক্ষার শেষে দেশের তরুণদের জঙ্গী শিক্ষা দেবার মতলবও ছিল তাঁর মনে। তাই করাচীর ব্যারাকে জঙ্গী শিক্ষা নেওয়ার সাথে সাথে বহু পত্র পত্রিকা ও গ্রন্থাদি পাঠ করে নিপীড়িত মানুষের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলেন।

নজরুল যে সৈন্য ব্যারাকে থাকা কালীন ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের সংবাদ পেয়েছিলেন নানা বাধা সত্ত্বেও, তার একটি প্রামাণ্য সংবাদ আমাকে তাঁর সৈনিক জীবনের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু কোয়াটার মাস্টার জমাদার শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র রায় জানান। আমি কৌতুহল বশতঃ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম যে নজরুল বা আপনারা ব্রিটিশের সৈন্য ব্যারাকে থাকতে রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে কোন সংবাদ পেতেন কিনা, এটা আমাকে লিখে যদি জানান তাহলে খুব উপকার হয়।

এই কৌতুহল হবার কারণ নজরুল সাহিত্য ও সাংবাদিক জীবনের অভিন্ন হৃদয় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের একটি প্রবন্ধ পড়ে বুঝতে পারি যে নজরুল লালফৌজ নিয়ে একটি পত্রোপন্যাস রচনা করেছিলেন ১৯১৮ সালে করাচীর গ্যাজা লাইনের ব্যারাকে থাকতে।

"১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে মজুর শ্রেণীর নেতৃত্বে রাশিয়ায় যে বিপ্লব হয়েছিল তার আবেদন করাচীর সেনানিবাসে নজরুলের প্রাণেও পৌঁছেছিল। তার আভাস আমরা তাঁর সেনানিবাসে লেখা গল্পে পাই। বিপ্লবের পরে মজুর শ্রেণীর নেতৃত্বে গঠিত লালফৌজ বিপ্লব-বিরোধী গৃহযুদ্ধ দমনে আত্ম-নিয়োগ করে। আমরা দেখতে পাই নজরুলের গল্পের নায়ক পাহাড়পর্বত ডিঙিয়ে গিয়ে লালফৌজে যোগ দিয়েছেন।"১

এই প্রবন্ধ পাঠ করে আমি নজরুল বন্ধু শ্রীশম্ভুচন্দ্র রায়কে জিজ্ঞাসা করায় আমায় পত্রে লেখেন—"এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য বলবার আছে। তা' পরে জানাব। এখন আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, নজরুল কি করে রাশিয়ার স্বাধীনতার খবর পেয়েছিল। আমাদের ব্যারাকের কর্তৃপক্ষের শ্যেনদৃষ্টি ছিল

---

(১) ১ম বর্ষ নজরুল সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩, জাগরণ পত্রিকার ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য রচনা—মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

যাতে আমরা বাইরে থেকে কোনরকম রাজনীতির খবর না পাই। সেজন্য পত্রপত্রিকা যা আসত তা' পরীক্ষা করে আমাদের দেওয়া হোত। তৎসত্ত্বেও 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো'র মত নজরুল এ সব খবর কি করে জোগাড করত তা সেই জানে।

"নজরুলের আড্ডা থেকেই বাছাই কয়েকজনকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সংবাদ দিত। যেমন আইরিশ বিদ্রোহ ও রুশদের কথা। আমরা কয়েকটি বন্ধু এসব বিষয়ে যেমন সাবধানতার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতাম নজরুল তার ভাবকে তেমন করে চেপে রাখতে পারত না। অবশ্য তার একটা পথ ছিল, গান ও কবিতার সাহায্যে সে গান গেয়ে ও কবিতা পড়ে তার ভাবকে ব্যক্ত করত। সৈন্যদের মধ্যে এসব বিষয় নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামাত না। একদিন সন্ধ্যায় ১৯১৭ সালের শেষের দিকেই হবে, এখন ঠিক স্মরণে আনতে পারছি না, হয়ত সেটা শীতের শেষের দিক। নজরুল তার বন্ধুদের মধ্যে যাদের বিশ্বাস করতেন, তাদের এক সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ করেন। অবশ্য এরকম নিমন্ত্রণ প্রায়ই সে তার বন্ধুদের করত। কিন্তু ঐদিন যখন সন্ধ্যার পর তার ঘরে আমি ও নজরুলের অন্যতম বন্ধু তার অর্গ্যান-মাস্টার হাবিলদার নিত্যানন্দ দে প্রবেশ করলাম, তখন দেখলাম অন্যান্য দিনের চেয়ে নজরুলের চোখেমুখে একটা অন্যরকম জ্যোতি খেলে বেড়াচ্ছিল। উক্ত নিত্যানন্দ দে মহাশয়ের বাড়ী ছিল হুগলী সহরের ঘুটিয়া-বাজার নামক পল্লীতে। তিনি অর্গ্যানে একটা মারচিং গৎ বাজানর পর, নজরুল সেদিন যেসব গান গাইলেন ও প্রবন্ধ পড়লেন তা' থেকেই আমরা জানতে পারলাম যে রাশিয়ার জনগণ জারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। গান বাজনা প্রবন্ধ পাঠের পর রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা হয়, এবং লাল-ফৌজের দেশপ্রেম নিয়ে নজরুল খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। ঠিক মনে নেই সে গোপনে আমাদের একটি পত্রিকা দেখায়। ঐ পত্রিকাতে আমরাও বিশদভাবে সংবাদটি দেখে উল্লসিত হয়ে উঠি। সেদিন সারা রাতই প্রায় হৈ হুল্লোড়ে আমাদের কেটে গিয়েছিল।"[২]

তারপব কবি উক্ত গ্যাজা লাইনের ব্যারাকেই "ব্যথার দান" নামক গ্রন্থটি লেখেন। এই গ্রন্থের মধ্যে কবি লালফৌজ সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। সেই নায়ক ছিলেন ভারতীয়, সে ছিল ব্রিটিশের সৈনিক, পালিয়ে গিয়ে লালফৌজে যোগ দেয়।

এ সম্বন্ধে মুজফ্‌ফর সাহেব বলেছেন—" ব্যথার দান' নজরুলের একখানা বহু প্রশংসিত গল্প পুস্তক। এই পুস্তকের প্রথম গল্প 'ব্যথার দানে' বিপ্লবের পরের রুশ দেশের প্রতি নজরুল যে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। করাচীর সেনানিবাসেই ১৯১৮ সালে এই গল্পটি লিখিত হয়।"[৩]

---

(২) ৺ শম্ভু রায়ের পত্রাবলী পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

(৩) কাজী নজরুল প্রসঙ্গে—লেখক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, পৃষ্ঠা—৬০।

এই গল্পটি ছাপাতে গিয়ে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার সহঃ সম্পাদক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লালফৌজ কথাটি ছাপতে ইতস্ততঃ করেন। কারণ তখন ভারতের আকাশ বাতাসে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। রুশাতঙ্ক তখন ব্রিটিশ সরকারের ও তার তাঁবেদারদের জলাতঙ্কের মতই পাগলা কুকুরের মত করে তুলেছিল। সেইজন্য ত্রৈমাসিক বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় "লালফৌজ" কথাটি না লিখে "মুক্তি সেবক সৈন্যদের দল" কথাটি বসিয়ে দিয়েছিলেন।[৪] তার কারণ ভারত গভর্নমেন্টের গোয়েন্দা বিভাগ তখন নূতন করে গড়ে তোলা হয়, এবং প্রাদেশিক পুলিসের বিশেষ বিভাগগুলিকেও কেন্দ্রীয় ইনটেলিজেন্স বিভাগের নির্দেশে তৎপর করে তোলার ব্যবস্থা হয়। সেই জন্যই বোধ হয় আহ্‌মদ সাহেব লালফৌজ কথাটি তুলে দেন।

৺ শম্ভু রায়ের পত্রে জানা যায় কি কি গ্রন্থ, পত্র পত্রিকা নজরুল পছন্দ করতেন ও জঙ্গী জীবনে সংগ্রহও করতেন।. ব্রিটিশ ব্যারাকে থাকাকালীন সরকারের অমানুষিক ব্যবস্থায় ও ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে নজরুলেরও লালফৌজে যোগ দেবার ইচ্ছা হয় নি তা কে বলতে পারে? সেই ইচ্ছাটাই যে তিনি ব্যথার দানের গল্পে প্রকাশ করেছিলেন কিনা, কিম্বা তাঁর সময়ে যাঁরা ব্রিটিশবাহিনী থেকে পালিয়ে লালফৌজে যোগ দিয়েছিল সে খবরও নিশ্চয়ই তিনি জানতেন। তাদেরই কথা হয়ত উক্ত গল্পে লিখেছিলেন নায়কের মাধ্যমে।

এ সম্বন্ধে মুজফ্‌ফর সাহেব লিখেছেন—"১৮১৮ সালের ঘটনা। ব্রিটিশ হস্তক্ষেপকারীর দল ট্রান্সককেসাসে শিশু সোভিয়েৎ রাষ্ট্রের টুঁটি টিপে মারার জন্য ইরান হতে সেখানে ব্রিটিশ ফৌজের কয়েকটি ইউনিট প্রেরণ করে। এই ইউনিটগুলিতে ভারতীয় সৈন্যরাও ছিল। ফৌজের ভিতরে বিপ্লবী ভাবধারা যাতে অনুপ্রবেশ করতে না পারে তার জন্য ব্রিটিশ-সেনাদলের চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতীয় ইউনিটগুলিতে গোলমাল ঘটে। বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য যে ঘৃণিত অভিযান চলেছিল তাতে যোগ দিতে সকল ভারতীয় ইউনিটের সৈন্যরা অস্বীকার করেন। তাঁদের মধ্য হতে কিছু কিছু সৈন্য ব্রিটিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেন এবং তারপরে যোগ দেন নবগঠিত লালফৌজে।[৫]

এই যে সৈন্যরা ১৯১৮ সালে ব্রিটিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে লালফৌজে যোগ দিলেন সে খবর উক্ত সালে ৪৯ নং বাঙালী পল্টনের কোয়ার্টার মাষ্টার হাবিলদার নজরুলের কাছে গ্যাজালাইনের ব্যারাকে কি পৌঁছায় নি। ৺শম্ভু রায়ের পত্রে বোঝা যায় যে নজরুল তাঁকে কি একটা পত্রিকা গোপনে দেখান, যা থেকে নজরুল বন্ধুরা নভেম্বর বিপ্লবের কথা জানতে পারেন। যদি তাই হয় তা হলে উক্ত সৈন্যদের মধ্যে "মুর্তজা আলী"

(৪) কাজী নজরুল প্রসঙ্গে—লেখক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ পৃষ্ঠা—৬৪।
(৫) কাজী নজরুল প্রসঙ্গে—পৃষ্ঠা ৬৬।

লালফৌজে যোগ দিয়ে যে খ্যাতি অর্জন করেন সে কথাও নজরুল নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিলেন।[৬]

যে সময় নজরুল রুশ বিপ্লব সফল হওয়ার জন্য, আনন্দে আবেগে বন্ধুদের ব্যারাকের মধ্যে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে, গান গেয়ে, কবিতা পড়ে, প্রবন্ধ লিখে নিজের মনোভাবকে ব্যক্ত করে রুশ বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তখন ভারতবাসী ও বাঙালীরা প্রায় এসব বিষয় কিছুই জানতেন না, বা জানলেও কোন কিছু ব্যক্ত করতে দ্বিধা বোধ করতেন। বন্ধুদের কাছে আনন্দ ব্যক্ত করেই নজরুল শেষ করেন নি, ব্রিটিশ ফৌজ ছেড়ে যারা লাল-ফৌজে যোগ দিলেন তাঁদের তাঁর রচনার মাধ্যমে অভিনন্দন জানালেন। সেই জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম সৈনিক হিসাবে ও কবি সাহিত্যিক হিসাবে নজরুলকে প্রথম সোভিয়েৎ সুহৃৎ নিঃসন্দেহে বলা যায়।

(৬) কাজী নজরুল প্রসঙ্গে—পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭

একটি গোঁড়া পরিবার

১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারি সাপ্তাহিক "বিজলী" পত্রিকাতে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হয়। আমরা, তৎকালীন তরুণের দল, গান্ধিজীর আন্দোলনে তখন বিদ্যালয় ছেড়ে কংগ্রেসে ২৪ ঘণ্টার স্বেচ্ছাসেবক ও ছাত্র হিসাবে যোগ দিই। হুগলী সহরে শ্রীভূপতি মজুমদার অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষকে মধ্যমণি করে কংগ্রেস অফিসের সঙ্গে একটি জাতীয় বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা কয়েকটি ছেলে স্বেচ্ছাসেবক ও ছাত্র ছিলাম। তাদের মধ্যে বিশেষ যারা ছিলেন তাঁরা হলেন হামিদুল হক, সিরাজুল, হক, বিজয় মোদক, গোপাল মান্না, আমি ও আরো অনেকে। শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন বিপ্লবী মোক্ষদাচরণ সমাধ্যায়ী, ধরানাথ ভট্টাচার্য ও দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়। পরে এসে যোগ দেন গান্ধীবাদী প্রফুল্ল সেন ও অধ্যাপক অনাথনাথ বসু। প্রধান শিক্ষক ছিলেন বিপ্লবাচার্য অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ*।

"বিজলী" পত্রিকায় "বিদ্রোহী" কবিতা পড়েই প্রথমে হামিদুল হক ও বিজয় মোদক (এখন এম্, পি) কলকাতায় নজরুলেব সঙ্গে গিয়ে পরিচয় করে আসেন এবং বিদ্যামন্দিরে নজরুলকে আমন্ত্রণ কবে আসেন।

অজ্ঞাত অখ্যাত নজরুল ঐ এক "বিদ্রোহী" কবিতাতেই দেশের জনগণচিত্ত এমন জয় করে নিয়েছিলেন যে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে মুখে তখন ঐ "বিদ্রোহী" কবিতা দিকে দিকে প্রাণ সঞ্চার করে চলেছিল। এমনি করে দেশের মানুষ তখন ঐ একটি কবিতার সাথে নজরুলকেও আপন করে নিয়েছিল।

নজরুল বিদ্যামন্দিরের আমন্ত্রণে এলেন হুগলী কংগ্রেস অফিসে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি। আমরা স্বেচ্ছাসেবকরা নজরুলকে দেখেই আমাদের মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চারে শিহরণে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সেদিন নজরুল প্রথমেই গাইলেন রবীন্দ্রনাথের গান, "ও চাঁপা ও করবী", তার নিজের লেখা 'জাতের বজ্জাতি', "শিকল পরা ছল" প্রভৃতি গান। আবৃত্তি করলেন "বিদ্রোহী"। আমি পূর্বেই "বিজলী" থেকে 'বিদ্রোহী' কবিতা মুখস্থ করে

* জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। অধ্যাপক ঘোষকে কিছুদিন বাদে গান্ধীবাদী প্রফুল্ল সেন মহাশয় ষড়যন্ত্র করে বিদ্যামন্দির থেকে সরিয়ে দেন। এই সংবাদটি তিন বছর আগে "জনসেবক" দৈনিক পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় খুব বাহাদুরি করে লিখে প্রফুল্ল সেন আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন। যখন এই ঘটনা ঘটে নজরুল তখন হুগলীতে। তিনি এর খুব প্রতিবাদ করেন। সেই রাগে সেন মহাশয় কোনদিন নজরুলকে সহ্য করতে পারেন নি।

বিদ্যামন্দিরকে মাতিয়ে রাখতাম, মাতিয়ে রাখতাম হুগলী-চুঁচুড়ার তরুণ-দলকে। তাই বিজয় মোদক ও সিরাজ নজরুলের আবৃত্তির পর আমাকে বিদ্রোহী কবিতা আবৃত্তি করতে বলায় নজরুল আমাকে বার বার আবৃত্তি কবার জন্য বললেন। আমার আবৃত্তি শুনে নজরুল খুব উৎসাহিত হয়ে আমাকে আদর করে বুকে চেপে ধরে বললেন, "তোর আবৃত্তি আমার খুব ভাল লেগেছে, তুই আমার কাছে যাবি কলকাতায়।" 'তুমি' নয় একেবারে প্রথমেই 'তুই' বলে আমায় সম্বোধন করলেন। এমনি ছিলেন তিনি তরুণদের আপন জন।

এরপর প্রকাশ করলেন "ধূমকেতু" অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা! সপ্তাহে দুবার বার হোত ৩২নং কলেজ স্ট্রীট থেকে। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের ১২ই আগস্ট। আমাদের বিদ্যামন্দিরে বিক্রয়ের জন্য কপি আসত। আমি বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করতাম, বিক্রি করতাম রাস্তায় রাস্তায়। ছড়া বানিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে লোক জড় করে বিক্রি কবতাম—"ধূমকেতু" থেকে কবিতা পড়ে আবৃত্তি করতাম। নজরুল আমায় বলেছিলেন "লজ্জা বাধা, ভয়—তিন থাকতে নয়। যা করবি দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, তিনটেকে দূর করে দিয়ে করবি।" আমি তাই করে হুগলী-চুঁচুড়া, চন্দননগরে বেশ পরিচিত হয়ে পড়েছিলাম। চন্দননগরের সন্তান সঙ্ঘে তিনি বহুবার গেছেন, গেছেন কল্কি সঙ্ঘে নানা উৎসবে; প্রবর্তক সঙ্ঘেও গেছেন। এই তিনটি সঙ্ঘই ছিল সশস্ত্র বিপ্লবী যুগান্তর দলের আড্ডা। সন্তান সঙ্ঘের তিনি ছিলেন সভ্য। এই সঙ্ঘে আমিও যেতাম, নজরুলের দেশাত্মবোধক আবৃত্তি ও গান গাইতাম। এই সন্তান সঙ্ঘ ছিল বিপ্লবীদের আড্ডা। এর সভাপতি ছিলেন বিপ্লবী যোগেন্দ্রনাথ শেঠ। তিনি ছিলেন নজরুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সন্তান সঙ্ঘের সভাপতি শেঠ, কল্কি সঙ্ঘের বিপ্লবী ব্রজেন পাল, প্রবর্তকের শ্রদ্ধেয় অরুণ দত্ত, বিপ্লবী মনীন্দ্র নায়েকের সঙ্গে ছিল তাঁর অন্তরঙ্গতা।

পূজা এসে গেল। পূজায় নজরুল "ধূমকেতুতে" লিখলেন "আনন্দময়ীর আগমনে"। সরকার কবিতা বাজেয়াপ্ত করলেন। আমাদের কাছে বিক্রয়ের জন্য খুব বেশি সংখ্যায় পাঠায়েছিল কলকাতা থেকে। আমরা রাতারাতি সব বিক্রি করে ও নানা জায়গায় লুকিয়ে রেখে পরে অনেককে দিয়েছি। বিপ্লবী দলে একটি অস্ত্রের যা মূল্য ছিল তখন "ধূমকেতুর" মূল্যও ছিল তেমনি। একটি অস্ত্র জোগাড করে যেমন গোপনে রাখতাম তেমনি বাজেয়াপ্ত "ধূমকেতু" লুকিয়ে রাখায়ও কম উৎসাহ ছিল না। নজরুলের ঐ কবিতার জন্য এক বৎসব সশ্রম কাবাদণ্ড হল। সেন্ট্রাল জেল থেকে এলেন হুগলী জেলে, শহরে হুলস্থুল পড়ে গেল। দেওয়ালী সংখ্যা 'ধূমকেতুতে" বার হল "ম্যয় ভুখা হুঁ" প্রবন্ধ—তাও বাজেয়াপ্ত হল। বিচারের সময় যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন তাও আমাদের বিপ্লবী দলের কাছে বৈপ্লবিক দর্শনের মর্যাদা পেয়েছে।

হুগলী জেলে অনশন ভঙ্গ করানোর জন্য শ্রদ্ধেয় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এলেন বিরজাসুন্দরী দেবীকে নিয়ে হুগলীতে। উঠলেন হুগলী বিদ্যামন্দিরে।

হামিদুল হক, বিপ্লবী জনার্দন চক্রবর্তী, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে তাঁদের সঙ্গে গেলেন হুগলী জেলে। কবি সেদিন মাতা বিরজা-সুন্দরীর হাতে কমলালেবুর রস পান করে অনশন ভঙ্গ করেন।

তারপর একদিন বৎসরান্তে নজরুল মুক্ত হলেন বহরমপুর জেল থেকে। এলেন কলকাতায়। আমরা শুনলাম নজরুলের বিয়ে। বিয়ে হয়েছিল ৬নং হাজী লেনে ১৯২৪ সালের ২৪শে এপ্রিল মঈনুদ্দিন হোসায়নের পৌরহিত্যে।

শুনলাম, নজরুল হিন্দুর মেয়ে বিবাহ করে কলকাতায় খুব ফ্যাঁসাদে পড়েছেন। নববধূকে নিয়ে কোথায় উঠবেন? হিন্দু মুসলমান আত্মীয় বন্ধুরা সবাই কবির উপর তখন মহা খাপ্‌পা, বিশেষ করে 'প্রবাসী' পত্রিকার ব্রাহ্মদল, শনিবারের চিঠি ও আজাদের দল, আর নজরুলের চুরুলিয়ার আত্মীয় জ্ঞাতি বন্ধুরা। এদিকে তৎকালীন হুগলীর নেতা শ্রীভূপতি মজুমদার 'স্টেট-প্রিজনার' হয়ে জেলে, শ্রীমুজফ্‌ফর আহ্‌মদও তার আগেই বন্দী হয়ে গেছেন জেলে। হুগলীর হামিদুল, সিরাজুল হক, বিজয় মোদক ও বীরেন ঘোষ এইসব যুগান্তর দলের সভ্যরা দ্রুত পরামর্শ করে কবি ও কবির পরিবারদের কলকাতা থেকে নিয়ে এলেন হুগলীতে। এখানে এসেই নজরুল আমাকে বিশেষ করে কাছে টেনে নিলেন। আমি কবির কাছে আত্মসমর্পণ করে যেন অকূলে কূল পেলাম।

এখানে সবিনয়ে একটি কথা বলে নিতে চাই। আমার সঙ্গে নজরুলের এই ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ সম্পর্ককে তুলে ধরছি কেন? বহু পাঠক, বন্ধু স্বজনের অনুরোধে এ-কাজটি করতে হল। এতে যদিও আমি লজ্জা বোধ করছি, তবুও এ থেকে দেখা যাবে নজরুল তার দুর্বার গতি নিয়ে একটি গোঁড়া পরিবারে কেমন করে প্রেমের প্লাবন বইয়ে গোঁড়ামির গোড়া উৎপাটিত করে আত্মার আত্মীয় হয়েছিলেন আমাদের পরিবারে।

প্রথমেই বলে রাখি আমি মাতুল সংসারে মানুষ হয়েছি। আমার মাতুল ছিলেন উচ্চপদের পুলিস অফিসার; সেকালের পুলিসী দুর্ধর্ষতায় ডাকসাইটে লোক ছিলেন। তাঁর একটা মহৎ গুণও ছিল, তিনি বিপ্লবী দলের কাজকে গোপনে সাহায্য করতেন টাকা দিয়ে; নয় খবর দিয়ে তাদের সাবধান করে দিতেন, এ কথা ভূপতি মজুমদারের কাছেই শুনেছি।

আর আমার বাবা ছিলেন তেমনি কট্টর ব্রাহ্মণ—গোঁড়ামীর চরম-শীর্ষে বাস করতেন। তাঁর কাছে একমাত্র কালিদাস ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কবি ছিলনা, মাইকেল ম্লেচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ "পাম্নরা কবি।" দেশের স্বাধীনতাও চাইতেন,—ব্রাহ্মণ্য-শাসিত রাজ্য। এহেন বাড়ির ছেলে আমরা; আমি ও আমার কনিষ্ঠ শান্তি (পরিতোষ)। বাবাকে লুকিয়ে শান্তি নজরুলের বাড়িতে যেত। সে ছিল হুগলী বিপ্লবীদলের সর্বকনিষ্ঠ সভ্য। তখন বিপ্লবের পাঠ নিচ্ছে অত্যন্ত ধীরে ও কঠিন নিষ্ঠার সঙ্গে। আমার মত কোন হৈচৈ তার ছিল না, চুপচাপ। নজরুল, বিশেষ করে প্রমীলা দেবী তাকে আর হৃদয় মোদককে খুব

ভালবাসতেন। একার সংসারে দুটি যেন তাঁর সাথী স্বরূপ ছিল। বালিকা বধূর দুটি কিশোর দেওর।

নজরুলের নাম বাবা সহ্য করতে পারতেন না, তৎকালীন মোল্লা পুরুতের মতই। তাঁর ছেলে হয়ে আমি নজরুলের পিছনে পিছনে গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াই এটাও তাঁর সহ্য হোত না। তিনি ছিলেন কুলীন কন্যার ঘর-জামাই। আমি ছিলাম মাতুলালয়ের আদরের ভাগ্নে। তাই বাবা আমায় কিছু বলতে সাহসও করতেন না।

আমার মা ছিলেন সন্তান স্নেহে অন্ধ। তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল যে তাঁর ছেলেরা অন্যায় কাজ কখনও করবে না। তাই মা আমাদের বৈপ্লবিক-কর্ম-জগতের সাথী হয়ে গিয়েছিলেন।

আমাদের পরিবারের ব্রাহ্মণ্য আচার আচরণের মধ্যে নজরুল কি করে প্রবেশ করল? আমাদের পাশের বাড়িতে আমার এক দিদিমা, পাবনা জেলার জমিদারের বালবিধবা মেয়ে, গঙ্গাবাসের জন্য এসে বাস করতেন, তখন তাঁর বয়স সত্তরের ওপরে। তাঁকে দেখাশুনা আমরাই করতাম। তিনি প্রত্যহ ভোরে গঙ্গা স্নান করে পূজা আহ্নিক করতেন। আমার কাছে কবির গান, কবিতা, প্রবন্ধ, সব শুনে তিনি নজরুলের ভারী ভক্ত হয়ে ওঠেন। আমি ছিলাম তাঁর প্রিয় নাতি। তিনি নজরুলের শতায়ু কামনা করে তার নামে কল্যাণ কামনা করে ১০৮টি তুলসী ও বেলপাতা চাপাতেন তাঁর গৃহ-দেবতার মাথায়।

দিদিমার ঐ বাড়ির বৈঠকখানায় ছিল আমাদের বিপ্লবীদের প্রকাশ্য আড্ডা 'কল্যাণ সমিতি'। এতে ছিল লাইব্রেরী আর ব্যায়ামের ব্যবস্থা, গোপনে ছিল অস্ত্র শিক্ষা ও আমদানির ব্যবস্থা। আমি দিদিমার অনুরোধে নজরুলকে সেখানে আনলাম। সেদিন দিদিমা নিজহাতে নানারকম খাবার তৈরি করে সামনে বসে কবিকে ভোজন করান। এই দেখে আমার মামা নজরুলকে আনলেন আমাদের বাড়ি। বাড়ির বাইরে নয়, অন্দরে। খাওয়া দাওয়া হল, হল গান বাজনা। আবদার করলেন ভক্তিমূলক গান গাইবার জন্য। নজরুল তখনই একটা কীর্তন লিখে তাঁকে শোনালেন। এমনি করে হল ঘনিষ্ঠতা। মা তো বটেই, বাড়ির বৌদের সঙ্গেও তাঁর মেলামেশার বাধা ছিল না। এমনি করে বাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও নজরুল তাঁর ত্রিশূল হানলেন একটি কট্টর গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের গোঁড়ামীর মূলে। এর জন্য বাবার কাছে আমিই দায়ী ছিলাম। এমনি একটি বিষয় শ্রদ্ধেয় পবিত্রদা (গঙ্গোপাধ্যায়) লিখেছেন :—"যে নজরুল পরবর্তী জীবনে কালীর উপাসক হয়েছিলেন, 'মৌলোভী যত মৌলবী আর মোল্লারা' দেবদেবী নাম মুখে আনার অপরাধে যে 'পাজীটার' জাত মারবার ফতোয়া দিয়েছিলেন, 'কাফের কাজীও', সেই নজরুলকেই জন্মত মুসলমান হওয়ার অপরাধে তদানীন্তন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে কম নাকাল হতে হয় নি। আমার বাড়িতে নজরুলের অবাধ যাতায়াত এবং খাওয়া-দাওয়া চলত—এই অপরাধে আমার শ্বশুর বাড়ির গ্রামের লোক আমার স্ত্রীর হাতে খাদ্য

গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। অথচ কলকাতায় এসে আমার শ্বশুর শাশুড়ী নজরুলের গানে এবং আলাপে মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, এ-ছেলে হিন্দু কি মুসলমান, তা 'ভাববার অবকাশ নেই। ওর বন্ধুত্বের জন্য যদি সমাজে একঘরে হতে হয়; সে মূল্যও যথেষ্ট নয়।"

অনেক সময়ে মা নজরুলের চরম অভাবের সময় নজরুলের বাড়িতে দেখা করার অছিলায় বহু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে দেখা করতে তাঁর চকবাজারের বাড়িতে যেতেন। নজরুল তার স্বাভাবিক শ্রদ্ধা নিয়ে মা, দিদিমা, মামা প্রভৃতির সঙ্গে ব্যবহার করতেন উদারতার সঙ্গে। এই উদার স্বভাবের কোন ব্যতিক্রমই ছিল না, ছেলেমেয়ে বলে—তাঁরই কথায় বলা যায় "আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।" বিষয়-বিষ-বিকারাচ্ছন্ন লোকেরা তাঁকে এর জন্য নিন্দাবাদও করেছে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি—নজরুল যখন দিদিমার বাড়ির বৈঠকখানায় গান করতেন "জাতের বজ্জাতি", "সত্যমন্ত্র", "মিলন গান"—যেমন,

"জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছ জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে, জাত ছেলেব হাতের নয়ত মোয়া।"

আবার

"বলতে পারিস ভগবানের কোন সে জাত
কোন ছেলের তার লাগলে ছোঁয়া অশুচি হন জগন্নাথ
জাত সে শিকেয় তোলা রবে, কর্ম নিয়া বিচার হবে
তা'পর বামুন চাঁড়াল এক গোয়ালে, নরক কিম্বা স্বর্গে থোওয়া।"

অথবা "সত্যমন্ত্র" থেকে :—

"পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর
বিধির বিধান সত্য হোক, বিধির বিধান সত্য হোক
জাত সমাজের নাই সেথা ঠাঁই
জগন্নাথের সাম্য লোক, জগন্নাথের তীর্থ লোক।"

অথবা 'মিলন গান' থেকে :—

"ভাই হয়ে ভাই চিনবি আবার গাইব কি আর এমন গান
সেদিন দুয়ার ভেঙ্গে আসবে জোয়ার মরা গাঙে ডাকবে বান"
"...(তোরা) বাঁদর ডেকে মানলি শালিস, ভাইকে দিতে ফাটল প্রাণ
(এখন) শালিস নিজেই যা-ভাল-সব বোকা তোদের এই (কলা) দেখান"

অথবা—

"(তোদের, হাড় খেয়েছে মাস খেয়েছে এখন চামড়াতে দেয় হ্যাচকা টান
(তোদের) কলজে চুঁয়ে গলছে রক্ত, দলছে পায়ে ডলছে কান" ইত্যাদি

প্রভৃতি গান গাইতেন, তখন আমার বাবার বন্ধু বেদান্ত শাস্ত্রী, সাংখ্যতীর্থ, মৌলবী, মৌলানা প্রভৃতি রাস্তার ধারে ছোঁয়া বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনতেন।

এবং পরে তাঁরা আমাদের বৈঠকখানায় বাবার আসরে নজরুলের গান গাইবার, লিখবার বহুত তারীফ্ করতেন। তারীফ্ করতেন শব্দ বিন্যাসের আর তীক্ষ্ণ যুক্তিরও। তবু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা নজরুল মুসলমান বলে প্রকারান্তরে অশ্রদ্ধা ব্যক্ত করতেন, বৃদ্ধ মৌলবী মোল্লারা মুসলমানের ছেলের এমন কাফিরী ব্যবহারকে অভিশপ্ত করতেন। কিন্তু বাবা ছাড়া, মা মাস-দিদিমা ও পাড়ার লোকেরা নজরুলকে শ্রদ্ধা করত, সমাদর করত বাড়ি বাড়ি আমন্ত্রণ জানাত। আমারও একটা স্নেহের স্থান শহরে, গ্রামে নজরুলের বন্ধু বলে বিস্তারলাভ করেছিল।

নজরুল আমার ভিতর যা গুণ বলে মনে করতেন তাকে উন্নত করার জন্য কী যত্নই না নিতেন। কী করে আমি বড় হব, সমাজের মধ্যে আমি ভালবাসার পাত্র হব, তার জন্য তাঁর কত ভাবনাই না ছিল। যত বই বার হোত তার এক কপি করে আমায় আশীর্বাদ স্বরূপ দিতেন। যা লিখতেন তা প্রমীলা দেবী, মাসীমা (শাশুড়ী) ও আমাকে প্রথম শোনাতেন। গান লিখলে সুর দিয়েই আমাদের শুনিয়ে ছাড়তেন। আমি আবৃত্তি করতে পারার জন্য, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর কাছে যাতে ভাল আবৃত্তি শিখতে পারি তার জন্য। আমার আবৃত্তি শুনিয়েছেন ভাদুড়ী মহাশয়কে। ভাদুড়ী মহাশয়ও আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন আমাকে, নজরুলও সেখানে আবৃত্তি করেছেন। আবার নিয়ে গেছেন নির্মলেন্দু লাহিড়ীর কাছে। লিখবার প্রবণতা ছিল বলে তিনি সযত্নে আমাকে ছন্দ-বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। ভাষার ভাণ্ডার কী করে সমৃদ্ধ করতে হয়, প্রবাদ বাক্য কী করে রচনায় ব্যবহার করতে হয় এই সব নির্দেশ দিয়ে আমায় গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

বহুদিন চেষ্টার পর প্রথম দুটি কবিতায় আমার ছন্দের মিল দেখে কী আনন্দ প্রকাশই না করেছিলেন। আমার এক বন্ধুকে পত্রে লিখেছিলেন: "প্রাণতোষকে দেখলাম, তার মনের কবি বোধ হয় তোর অগ্রজ। তার কবি শিশু এখন বেশ চলতে শিখেছে, আগে পা' পেছলাত এখন পা শক্ত হয়েছে। চলার মিল ছিল না আগে, এখন দুইটা চরণই বেশ মিলে-মিশে চলছে—ওর দুঃখের দিন ঘনিয়ে এল বলে। অর্থাৎ কবি বলে পরিচিত হল বলে।"১

আমি কবি বলে পরিচিত হইনি। পরিচিত হয়েছি কবি নজরুলের সাথী বলে। তাই তাঁর আশীর্বাদ স্বরূপ 'ওর দুঃখের দিন ঘনিয়ে এল বলে' কথাটি মাথায় তুলে নিয়ে জীবন-সন্ধ্যায় এসে পৌঁছেছি। তিনি আমাকে আর একটা কথা বলেছিলেন, "তোর কলমকে বড়লোকের বাইজী করিসনে—লক্ষ্মীর-প্যাঁচার প্যাঁচে নিজেকে বিলিয়ে দিসনে।" আমি তাঁর এ বাণীর মর্যাদা আজও রেখে চলেছি। তা না হলে ছাইপাঁশ লিখে মন রাখা রচনায় পয়সা রোজগার করে 'সুখে থাকার' পথই ধরতাম।

(১) কবি শচীন করকে (হাবুল) লেখা চিঠি

ফরিদপুরে

১৯২৫ সালে ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। সভাপতিত্ব করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপ্লবী নেতা পূর্ণ দাস তাঁর শান্তিসেনা দল নিয়ে উপস্থিত। দক্ষিণপন্থী যদুপাল, নিবারণ পাল প্রভৃতি সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ।

২রা মে দেশবন্ধু তাঁর ভাষণ দেন। সর্বসাধারণের কাছে এই তাঁর শেষ ভাষণ। কারণ ফরিদপুর থেকে ফিরে এসে দার্জিলিং যান। জুন মাসের ১৬ই তারিখ বৈকাল ৫টায় দার্জিলিং-এ বাংলা দেশকে অনাথ করে তিনি মহাপ্রয়াণ করেন।

দেশবন্ধু যে কদিন ফরিদপুরে ছিলেন নজরুল সে কদিন তাঁর কাছেই থাকতেন। দেশবন্ধুও তাঁকে কাছ ছাড়া করেন নি।

নজরুল ফরিদপুরে গেলেই বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা ও উকিল স্বর্গগত দীনেশ সেন মহাশয়ের বাড়িতেই প্রথম উঠতেন। সেন মহাশয় ও তাঁর স্ত্রী নজরুলকে ছেলের মত স্নেহ করতেন। নজরুলও তাঁদের আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। দীনেশ সেন মহাশয়ের বাড়ি ছিল বাংলাদেশের বিপ্লবীদের ও কংগ্রেসীদের হস্টেল বিশেষ। বাইরে থেকে যাঁরাই যেতেন, তাঁদের আশ্রয়ে সকলেই থাকতেন ও স্নেহযত্নে সকলেই আপ্যায়িত হতেন, বিশেষ করে দীনেশ বাবুর স্ত্রীর মায়ের মত ব্যবহারে।

এই সময়ে দেশবন্ধু, নজরুল ও আরো অনেকেই দীনেশবাবুর বাড়ি গুলজার করে রেখেছিলেন। দীনেশবাবুর সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান মৃণাল সেন চলচ্চিত্র জগতে আজ ভারতের স্থান গৌরব শিখরে স্থাপন করেছেন। নজরুল এই সময় হুগলীতে থাকতেন।

এই সম্মেলনে বহু বাদ-প্রতিবাদ হয়। দেশবন্ধুর "হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট"-এর বিষয় নিয়ে অনেকে বিদ্রূপও করে; ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের প্রস্তাব নিয়েও বহু চোরাবাণ তাঁর বুকে বেঁধে। এই সম্মেলনেই নজরুল একটি ব্যঙ্গাত্মক গান লেখেন। "প্যাক্টের আসনাই"। দেশবন্ধুর প্যাক্টকে বিদ্রূপ করে। "বদনা গাড়ুতে ঠোকাঠুকি লাগে প্যাক্টের আসনাই"—দেশবন্ধু এ গান শুনে খুবই আনন্দ প্রকাশ করেন, আরও বিস্মিত হন নজরুলের এই ক্ষমতা দেখে। কারণ যখন প্যাক্টের বিষয় নিয়ে তর্ক হচ্ছে তখনই এটা লেখেন, সুর দেন এবং গেয়ে শোনান। একটা ব্যথা নিয়েই তিনি দার্জিলিং গিয়েছিলেন। ফিরে এসে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিরোধ মেটাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তা আর হল না। কবি নজরুল এই সম্মেলনের পরে অল্প কয়েকদিন মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীর (জমিদার মইজুদ্দি বিশ্বাসের পুত্র লাল মিঞা) অনুরোধে তাঁদের বাড়িতে থাকেন। আর সমগ্র ফরিদপুর শহরকে গানে, আবৃত্তিতে মাতিয়ে দেন। তাঁর আগমনে ফরিদপুরের

তরুণ সম্প্রদায় বিশেষ করে মুসলমান তরুণদের মধ্যে নূতনভাবে উৎসাহের ও প্রাণের সঞ্চার হয়। মাদারীপুরের ইস্কান্দার এম. এ ও ল পড়ছে; সে নজরুলকে তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ করেছিল। এরা নজরুলের সংস্পর্শে দেশভক্ত হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে নজরুল-ভক্ত বিপ্লবী জীবন মোল্লার কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে। জীবন মোল্লা বিপ্লবী দলের বিশ্বাসী সভ্য ছিলেন। তারপর ইনি বোমা প্রস্তুত করতে গিয়ে আহত হন, পরে যতদূর মনে পড়ে "চর মুগরিয়া" ডাক লুট মামলায় আসামী হয়ে জেলও খাটেন। এঁর মত উদার ও আত্মভোলা যুবকর্মী কমই দেখা গেছে। নজরুল এঁকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন।

লালমিঞার বাড়িতেই "নকসী কাঁথার মাঠ"এর কবি জসীমের সঙ্গে কবি নজরুলের আলাপ হয়। তাঁর সহজ সরল মেঠো ভাষার কবিতা শুনে নজরুল জসীমকে খুব উৎসাহ দেন। জসীমের গোবিন্দপুরের বাড়িতেও কবি গিয়েছিলেন। লালমিঞা এই সময় তরুণ নেতারূপে আস্তে আস্তে মাথা তুলে উঠছেন। কবি নজরুল কোনও লোকের গুণ দেখলে তাকে যত প্রকারে হয় সাহায্য করতেন। লালমিঞাকে নেতারূপে খাড়াও করেন নজরুলই।

পরবর্তীকালে অবশ্য নজরুল নেতা লালমিঞার চাল-চলনে দুঃখই পেয়েছিলেন। কারণ তরুণ জীবনে তিনি নেতৃত্বের মোহে আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে যান।

কয়েকমাস পরে কবিকে ফরিদপুরের হিন্দু মুসলিম তরুণ বিপ্লবী দল আবার ফরিদপুরে নিয়ে যান। কবি নজরুলের সঙ্গে এইবার এমন একটি অপূর্ব চরিত্রের ব্যক্তির আলাপ হয় যাঁর কথা তিনি জীবনেও ভুলতে পারেননি। তিনি হচ্ছেন হুমায়ুন কবীরের পিতা কবীরুদ্দিন আহমেদ। সৌজন্যে, জ্ঞানের গভীরতায়, মধুর ব্যবহারে এক মুহূর্তে ছোট বড় সকলের চিত্ত জয় করে নিতেন তিনি। কবি এইবার গিয়ে কবীরউদ্দিন সাহেবের বাড়িতে অতিথি হন। নজরুলের সঙ্গে হুমায়ুন কবীরের 'ধূমকেতু' অফিসে আলাপ হয়েছিল। সেইদিন থেকে কবীরসাহেব নজরুলকে শ্রদ্ধা করতেন। নজরুলও কবীরসাহেবকে স্নেহ করতেন।

কবি নজরুল কবীরসাহেবের বাড়িতে ঢুকেই দেখেন যে দোতলার সিঁড়ির সামনেই মস্ত বড় একটি শ্বেত পাথরে বড় বড় লাল অক্ষরে খোদাই করা কথাগুলি—

"বল বীর
বল চির উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি
নতশির ওই শিখর-হিমাদ্রী।"

দেখেই কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে দোতলায় উঠে গানে, গল্পে, পরিহাসে ঘন্টার পর ঘন্টা মাতিয়ে রাখেন।

হুমায়ুন কবীর এই সময় ছাত্র হিসাবে দেশের যেমন মুখ উজ্জ্বল করেছেন তেমনি ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে থেকে অন্যান্য ছাত্র নেতাদের সঙ্গে পরিচালনাও করেছেন। এমনি সময় কবি গেলেন ফরিদপুরে।

"ওয়াহাবী" আন্দোলন যখন ভারতব্যাপী ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন রূপে ছড়িয়ে পড়েছিল, হিন্দু মুসলিম চাষীদের মধ্যে তখনই ফরিদপুর জেলায় দুদুমিয়ার নেতৃত্বে "ফরাজী" আন্দোলন শুরু হয়। হুমায়ুন কবীরের মাতামহবংশ ছিলেন এই ফরাজী আন্দোলনের নেতার হাতিয়ার স্বরূপ। কবীরের মাও ছিলেন মহীয়সী মাতৃরূপা মহিলা।

ফরিদপুরের তরুণ সম্প্রদায়, বৈপ্লবিক জগতের অগ্নিময় আবহাওয়ার উত্তাপকে অবাধে শ্বাসে শ্বাসে বুক ভরিয়ে তুলছিল, তাতে আবার তারা বিদ্রোহী কবিকে পেয়েছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য, উদ্দাম আনন্দ তাদের মৌজ করে দিল।

এই গরম আবহাওয়ায় কবির সঙ্গে পরিচয় হল এক নীরব ভক্তের। এর নাম সৈয়দ আবদুর রব। মানুষের কবির সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় হল, মানুষের সেবকের বা খাদেমের সঙ্গে। বৈপ্লবিক আবহাওয়ার মধ্যে কবি সৈয়দ রবের স্বভাবে দেখলেন জাতির গোঁড়ামী বর্জিত এক শান্ত সৌম্য প্রেমিকের মহান রূপ। তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে বুঝলেন এই তরুণ কালে নব সমাজের সেবকের রূপে হবে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, প্রতিভাত। তাঁকে কবি আশীর্বাদ করে সেবাকার্যে এগিয়ে যাবার জন্য উৎসাহ দিলেন।

নিজ-প্রতিষ্ঠিত "খাদেমুল এনসান সমিতি" সেবা প্রতিষ্ঠানকে সেই উৎসাহে সৈয়দ আবদুর রব এক বৃহত্তর সেবাব্রতের কর্মসূচীতে নিয়োগ করলেন। প্রকাশিত হল "মোয়াজ্জিন" নামে সমিতির মুখপত্র এক মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকায় নজরুল লিখলেন তাঁর সুবিখ্যাত 'মোয়াজ্জিন' কবিতাটি। এই পত্রিকায় পরে কয়েকটি গান, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখে-ছিলেন। এই সমিতি করতে গিয়ে সৈয়দ রব জাতির কাছে যেমন লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন, তেমনি আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থও হয়েছিলেন। তিনি নজরুলের এই চারটি লাইনকে মন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন—

"গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান্।
নাই দেশকাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।"

কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলার এক ঘরে তার ছিল সমিতির ও 'মোয়াজ্জিন' পত্রিকার অফিস। এই অফিসে নজরুলের হাতের লেখায় ঐ কবিতার লাইন কয়টি প্রবেশদ্বারে শোভা পেত। এর হেড অফিস ছিল ফরিদপুরে। খাদেমুল এনসানের খাদেমরা আসাম থেকে সুদূর বঙ্গে পর্যন্ত ছড়িয়ে

পড়েছিল সেবাকার্যে। নজরুলের স্নেহ শুভদৃষ্টি সব সময়ই এদের উদ্যমের অগ্রগতিতে সাহায্য করেছিল। কয়েকবার নাটক ও গানের মজলিস করেও তিনি অনেক টাকা তুলে দিয়ে এদের সাহায্য করেছিলেন।

হুমায়ুন কবীরের বাড়িতে যেমন 'বিদ্রোহী' উদ্ধৃতির খোদাই ছিল পাথরে ; সৈয়দ রবের হৃদয়ে, প্রচারে, কর্মে, রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে ছিল উপরোক্ত চার লাইন। সে যে সেবা করত তাতে হিন্দু ছিল না, ছিল না মুসলমান, খ্রীষ্টান, বড়লোক গরীব লোক। যখন যার সেবার ও সাহায্যের প্রয়োজন হত তাকেই তিনি ভরপুর প্রেম দিয়ে সেবা করতেন। রবকে বাঙলার হিন্দু-মুসলমান সকলেই সাহায্য করত। রবীন্দ্রনাথও রবকে স্নেহ ও আশীর্বাদধন্য করেছেন। কিন্তু গোঁড়াদের অত্যাচারে তিনি খাদেমুল এন্‌সান সমিতি তুলে দিতে বাধ্য হন শেষ পর্যন্ত।

নজরুলের স্পর্শ পেয়ে ফরিদপুরের মুসলমান তরুণ ও ছাত্রসমাজ যেমন উদারতার সঙ্গে এগিয়ে এসেছিল আন্দোলনে, সমাজ সেবায়, হিন্দু-মুসলমানের গভীর সখ্যতায়, তার পরিচয় পাওয়া যাবে তৎকালীন নানা-কর্মানুষ্ঠানের পরিচয়ের মধ্যে। ফরিদপুরে নজরুলের কথা চিন্তা করলে হুমায়ুন কবীর, জীবন মোল্লা, জসীমউদ্দীন ও সৈয়দ আবদুর রবের কথাই বারে বারে মনে পড়ে।

চট্টগ্রামে

অসহযোগ আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকার দেশব্যাপী বেড়াজাল দিয়ে ছোট বড় কর্মী ও নেতাদের ছেঁকে তুলে জেলখানায় পুরে ফেলে আন্দোলনকে চেপে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে দেশের কর্মী ও নেতাদেরই সুবিধা হল। কারণ ভিন্ন ভিন্ন জেলে বিভিন্ন জেলার কর্মীদের পরিচয় আর বন্ধুত্বও পাকাপাকিভাবে গড়ে উঠে। নরম-পন্থীদের থেকে চরম-পন্থীদেরই (বিপ্লবী) সুবিধা হয়েছিল বেশি।

১৯২৩ সাল থেকে ব্রিটিশ সরকার এক এক করে নানা জেলার কর্মী ও নেতাদের ছেড়ে দিতে শুরু করল। ১৯২৫ সালে প্রায় জেল খালি হয়ে গেল।

কেবল দুই একজন বিপ্লবী বড়দাদারা জেলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য রয়ে গেলেন। অন্যান্য যে সব কর্মীরা বাইরে এলেন তাঁরা ভবিষ্যৎ আন্দোলনের জন্য কর্মপন্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। বিভিন্ন জেলের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করে চট্টগ্রামের কর্মীরা চট্টগ্রামে "নিখিলবঙ্গ যুব সম্মেলন" ডাকলেন। যতদূর মনে পড়ে এই সভায় সভাপতিত্ব করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, দ্বিতীয় দিনে অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও তৃতীয় দিনে পূর্ণচন্দ্র দাস। অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

প্রথমদিনে সভার উদ্বোধন করেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল। উদ্বোধন সঙ্গীতও কবিকেই গাইতে হয়েছিল। চট্টগ্রামে যাবার পথে কবি নজরুল তাঁর প্রিয়বন্ধু অগ্রজপ্রতিম মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সন্দীপের বাড়িতে কয়েকদিন কাটিয়ে যান। মুজফ্‌ফর সাহেবের বাড়ির আদর যত্নের কথা তিনি প্রায়ই বলতেন। সেখান থেকে চট্টগ্রামে গিয়ে হবিবুল্লা বাহারসাহেবের তামা-কুমণ্ডির বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি বেশ কিছুদিন ছিলেন।

জনাব হবিবুল্লা বাহার ও তাঁর ভগ্নী সামসুন্‌নাহার তৎকালীন ছাত্র আন্দোলনে যথেষ্ট নাম করেছিলেন। এদের যে বাড়িতে কবি উঠেন সে বাড়িটি মস্ত বড় একটা বাগানের মধ্যে ছিল। সেই বাগানের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল সারবন্দি সুপারি গাছের শোভা। এই বাগানের একটি নির্জন ঘর কবিকে থাকবার জন্য বাহার পরিবার ছেড়ে দেন। এই ঘরে বসে কবি বহু কবিতা রচনা করেছিলেন। এইখান থেকেই তিনি সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনের অভিভাষণে কবি নজরুল, সুভাষচন্দ্র, পূর্ণ দাস, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি যুবসমাজকে সোজাসুজি ব্রিটিশ সরকার ও ফিরিঙ্গির গোলামদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণের আহ্বান জানান। যতদূর মনে পড়ে পূর্ণ দাস ও অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্রের ভাষণ পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে সারা বাংলাদেশের কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সম্মেলন শেষ হবার পর কবি বাহারসাহেবের সঙ্গে চট্টগ্রামের নানা জায়গায় ঘুরে দেখেন। কর্ণফুলী নদী দেখতে গিয়ে কবি এমন মুগ্ধ হয়ে যান যে এক অঞ্জলি জল নিয়ে নদীতে অর্ঘ্য দেন ও কর্ণফুলী কবিতায় লেখেন—

"ওগো ও কর্ণফুলি।
তোমার সলিলে পড়েছিল কবে কার কানফুল খুলি?
তোমার স্রোতের উজান ঠেলিয়া কোন তরুণী কে জানে?
'সাম্পান' নায়ে ফিরেছিল তার দয়িতের সন্ধানে?
আনমনা তার খুলে গেল খোঁপা কানফুল গেল খুলি,
সে ফুল যতনে পরিয়া কর্ণে হলে কি কর্ণফুলি।"

এরপর কবি নজরুল বাহার ও নাহার দুই ভাই বোনকে দু লাইনে লেখেন—

"আলোর মত জ্বলে ওঠ। উষার মত ফোটো।
তিমির চিরে জ্যোতির মত প্রকাশ হয়ে ওঠো।"
৩০.৭.২৬

বাহার ও নাহার দুই ভাইবোনের যত্নে স্নেহ-পাগল নজরুল মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই এর পরের কবিতাটিতে লেখেন—

"কে তোমাদের ভালো?
"বাহার" আনো গুলসনে গুল "নাহার" আনো আলো।
"বাহার" এলে মাটির রথে ভিজিয়ে সবুজ প্রাণ,
"নাহার" এলে রাত্রি চিরে জ্যোতির অভিযান।
তোমরা দুটি ফুলের দুলাল আলোর দুলালী।
একটি বোঁটায় ফুটলি এসে নয়ন ভুলালী।
নামে নাগাল পাইনে তোদের নাগাল পেল বাণী
তোদের মাঝে আকাশ ধরা করছে কানাকানি।"
৩১.৭.২৬

"বাহার" শব্দের অর্থ বসন্ত ও "নাহার" মানে দিন। পরবর্তীকালের "সিন্ধু হিন্দোল" নামক গ্রন্থটী এই কবিতাসহ বাহার ও নাহারকে কবি উৎসর্গ করেন।

এই "সিন্ধু হিন্দোল" গ্রন্থটিতে "সিন্ধু" নামক তিনটি কবিতা আছে। তাও ঐখানে লেখা। কবি নজরুল চট্টগ্রামে গিয়ে সমুদ্র দেখে যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, তেমনি একট মত্ততার আবেগ তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এই সময় সমুদ্র ও কবি যেন একই, এমনি একট ভাব ব্যক্ত করতে লাগলেন

কথায় ও ভাবে। পরে কবি নজরুল "সিন্ধু" কবিতায় কবি ও সমুদ্র এক, এই কথাই নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন—

"হে সিন্ধু, হে বন্ধু, হে মোর চির বিরহী।
হে অতৃপ্ত। রহি রহি
কোন বেদনায়
উদ্বেলিয়া উঠ তুমি কানায় কানায়।'

(১)

"বন্ধু ওগো সিন্ধু রাজা স্বপ্নে চাঁদ মুখ
হেরিয়া উঠিলে জাগি, ব্যথা করে উঠিল ও বুক!
কী যেন সে ক্ষুধা জাগে; কী যেন সে পীড়া,
গলে যায় সারা হিয়া, ছিঁড়ে যায় যত স্নায়ু শিরা।
নিয়া নেশা, নিয়া ব্যথা সুখ
দুলিয়া উঠিলে সিন্ধু উৎসমুখ উন্মুখ।
কোন প্রিয়-বিরহের গভীর ছায়া
তোমাতে পড়িল যেন, নীল হল তব স্বচ্ছ কায়া।"

সিন্ধুর সুগভীর উদ্বেলতা কবি নজরুলের জীবনের গভীর প্রেমানুভূতির উদ্বেলতার সঙ্গে যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে।

(২)

তারপর দ্বিতীয় তরঙ্গে বললেন—

"এসো বন্ধু মুখোমুখি বসি,
অথবা টানিয়া লহ তরঙ্গের আলিঙ্গন দিয়া দুঁহু পশি।
ঢেউ নাই যেথা—শুধু নিতল সুনীল।
তিমিরে কহিয়া দাও—সে যেন খোলে না খিল
থাকে দ্বারে বসি।
সেইখানে কব কথা। যেন রবি শশী
নাই পশে সেথা।
তুমি রবে—আমি রব—আর রবে ব্যথা।
সেথা শুধু ডুবে রব কথা নাহি কহি ;—
যদি কই
নাই সেথা দুটি কথা বই ;
আমিও বিরহী বন্ধু ; তুমিও বিরহী।"

বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হয় কবি সেই মহাবিরহী মহাসমুদ্রের সঙ্গেই কথা বলছেন।

(৩)

তারপর তৃতীয় তরঙ্গে লিখলেন—

"হে মহান! হে চিরবিরহী!
হে সিন্ধু হে বন্ধু মোর, হে মোর বিদ্রোহী,
সুন্দর আমার!
লত নমস্কার।
তুমি শূন্য, আমি শূন্য, শূন্য চারিধার।
মধ্যে কাঁদে বারিধার; সীমাহীন রিক্ত হাহাকার।"

এর পর লিখলেন "অনামিকা" কবিতা।

"প্রেমের কোন নাম নেই, নেই কোন সীমা।
যে নাম বা যে সীমায় প্রেমকে ধরিতে চায়
মন সে-নাম বা সে-সীমা সত্য নয়, সত্য সেই
চিরন্তন প্রেম, যে প্রেম যুগ থেকে যুগে—"

সীমায় বাঁধা পড়েও অসীম তারই হদিস কবি এই কবি বন্ধু সমুদ্রকে কাছে পেয়ে লিখলেন—

"প্রেম সত্য, প্রেম-পাত্র বহু অগণন,
তাই চাই, বুকে পাই তবু কেন কেঁদে ওঠে মন।
মদ সত্য পাত্র সত্য নয়;
যে পাত্রে ঢালিয়া খাও সেই নেশা হয়।
চির সহচরি।
এতদিনে পরিচয় পেনু; মরিমরি।"

বাহার সাহেবের বাড়িতে লেখেন "চক্রবাক্" ও "বাতায়ন পাশে" "গুবাক তরুর সারি" "শীতের সিন্ধু" প্রভৃতি। বাহার সাহেবের বাগানের নির্জন কক্ষে কবি চখাচখির ডাক শুনে চকিত হয়ে উঠতেন। সারি সারি সুপারি গাছের পাতার শব্দে ভাবপ্রবণ মন মগ্ন হয়ে যেত। তিনি চক্রবাক্ কবিতায় লিখলেন :—

"ওগো ও চক্রবাকী
তোমারে খুঁজিয়া অন্ধ হল যে চক্রবাকের আঁখি"

পরে ফিরে আসবার সময় বাতায়ন পাশে সুপারি গাছের সারিকে বললেন—

"বিদায় হে মোর বাতায়ন পাশে
নিশীথ জাগার সাথী—

ওগো বন্ধুরা, পাণ্ডুর হয়ে এল
বিদায়ের রাতি।"

এর পর আরো কয়েকদিন থাকেন "সাম্পান" মাঝিদের সঙ্গে সাম্পান নৌকায়। এই মাঝিরা এই নৌকাতেই পরিবার প্রভৃতি নিয়ে বাস করে। এদের মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ খুব কমই। এই সাম্পানে থাকাকালীন তিনি অসংখ্য ভাটিয়ালি গান লেখেন।

"নদীর ও জল শুকায় রে ভাই
সে জল আসে ফিইরা
আর মানুষ গেলে ফেরে নারে
দিলে মাথার কিরা
আমি ভালবাইসা গেলাম ভাইসা
আমি হইলাম দ্যাশান্তরী।"

এমনি অপূর্ব সব সঙ্গীত। এই সব সঙ্গীত "হিজ মাস্টার্স ভয়েস" কোম্পানী রেকর্ডের মাধ্যমে আমাদের পরিবেশন করেছিল।

দরদী নজরুল

(১)

কবি নজরুল ইসলাম যখন হুগলীতে ছিলেন তখন প্রায়ই তাকে কলকাতায় যেতে হত। নজরুল "দামাল" ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর আড়ালে ছিল অতি কোমল একটি মন। সেই মনের উপর বিচ্ছুরিত হত মনীষার আলো। সেই আলোতে সাধারণ বুদ্ধিজীবিরা যা দেখতে না পেতেন, তিনি তা দেখতে পেয়ে তাঁর তীব্র, মধুর ভাষা দিয়ে সেই রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। কলকাতায় সারাদিন ঘোরাঘুরির পর সাথীদের নিয়ে হ্যারিসন রোড়ের "দিলখোস কেবিন" রেস্তোরায় খাওয়াদাওয়া এবং সাহিত্য আলোচনা করতেন। ঐ সময় বিভিন্ন কাগজে কবির যে সব লেখা বেরুত তার জন্য দেয়ালে দেয়ালে বিজ্ঞাপন দিতেন পত্রিকার কর্তৃপক্ষরা। কবির সাক্ষাতেব জন্য কেবিনেব আশে পাশে ভীড় জমত।

দিলখোস কেবিনের সিঁড়ির নিচে তখন একটি নারী, কোলে একটি ফুট-ফুটে ছেলে নিয়ে ঘোমটা দিয়ে ভিক্ষা করত। অত্যন্ত সংযত তার আচরণ দেখে ভদ্র ঘবের মেয়ে বলেই মনে হত। আশে পাশে রকমারি ভিক্ষুকের ভীড়ে সুন্দর শিশু কোলে করে দীর্ঘ ঘোমটা দিয়ে মেয়েটি শুধু হাত পেতে বসে থাকত, মুখ ফুটে কখনও ভিক্ষা চাইত না। নানা দিক থেকে তাকে কটাক্ষ করে নানা গুঞ্জণ শোনা যেত পথিকদের মধ্যে। ভিক্ষা দেওয়ার বদলে স্থূল রসিকতার দু'চারটে ইঁট পাটকেল ছুঁড়ে দিত কেউ কেউ তার দিকে। তখনকার চিন্তাশীল শিল্পী, লেখক ও দেশ ভক্ত কর্মীদের অনেকে দিলখোসে আসতেন। মেয়েটিকে নিয়ে যে সব শালীনতাহীন আচরণ এবং অভদ্র উক্তির ইঙ্গিত হত সকলেই তা বিনা প্রতিবাদে সহ্য করতেন। নজরুল কিন্তু ব্যথা পেতেন, ও খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতেন।

এই সময়ে "লাঙল" পত্রিকায় কবির বিখ্যাত কবিতা একটার পর একটা বার হচ্ছে! "সাম্যবাদ" কবিতাবলীও "লাঙলে" প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে "বারাঙ্গনা" নামে একটা কবিতা আছে। উক্ত কবিতাটি পুস্তিকা রূপে প্রকাশের পর সমাজের প্রত্যেক স্তরে যেমন প্রচুর বিক্রি হয়েছিল, তেমনি কলকাতার বারাঙ্গনারাও প্রচুর কিনেছিল। তাতে লেখা আছে—

"নাই হ'লে সতী, তবু তো তোমরা মাতা ভগিনীরই জাতি,
তোমাদের ছেলে আমাদেরই মত, তারা আমাদেরই জ্ঞাতি।
আমাদেরই কোন বন্ধুস্বজন আত্মীয় বাবা কাকা—
পিতা উহাদের ; উহাদের মুখে মোদেরই চিহ্ন আঁকা।
শোন মানুষের বাণী
জন্মের পর মানব জাতির থাকে নাকো কোন গ্লানি।"

এই লাইন কটি প্রকাশিত হবার পূর্বে যে ঘটনাটি ঘটে, তা ঐ ভিখারিণীকে নিয়ে। কবি তখন সারা দেশে মধ্যাহ্ন সূর্যের মত প্রদীপ্ত ও প্রতিভাত। যেখানে যেতেন যুবক দলের ভীড় লেগে যেত। একদিন সন্ধ্যায় কয়েকটি বন্ধু নিয়ে কবি কেবিনে ঢুকতে যাচ্ছেন এমন সময় একজন প্যান্ট কোট পরা চুস্ত্ বাঙালী সাহেব তার সন্ধ্যার ভোজন সমাপ্ত করে বেরিয়ে আসতে আসতে তাকে বলতে শুনলেন—"ভিখারীর আবার ছেলে হবার সখ!"—বলেই ঘৃণায় তিনি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। অনেক দিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ নজরুলকে সহসা যেন চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতো নাড়া দিল। আরক্ত চোখে লোকটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার জামার কলার চেপে ধরে দুএকটা ঝাঁকানি দিয়ে যে-সব কথা তিনি ভর্ৎসনার সুরে বলেছিলেন, তাইই পরে উক্ত "বারাঙ্গনা" কবিতার ছত্রে ছত্রে ফুটে ওঠে। পরে একটি প্রবন্ধেও বিত্ত ও অর্থবান সমাজপতিদের ব্যঙ্গ করে ঐ ঘটনাটি উল্লেখ করেছিলেন। বাজেয়াপ্ত "রুদ্রমঙ্গল" কিংবা "দুর্দিনের যাত্রী" কোন্ বইতে যে প্রবন্ধটি রয়েছে তা মনে নেই। "দুর্দ্দিনের যাত্রী" বইটির প্রকাশক ছিলেন "বর্মন পাবলিশিং হাউস"। সেদিন নজরুল আর কেবিনে ঢোকেন নি। সমস্ত টাকা পয়সা মেয়েটিকে উজাড় করে দিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।[১]

(২)

আর একদিনের ঘটনা। কবি তখন সপরিবারে শ্যামবাজারের একটি বাড়িতে থাকেন। প্রায়ই হাসির গায়ক নলিনী সরকারের বাড়ি যেতেন। একদিন খুব সকালে কবি নলিনীবাবুর বাড়িতে আসছেন, পথে একটি বাউলের গান শুনে থমকে একটি বাড়ির রকে বসে পড়লেন। বাউলটি তন্ময় হয়ে গান গাইছে। মাথা ভরা বাবরী চুল, মুখে দাড়ি, পরণে আলখাল্লা হাতে একতারা, গান গাইবার পদ্ধতি দেখে তাকে বিশুদ্ধ বাউল বলেই মনে হল। গান সাঙ্গ হলে কবি বাউলকে কাছে ডেকে এনে আরও আট-দশখানি গান শুনলেন। নিজের পছন্দ মত কয়েকখানি গান লিখেও নিলেন। সে গানগুলি বহুদিন পরও কবিকে তন্ময় হয়ে গাইতে শুনেছি; তাঁর কয়েকটি বাউল সুরের গানে কিছু কিছু প্রয়োগও করেছেন।

গান শোনার পর কবি বাউলকে দশটি টাকা দিয়েছিলেন। বাউল কিছুতেই কবির দেওয়া টাকা নেবে না। কবিও টাকা ফেরৎ নেবেন না। নজরুলের তেজোদীপ্ত চেহারা দেখে বাউল মুগ্ধ। সে কেবল কবিকে

(১) এই মহিলাটির একখানি সুবৃহৎ ছবি এঁকেছিলেন দেশে এবং বিদেশে "ম্যাক্স্" ও ভি. সি. নামে খ্যাত শিল্পী। হ্যারিসন রোডের উপর "পটল ডাঙ্গা হাউসে" এঁর বাড়ি। এঁর পুরো নাম পূজনীয় শিল্পাচার্য শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়। এই ছবিখানি ১৫ হাজার টাকায় বিক্রি হলে তিনি ঐ টাকাটা উক্ত মহিলাটিকেই দান করে দিয়েছিলেন।

বলেছে "গোঁসাই, নাম শুনিয়ে দাম নিতে নেই।" বাউলরা গোঁসাই শব্দ ব্যবহার করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের। কবি বাউলকে তাঁর ঠিকানা দিয়ে বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ জানান। কবির কাছে মাঝে মাঝেই তাঁকে আসতে দেখেছি। আর দেখেছি নিবিষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে সহজিয়া ও বাউলদের ধর্ম নিয়ে আলাপ করতে।

হাতে টাকা থাকলে কারুর অভাব অনটনের কথা শুনে নজরুল স্থির থাকতে পারতেন না। কাল নিজের কী করে চলবে সে কথা বিবেচনা না করেই প্রার্থীকে টাকা দিয়ে কতবার তিনি হাসিমুখে অভাবের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। অনেক গরিব মধ্যবিত্ত পরিবারকে, যাঁরা বাইরে অভাবের কথা বলতে পারেন না, নজরুল গোপনে তাঁদের সাহায্য করেছেন। তাঁদের কারুর কারুর অবস্থা এখন বেশ ভালই, কিন্তু কবির কথা তাঁরা বোধ হয় ভুলেই গেছেন। ভুলে যাঁরা যান নি, তাঁরা বাহাদুরি নেবার জন্য কতনা আজগুবি কথা রটনাও করেছেন। তার ভাগটা কুৎসার দিকেই বেশি।

(৩)

একদিন নজরুল কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগরে ফিরে যাচ্ছেন। স্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়িতে গোয়ারী যাবার পথে একটি নারীকণ্ঠের কান্নায় সচকিত হয়ে গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, ঐ বাড়িতে একটি মেয়ে মারা গিয়েছে, কিন্তু দাহ করার সঙ্গতি নেই। শুনেই কবি গাড়ি থেকে নেমে আসেন। বাড়ির কাছে গিয়ে দেখলেন, বহু লোক জমেছে, কিন্তু সৎকারের কোন ব্যবস্থা হয়নি। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে যে কাঁদছিল তাঁর হাতে পঞ্চাশটি টাকা সৎকারের জন্য দিয়ে এবং দু'চারটে সান্ত্বনার কথা বলে তিনি চলে এলেন। গাড়িতে এসে আফ্‌শোষ করে বলতে লাগলেন, "আমি মুসলমান না হলে আজ একটা ভাল কাজে লাগতাম। মরার পরেও জাত বিচার!" বাড়ি পৌঁছে গাড়োয়ানকে ভাড়া মিটাবার মত পয়সাও তাঁর পকেটে অবশিষ্ট ছিল না। ঘর থেকে পয়সা এনে তবে গাড়োয়ানকে ভাড়া মিটিয়ে দিলেন।

(৪)

নজরুলের দরদী মনের পরিচয়ের জন্য কয়েকটি ঘটনার কথা এখানে বলছি। তখন তিনি করাচীর গ্যাজা লাইনের বাঙালী পল্টনে কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার। সাত হাজার সৈনিক ছিল এই ক্যাম্পে। এদের মধ্যে দুজন ব্যক্তি ছিলেন মৃত্যুব্রতী সকল সৈনিকের পরিচিত, অত্যন্ত প্রিয়। একজন হলেন হাবিলদার নজরুল এবং অপর জন ডিসীপ্লিনারী ইনচার্জ জমাদার শ্রীশম্ভু রায়। এই শম্ভু রায় এবং নজরুল ছিলেন অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। শ্রীযুক্ত রায় বলেন "নজরুলের সমস্ত জীবনটাই দরদী মনের রসে ছিল ভরপুর। অসুখে বিসুখে বিপদে আপদে আমাদের চেয়েও নজরুলের হৃদয় সর্বদাই

প্রসারিত থাকত সকলের জন্য। তাঁর কাছে সেই জন্য ডানপিটেরদলরা নানা রকমের আব্দার করে উত্যক্ত করত। নজরুলও হাসিমুখে ও সহৃদয়তার সঙ্গে মেনে নিতেন, বিরক্ত না হয়ে।

একদিন প্যারেডের ছুটিতে দু'তিনজন ছেলে দল বেঁধে পাশ নিয়ে গেল বাইরে বেড়াতে। ওরা বেড়াতে গেল করাচীর বাজারে। সেখানে ছিল বড় একটা ঘড়ির দোকান। সেই দোকানে ঘড়ির দর জিজ্ঞাসা করায় মালিক বলল,—"বাঙালীর আবার ঘড়ি কেনার ক্ষমতা আছে নাকি?" ছেলেদের দেশাত্মবোধে লাগল আঘাত। তাই ছেলে তিনটি দোকানে ঢুকে সব ভেঙে তচ্‌নচ্‌ করে চলে এলো ক্যাম্পে। ফিরে এসেই অধমতারণ নজরুলকে সমস্ত জানাল। নজরুল শুনেই এই ঘটনার ফল কী হবে তা বুঝতে পারলেন। তখনই নজরুল তাঁর শম্ভুদার কাছে ছুটে গিয়ে সব বলবার পর এদের বাঁচাবার অনুরোধ করলেন।

ইনচার্য শম্ভু রায় কাজীর পরামর্শ মত ওদের রক্তমাখা পোষাকগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলে নূতন পোষাক পরিয়ে ওদের প্যারেডে দিলেন পাঠিয়ে; প্যারেড থেকে তিন জনকে ফিরিয়ে এনে রেজিস্ট্রি বইটায় অনুপস্থিতকে উপস্থিত করে গ্যাঁট হয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ বাদে দোকানের মালিক পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট সহ কমাণ্ডারের কাছে এসে নালিশ করে বিচার প্রার্থনা করলে।

কমাণ্ডার শিনাখ্‌ৎকরণের জন্য লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। কিন্তু বিরোধী পক্ষ আবোল তাবোল করে শিনাখ্‌ৎ করলে, অপরাধীকে সঠিক-ভাবে দেখাতে না পারায় সে যাত্রা বাঙালী রেজিমেন্টের মান রক্ষা হল।[২] নজরুলের সহৃদয়তায় ছেলে তিনটিও বেঁচে গেল।

আর একটি ঘটনা এই রকম। যে সময় বাঙালী পল্টনে লোক সংগ্রহ করা হচ্ছিল সেই সময় বাঙালী যুব সম্প্রদায় যুদ্ধে যোগদান করার জন্য এতটা আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল যে, তারা যদি সৈনিক শ্রেণীতে স্থান না পেত তা হলে তারা যে কোন 'নচ কাজ নিয়েও সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করত। একটি বড়ঘরের ছেলে, দেখতে সুন্দর, গৌরবর্ণ বাঙালী যুবক বাড়ি থেকে পালিয়ে বাঙালী পল্টনে রাঁধুনী হয়ে প্রবেশ করেছিল। Head cook (রন্ধনশালার প্রধান পাচক) গোবিন্দ সকলের প্রতি যেমন অত্যাচার করত, এই ছেলেটির উপরও তেমনি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিত।

এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে যুবকটি দেশে (বাঙলায়) পালিয়ে আসে। সৈনিক জীবনে Deserter হওয়া একটা মহা অপরাধ, এই অপরাধের বিচার করেন লেফটেনান্ট ডগলাস। ডগলাস ছিল আই. সি. এস. অফিসার। এই ডগলাসই পরবর্তী কালে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন। অত্যাচারের জন্য বাঙালী বিপ্লবীদের হাতে রিভলবারের গুলিতে পাপজীবন থেকে রেহাই পান।

(২) পরিশিষ্টে ৺শম্ভু রায় মহাশয়ের চিঠি দ্রষ্টব্য।

ডগলাস তখন মাত্র দেশ থেকে এসেছে। ভারতীয় কোন ভাষাই সে বুঝত না। তার কাছে সেই ছেলেটির বিচারের ব্যবস্থা হল। সবাই গিয়ে ধরল কাজী নজরুলকে, যেমন করে হোক ওকে বাঁচাতে হবে; তুমি ছাড়া ওকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

ছেলেটিকে লেফটেনান্ট সাহেব জিজ্ঞাসা করল কেন সে পালিয়ে ছিল? ছেলেটি কিছু বুঝতে না পারায় কোয়ার্টার মাস্টার মনিরুদ্দিন ওকে সাহেবের কথা বুঝিয়ে দিতেই আসামী বললে Head cook (প্রধান পাচক) গোবিন্দ আমার উপর অত্যাচার করায় আমি পালিয়ে গেছলাম।

ছোকরার কথা শুনে কাজী প্রমাদ গনল। নিজেতো মরবেই গোবিন্দকেও মারবে। এই ভেবে কাজী নজরুল এগিয়ে এসে সাহেবের থেকে দূরে দাঁড়ালেন। তখন সাহেব জিজ্ঞাসা করলে What is Gobindo? সবার আগেই কাজী তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন Gobindo is another name of blanket, sir, এই বলেই কাজী যেখানে কম্বল, কাপড়, প্যান্ট প্রভৃতি থরে থরে সাজান ছিল, সেখানে গিয়েই মনিরুদ্দিনকে জোর হাতে ইসরায় বল্‌তে বলছেন আর কেবলই কম্বলের গাদার উপর হাত দিয়ে দেখাচ্ছেন। এমন সময় ডগলাস সাহেব বললে "Is not Gobindo free issue?" নজরুলও তখনই মনিরুদ্দিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কম্বল দেখিয়ে হাত জোড় করে "না" এই কথাটি বলতে ইসারা করছেন। মনিরুদ্দীন তখন বললেন "No"। লেফটেনান্ট সাহেব তখন বললে যে Issue twelve Gobindos for my each followers। উপস্থিত সকলের মুখে হাসি ফুটল। গোবিন্দ গোবিন্দ করে সবাই হুল্লোড় বাধিয়ে দিল।

তখন শীত পড়ে এসেছে। অধমতারণ নজরুলের বুদ্ধির দৌড়ে গোবিন্দ ও সেই ছেলেটি তো প্রাণে বাঁচলই, সঙ্গে শীতের শেষে ১২ খানা করে কম্বলও লাভ হল। সেই থেকে রেজিমেন্টের মধ্যে কম্বল কথাটা উঠেই গেল, তার স্থান দখল করল "গোবিন্দ"। গোবিন্দ বললেই কম্বল বোঝাত।

(৫)

কবি নজরুল শৈশবকাল থেকে দুটি প্রাণীকে শত্রু বলে জানতেন। একটি পুলিস আর একটি ইংরাজ জাতি। এদের দুচক্ষে যেমন দেখতে পারতেন না, তেমনি সান্নিধ্যও বরদাস্ত করতে পারতেন না। কিন্তু বিপন্ন কোনও মানুষ পুলিস বা ইংরাজ হলেও দরদী নজরুল প্রাণ দিয়ে তার সেবা করতে ত্রুটি করতেন না।

ঘটনাটি হাস্যকর হলেও নজরুলের সহৃদয়তার পরিচয় এর মধ্যেও আছে। একদিন কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার নজরুল তাঁর বুটপট্টি কম্বলের স্তূপের আড়ালের সাধন-গুহায় লেখাপড়ায় ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন। জাতি

নির্বিশেষে নজরুলের কাছে সবাই গিয়ে আবদার করত। তারা জানে বিপত্তারণ নজরুল তাকে উদ্ধার করবেনই।

একদিন এক লেফটেনান্ট "ড্রাইভার" নামে এক সাহেব খুব বিপন্ন হল। বহুক্ষণ প্যারেডের পর তার ভিতরে জাগল প্রকৃতির সাড়া। সে নিয়মানুবর্তীতার জন্য প্রাণপণে ছিল চেপে। কিন্তু প্যারেড শেষ হবার আগেই হয়ে গেল কাপড়ে চোপড়ে। প্যান্ট পট্টি ছাপিয়ে বুট পর্যন্ত নেমে এলো, বেগ আর সহ্য করতে পারল না; সাহেব তো দিশেহারা, এমন সময় অগতির গতি কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদারের কথা তার মনে পড়তেই সটান ছুটলো নজরুলের কাছে। কোথায় নজরুল তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, সাহেব জানে জমাদার শম্ভু রায়কে। সাহেব শম্ভু রায়কে ধরল, শম্ভু রায় নজরুলকে তাঁর সাধন গুহার থেকে বার করে সাহেবকে দেখিয়ে তার ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করলেন। নজরুল সাহেবকে তাঁর ঘরের আড়ালে নিয়ে নূতন প্যান্ট পট্টি বুট শার্ট প্রভৃতি দিয়ে তাকে সাহায্য করলেন সর্বপ্রকারে।

কাজী ইউরোপীয়দের উপর বিরক্ত হলেও বিপন্নকে সাহায্য করাটা মানুষের ধর্ম বলেই জানতেন। তাই যাদের উপর হাড়ে চটা সে বিপদগ্রস্থ হয়ে শরণাপন্ন হওয়ায় তাকে রক্ষাই করলেন। নজরুল এমনি উদার আর দরদী।[৩]

৬)

ধর্ম ব্যবসায়ীদের উপর নজরুল ছিলেন হাড়ে চটা। সে বিষয়ে একবার একটি ঘটনার কথা বলেছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল তাঁর জন্মভূমি চুরুলিয়াতে। কবি তখন অল্পবয়স্ক বালক মাত্র। ঈদের উৎসবে গ্রামের মস্‌জিদে মৌলবী সাহেবের কাছে এক মুসলমান ভিক্ষুক কিছু খাবার ভিক্ষা চেয়েছিল। ঈদ উৎসবের দিনে সকলে সকলকে খাওয়ায় আর ভিক্ষুকদের জাকাত দেয়—এই হল ঈদের নিয়ম। মৌলবী সাহেব কিন্তু ভিক্ষুককে তাড়িয়ে দেন। ভিক্ষুকটি মনের দুঃখে ফিরে যাচ্ছিল। বালক নজরুল জানতে পেরে তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পেট ভরে খাইয়ে দেন। বোধহয় এই সব কারণেই গ্রামের সবাই তাঁকে "দুখুমিয়া" বলে ডাকত। কেউ কেউ "তারা ক্ষ্যাপাও" বলত। সেই থেকে হৃদয়হীন স্বার্থপর ধর্মব্যবসায়ীদের উপর নজরুল জন্মের মত চটে যান। পরবর্তীকালে "আমার কৈফিয়ৎ" কবিতায় লেখেন—

"মৌলোভী যত মৌলবী আর মোল্‌-লারা কন হাত নেড়ে
দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজীটার জাত মেরে।

(৩) পরিশিষ্ট ৮/শম্ভু রায়ের চিঠি দ্রষ্টব্য

ফতোয়া দিলাম কাফের কাজী ও
যদিও শহীদ হইতে রাজী ও!

"আমপারা" পড়া হাম বড়া মোরা এখনও বেড়াই ভাত মেরে।
হিন্দুরা বলে পার্শী শব্দে কবিতা লেখে, ও পাত্ নেড়ে॥"

দেশের হিন্দু-মুসলমান বেরসিক ধর্মব্যবসায়ীদের উপর নজরুল কতখানি চটা ছিলেন কবিতাটি তারই নিদর্শন। ঐ মস্‌জিদের ঘটনার কথা কবি তাঁর, "সাম্যবাদী" কবিতাবলীর "মানুষ" কবিতায়ও লিখেছেন—

"গাহি সাম্যের গান,
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নহে, নহে কিছু মহীয়ান।
মস্‌জিদে কাল শিরণী আছিল, অঢেল গোস্ত রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি।
এমন সময় এল মুসাফির গায়ে আজাবির চিন্
বলে, 'বাবা আমি ভুখা ফাঁকা আছি আজ নিয়ে সাতদিন'
তেরি*য়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা, "ভ্যালা হ'ল দেখি ল্যাঠা!
ভুখা আছ মর্‌গো—ভাগাড়ে গিয়া, নামাজ পড়িস ব্যাটা?"
ভিখারী কহিল, 'না বাবা', মোল্লা হাঁকিল, 'তা'হলে শালা
সোজা পথ দেখ', গোস্ত রুটি নিয়া, মস্‌জিদে দিল তালা।"

অবশ্য এই বিষয়ে এই কবিতাটির মধ্যে হিন্দু পুরুতদের নিয়েও লিখেছেন। তাছাড়া তারকেশ্বর আন্দোলনে মোহন্তকে গদি থেকে অপসারিত করার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়ে "মোহ অন্তের গানে" লেখেন—

"এই সব ধর্মঘাগী
দেবতায় করছে দাগী
মুখে কয় সর্বত্যাগী ভোগ-নরকে বসে
সে যে পাপের ঘণ্টা বাজায় পাপী, দেব-দেউলে বসে,
আর ভক্ত তোরা পূজিস তারেই, যোগাস খোরাক সেবা-দাসী।"

ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এত কঠোর সমালোচনা করলেও নজরুল নিজে কিন্তু ভক্তিহীন বা অবিশ্বাসী ছিলেন না। এসব যে লিখেছেন ভক্তিহীন, অবিশ্বাসী হবার জন্য, তাও নয়। ভগবানের নাম ভাঙিয়ে যারা সরল মানুষকে ব্যথা দেয়, সেই সব ভক্তদের মুখোশ খুলে চোখে আঙুল দিয়ে তাদের চিনিয়ে দিয়েছেন মাত্র। তাই "বিষের বাঁশীর" "সত্যমন্ত্র" গানে লিখেছেন—

"পুঁথির বিধান যাক্ পুড়ে তোর,
বিধির বিধান সত্য হোক।
এই খোদার উপর খোদকারী তোর
মানবে না আর সর্ব্বলোক !!
জাতের চেয়ে মানুষ সত্য
অধিক সত্য প্রাণের টান
প্রাণঘরে সব এক সমান।'

(৭)

কবি তখন "হিজ মাস্টার্স ভয়েস"-এ নিয়মিত গান লিখে দিচ্ছেন এবং সুর সংযোজক রূপে চুক্তিতে কাজ করছেন। এই সময় কবির গান বাংলা থেকে ভারতের সর্বত্র এবং বিদেশেও প্রচুর বিক্রি হচ্ছে। বৈদেশিক সুরজ্ঞরা তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দনও জানাচ্ছেন। শ্রীমতী প্রমিলা নজরুল এই সময় থেকেই ধীরে ধীরে পক্ষাঘাতে অসুস্থ হয়ে পডছেন। কবির মন তাতে উদ্বেগাকুল হযে ঐশ্বরিক ক্ষমতাব দিকে ঝুঁকে পড়ছে। তাঁব হাবভাবে, কথায় ও আচরণে অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস এসেছে বলে মনে হচ্ছে। তিনি নিজে সামুদ্রিক-বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। যতদূব মনে পড়ে বিচারও ভালই করতে পারতেন। অন্ততঃ নিজেব সম্বন্ধে যে বিচার করে বলেছেন তার সত্যতা সম্বন্ধে তো এখন দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর হাতে শিরোরেখা ভাঙা থাকায় তিনি তাঁর মস্তিষ্ক পীডার বিষয় তাঁর সাথীদের মাঝে মাঝে বলতেন। তারকেশ্বরে স্ত্রীর জন্যে হত্যে দেওয়া, মহাকালীর প্রতি ভক্তির আন্তরিকতা, হুগলীর বন মস্‌জিদে মানত্ করা প্রভৃতি এই সময়েই। এই সময়ে তাঁর মধ্যে অলৌকিক শক্তির বিকাশ মাঝে মাঝে যেন প্রকাশ হয়ে পড়ত। সেই রকম ঘটনারই একটা কথা বলছি।

নলিনী সরকার স্ট্রীটে হিজ মাস্টার্স কোম্পানীর বাড়িতেই নজরুলকে সুর দেওয়া শেখাতে হোত। সেখান থেকে কাজ সেরে কবি নজরুল উঠি উঠি করছেন। এমন সময় তাঁর কাছে বহুদিন পর এই লেখক দেখা করতে গেল। আমাকে পেয়ে কবি খুবই খুশী হয়ে বললেন, "চল্ বেড়িয়ে আসি"। এই বলে কবি কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে এসে দাঁড়ালেন।, তিনি ট্যাক্সি ছাড়া কোথাও চলাফেরা করতেন না। অনেকগুলো ট্যাক্সি চলে গেল, কিন্তু কবি দাঁড়িয়েই আছেন একভাবে। কিছুক্ষণবাদে কবি একটি রিক্সা-ওয়ালাকে ডেকে তাতে উঠলেন। তাকে সোজা যেতে বললেন। রিক্সায় যেতে যেতে ওয়েলিংটনের মোড়ে এসে রিক্সাওয়ালা জিজ্ঞাসা করল কোন্ দিকে যাবে? কবি এসপ্লানেডের দিকে যেতে নির্দেশ দিলেন। রিক্সা চৌরঙ্গীর দিকে চলেছে, ব্রিস্টল হোটেলের ধারে নেমে পড়লেন।

শ্রান্ত ক্লান্ত রিক্সাওয়ালা গামছা দিয়ে মুখ মুছে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। কবি তার পাঞ্জাবীর দু'পাশের পকেটে হাত পুরে দিয়ে যা টাকা উঠল তাই

রিক্সাওয়ালার হাতে গুঁজে দিলেন। সে হাত খুলে দেখে যে আশাতীত পারিশ্রমিক হিসাবে সে টাকা পেয়েছে। সে ভয় পেয়ে কবিকে বললে "হুজুর, এত টাকা আমার কাছে থাকলে পুলিসে সন্দেহ করবে।" কবি কোন কথা না বলে একখানা কার্ড তাঁর হাতে দিয়ে বললেন "এতে আমার নাম ঠিকানা আছে, দেখালেই হবে"। তবু লোকটি কবির পরিচয় জানতে চায়, কবি না বলে এগিয়ে যান। তখন আমি রিক্সাওয়ালাকে কবির নাম বলে দিই। নাম শুনেই রিক্সাওয়ালা কবির পায়ের ধুলো নিতে উপুড় হয়ে পড়ে। কবি তাকে তুলে ধরে বুকের কাছে টেনে নেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। চৌরঙ্গীর আলোয় ব্রিস্টলের ধারে স্বপ্নপুরীর যাত্রী রাত-চরা পুরুষ ও নারী প্রজাপতিরা হরেক রঙের পাখা মেলে দিয়ে হাল্কা হাওয়ায় ভেসে চলেছে। কবিকে প্রায় সকলেই চেনে। সেইখানে সেই অবস্থার মধ্যে বাঙলার বিদ্রোহী কবির সঙ্গে এক রিক্সাওয়ালার কোলাকুলি চলেছে—তারা বিস্মিত হয়ে এই দৃশ্য দেখছে।

পিছনের সমস্ত লোক আশ্চর্য ও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে; দুজনের কারুরই কথা নেই। রিক্সাওয়ালা কবির পায়ে তার কৃতজ্ঞতা জানাতে চায়; কিন্তু তিনি তাকে পায়ে হাত দিতে দেবেন না। এমনিভাবে কিছুক্ষণ চলার পর দেখা গেল কবি নজরুলের বড় বড় চোখদুটি জলভারে টল টল করছে; আর রিক্সাওয়ালার গাল বেয়ে চোখের জলের ধারা নেমে এসেছে। এই অবস্থা কেটে গেলে কবি রিক্সাওয়ালাকে বললেন "তোমার বাড়িতে ছেলের খুব অসুখ, যাও এই টাকা নিয়ে ভাল করে ছেলেকে ডাক্তার দেখাও গে"। একথা শুনে সে লোকটির ভক্তি আরও বেড়ে গেল। সে সাহস করে জিজ্ঞাসা করলে, হুজুর কী করে জানলেন? কবি সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে হোটেলের ভিতরে ঢুকে পড়লেন।

কবি নজরুলের জীবনে এরকম অদ্ভুত ঘটনা বহু আছে। তাঁর ভিতরে সব সময়ই একটা ভক্তির ফল্গুধারা প্রখর গতিতে চলত। সাধারণ লোকেরা যত নিন্দাই তাঁর করুক; এদিকটার খবরতো কেউ রাখত না।

(৮)

নওরোজ—
সচিত্র মাসিক পত্র

কার্য্যালয়
৪০ বি, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা
৪.৭.২৭

জয়যুক্তেষু

আপনার স্নিগ্ধ চিঠি না-চাওয়ার পথ দিয়ে এসে আমায় যতনা বিস্মিত করেছে তার চেয়ে আনন্দ দিয়েছে ঢের বেশী।

আমি এতটা আশা করতে পারিনি, যে প্রশংসা আপনার ললাটে প্রদীপ্ত

প্রতিভা শিখাকে উজ্জ্বলতর করবে—বা সোজা কথায় আমার প্রশংসায় আপনার মত অসীম শক্তিশালী দুরন্ত সাহসী লেখকের কিছু এসে যায়।

আমার মনের চেয়ে চোখের স্মরণশক্তি একটু বেশী। দেখলে তাকে হয়তো গ্রহান্তরেও চিনতে পারি—কিন্তু শুনলে তাকে পক্ষান্তরে চিনতেও বেগ পেতে হয়।

কাজেই নন্দ চৌধুরী লেনের দেখা আপনাকে কাব্যের নন্দনকাননের রাজপথে দেখেও চিনতে আমার এতটুকু দেরী হয়নি। নন্দ চৌধুরী লেনের সেই সুশ্রী ছিপছিপে তরুণের চোখে অপ্রকাশ প্রতিভার যে আয়োজন দেখেছিলাম—তার পরিপূর্ণবিকাশের সমারোহ আজ আমাকে শুধু বিস্মিত করেনি—পূজারী করে তুলেছে। একবুক কাদা ভেঙে পথ চ'লে একদীঘি পদ্ম দেখলে দুচোখে আনন্দ যেমন ধরেনা, তেমনি আনন্দ দুচোখ পু'রে পান করেছি আপনার লেখায়—এ বললে আপনি কী মনে করবেন জানিনে, তবে আমার প্রাণের আনন্দ এর চেয়ে ভাল ক'রে প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই ব'লে লজ্জা অনুভব করছি।

নন্দ চৌধুরী লেনে আপনার "লোমহর্ষণ" নাটকটা শুনেছিলাম কিনা মনে নেই। যখন মনে নেই···তখন ওটাতে হয়ত "লোমহর্ষণ'ই হয়েছিল 'প্রাণহর্ষণ' হয়নি, হ'লে নিশ্চয় মনে থাকত। তারজন্যে দুঃখ করিনে কারণ আপনাকে তো মনে আছে, শুধু সুশ্রী আপনাকে দেখেছিলাম সেদিন, আজ সুন্দর তোমায় দেখেছি।

পবিত্রের মারফৎ আপনার প্রথম লেখা পড়ি—"মুক্তির ডাক"। প'ড়ে আমার কেমন লাগে, পবিত্র লিখ্‌তে বলেছিল। ইচ্ছে করেই লিখিনি। সূর্য্যকে অভিবাদন করতে পারি—কিন্তু তাকে উজ্জ্বলতর ক'রে দেখানোর মত আলো ও অভিমান আমার নেই। আজো আপনার শক্তিকে অন্তর দিয়ে নমস্কার জানাচ্ছি মাত্র, তাকে প্রশংসা করিনি। আপনাকে প্রশংসা করার শক্তি আমার নেই।

আপনার "মুক্তির ডাক"-এর পর আমি "অজগর মণি" ও "কাজল লিখা" পড়ি। প'ড়ে মুগ্ধ হই, কিন্তু মুগ্ধ হয়েই ক্ষান্ত থাকিনি। যাকে পেয়েছি তাকেই পড়িয়েছি। কিছুদিন আগে নোয়াখালি যাই। সেখান থেকে লক্ষ্মীপুর গিয়ে সুধাংশু ব'লে একটি ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়। বোধ হয় আপনিও চেনেন তাকে। তাকে ধন্যবাদ, সেই আমায় তিনখানা বাসন্তিকা দেখায়। তাতেই আপনার অমর সৃষ্টি "সেমিরি মিস" "ইলা"ও "স্মৃতির ছায়া" পড়ি। "সেমিরি মিস" পড়ে কী যে আনন্দ পেয়েছি—তা বলে উঠতে পারছিনে। যতবার পড়ি ততবারই নূতন মনে হয়। আজ ইউরোপে জন্মালে আপনার প্রশংসায় দশদিক মুখরিত হয়ে উঠত।

এ ঈর্ষার—এবং ততোধিক ঈর্ষাতুর সাহিত্যিকের দেশে আপনার যোগ্য আদর হয়নি দেখে বিস্মিত হইনি একটুও দুঃখিত যতই হই।

"ইলা"ও আমার বুকে কম দোল দেয় নি—কিন্তু "সেমিরি মিস"-এ আমি যেন তলিয়ে গেছি। এত বড় সৃষ্টি।—দুঃসাহসের দিক থেকে বলছিনে—এর

সৃষ্টির সার্থকতার ও পরিপূর্ণতার দিক দিয়েই বলছি—আমায় আর কারুর কোন লেখা এত বেশী বিচলিত করে নি।...আপনার লেখার একটা ফিরিস্তি দেখেছি বাসন্তিকায় আপনার শেষ চিঠিতে, কিন্তু তার সবগুলি পড়ে উঠবার সুযোগ সুবিধে পাইনি বলে নিজেকে দুর্ভাগ্য মনে করছি।

আমার ভয় হয় উকিল মন্মথ "সেমিরি মিস"-এর মন্মথকে ভষ্ম না করে ফেলে। ল আর অঙ্কাতঙ্ক আমার ছেলে বেলা থেকে।

আমি ইঙ্গিত দিতে কি পারব আপনার মত শিল্পীকে আপনার সৃষ্টি বিষয়ে?—আমার মনে হয় "তাজমহল" সৃষ্টির কল্পনাকে কেন্দ্র ক'রে লেখা আপনার হাত দিয়ে যা বেরুবে তা' সত্যিকার তাজমহলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে—"সেমিরি মিস"-এর স্রষ্টাকে এ লিখতে এতটুকু কুণ্ঠা আমার নেই। আপনার মত জানলে খুশী হব।

"নওরোজ" বেরিয়েছে—ওতে আমার এক মিতে লেখককে দেখবেন—তবে তিনি 'নাজীরুল', নজরুল নন—আকার ইকারে দণ্ড ধারণ ক'রে নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করেছেন। তাঁর ভাল লেখা প'ড়ে তাঁর প্রাপ্য নজরুলকে দেবেন না যেন—সত্যিই অনেক বকলাম—আপনার অনুরোধই রক্ষা করা গেল। তবে বকাটা বড্ড তাড়াতাড়ি হ'ল—তাই এ বকাটা বোকার মতই মনে হবে।

P. S. আপনার নৃপেনদার সহযোগে আমিও অনুরোধ জানাচ্ছি, নওরোজের হাটে সওদা করতে আসার জন্য। দেরী করলে চলবে না। কখন লেখা পাঠাচ্ছেন জানাবেন।

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতি গ্রহণ করুন। ইতি

"নবনাটিকা" দর্শনাকাঙ্ক্ষী—
স্বাঃ নজরুল ইসলাম

"এক বুক কাদা ভেঙে পথ চ'লে এক দীঘি পদ্ম দেখলে দু'চোখে আনন্দ যেমন ধরে না, তেমনি আনন্দ দু'চোখ পুরে পান করেছি আপনার লেখায়।" কবি নজরুল এই কথা লেখেন বর্তমান যুগের প্রথিতযশা অন্যতম নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়কে।

তেতাল্লিশ বৎসর পূর্বের অখ্যাত তরুণ নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় "বাসন্তিকা" নামে একটি পত্রিকায় "সেমিরি মিস্" নামক একটি নাটক লেখেন। এই নাটকটি কবি নজরুল নাট্যকারের কোনও বন্ধুর মারফৎ পান। এই সময় তরুণ নাট্যকার তাঁর দেশে ওকালতি শুরু করেন ল কলেজ থেকে বেরিয়েই।

উক্ত 'সেমিরি মিস্' নাটকটি কবির এত ভাল লেগেছিল যে কবি নাট্যকারকে এই চিঠি লিখে পাঠান। স্বল্প পরিচিত নাট্যকারকে কবি যেভাবে সম্ভাষণ ও তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভবিষ্যৎ বাণী করেন তা একমাত্র কবি নজরুলের পক্ষেই সম্ভব। এই লেখনীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় কবির মন যেমন গভীর দরদে ভরপুর ছিল, গুণীজনের গুণে ব্যাপকতর

স্পর্শও ঐ সমুদ্রের মত মনে তেমনি দোলা দিত। ব্যাকুল মন কেবলি চাইত গুণীর আসনের চির প্রতিষ্ঠা করবার সুনির্দিষ্ট পথ ও তাঁর সুযোগ।

এই উদারতার পরিচয় কি বর্তমান যুগের কোনও ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়? কী অফিসে, কী সাপ্তাহিক, দৈনিক পত্রিকাদিতে; মাসিকে ও রাজনৈতিক সংগঠনে সাংস্কৃতিক দল প্রভৃতিতে এই ছোট ছোট গোষ্ঠী রচনা করে গোষ্ঠী-সুখ উপভোগ করেন। "পৃষ্ঠ-কণ্ডুয়ন" করে তৃপ্তি লাভ করেন। এঁদেরই দরজায় দরজায় গুণী তাঁর রচনা, শিল্প প্রভৃতি সম্ভার নিয়ে ফিরে ফিরে আসেন যতক্ষণ না গোষ্ঠী-পতির খাতায় নাম লেখাতে পারেন, অর্থাৎ গোষ্ঠীভুক্ত হবার সুযোগ পান।

বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক মহল্লার এই কৃপণতা বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে ছিল না; বরং ভারত পথিক রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ থেকে কবি নজরুল পর্যন্ত সাংস্কৃতিক প্রসার তার জন্য উদার ও অকৃপণ ছিলেন পূর্বের সাহিত্য সাধকগণ, গুণী ও প্রতিভাবানের প্রতিষ্ঠাকে তাঁরা মনে করতেন স্বদেশের সেবা ও মানবতা প্রসারের প্রধানতম দিক। তাঁরা দল বা গোষ্ঠীর দিকে চাইতেন না, তাঁরা রচনা ভঙ্গি ও আঙ্গিকেরও ধার ধারতেন না, তাঁরা দেখতেন প্রতিভার দিকে, গুণী ও প্রতিভাবানকে স্বদেশ আত্মার বিকাশ রূপেই দেখতেন।

কবি নজরুলও স্বল্প পরিচিত এক নাট্যকারের মধ্যে প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন ও তাঁর সাফল্য কামনা করলেন স্বদেশ আত্মার পক্ষ থেকে। শুধু সাফল্য কামনাই নয়। পরবর্তীকালে মন্মথবাবুর লেখা বহু নাটকে যেমন, কারাগার, মহুয়া, মাটীর ডাক প্রভৃতি গ্রন্থে প্রচুর গান লিখে দিয়েছেন, সুর দিয়ে গাইয়েদের শিখিয়েও দিয়েছেন।

কত অভাজন যে নজরুলের স্পর্শে, স্নেহে ও সান্নিধ্যলাভে সকলের প্রিয়ভাজন হয়েছে, তার সীমা সংখ্যা নেই। আমাদের কবি বন্ধু স্বর্গীয় শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র তার মধ্যে অন্যতম। খুলনা জেলার বিখ্যাত মিত্র পরিবারের ছেলে ছিল সতীশ। বিখ্যাত মিত্র পরিবারের ছেলে হলেও সতীশদের পরিবার ছিল খুবই দরিদ্র। বহু লোকের দোরে ধরনা দিয়ে সে কোন রকমে ম্যাট্রিক পাশ করে দরিদ্র সংসারের জন্য কলকাতার পথে পা বাড়িয়ে ছিল। অচেনা কলকাতায় এসে ঘুরে বেড়িয়ে অনাহারে অর্ধাহারে কাজের খোঁজ করছিল। তখন বাংলাদেশের দুটি ছোট বইয়ের দোকানের নাম, বালক কিশোর ও যুবকদের মনে থাকত গেঁথে। একটি ছিল বিপ্লবী ব্রজবিহারী বর্মনের "বর্মন পাবলিশিং হাউস"। আর একটি হল ডি. এম. লাইব্রেরী। দুটি দোকানই ছিল হেদুয়া পার্কের কাছে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের এ-পারে ও-পারে।

ছেলেদের মধ্যে এই দুটি বইয়ের দোকানের নাম এত ঘনিষ্ঠতা লাভের কি কারণ?—সেটাই বলব। ১৯২৫ সালের কথা। বিদ্রোহী কবি নজরুল তখন বাঙলার এক বিস্ময়মণ্ডিত উজ্জ্বল মানুষ। তাঁর বই এই দুটি প্রকাশকই প্রকাশ করতেন। এঁদের মধ্যে ছিল দুরন্ত প্রতিযোগিতা, কে কত

তাঁর বই ছাপাবে তার। ডি. এম-এর ছিল টাকা, আর বর্মনের ছিল বৈপ্লবিক সততা। বর্মন জেলে গেছে, ছিল ফাঁসীর আসামী। ব্রিটিশ সরকার অনেক চেষ্টা করেও তাকে ফাঁসাতে ফাঁসাতে না পেরে পাঠিয়েছিল আন্দামানে। হাতে একটি পয়সাও না নিয়ে হলেন প্রকাশক। আন্দামান থেকে তিনি হয়ে এসেছিলেন মার্কসবাদী। তাই বাংলাদেশের ও পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা যেমন ডাঃ ভূপেন দত্ত, নজরুল, মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদ প্রভৃতি তাঁকে সহযোগিতা দিয়ে সাহস যুগিয়েছিলেন, তেমনি সহযোগিতা করেছিল তৎকালের বিপ্লবী ও সাম্যবাদী ছাত্র ও যুবসমাজ। এই অবস্থা যখন দেশের, তখন সরল গ্রাম্য যুবক কবি সতীশ কলকাতায় এলেন।

প্রথমে সতীশ বর্মন পাবলিশিং হাউসের ব্রজবিহারীর সঙ্গে দেখা করল। সেইদিন নজরুল তাঁর "সাম্যবাদ" পুস্তিকার প্রুফ দেখছিলেন বসে। সতীশ ব্রজবিহারীর কাছে একটা কাজের জন্য আবেদন করল। ব্রজ-বিহারী তার দারিদ্র্যের কথা সতীশকে বলায় সে যেমন হতাশ হয়ে পড়ল তেমনি হল ম্রিয়মান। নজরুল তার অবস্থা দেখে বললেন যে 'দেখ আমার বইয়ের আর একজন প্রকাশক আছেন। তাঁর অনেক টাকা, সে লোক খুঁজছে। তুমি সেখানে যাও, কাজ পেয়ে যাবে। সতীশ তখনও নজরুলকে চিনত না। ব্রজবিহারী তাঁর পরিচয় দিতেই সে নজরুলকে প্রণাম করে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠল। নজরুল চিঠি দিয়ে আমাকে ডি. এম-এর দোকানে সতীশকে নিয়ে যেতে বললেন। যাই হোক সতীশের ওখানেই চাকরি হয়ে গেল। ঘাড়ে করে দোকানে দোকানে বই দেওয়া, প্রেস থেকে কপি ও প্রুফ দেওয়া নেওয়া, এককথায় সতীশ ছিল ডি. এম-এর সাড়ে আট ভাজা চানাচুরের মত।

এই সময় আমাদের একটা আড্ডা ছিল ৫৫ নং মানিকতলার দোতলায়। এখানে একখানা ঘরে থাকতেন নজরুলের স্নেহধন্য কবি শ্রীশচীন কর। সে চাকরি করত আর রাত্রে কলেজে পড়ত। তার পাশের ঘরে থাকতেন ডি. এম লাইব্রেরীর গোপালদাস মজুমদার। তাঁর ঘরে ছিল একটা টেবিল, হারমোনিয়ম। নজরুল মাঝে মাঝে যেতেন, গান গাইতেন; আর পিছনে পিছনে যেতেন অনিল বাগচী (মোন্টি) ও তার বন্ধু সেন্টি। ওরা দুজনেই দেখতে ছিল কার্তিকের মত; গোপাল মজুমদারের খুব প্রিয়। আমাদের যুগান্তর দলের একখানি ঘর ছিল ছাদের ওপর। নজরুল সেখানেও মাঝে মাঝে যেতেন। ঐ ঘরে ডাঃ ভূপেন দত্ত, ব্রজবিহারী প্রমুখও এসে আড্ডা জমাতেন।

সতীশের আস্তানা ছিল ডি. এম-এর বইয়ের গুদাম ঘরে, নিচের তলার একখানি ছোট্ট কামরায়। পাইস্ হোটেলে খেত। আর সারা দিনরাত অক্লান্ত খাটত উক্ত প্রকাশকের অর্থ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মাসিক ত্রিশটি টাকায়।

আমি ও শচীন কর সতীশের বন্ধু হয়ে গেলাম। জানতে পারলাম, সতীশ কবি ও সাহিত্যিকও বটে। খবরটা পৌঁছে দিলাম নজরুলের কাছে। নজরুল অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে একদিন হানা দিলেন সতীশের

আস্তানায়। সংগ্রামী কবি সংগ্রামেরও কবি নজরুল, তিনি সতীশের আস্তানায় গিয়ে সতীশকে বুকে জাপটে ধরে তার কবিতা শুনবার আবদার জানালেন। সতীশ ছিল লাজুক প্রকৃতির বিনয়ী এবং নম্র স্বভাবের। নাছোড়বান্দা নজরুল সতীশের কবিতা শুনে খুবই খুশি হয়ে তার কবিতার প্রচারের প্রতিশ্রুতি দিলেন ; দিলেন তাকে অকুণ্ঠ উৎসাহ, ভরসা ও সাহস। সেদিন তাঁর করাচীতে সাহিত্য-সাধনার গল্প বলে বললেন যে "তুমি যেমন বইয়ের গুদামেব এককোণে বসে অবসরের সময় সাহিত্য-সাধনা করছ, তেমনি আমিও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের অন্তরালে ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে সাধনা করেছি।"

এর পরে নজরুল সতীশের বহু কবিতা এবং ছোটগল্প বিভিন্ন কাগজে প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন। যেমন ঋত্বিক, ইঙ্গিত, বাংলার বাণী, কালিকলমে। ডি. এম-এর মালিককে বলে ত্রিশ টাকা মাইনের থেকে কিছু বেশি টাকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। সতীশকে নজরুল একটি আশীর্বাণীও লিখে দিয়েছিলেন—

পরম কল্যাণীয় কবি শ্রীমান সতীশ মিত্র

জয়যুক্তেষু,

সম্মুখে মহা ঊর্মির দোলা,
তরণীও টলমল।
শক্ত মুঠিতে ধরে থাক হাল
সংগ্রামে পাবে ফল্ ॥
পথে পথে কাঁটা পায়ে পায়ে বিঁধে
পিচ্ছিল করে পথ।—
ভয় কি তাহাতে?—চলে যাও সোজা
পেয়ে যাবে জয়-রথ ॥

শুভার্থী
কাজদা

২৬শে ভাদ্র, ১৩৩২
কলিকাতা

বর্তমান যুগের সাহিত্যিক কবিরা নজরুলের এই উদার ও স্নেহশীলতার চরিত্রকে উপলব্ধিই করতে পারবেন না। কারণ এ-যুগে ব্যক্তিকেন্দ্রীকতা প্রকট হয়ে উঠেছে। কে খেল, কে খেল না, অপরের জীবনের জন্য সুযোগ করে দেওয়ার পবিত্র ইচ্ছাও এখন আর নেই। নিজেকে নিয়েই সবাই ব্যস্ত। "আপনি বাঁচলে বাপের নাম" প্রবাদ বচন বর্তমান গুণীজনদের মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু নজরুলের সময় পর্যন্ত সমাজের এমন অবস্থা ছিল না। নজরুলের মধ্যে দেখতে পাই নরনারী নির্বিশেষে যেখানে একটুও গুণ

দেখেছেন, তার বিকাশের পথ প্রশস্ত করে দেওয়ার জন্য জীবন দিয়ে, কলঙ্ক মাথায় নিয়েও বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা তাঁর ছিল। আজকের দিনে কত গুণী ছেলে-মেয়ে কত নামজাদা সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক শিল্পীদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু কেউ কোন সুযোগ করে দিতে এগিয়ে আসে না। তাঁরা ওঁকে বুঝতে চান, কি রং লেগেছে ওর মনে।

১৯৩৭ সালে সতীশচন্দ্র রোবাইয়াৎ-ই-ওমরখৈয়াম অনুবাদ করল ফিট্‌জেরাল্ডের ইংরাজি অনুবাদ থেকে। নজরুলকে পড়তে দিল অনুবাদটি। অনুবাদ পড়ে নজরুল তো মহা খুশি। ছাপাবার জন্য তিনি উঠেপড়ে লাগলেন। এই বইতে স্বেচ্ছায় দিলেন ভূমিকা লিখে। লিখলেন—"যে সব কবি ফিট্‌জেরাল্ড অনুবাদ ক'রে বাঙ্‌লা সাহিত্যে যশস্বী হয়েছেন, শ্রীমান সতীশের অনুবাদ তাঁদের কারুর অনুবাদের চেয়ে খারাপ হয়নি, বরং কারুর কারুর চেয়ে সুন্দরতর হয়েছে—এ আমার ব্যক্তিগত ধারণা। কাব্য লোকের নবানতম আগন্তুক বলে উপেক্ষা না করে এ অনুবাদ পড়ে গেলে সকলেরই এই ধারণা হবে বলে আমার বিশ্বাস। কোথাও কোন কষ্ট কল্পনা নাই. চমৎকার মিল, সুন্দর ভাষা, সমতাল ছন্দ—সব মিলে সুন্দর কবিতা হয়ে উঠেছে। অনুবাদ বলে মনে হয় না।

"খৈয়ামের দর্শন নিয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে ও হচ্ছে—কাজেই ও নিয়ে আর না-ই বললাম কিছু।"

"এ অনুবাদ পড়ে আমি সত্যি সত্যি আনন্দিত হয়েছি, চমৎকৃত হয়েছি। এই ভাস লাগাকে আরো ভাল করে বলতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আমার এ ভূমিকা না হলেও ওর চল্‌ত—কেন না কাব্য-সরস্বতীর আশীর্বাদ সে লাভ করেছে। ইতি—

কাজী নজরুল ইসলাম"

এই ভূমিকাতো লিখেই দিলেন, কিন্তু বইটা ছাপানো চাই। তাঁর অনুরোধে একটি ছোট প্রকাশক বইখানি ছাপিয়ে দিল। তাতে দুঃস্থ সাহিত্যিক, স্বল্প বেতনে প্রকাশকের কর্মচারী কবি সতীশের কিছু অর্থপ্রাপ্তি হয়েছিল। তারপর সে ৩৮ নং মানিকতলা স্ট্রীটের একটি মেসে উঠে গেল। তখন আমি স্বগৃহে অন্তরীণ অবস্থায় আটক ছিলাম। মাঝে মাঝে নজরুল কলকাতা থেকে চুঁচুড়া হুগলীর সাথীদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। একদিন সতীশকে সঙ্গে করে আমার চুঁচুড়ার বাড়িতে এলেন। সঙ্গে ছিলেন বন্ধুবর হেম বাগচী। এসে গান আবৃত্তি সবই হল। সতীশ আমার জন্য একট তার অনুবাদ ওমর খৈয়াম বই এনেছিল। সেই বইয়ে আমার জন্য একটি কবিতাও লিখে এনেছিল—

"কবি বন্ধু
শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
করকমলেষু

আমার মনের বনের অপরাজিতা
তোমারে আনিয়া দিলাম, হে মোর মিতা!
সুরভি বিহীনা, তবু
তোমার সকাশে কভু
জানি, ভালো জানি—হবে না অনাদৃতা।

"নববর্ষ" তোমার
১৩৪৪, কলিকাতা সতীশচন্দ্র মিত্র

নজরুল এনেছিলেন আমার জন্য "সঞ্চিতা," কবি হেম বাগচী তার লেখা "দীপান্বিতা" কবিতাগ্রন্থ। একক বন্দী জীবনে সে দিন কী আনন্দই না পেয়েছিলাম। সে দিন সবাই স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। সতীশ আবেগময় কণ্ঠে তার ওমর খৈয়াম থেকে কয়েকটি 'রোবাইয়াৎ' পড়েছিল। নজরুলের স্নেহধন্য, দরদসিক্ত সতীশের দুটি রোবাইয়াৎ শোনাই—

"সজনী! জাগো, জাগো, রজনী নাহি আর,
জ্যোৎস্না নিভে গেছে তারকা চাঁদিমার!
প্রাসাদ চূড়ে ওই পড়িল আসি সই
হিরণ-কিরণেষু শবর সবিতার।
স্বপনে নিশিভোরে কে ব'লে গেল মোরে,
কাটাবি কতকাল রে মূঢ়, ঘুম-ঘোরে?
শুখালো আয়ু-সুধা মিটাবি কবে ক্ষুধা?
নিরাজী এই বেলা পেয়ালা নেরে ভোরে।" ইত্যাদি

নজরুলের নির্দেশেই বইখানি সতীশ উৎসর্গ করেছিল কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয়কে।

অতঃপর সুখে দুঃখে নয়, দুঃখেই তার দিন কাটছিল। প্রকাশকের দোকানের কর্মচারীর স্বল্প বেতন, দুর্দান্ত খাটনিতে তার জীবনীশক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়েছিল ক্ষয়রোগের আক্রমণে। নজরুল ও তাঁর বন্ধুরা বহু চেষ্টা করেও তাকে আর ধরে রাখতে পারেনি। শেষের দিনও নজরুল তার শিয়রে বসেছিলেন স্তব্ধ দীপশিখার মত। সরস্বতীর শ্বেত শতদলের কুঁড়ি ঝরে গিয়েছিল যক্ষের ধনপ্রয়াসী প্রকাশকের প্রাণহীন শুষ্ক নিঃশ্বাসে। আজ যদি সতীশ বেঁচে থাকত তাহলে নজরুলের "কপিরাইট বিক্রয়ের" রহস্য উদঘাটিত হতে পারত। তার বিধবা পত্নী কোথায় জানি না। দেশভাগের খরস্রোতে কোথায় ভেসে গেলেন দরিদ্র কবির সীমন্তিনী।

ব্যক্তি জীবনে নজরুল

কবি নজরুলের জীবনে একটি বুনো ঘোড়ার গতি তাঁকে মুক্তির আকৃতিতে ছুটিয়ে নিয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু সেই অস্থিরতার মধ্যে কোন অশোভনতা ছিল না বরং জনমনকে চুম্বকশক্তিতে তাঁর দিকে টেনে নিয়ে যেত। সেখানে কবির "চোক্ষে পুরুষ রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।"

নরনারী নির্বিশেষে বালক, কিশোর, যুবক, আধাবয়সী ও বুড়ো সকলেই সেই গতির আবর্তে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সাধারণ, অসাধারণ, প্রতিভাবান, পণ্ডিত প্রভৃতি সকলকেই ছুটে যেতে দেখেছি কবির সদ্য-উৎসারিত প্রাণ-বন্যার বেগে। সেখানে "কেউ ডুব দিয়েছে, কেউ ঘট ভরেছে, কেউ নিয়েছে বিদায়।" অথচ কবি চলার পথে কখনও বিশেষ করে কারুর প্রতি আকৃষ্ট হননি। কিন্তু যারা তাঁর সঙ্গ পেয়েছে তারা কবির আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছে। তাঁর স্বভাব ছিল ঠিক হাঁসের মত। পাখা ঝাড়া দিয়ে পালকে লাগা জল কাদা থেকে মুহূর্তে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছেন। চেতনার তাড়নায় তিনি এক থেকে অপরে পরম শান্তির পথ খুঁজেছেন, তাই তিনি লিখেছেন—

"দিয়া বেদনার পরে বেদনা
নাথ দিলে এ কী এ বিপুল চেতনা?"
(ছায়ানট)

মানুষের প্রতি মুহূর্তের সংঘাতময় জীবন থেকেই কবি বেদনা পেতেন। তাঁর জন্য কবি-চেতনা তাঁকে মুসাফির করেছিল মুক্তির দিশার জন্য।

যে সময়ে কবি বাঙলা দেশে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পান, সে সময়ে সমাজ-জীবনে জড়তা হাড়ের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। এই অবস্থায় কবি জাগরণীর সুরে, ক্ষুরধার ভাষায়, প্রাণ প্রাচুর্যের উচ্ছ্বাসে দেশের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করায়, মুগ্ধ নরনারী কবিকে ভালবেসেছিল। অনভ্যস্ত মানুষেরা নূতনের প্রখর রূপ দেখে সন্দেহ করেছিল, সহ্য করতে পারেনি; তাই নিজেদের কলুষতার পাথর দিয়ে নজরুলের প্রাণ-শক্তিকে চাপা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু যা সত্য তার ক্ষয় নাই, তাই নজরুল কলুষজয়ী হতে পেরেছিলেন তাঁর সত্য আবেদনের দ্বারা। কবিকে যারা কাদা জলে পঙ্কিল করতে চেয়েছে তাদের যে কবি বুঝতেন না, তা নয়; তাদের কাছে যে দুঃখ বেদনা পেতেন ও তাঁর মন যে অসীম সমুদ্রের সন্ধান করত তা বোঝা যায়। সেই সমুদ্রেই শেষ পর্যন্ত তাঁকে আধ্যাত্মিকতার পথ দিয়ে নিয়ে গেছে নজরুলের মহৎ নিয়তি। এই সমুদ্র-প্রয়াসই নজরুল জীবনের মূলকথা। প্রেম বোধ নজরুলের মধ্যে সমুদ্রের মতই অসীম ছিল। প্রেম অতি দুর্লভ

জিনিস। জন্ম-জন্মান্তরের বহু সাধনায় এই প্রেমবোধ জন্মে। অনেক সুকৃতিবলে মানুষ এর অধিকারী হয় এবং উপলব্ধি করতে পারে। মানব জীবনে প্রেম অমৃতের মত, তাই প্রেমের যে অধিকারী সে জগতে অমর হয়। যার জীবনে প্রেমবোধ জাগেনি, সে মানব প্রেম, দেশ প্রেম ও ভগবৎ প্রেম উপলব্ধি করতে পারে না। তার দ্বারা কোন সৃষ্টি হওয়াই সম্ভব নয়। নজরুল জীবনের নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সমুদ্রের মত অসীম প্রেমকে চেয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক পথে সেই চরম প্রেমকে দেখতে পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছেন, এইটাই বোঝা দরকার। তাই কবির বিভিন্ন লেখার মধ্যে, কাজের ও কথাব মধ্যে এই প্রেমেরই দেখা পাওয়া যায়। "পথচারী" কবিতাই নজরুলের জীবনের মর্মবাণী। তিনি ব্যক্তি জীবনের স্থূল ঘটনাকে প্রাধান্য দেননি ; উচ্চহাস্যরোলে তুচ্ছ করতে পেরেছিলেন দুঃখ দারিদ্র্যকে। কিন্তু কবির হাসি, গান, আলাপ দূর থেকে দেখেশুনে যাঁরা মুগ্ধ হতেন তাঁরা কবির ব্যক্তি-জীবনের বিপুল বেদনার পরিচয় পাননি। পেলে দেখতেন যে কত অসীম-বেদনাবোধ বুকে করে কবি মানুষের মুক্তি চেয়েছেন। "গোপন প্রিয়া" কবিতায় লিখেছেন—

"দূরের প্রিয়া পাইনি তোমায় তাই এ কাঁদন রোল।
কূল মেলেনা তাই দরিয়ায় উঠতেছে ঢেউ দোল্!
তোমায় পেলে থামতো বাঁশী
আসতো মরণ সর্বনাশী।
পাইনি ক' তাই ভরে আছে আমার বুকের কোল।
বেসুর হিয়া শূন্য বলে উঠছে বাঁশীর রোল॥

শূন্য বুকে বাঁশীর সুর পাওয়া যাবে মনে করে কবি নরনারী নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে অসীম বিশ্বাস নিয়ে মিশেছেন, আঘাত পেয়ে গান গেয়েছেন, কিন্তু কোথাও নিজের কবি-সত্তাকে হারিয়ে ফেলেননি। তাঁর কবিচিত্ত চেতনার আলোকে জেনেছিল যে—

"......হিয়া পাথর পরশি পরশ-পাথরও হয়।" কবির মনকে কটা লোক বুঝতে চায়। বিশেষ করে কবির ভাব-প্রবণতা, যে প্রবণতা কবিকে মানব সমাজের মধ্যে ঠেলে নিয়ে বেড়ায় তাকে তো বোঝা সহজ নয়। তাই কবি যাদের কাছে যান তাদের কাছে মনটাকেই নিয়ে যান মন পাবার জন্য। সেটা কোন কবিই পান না। তাই কবি নিজেকে ছাড়া আর সবাইকেই 'পাথর' বলে, পাষাণ বলে মনে করে ব্যথা পেয়ে পরশ-পাথর হয়ে উঠেন। কবি নজরুলের মনও এই পাথুরে মনের সান্নিধ্য লাভে পরশ-পাথর হয়ে উঠেছে। তাই দেখা যায় নজরুল ইসলামের বাস্তব জীবনের সংগ্রাম ও কবি-মনের সংগ্রামের মহামিলনে কবি ব্যক্তি-জীবনে আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন ও কবিসত্তাকে উজ্জ্বলতর করে রূপ দিতে পেরেছেন। তাই কবির উজ্জ্বল ও উচ্ছল ব্যক্তি-জীবনকে যারা তাদের স্বার্থে লাগাতে

চেয়েছে তাদের বারংবার এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এইসব ছদ্মবেশী স্বার্থবহ বন্ধুরাই ব্যর্থতার আঘাতে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে তাঁর নামে নিন্দা রটিয়েছে, কুৎসার কন্টক পথে পথে বিছিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কবি কখনও তাদের প্রতি রুষ্ট হননি, বরং দেখা হলে আত্মীয়তার দুই বাহু বাড়িয়ে তাদের বুকে টেনে নিয়েছেন, সুমিষ্ট ব্যবহারে তাঁর আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে।

নজরুলকে ব্যক্তি জীবনে দেখে রবীন্দ্রনাথের এই কটা লাইন কেবলই মনে হয়—

"মন দেয়া নেয়া অনেক করেছি
নূপুরের মত বেজেছি চরণে চরণে ;
আঘাত করিয়া ফিরেছি দুয়ারে দুয়ারে,
সাধিয়া মরেছি ইঁহারে তাঁহারে উঁহারে,
অশ্রু গাঁথিয়া রচিয়াছি কত মালিকা,
রাঙ্গিয়াছি তাহা হৃদয় শোণিত বরণে।
নূপুরের মত বেজেছি চরণে চরণে।"

বিশ্ব কবির "উদাসীন" কবিতার এই কটা লাইন কবি নজরুলের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। যাঁরা তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে মিশেছেন তারা দেখেছেন পরম বন্ধুর নিষ্ঠুর আচরণে তাঁর হৃদয় শোণিতে তিনি স্নান করে উঠে মুক্তির গান গেয়েছেন। কখনও কারুর নামে অভিযোগ করেননি। বাঙলা দেশে তার নামে যে কত অলীক নিন্দা প্রবাদের মত ছড়িয়ে আছে তা তিনি শুনেছেন, কিন্তু জীবনে তার প্রাধান্য দেননি মোটেই। তাই তিনি "এ মোর অহঙ্কার" কবিতায় লিখেছেন—

"নাইবা পেলাম কণ্ঠে আমার তোমার কণ্ঠহার
তোমায় আমি করব সৃজন এ মোর অহঙ্কার।
এই ত আমার চোখের জলে,
আমার গানে সুরের ছলে,
কাব্যে আমার, আমার ভাষায়, আমার চেতনায়,
নিত্যকালের প্রিয়া আমায় ডাকছে ইসারায়।" (জিঞ্জীর)

এই "নিত্যকালের প্রিয়া"র ইসারাই কবিকে এক থেকে অপরে ছুটিয়ে নিয়ে বেরিয়েছে সৃষ্টির বেদনাকে রূপ দেবার জন্য। এই পথে এসেছে অসংখ্য নরনারী তাদের ব্যক্তিগত, দলগত, আদর্শগত স্বার্থ ও স্বার্থহীন মতলব বা উদ্দেশ্যকে সফল করবার জন্য। কবিকে কেউ বেঁধে রাখতে পারেনি কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধির কেন্দ্রে।

"নর ভাবে আমি নারী ঘেঁষা, নারী ভাবে নারী বিদ্বেষী।" "আমার

কৈফিয়ৎ" কবিতায় একথা কয়টি কবি লিখেছেন। কিন্তু পুরুষরা যখন তাঁকে নিন্দা করেছেন নারীর সঙ্গে কুৎসা রটিয়ে, তখন কি তারা বিচার করে দেখেছেন—কবির জীবনে পুরুষ যত এসেছে, সে তুলনায় নারীর সংখ্যা কত কম? অসার বাঙালী-সমাজে কবি এসেছিলেন একটি চলমান অগ্নি প্রবাহের মত। সেই আগুনে অসংখ্য পুরুষ ও নারী পতঙ্গের মত, কেউ লোভে এসে পুড়ে মরেছে, কেউ পুড়ে খাঁটি সোনা হয়েছে। এই জীবন নিয়েই তিনি সুখী ছিলেন। কিন্তু কবি-সত্তা জন্মক্ষণ থেকে তাকে মুসাফির করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল; কেবলই খুঁজে চলার ব্রত ছিল নজরুলের। তাই কোন একটা অবস্থায় তিনি সুখী থাকতে পারতেন না। এক ভাব থেকে আর এক ভাবে, এক চক্রবাল থেকে আর এক চক্রবালে, এক মানুষ থেকে আর এক মানুষে, কোথায় সে পরম শান্তির বস্তু, কোথায় এর শেষ?—এই অনুসন্ধানই ছিল কবির জীবন-বেদ। আমরা বুঝতে না পেরে তাঁকে অবিশ্বাস করেছি, নিন্দা রটিয়েছি, নিজের ক্ষুদ্রতা দিয়ে তাকে হীন করবার চেষ্টা করেছি। কবি "ধূমকেতুতেই" লিখেছিলেন—

"নিয়মের মাঝে এসো অনিয়ম।"

গতানুগতিকের পথে যখন সবাই চলেছে তার ফলে দেশের কোথাও কল্যাণ হচ্ছে না, নিয়মের ও আইনের গোলাম হয়ে পড়েছে সবাই; তখন কবি অনিয়মকে আহ্বান করলেন। দেশব্যাপী ব্যতিক্রমের পাগলা হাওয়া বইয়ে দিলেন। কবি নিজেই ছিলেন এই ব্যতিক্রমের অগ্রদূত। চলায়, বলায়, হাসায়, গান গাওয়ায়, লেখায়, পোষাকে তিনি এমন একটা বিদ্রোহ প্রকাশ করতে লাগলেন যে দেশের সকলে চমকে উঠল। তিনি বলতেন—'সবাই যা করে যাচ্ছে আমি তার থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখি কারণ, নিয়ম ভাঙ্গায় যে ভয় নেই সেটাই আমি জানাতে চাই।' লাল চাদরের সঙ্গে গেরুয়া মির্জাই পরতেন। গেরুয়া পাঞ্জাবীর সঙ্গে বাসন্তী রঙের চাদর গায়ে দিয়ে ফিকে গোলাপী সিল্কের জরী পাড়ের ধুতি কখনও কখনও পরতে দেখেছি। তাঁর পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল। সভায় সভায় গান গাওয়া, আবৃত্তি করাই ছিল তাঁর কাজ। স্বল্পাহারী ছিলেন তিনি। চা পান করতেন আর পান খেতেন। কিন্তু কখনও তাঁর 'পানদোষ' ছিল না। তাই বলে তিনি মোটেই অস্বাভাবিক লোক ছিলেন না। কবি-নজরুল ও মানুষ-নজরুলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ছিল। কবি সকল সময়ই আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার রসে ভরপুর থাকতেন, এইটাই তাঁর সহজাত স্বভাব। এই স্বাভাবিক ভাব প্রকাশ পেত পরিচিত অপরিচিতদের সঙ্গে যখন তিনি মিশতেন। তাঁর কাছে যেই যেত তাকে কবির ব্যবহারে মনে করতেই হত যে 'নজরুল আমার কত আপনার লোক, কতদিনের পরিচয়'। শিশু, বালক ও কিশোরদের

সঙ্গে কবি যখন মিশতেন তারা কবির আন্তরিকতায়, অদ্ভুত অদ্ভুত গল্পে, ছড়ায় মশগুল হয়ে থাকত। কবিও ভুলে যেতেন তাঁর বয়সের মাপকাঠি।

তিনটি লোক নিয়ে কবি নজরুলের সংসার ছিল। কিন্তু এই ছোট সংসারটি অতিথি অভ্যাগততে দিনরাত গমগম করত।

পরম স্নেহময়ী গিরিবালা দেবী মায়ের মত সকলকে সেবা যত্ন দিয়ে আনন্দ দিতেন। মাতৃমূর্তিতে দিবারাত্র সংসারের কাজ করতেন। পরিচ্ছন্নতা, সর্বকাজে নিপুণতা, আগন্তুকদের নানা রকম খাবার তৈরি করে খাওয়ানো প্রভৃতি ছিল তাঁর স্বভাব। শত অভাবের মধ্যেও ধৈর্যের সঙ্গে একমাত্র মেয়ের সংসারকে পাকা মাঝির মত চালিয়ে নিয়ে গেছেন, সকল সময়ই সন্তানের মত শিবতুল্য জামাইয়ের সম্মান বজায় রেখেছেন।

দ্বিতীয় প্রাণী কবি-পত্নী প্রমীলা দেবী। শিবের মত ভাব-পাগল স্বামীকে হাসিমুখে বিবাহের প্রথম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সতী বেহুলার মত আগলে রেখেছিলেন। প্রমীলা দেবীর প্রকৃতি স্বভাবতই শান্ত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ। তিনি মোটেই প্রগলভা নন। স্বল্পভাষী প্রমীলা দেবী প্রয়োজন মত কথা বলতেন, রসিকতা করতে বেশ ভালই জানতেন তবে অকারণ কথা কওয়া, চাপল্য প্রকাশ করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। তিনি যে অসীম ধৈর্যশীলা তার প্রমাণ দেখেছি দুই দুইবার পুত্রশোকে কাতর হয়েও ধীরতার সঙ্গে সংসার করেছেন। শত অভাবেও স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে নিরানন্দ ভাব প্রকাশ করেননি। এই সাধ্বীকে নিয়েও অনেকে কত কথাই না বলেছে। নজরুল যে আজ জনপ্রিয় কবি, তার পিছনে যে এই প্রমীলা দেবীর দান কত, তা কি কেউ জানে? কবি নজরুল তাঁর "দোলন চাঁপা" বইখানি তাঁর সহধর্মিণীকেই উৎসর্গ করেছেন। কবি পত্নীর আর একটি নাম "দুলু"। এই গ্রন্থের পূজারিণী কবিতাটি কবির বহু শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্যতম। এই কবিতাটি মন দিয়ে পড়লে দেখা যাবে কবি স্বামী হিসাবে কত নিখুঁত।

পারিবারিক জীবনে কবি কখনও অসুখী ছিলেন না। তবে অর্থাভাবে সংসারের প্রতি কর্তব্য করতে পারতেন না বলে দুঃখ পেতেন। সহস্র কাজের তাড়নায়; অর্থের চেষ্টায় সব সময়ই তাঁকে বাইরে বাইরে থাকতে হত। কিন্তু যখনই ঘরে ফিরে আসতেন তখনই সময় করে স্ত্রীর কাছে ও মায়ের মত শাশুড়ির কাছে বসে নানা গল্প, আলোচনায় মাতিয়ে রাখতেন। শাশুড়িকে তিনি অত্যন্ত সমীহ করে চলতেন, তাঁকে উপযুক্ত সম্মান ও ভক্তি করতেন। যখন যা লিখতেন বাড়ির ঐ দুজনকে প্রথম শোনাতেন আর শোনাতে শোনাতে রচনা সংশোধন করতেন। নিজের লেখার প্রতি এত নির্মম ছিলেন যে কাটতে কাটতে প্রায় সবই বদলে ফেলতেন, সংশোধন করে যে পর্যন্ত না খুশি হতেন সে পর্যন্ত কলম ছাড়তেন না।

কবিপত্নী অসুস্থ হয়ে পড়লে, মাতা গিরিবালা দেবী যেভাবে রুগ্না কন্যার সেবা করেছেন, ছোট ছোট দুটি নাতি, লেনিন ও সানইয়াৎ (সানি, নিনি)কে

সামলেছেন, সংসারের সমস্ত কাজ নিপুণভাবে দৈনিক সমাধা করেছেন, সে কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। এই সময় কবির নানা খেয়াল দেখা যায়। আধ্যাত্মিক চিন্তায় প্রায় সব সময়ই মশগুল হয়ে থাকতেন। গ্রামোফোন কোম্পানির কাজটা তখনও তাঁর ছিল। অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য প্রচুর টাকা খরচ হত, সেই জন্য কবি কোন এক মুসলমান ভদ্রলোকের কাছে হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার করেন! পরে এই লোকটি কোর্টের ভয় দেখিয়ে টাকার তাগিদ দেয়। কবি সে লোকটির ঋণ শত চেষ্টাতেও শোধ করতে পাচ্ছিলেন না। তখন উক্ত মুসলমানটি গ্রামোফোন কোম্পানির কাছ থেকে টাকা আদায় করে নেবার ভয় দেখায়। কবি ভারি চিন্তিত হয়ে পড়েন ইজ্‌জৎ যাবার ভয়ে। ভাবতে ভাবতে কবি ঠিক করেন যে কোম্পানির কাজ ছেড়েই দেবেন! এদিকে ঘরে অসুস্থ মেয়ে ও দুটি নাবালককে নিয়ে গিরিবালা দেবী হাবুডুবু খাচ্ছেন, কবি এই সময় কোম্পানির কাজ ছেড়ে দিলেন। নজরুল মাঝে মাঝে কাবলির কাছ থেকে টাকা ধার করেও সংসার চালাতেন। তাই কবির হরি ঘোষ স্ট্রীটের বাড়ির দরজায় এই সময় কাবলিদের বসে থাকতে দেখা যেত।[১]

এই অভাবের দিনেও প্রমীলা দেবীর এক আত্মীয় পরিবার তাঁদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কবি, কবিপত্নী ও গিরিবালা তাঁদের সাধ্যমত সেবা করতে কার্পণ্য করেননি।

কবি নজরুল এই সময়ে নানা কারণে আধ্যাত্মমুখী হয়ে পড়েন। আহার-নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করে আধ্যাত্ম সাধনা শুরু করেন। শ্যামা সঙ্গীত, ভক্তিমূলক ইসলামী গানও এই সময় লেখেন। স্ত্রীর দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়ের জন্য তারকেশ্বরে হত্যে দেন। হুগলীর বিখ্যাত বনমসজিদে মানত্ করেন। পরে ধীরে ধীরে নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েন। গিরিবালা দেবী জামাইয়ের অসুস্থ অবস্থা দেখে দিশাহারা হয়ে পড়েন। মেয়ের জন্য যে সংগ্রামময় জীবন তিনি বেছে নিয়েছিলেন, সহস্র বাধাও অতিক্রম করেছিলেন যাদের মুখ চেয়ে, সেই স্নেহের সন্তান নজরুলের অবস্থা দেখে আর ধৈর্য রাখতে না পেরে একদা তিনি চিরকালের জন্য কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন, আজও তার কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি।

কবির-'বুলবুল' বা অরিন্দম খালেদ নামে তৃতীয় পুত্রের কৃষ্ণনগরে ১৯২৬ সালের ৯ই অক্টোবরে জন্ম হয়।

তার স্মৃতিশক্তি ছিল যেমন অদ্ভুত, শ্রুতিশক্তিও ছিল তেমনি। একবার যা শুনত তা কখনও ভুলত না। বালক বুলবুল অল্প বয়সে তার পিতার ডান হাত হয়ে উঠেছিল। এন্টালী অঞ্চলে মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের বাড়িতে কালব্যাধি বসন্ত রোগে তার মৃত্যু হয়। নজরুল গান লিখে তাতে যখন সুর দিতেন বালক বুলবুল তা শুনে ঠিক ঠিক মনে রাখত।

(১) কাঁচড়াপাড়ায় "নজরুল জন্মতিথি" উৎসবের প্রধান অতিথি শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষণ থেকে উল্লিখিত।

কবিকে কখনও ব্যক্তিগত কথা বলতে শুনিনি বা শোক দুঃখে অধীর হতে দেখিনি। যখনই গভীর বেদনা বোধ করতেন বা পেতেন তখনই গানে ও কবিতায় সুর ও বাণীর পথে তা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বুলবুলের বেলায় তার বাঁধ ভাঙ্গার মত শোক উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। 'হাফিজ' ছিলেন নজরুলের প্রিয় কবি। হাফিজের 'তিয়াত্তরটি রোবাইয়াৎ' তিনি অনুবাদ করে 'রুবাইয়াৎ-ই হাফিজ' বইখানি প্রকাশ করে বুলবুলকে উৎসর্গ করেন। কবি সেই উৎসর্গে লেখেন—

'বাবা বুলবুল।
তোমার মৃত্যু শিয়রে বসে

'বুলবুল-ই সিরাজ' হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ আরম্ভ করি, যেদিন অনুবাদ শেষ করে উঠলাম, সেদিন, তুমি আমার কাননের বুলবুলি উড়ে গেছ……

জানিনা তুমি কোথায়। যে-লোকেই থাক, তোমার শোকসন্তপ্ত পিতার এই শেষ দান শেষ চুম্বন বলে গ্রহণ করো।

সিরাজের বুলবুল কবি হাফিজের কথাতেই তোমাকে স্মরণ করি।

'সোনার তাবিজ, রূপার সেলেট
মানাত না বুকেতে যার,
পাথর চাপা দিল বিধি
হায়, কবরের শিয়রে তার।'

পিতা হিসাবে, স্বামী হিসাবে, বন্ধু বৎসল হিসাবে কবি নজরুলের জুড়ি ছিল না। নিজের ছেলের, নিজের স্ত্রীর ও বন্ধুদের দুঃখ দেখে বিশ্বের বেদনা তাঁর বুকে জোয়ার জাগাত। ঘরের মধ্যে যে অবস্থা দেখবেন তাই বড় করে বিশ্বের পটভূমিকায় আঁকতেন। তাঁর ব্যক্তিজীবন ছিল বিশ্ব ব্যক্তিসত্তার মিলন বেদি।

টাকা তিনি অনেক রোজগার করেছেন। কিন্তু চুরুলিয়ার দুখুমিয়া নজরুল হয়েও টাকা রাখতে পারেননি। সেকি খামখেয়ালীর জন্য? না, বন্ধুদের দুঃখ লাঘব করতে গিয়ে ব্যয় হয়েছে? আজ কবির সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন। কিন্তু যাঁরা তাঁর সরল বন্ধুত্বের দান গ্রহণ করেছেন তাঁদের সেসব প্রকাশ করার সৎ সাহস নেই কেন?

কবি আজও বেঁচে, তাঁর বন্ধুত্বের গর্ব নিয়ে অনেকেই গল্প জমান, তাঁরা নিজেদের কথা নিয়েই ব্যস্ত। বন্ধুবৎসল কবির বন্ধুত্বের গভীরতার বিষয় স্বীকার করতে তাদের অহমিকায় বাধে।

নজরুল যখন "ধূমকেতু" প্রকাশ করেন, সেই সময় তিনি নূতন লেখক লেখিকার খবর পেলেই তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে লিখবার জন্য উৎসাহ

দিতেন, ও ভাল রচনা হলে প্রকাশ করতেন। আজকের দিনে পত্র পত্রিকায় দলের লোক না হলে যেমন ঠাঁই পাওয়া যায় না, নজরুলের মধ্যে সে দল-দুষ্টতা ছিল না। "ধূমকেতু" প্রকাশের সময় হুগলীর অন্যতমা লেখিকা শ্রীযুক্তা মহামায়া দেবীর[২] খবর পেয়ে হুগলীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে তাঁর রচনা "ধূমকেতুর" কয়েক সংখ্যায় প্রকাশ করেন। উক্ত দিবস ভাইফোঁটার দিন ছিল। মহামায়া দেবী ঐদিন হুগলীর বিপ্লবী ও সাহিত্যিক ভাইদের বরাবরই সমারোহ করে ফোঁটার ব্যবস্থা করতেন। ঐদিন নজরুলের উপস্থিতিতে উৎসবটি বেশ জমাট হয়েছিল। ঐ সপ্তাহের "ধূমকেতুতে" "ভাই ফোঁটার" উপর কবি সুন্দর একটি রোমাঞ্চকর প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

শিশু ও বালকদের সঙ্গে কবি যখন মিশতেন, তারা কবিকে তাদের সমবয়সী বন্ধু বলে ভাবত। কবিও আত্মহারা হয়ে মিশে যেতেন ওদের ভিতরে। তাদের অদ্ভুত অদ্ভুত গান, গল্প ও ছড়া মুখে মুখে বানিয়ে বলতেন। হাসি মুখে শিশুদের আবদার পালন করতেন। "ঝিঙে ফুল" বইয়ের লিচুচোর, কাঠবিড়ালী প্রভৃতি এই সব আব্দারেরই ফল। একটি কবিতা হুগলীর সরকারী উকিল "আনোয়ার সাহেব" কে উদ্দেশ্য করে লেখা। এই আনোয়ার সাহেব ছিলেন মিসেস্ এম রহমানের পিতা। নজরুল মিসেস্ রহমানকে "বিষের বাঁশী" বইখানি উৎসর্গ করেন "নাগ মাতা" বলে। কবি লিখেছিলেন—

"এমনি প্লাবন দুন্দুভিবাজা ব্যাকুল শ্রাবণ মাস
সর্বনাশের ঝাণ্ডা দুলায়ে ; বিদ্রোহী রাঙাবাস
ছুটিতে আছিনু মাভৈঃ মন্ত্রে ঘোষিত অভয়ঙ্কর
রণ বিপ্লব রক্ত অশ্ব কশাঘাত জর্জর।
সহসা থমকি দাঁড়ানু আমার সর্পিল পথ বাঁকে
ওগো নাগ মাতা বিষ জয় জয় তব গরজন ডাকে।"

কবি সুবোধ রায়ের বাড়ি ও আমাদের বাড়ির ছোট ছেলে মেয়েদের "কাজী কাকা" এলে খাওয়াদাওয়ার কথা মনে থাকত না। বড়রা নজরুলকে নিয়ে আড্ডা জমাতে পারতেন না বলে বিরক্ত হয়েও উঠতেন। কিন্তু কবি সবটুকু মনপ্রাণ ঢেলে দিতেন শিশু ও বালকদের মধ্যে। হুগলীতে তিনটে বাড়িতে বেশি যাতায়াত করতেন। হামীদুন্নবী মোক্তারের বাড়ি, আমাদের বাড়ি ও কবি সুবোধ রায়ের বাড়ি। কবি সুবোধ রায়ের বাড়ি এলে দিন দুই তো তাঁকে থেকে যেতেই হত। শিশুদের আবদার পালন সম্বন্ধে শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন তাঁর মেয়ের আব্দার পালনের কথা।

(২) ইনি হুগলীর তাঁতিপাড়ায় থাকতেন। কিছুদিন পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

আমার মা নজরুলকে সামনে বসিয়ে খাওয়াতে ভালবাসতেন। আমাদের সংসারে মা, দিদিমা, ঠাকুমা, মাসীমাদের মন হিন্দুয়ানির সংস্কারের গোঁড়ামির লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল। কিন্তু কবি নজরুল সে বেড়া ডিঙ্গিয়ে নব সূর্যের মত উদিত হয়েছিলেন। পূজায় বসে মা, দিদিমাদের দেখেছি নজরুলের কল্যাণ কামনা করতে। নজরুল এলে সবাই দল বেঁধে বসে গান শুনতেন, কবির উচ্ছ্বসিত উচ্চ রোলেব হাসিতে মুগ্ধ হতেন। ভক্তিমূলক গান শুনতে চাইলে টাট্‌কা লিখে সুর দিয়ে তাঁদের অবাক করে দিতেন। সেই সময়ে ঘরে ঘরে এমনি করেই কবি সকলের মন জয় করেছিলেন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা, যুবক যুবতী ও শিশু বালকদের।

নজরুল বলতেন "আমি শত-দলের কবি। আমি কোন একটি দলেব রং মেখে সং সাজতে চাই না। আমি তারই কবি যে ইংরেজ ও দেশীয় অত্যাচারীদের দেশ থেকে তাডাবে ও চরম শাস্তি দেবে।" তাই তাঁর ব্যক্তি জীবন ও কবি জীবন ছিল এক। সকলের মধ্যেই তাঁর বাণী, তাঁর সুর প্রবেশ করেছিল। কবির ব্যক্তিগত জীবনও তাই সকল রকম লোকের মনকেই আকর্ষণ করতে পেরেছিল, পেবেছিল সজীব ও বেগবান করতে।

চারণ কবি মুকুন্দ দাসেব

"মনে মুখে দুই সমান রেখো ভাই
মানুষ যদি হতে চাও।"

এ দুটো লাইন সহজ ভাবে নজরুলেব মধ্যে অপূর্বভাবে মূর্ত হতে দেশ তখন দেখেছে। কবি নজরুলের জীবনে কাজে ও কথায় দ্বৈত ব্যবহার ছিল না।



সুরকার ও গীতকার



১৯৬২ সালে কবির জন্মদিনে মুজাফ্‌ফর আহমদ ও কবি

গীতকার ও সুরকার

বাংলা গান রচনায়, গানের সুর নির্বাচনে ও গান গাওয়ায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ, অতুল প্রসাদ ও নজরুল ইসলামের স্থান সবার উপরে। রবীন্দ্রনাথের ছিল কিন্নর কণ্ঠ, অতুলপ্রসাদ গাইতেন মৃদুকণ্ঠে। কণ্ঠের বৈশিষ্ট্য ছিল অতুলপ্রসাদেব। গানের ভাবকে ফুটিয়ে তোলাব জন্য তাঁর শরীর ভাব মাধুর্যে দুলে দুলে উঠত নদীর ছোট বড তরঙ্গের মত। ঠুংরির সূক্ষ্মতম সুব-বৃত্তকে কণ্ঠে ফুটিয়ে তোলার ব্যাকুলতায় সুরস্রষ্টার পরিচয় মূর্ত হয়ে উঠত। সামান্যতম দানাকেও নিষ্ঠার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতেন। অতুলপ্রসাদের সঙ্গে নজরুলের পবিচয় করিয়ে দেন ভারতের অন্যতম সুরস্রষ্টা, কবি ও গায়ক শ্রীদিলীপকুমাব বায়। অতুলপ্রসাদেব গান শুনে সুরের বীতি-নীতি দেখে নজরুল ঠুংরি ও খেয়াল গানের নূতন একটা পথ পান। নজরুলেব কণ্ঠ তত ভাল ছিল না, মোটা গলায় সব কটা পর্দাতেই তাঁর গলা উঠত নাবত, কিন্তু সেরকম সাবলীলভাবে সুর খেলে বেড়াত না। সেজন্য তাঁর গান শুনতে যে কষ্ট হত তা নয়, বরং ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনত, শুনত এই জন্য যে ভাবকে গানের ভিতব দিয়ে ফুটিয়ে তোলার অদম্য প্রয়াস ছিল তাঁর। অতি সাধারণ গানকেও অসাধারণ দরদ দিয়ে গেয়ে মনোহাবী করে তুলতে পারতেন। লম্বা লম্বা আঙ্গুলগুলো হারমোনিয়ামের পর্দায় যেন সাপের মত খেলে বেড়াত, শ্রোতাব মানসলোকে চমক দিত ঘন মেঘের কোলে বিদ্যুতেব মত। কবি নজরুল আড়বাঁশী পিক্‌লু ও মোহন বাঁশী ভাল বাজাতে পারতেন, বাঁশী বাজান অবস্থায়, তার একখানি স্কেচ নিয়ে ছিলেন স্বর্গত শিল্পী দিনেশরঞ্জন দাস। সেই স্কেচখানি কবির বিখ্যাত "বিষেব বাঁশী" গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে ছাপান আছে। তারপর তাঁর সুরজ্ঞান এমনি ছিল যে, হুগলীতে থাকা-কালীন বিখ্যাত সেতারী ৺প্রকৃতি গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে স্বল্প সময়ের মধ্যে সেতার বাজাতে শিখেছিলেন। তাঁর বাঁশী শুনে মুগ্ধ হত না এমন লোক দেখিনি। চট্টগ্রামে যখন গিয়েছিলেন, তখন কর্ণফুলীর তীরে বন্ধু হবীবুল্লা বাহার একটি ছবি তুলেছিলেন। বাঁশী মুখে সেই ছবিটি বেগম নাহারের "নজরুলকে যেমন দেখছি" গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য কবির সেতার বাজানও চাপা পড়ে যায়, আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য। যখন গান গাইতেন তখন কণ্ঠের আবেগ, হৃদয়ের দরদ একাকার হয়ে যেত, সুর কখনো গম্ভীর, কখনো বিলম্বিত ; কখনো দ্রুত। কখনও বা যন্ত্র ছেড়ে দিয়ে শুধু গলায় বাণীকে প্রাধান্য দিয়ে গান গাইতেন তিনি। বলতেন, "সুর-বাহনের পিঠে চেপে বাণী চলবেন তাঁর গন্তব্য স্থানে, সুরকে লাগাম দিয়ে চালাব আমি।" এই অভ্যেসটা তাঁর হয়েছিল ছেলেবেলায় "লেটোর দলে" গান গেয়ে।

গ্রাম্যগানের দলে সুরকে তত প্রাধান্য দেওয়ার রেওয়াজ নেই। যেমন মুকুন্দ দাস মহাশয়ের ছিল না। বাণীকে প্রাধান্য দিয়ে বলবার বিষয়কে সকলের মধ্যে অনুভব যোগ্য করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকেই নজরুল তাঁর সঙ্গীতের মধ্যে আজীবন রক্ষা করে গেছেন। বারংবার একটি কথাকে বা একটি পংক্তিকে নানাভাবে ঝোঁক দিয়ে নিয়ে গান গেয়ে শ্রোতাদের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। একে গ্রাম্য পদ্ধতি বলা যেতে পারে বা কীর্তনের আসর দেওয়ার পদ্ধতি। কারণ বাঙলাদেশের আউল বাউলরা এই ভাবে গেয়ে থাকেন। এই পদ্ধতির সংক্রমণশীলতাগুণেই গাইয়ে হিসাবে নজরুল আমাদের মধ্যে বেঁচে রয়েছেন সুকণ্ঠ না হয়েও। যাঁরা নজরুলের কণ্ঠে তাঁর লেখা গান শুনেছেন, তাঁরা অপরের কণ্ঠে সে গান শুনে আজও তৃপ্ত হন না। অবশ্য তাঁর লেখা গান কমলা ঝরিয়া, ইন্দুবালা, জ্ঞান গোস্বামী, উমাপদ ভট্টাচার্য, হিমাংশু দত্ত, নলিনী সরকার, মৃণালকান্তি ঘোষ, ধীরেণ দাস প্রভৃতি যে মেজাজ দিয়ে গেয়েছেন, তারও তুলনা হয় না; কিন্তু উক্ত গাইয়েদের পরে বর্তমানে—তাঁর গান যাঁরা গাইতে চেষ্টা করেন তাকে গাওয়া বলেনা, আওড়ানই হয়। নজরুলগীতির প্রসাদ-গুণ হল ভাবপ্রধান। অতি সাধারণ গানও হৃদয়ধর্মী। এই মর্মবাদই বাংলার চারজন গীতকারের জয়যাত্রার প্রধান কারণ। রবীন্দ্রনাথ যেমন রাগ সঙ্গীতকে আশ্রয় করে তাঁর গানে সুর দিয়েছেন, তেমনি এযুগের সঙ্গীত-জগতের দুই পথ-প্রদর্শক অতুলপ্রসাদ ও নজরুল, তাঁদের গানের সুরও ঐ রাগ সঙ্গীতের কাঠামোতেই রূপ দিয়েছেন। বিশেষ করে অতুলপ্রসাদের ঠুংরি আর নজরুলের গজল। মনে হয় নজরুলের পরই বাংলার সঙ্গীত জগতে কবি ও গীতকারের অজন্মা হয়েছে। কোন কোন লোক তাঁর কণ্ঠ নিয়ে আলোচনা করলে তিনি বলতেন যে, "কণ্ঠ না থাক কল্‌জে তো আছে। কলজে দিয়েই গান গেয়ে যাবো।" গীতকার নজরুলের সঙ্গীত সম্বন্ধে বুঝতে হলে কবিজীবনের চারিটি পর্যায় পরিক্রমা করতে হবে। কারণ কবি নজরুল কিশোর কাল থেকে যৌবনের শেষ পর্যন্ত গানের ছোট বড় রাস্তা, অলিগলি ঘুরে এসে কালীভক্ত হয়ে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে স্তব্ধ হয়ে আছেন। কে জানে মায়ের ভাব সমুদ্রে ডুবে রত্ন পেয়েছেন কি না? অন্তর লোকের আনন্দ-রসে মৌজ হয়ে স্তব্ধ হয়ে আছেন কিনা?

গীতকার নজরুলের গানের প্রথম পর্যায় লেটোর দলের বালক ও কিশোর গায়ক নজরুলের মধ্যে নিহিত রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে কবি প্রেম-সঙ্গীত লিখলেন যা ভাষায় ও সুরের দিক থেকে গভীর নয়, তবুও ভাবের গভীরতায় ভরপুর। এই সময়েই তিনি শক্তিমান ভাষায় স্বাধীনতা আন্দোলনের উপযোগী অপূর্ব সঙ্গীত রচনা করেন অপূর্ব সুরের মাধ্যমে। তৃতীয় পর্যায়ে রচনা করেন গজল। চতুর্থ পর্যায়ে ভক্ত নজরুলের ভক্তিমূলক গান বাংলা তথা ভারতের আকাশে বাতাসে ছেয়ে যায়। গীতকার ও সুরকার নজরুল-জীবনের এই দিকটা বিশেষ রূপে অনুধাবন করা দরকার।

বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ থেকে হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষই তাঁর জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। করাচীর সৈন্য বিভাগে থাকা পর্যন্ত কবি নজরুল ফারসী, ইংরাজী, বাংলা, উর্দু, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা থেকে ভাব সঞ্চয় করেছেন, বিভিন্ন দেশ বিদেশের লোকের সঙ্গে মিশে বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করে যেমন আনন্দ পেয়েছেন তেমনি আঘাতও পেয়েছেন। কিশোরকাল থেকে সৈনিক জীবন পর্যন্ত কবি নজরুল নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। একে কবির কাব্য জীবনের গঠন যুগ বলা যায়। এ যুগের গান ও কবিতা রচনার দিক থেকে সুষ্ঠু না হলেও ভাব গভীরতায় জাতীয় সাহিত্য সম্পদ বলে ধরে নিয়েছিলেন তখনকার সুধীজন। যুদ্ধের পর কবি জাতির মুক্তি আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করেন। এই সময় যে সব গান লিখে ও গান গেয়ে বজ্র নির্ঘোষে দেশের অসাড় চিত্তে চেতনা সঞ্চার করেন তার সুর সংযোজনার কারুকার্য ও সুর নির্বাচনের সুক্ষ্মবোধ ও গভীরতা সম্বন্ধে সুরস্রষ্টারা যদি ব্যাপক আলোচনা করেন তা হলে নজরুল ইসলামের জীবনের বিশেষ একটা দিক উদঘাটিত হয়ে যাবে। কবি যে সব ব্যঙ্গমূলক গান লিখেছেন তার বাহাদুরিও কম নয়। তাঁর এইসব গানে শ্লেষ বা আঘাত থাকলেও জাতির মনে বিরক্তি বা ক্ষোভের উদ্রেক করেনি, বরং কবিকে বাঙ্গালীরা পরম আত্মীয় বলে মেনে নিয়েছেন। কারণ জাতির বৃহত্তর স্বার্থের জন্যই তিনি এসকল গান রচনা করেছেন। তা ছাড়া কবি যে কথা বলতেন, সে কাজও তিনি করতেন, সে কাজ করে তবে তিনি লিখে গাইতেন।

"ভিক্ষা দাও। ভিক্ষা দাও ॥
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী,
সন্তান দ্বারে উপবাসী
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও।"

এই মানবতা বোধকে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই পর্যায়ের পর তিনি তাঁর গজলের যুগে আসেন। গজল গানের শুরু তাঁর জীবনে আসে অকস্মাৎ রূপে। কলকাতার পারসী থিয়েটারের মালিকের অনুরোধে কবি একটী গজল গান লিখে দেন। সম্পূর্ণ ফারসী ভাষাতে গানটি এই :—

"গুল্‌সন্‌কে চুম্‌ চুম্‌ কহতে বুল্‌ বুল্‌
রুখসারাসে বে দরদী বোরখা খুল।
হাঁসতি হ্যায় বোস্তাঁ
মস্ত্‌ হো যা দোস্তা
শির্‌ শিরাজীসে যা
বেহোস্‌ হো জাঁ

সব্ কুছ্ আজ রঙ্গীন্ হো সব কুছ্ মশ্‌গুল্
গুল্ হোকার হাঁস্‌তি হায় দোজখ্ বিল্‌কুল্।
হারে আশেক্
মাশুক্‌কি চমনো মে খুল্‌তা নেহি,
দোবারা-ফুল্ ফুল্ ফুল্ ফুল্॥

গানটি "পূবের হাওয়া" নামক গ্রন্থতে আছে।

কবি যখন হুগলী থেকে কৃষ্ণনগর চলে যান তখন প্রায়ই কলকাতার নানা গানের আসরে তাঁর ডাক পড়ত। এই সময়ে অন্যতম কবি ও গায়ক শ্রীদিলীপকুমার রায়ের বাড়িতে একটা বড় গানের আসর বসে। সেই আসরে কবি এই গানটী গাইবার পর দিলীপবাবু কবি নজরুলকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে ফারসী শব্দের ওজন পুরোপুরি রেখে গজল গান লিখতে অনুরোধ করেন। নজরুল এর পর থেকে গজল গান লেখায় মেতে উঠেন। কবি তখন কৃষ্ণনগরে চাঁদ সড়কের গ্রেস কটেজে থাকতেন। এইখান থেকেই গজল গানের শুরু। গজলকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বাংলা ভাষায় যে ফারসী শব্দের ধ্বনিকে বজায় রাখা যায় তার প্রমাণও তিনি দিয়েছেন। নজরুলের পূর্বে ও পরে কোন গীতকার ও সুরকারই গজলকে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনপ্রিয় করতে পারেন নি, বর্তমানেও কেউ পারলেন না। এর কারণ নজরুলের যে নিষ্ঠা, যে পরিশ্রম ও সাধনার ঐকান্তিকতা ছিল, বর্তমানে গীতকার ও সুরকারদের মধ্যে তা নেই বলে।

অতঃপর কবি নজরুল রাগ সঙ্গীতের অনুরাগী হয়ে উঠেন। এই সময় ভারতীয় রাগসঙ্গীতের ঘরানা গায়ক জনাব মঞ্জু সাহেব, দবীর খাঁ, জমীর খাঁ, মস্তান গামা প্রভৃতির বন্ধুত্ব লাভ করেন ও তাঁরা কবি নজরুলকে রাগ-সঙ্গীতের গুঢ় তত্ত্বের সন্ধান জানান। উক্ত সঙ্গীত বিশারদগণ নজরুলের সুর, সুরের মর্ম গ্রহণের ক্ষমতা দেখে কবিকে "ডাকু" আখ্যা দিয়েছিলেন। সময়টা ১৩৩৯ সাল, কবি জমীর খাঁকে "বন গীতি" নামক বইটি উৎসর্গ করেছেন। উৎসর্গে লেখেন—

"ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীত কলাবিদ
আমার গানের ওস্তাদ
জমীর উদ্দিন খান্ সাহেবের দস্ত্ মোবারকে—

তুমি বাদশাহ্ গানের তখ্‌তে তখ্‌ত পশীন্,
সুর-লায়লীর দীওয়ানা মজনু প্রেম-রঙ্গীন।
কণ্ঠে তোমার শ্রোতস্বতীর উছল-গীতি,
বিহগ-কাকলী, গন্ধর্ব-লোকের স্মৃতি।
সাগরে জোয়ার সম তব তান শান্ত উদার,

হৃদয়ের বেলাভূমে নিশিদিন ধ্বনি শুনি তার।
খেলায় তোমার সুরগুলি পোষা পাখীর মত,
মুক্ত-পক্ষ চঞ্চল-গতি লীলা রত।
বীণার বেদনা বেণুর আকুতি তোমার সুরে,
ব্যথা-হত ভোলে ব্যথা তার, সুখী ব্যথায় ঝুরে।
সুর-শা'জাদীর প্রেমিক পাগল হে গুণী তুমি,
মোর "বন গীতি" নজ্‌রানা দিয়া দস্ত্‌ চুমি।"

কলিকাতা
১লা আশ্বিন, ১৩৩৯ নজরুল ইস্‌লাম

অতঃপর শেষ পর্যায়ে নজরুলকে দেখতে পাই ভক্ত হিসাবে। ভক্তি-মূলক গান লিখতে গিয়েও তিনি তান্ত্রিক সাধনা শুরু করেন। গভীর ভাবপূর্ণ কীর্তন, বাউল, শ্যামাসঙ্গীত ও ইসলামী গান প্রচুর লেখেন, সুর দেন, আর নানা সার্থক গায়কদের দিয়ে রেকর্ড মারফত দেশে বিদেশে ছড়িয়ে দেন। এখানেও দেখি কবি আচরণ ও অভ্যাসের মাধ্যমেই এই সম্পদ দিয়ে গেলেন জাতির সাহিত্য সভায় ভক্তদের গোপন-সাধন মহ্‌ফিলে। আজ পথে-ঘাটে, রেলে, ভিখারী ও ভক্তদের আসরে নজরুলের গান শুনি। কিন্তু শ্রোতারা জানতেও পারেন না এ কার লেখা। কারণ কবি নজরুল তাঁর গানের শেষে কোন ভণীতাও রাখেননি। বাংলা দেশের বহু কবির রেওয়াজ রয়েছে গীত রচনার শেষে ভণীতা দেওয়া। কিন্তু কবি নজরুল গানে তাঁর কোন চিহ্নও রেখে গেলেন না। শুধু গানের মাধ্যমে তাঁর ইষ্টকে বললেন—

"দিয়া বেদনার পরে বেদনা
নাথ। দিলে এ কত বিপুল চেতনা?"

শুধু চেতনার তাড়নায় তাড়িত হয়ে ঘাটে ঘাটে পথে পথে ক্ষ্যাপার মত পরশ পাথর খুঁজে ফিরে শেষের দিকে ভক্তি-মার্গে পৌঁছে পরশ পাথর পেয়ে বললেন —

"বলরে জবা বল।
কোন সাধনায় পেলিরে তুই
শ্যামা মায়ের চরণ তল।
তোর সাধনা আমায় শেখা (জবা)
জীবন হোক সফল।"

সাংবাদিক নজরুল

(১)

সাংবাদিক নজরুলকে জানতে হলে তাঁর বাল্য জীবন কী ভাবে গড়ে উঠেছিল তা জানা দরকার। কারণ পরবর্তীকালে নজরুল সাংবাদিক রূপে যখন আত্মপ্রকাশ করেন তখন তাঁর লেখনীতে কোন্ পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন, কেন দিয়েছেন, বোঝা যাবে।

খানদানী বংশের ছেলে নজরুল। বিরাট কাজী পরিবার কেন অভাব অনটনের মধ্যে সমস্ত কচি-কাঁচা ছেলে-মেয়ে নিয়ে দিন গুজ্‌রান্ করেছে। জমি থাকতেও ফসল পায়নি; প্রজা থাকতেও খাজনা পায়নি। এরিমধ্যে নজরুল-মাতা বিধবা জীবন যাপন করেছেন ছোট-ছোট কয়েকটি শিশু সন্তান নিয়ে।

কাজী নজরুল যখন শৈশব অবস্থা মাত্র পার হয়েছেন তখন থেকে সংসার চালাবার জন্য তাঁর কাকা বজলে করীমের গানের লেটোর দলে শাগরেদি করেছেন। তারপর ওস্তাদ গোদার দলে একটু বড় হয়ে পাঁচটাকা মাইনে নিয়ে লেটোর দলে নেতৃত্ব করেছেন ঐ বয়সে।

পরবর্তী জীবনে যখন কিশোর তখন কবি আসানসোলের রুটির দোকানে আট টাকা মাইনেতে 'বয়ের' কাজ করেছেন। গার্ড সাহেবের বাবুর্চি ছিলেন, এমনি করে দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করে দুঃখী জনসাধারণের মধ্যে শৈশব কাটিয়েছেন। দুঃখের ভয়ালরূপ সংসারে ও সংসারের বাইরে দেখেছেন ও ভুগেছেন। ভাবুকতা ও স্পর্শাতুর মন নিয়ে সংসারের কঙ্কর ও কণ্টকময় পথ দিয়ে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তাতেই তাঁকে জনগণের কবি ও জনগণের সাংবাদিক হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

৪৯ নং বাঙালী পল্টন যখন ইংরাজ সরকার ভেঙে দেয় তখন কবি করাচীতে। করাচীর ব্যারাকে থাকা কালে কলিকাতার "মুসলিম সাহিত্য সমিতির" সম্পাদক জনাব মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ হয়, ও বন্ধুত্ব বেশ জমে ওঠে। মুজফ্‌ফর সাহেবকে নজরুল ৪৯ নং বাঙালী পল্টন উঠে গেলে কী করা যাবে সেই কথা জানতে চান। এই চিঠির উত্তরে আহ্‌মদ সাহেব তাকে চলে এসে সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য বলেন। কিন্তু নজরুল এতে মনস্থির করতে না পারায় মুজাফ্‌ফর সাহেব তাঁকে লেখেন। "সে লিখ্‌ত সে সিদ্ধান্তই না হয় নিলুম, কিন্তু খাওয়া পরার কি উপায় হবে? জওয়াবে আমি তাকে লিখতেম খাওয়া-পরার ব্যবস্থা একটা হবেই। কলকাতা শহর অথই সমুদ্র নয়, শুকনো ডাঙ্গা মাত্র। সে সময়ে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নজরুলকে কল'কাতার সাহিত্যিকসমাজে

প্রতিষ্ঠা করা। অন্য সব হিসাব খতিয়ে দেখার মনোবৃত্তি তখন আমার ছিল না।"[১]

১৯২০ সালের আরম্ভের দিকে ৪৯ নং বাঙালী পল্টন ভেঙে দেয় ব্রিটিশ সরকার। নজরুলও বোঁচ্‌কা-বুচকি বেঁধে করাচী থেকে কলকাতায় চলে এসে সরাসরি গিয়ে উঠেন ৩২ কলেজ স্ট্রীটের মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে আহ্‌মদ সাহেবের কাছে। আহ্‌মদ সাহেবই নজরুলকে সাংবাদিকতার দিকে নিয়ে আসেন। তাঁর কথাতেই বলি—"নজরুল তো কবি ও লেখক ছিল না, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সৈনিকও ছিল। পল্টনে যোগ দিয়ে অনেকে উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায়, নজরুল তা' হয় নি। সে যখন পল্টন হ'তে ফিরে এল তখন সে ছিল দেশপ্রেমে ভরপুর ও স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর।"[২] এখানে এই কথাটি বলে রাখা দরকার হল এই জন্য যে সাংবাদিক নজরুলের সাংবাদিকতার ব্রতই ছিল দেশ গঠনের জন্য। দেশকে গড়তে সেই পারে যে আদর্শ-নিষ্ঠ ব্যক্তি। নজরুলও একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক ছিলেন। কথায় আছে—"আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়।" চরিত্রের বৈদ্যুতিক ও একনৈষ্ঠিক শক্তিদ্বারা তিনি তাঁর কবি ও সাংবাদিক জীবন দিয়ে দেশের নর-নারীকে ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩০ সালের আন্দোলনের উপযুক্ত সেবক হয়ে ওঠার জন্য যে আহ্বান করেছিলেন তা ব্যর্থ হয় নি বরং নজরুল ঐ সময়ে চারণ রূপে ও সাংবাদিক রূপে আবির্ভূত না হলে দেশ অতটা শক্তি লাভ করত না।

তাঁর সাংবাদিক জীবনের প্রথম সাথী মুজফ্‌ফর নজরুলকে পেয়ে একটা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হলে যে রূপার (টাকার) দরকার হয় তা তাঁদের ছিল না। কোথায় পাওয়া যায় টাকা, কে তাঁদের মতের সঙ্গে মত দিয়ে দেবে টাকা, এই কথা ভাবতে লাগলেন। এই পরিকল্পনায় ছিলেন নজরুল, মুজফ্‌ফর সাহেব ও তাঁর বন্ধু ফজলুল হক সেলবর্সী (নেতা ফজলুল হক নন)। পরে এ, কে, ফজলুল হকেব কাছ থেকে তাঁরা টাকা পেলেন এবং "নবযুগ" নাম দিয়ে এক পৃষ্ঠার "সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ পত্রিকা" প্রকাশিতও হল। সময় ১৯২০ সাল। পরিচালক রইলেন এ, কে, ফজলুল হক। পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক হলেন কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।[৩] এই পত্রিকায় নজরুল যে-সব প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন তাতে কয়েক দিনের মধ্যেই জামানতের হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং আবার দু'হাজার টাকা জমা দিয়ে পত্রিকা প্রকাশ চলতে থাকে। বহু দিন হয়ে গেছে তার ফাইল এখন আর পাওয়া যায় না। তবে সে সময়ে নজরুল "যুগবাণী" বলে একটা

---

(১) মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখিত "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে" গ্রন্থের ১১নং পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(২) ঐ ১৮নং পৃঃ "

(৩) ঐ ২১নং পৃঃ "

গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে। উক্ত গ্রন্থের মধ্যে যে সব প্রবন্ধ-গুচ্ছ আছে তা' উক্ত নবযুগ হতে সংগ্রহ করেছিলেন। এই বইটি তৎকালীন ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে দেয়। একুশটি প্রবন্ধের সমাবেশে এই গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। প্রথম প্রবন্ধের নামকরণ "নবযুগ"। তাতে কবি বলেন—"আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহামাতার মহা আনন্দের দিন, আজ মহামানবতার মহা-যুগের মহা-উদ্বোধন। আজ নারায়ণ আর ক্ষীরোদ-সাগরে নিদ্রিত নন। নরের মাঝে আজ তাঁহার অপূর্ব মুক্তি কাঙাল বেশ।...ঐ যে ভীম রণ-কোলাহল, তাহাতেই মুক্তিকামী দৃপ্ত তরুণের শিকল টুটার শব্দ ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিতেছে। সাগ্নিক ঋষির ঋক্ মন্ত্র আজ বাণী লাভ করিয়াছে অগ্নি পাথারের অগ্নি কল্লোলে।" এই অগ্নিকল্লোলই "বিদ্রোহী" কবিতার মাধ্যমে কুল ছাপিয়ে সমাজ ছাপিয়ে গিয়ে তরুণ দলকে নবযুগ গঠনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়েছিল।

মুজফ্ফর বলেন—নবযুগের প্রকাশের কিছুদিন বাদে একজন ইংরেজ জজ বাংলা জানতেন এবং পড়তেন। তিনি ফজলুল হক্ সাহেবকে চেম্বারে ডেকে নিয়ে বললেন, "তুমি তো কাগজের মারফতে অগ্নিবর্ষণ সুরু করে দিয়েছ।" আহ্মদ সাহেব আরও বলেন ঃ—"এ কথা মানতেই হবে যে নজরুলের জোরাল লেখার গুণেই "নবযুগ" জনপ্রিয় হয়েছিল। শুধু জোরাল লেখা বললেই সব কিছু বলা হল না। নজরুলের লেখা হেডিংগুলি হত অতুলনীয়।"[৪]

শৈশব পার হয়ে বাল্য ও কৈশোরে গ্রাম্য লেটোর গানের দলে গান গাওয়া ও পরে গান লেখার মাধ্যমে চলতি ভাষার ওপর যে অদ্ভুত দখল হয়েছিল, এবং দরিদ্র সমাজের লোক হয়ে দারিদ্র্য সম্বন্ধে যে ধারণা হয়েছিল এবং দরিদ্র সাধারণের ওপর আত্মীয়তার দৃঢ়মূলে হৃদয়-অভ্যন্তরে প্রসারিত হয়ে দরদী করে তুলেছিল, তাতেই কবি নজরুল সর্বপ্রকার শোষণ বিরোধী হয়ে উঠে প্রতিকার পন্থা তাঁর লেখনীর মারফত দিতে পেরেছিলেন। সেই জন্যই নজরুল সাধারণের কবি ও সাধারণের মনোহরণ করেছিলেন সাংবাদিকরূপে।

সাধারণ প্রবাদ বাক্য, চলতি শ্লোক, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, দেশ বিদেশের পৌরাণিক কাহিনীর উপমা দিয়ে, আরবী, ফার্সী ও হিন্দি শব্দ প্রয়োগে যে-কবিতা, যে-প্রবন্ধ লিখতেন, তাই নিয়ে গ্রামের হিন্দু-মুসলমান চাষী শহরের মজুর থেকে অর্ধ শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান ভদ্রলোকেদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যেতো।

হক্ সাহেবের উক্ত পত্রিকা "নবযুগ" তারপর নানা কারণে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর কিছু দিন বাদে "ধূমকেতু" "লাঙল" ও তার পর নজরুল পরিচালিত "গণবাণী" প্রকাশিত হয়। ও পরে হক্সাহেব পুনরায় "নবযুগ"

(৪) মুজফ্ফর আহ্মদ লিখিত "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে" গ্রন্থের ২২নং পৃঃ দ্রষ্টব্য।

দৈনিক পত্রিকা বেশ বড করে সার্কুলার রোড থেকে প্রকাশ করেন, নজরুলকে সম্পাদকমণ্ডলীর প্রধান সম্পাদক করে।

সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার আমলে বাঙলা দেশের তৎকালীন পত্রিকাদিতে যে সব রচনা প্রকাশের রেওয়াজ ছিল তার মধ্যে একটু গতানুগতিকতা দোষ দেখা যেত। কেউ কোন কিছু নূতন করে ভেবে সমাজ-চেতনাকে নূতন পন্থা দেখাতে সাহস করত না।

কিন্তু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও নজরুল, হক সাহেবের দৃষ্টিকে দেশের সাধারণতম অংশের দিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রেরণা দেন চাষী ও মজুরের সংবাদ সরবরাহ করে। সংবাদপত্রে চাষী ও মজুরের কথা সর্বপ্রথম প্রকাশের গৌরব এই "নবযুগ"-এরই প্রাপ্য। ঐ স্বল্পপরিসর পত্রিকায় নজরুল অতি অল্প লাইনের ভিতর যে-সব হেডিং দিয়ে রচনা প্রকাশ করতেন মতামতের কলমে, তা অত্যন্ত আকর্ষণীয় বস্তু ছিল।

এই গুণই ধূমকেতু, লাঙল, গণবাণী ও পরবর্তী নবযুগ পত্রিকায় আরও পক্কাবস্থায় দেখা গেছে। সান্ধ্য দৈনিক নবযুগের পর "ধূমকেতু" পত্রিকার প্রকাশ হয়। নবযুগের রচনার প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে বলেছেন: "সাগ্নিক ঋষির ঋক্‌মন্ত্র আজ বাণী লাভ করিয়াছে অগ্নিপাথারের অগ্নি কল্লোলে।" এই কথাটা সম্পূর্ণরূপে অগ্নি উচ্ছ্বাসে পরিণত হয় ধূমকেতুতে, কী প্রবন্ধে, কী কবিতায়, কী গানে, কী মতামতের টুকিটাকিতে। সে বৃহৎ ইতিহাস এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে বলা যাবে না। তবুও ধূমকেতুই যে বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে নবযুগের সূচনা করেছিল, গান্ধীজী পরিচালিত আন্দোলনকে ও তরুণ সমাজ পরিচালিত সশস্ত্র বিপ্লবকে সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সে কথা আজকের তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের সাংবাদিক শক্তির পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করে লিখেছিলেন:

"আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু;
দুর্দ্দিনের এ' দুর্গ শিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা।
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্দ্ধ চেতন।"

নজরুল চালিত বা সম্পাদিত পত্রিকা যত প্রকাশিত হয়েছিল, তার প্রচার এত ব্যাপক ছিল যে পত্রিকা সরবরাহ করে ওঠা যেতনা। কত যে জনপ্রিয় পত্রিকা হয়ে উঠেছিল তখনকার দিনের অর্থশালীদের পত্রিকাগুলির চেয়ে, তা বর্ণনাতীত। ভাঙা বাক্সে টাকা উপচে পড়ত, আবার কোথায়

উবে যেত। কেউ হিসাব রক্ষকও ছিল না, কারুর অভাবও ঘুচত না। সেই অভাবের জন্য কখনও কবিকে বা কবি-সঙ্গীদের মাথায় হাত দিয়ে দুর্ভাবনাও করতে দেখা যেতনা ; সদাই যেন তারা আদর্শবাদের স্রোতে ভেসে যেত তাদের সার্থকতা স্বাধীনতা মন্দিরের সোপানের দিকে। এই নিষ্কাম ব্রতধারী সাংবাদিক নজরুল তাই আজ দেশের জনসাধারণের হৃদয় আসনে অমর হয়ে বসে আছেন।

(২)

সৈনিক জীবন থেকে নজরুল সবেমাত্র রাইফেল ছেড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শৃঙ্খল মুক্ত করার জন্য লেখনী ধারণ করেছিলেন। জাতিভেদ-দোষদুষ্ট ভারতবর্ষে জাতিতে জাতিতে যে দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছিল তাকে ভেঙেচুরে মহৎ মিলনের ব্রত নজরুল গ্রহণ করেছিলেন। দেশের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়কে মিলনের বাণী গানে, প্রবন্ধে, নাট্যে, উপন্যাসে ও চারণ কবির কাজের মাধ্যমে দেশবাসীকে পরাধীনতার জ্বালা সহজে বোধ্য করে উপস্থাপিত করেছিলেন ১৯২২ সালে।

ধূমকেতুর সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখেছিলেন "আমার ধর্ম্ম" প্রবন্ধ। তাতে লিখলেনঃ "আমরা শুনতে পাচ্ছি যে আমাদের ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে চলতে হবে। কিসের জন্য আমাদের ধর্ম্মকে আশ্রয় করতে হবে? ওরে শূদ্র, তুই এবার ওঠ্। উঠে বল্,—আমি ব্রাহ্মণ নয় যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা নিয়ে পড়ে থাকব। আমি আর তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকব না। আমায় বাঁচতে হবে—যেমন করে হোক আমি বাঁচব। ওরে পতিত, ওরে লাঞ্ছিত, তুই দেখ সারা বিশ্ব তোকে ধ্বংস করতে উদ্যত। দেবতা তাঁর জল ঝড় নিয়ে, প্রকৃতি তার রোগ মহামারী নিয়ে তোকে পিষে ফেলতে ব্যস্ত। আবার তার জগদ্দল পাথর তোর বুকে বসিয়ে দিয়েছে—সমাজ তোর কণ্ঠ রোধ করে ফেলেছে। ধনীর অট্টহাস্য তোর প্রাণের করুণ কাঁদুনী ঢেকেছে।"

ধূমকেতুর প্রথম সংখ্যা থেকে নজরুল রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ মাথায় করে তাঁর সংকল্পকে কার্যে পরিণত করার দিকে এগিয়ে চললেন। নজরুলের লেখনীতে যে আগুনের ঝড় উঠেছিল তাতে দেশী বিদেশী শত্রুপুরীর আরাম-শয্যা, সুখাসন ও বিলাসিতার মধ্যে দেশকে ও মানুষকে ভুলে যাঁরা জীবন-যাপন করছিলেন তাঁরা সন্ত্রাসিত হয়ে উঠে নজরুল-লেখনীকে রুদ্ধ করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ধূমকেতুর অগ্নি-পুচ্ছ তাড়নায় তারা প্রায় বুদ্ধিহারা হয়ে উঠেছিলেন আর দেশের তরুণশক্তি শিরদাঁড়া সোজা করে পায়ের ও মনের দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে আশীর্বাদ করায় সাম্রাজ্যবাদী ও তার পদলেহিরা নজরুলের ভাষায় "ধামাধরা আর জামাধরা"'র দল যেমন হকচকিয়ে গিয়েছিল, তেমনি এরা নজরুলের প্রতি হিংস্র হয়ে উঠলেন, বিশেষ করে তৎকালীন তথাকথিত সাহিত্যিকরা। আর সাহিত্যিকদের মধ্যে যারা

দেশের স্বাধীনতা চাইতেন তাঁদের মধ্যে ৺সুবোধ রায়, মঈনুদ্দীন্ হোসায়ন, মঈনুদ্দীন খাঁ, নলিনীকান্ত সরকার, মুজফ্ফর আহ্মদ, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ধূমকেতুতে যোগ দেন।

নজরুল ধূমকেতু পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, কবিতা ও মতামত শীর্ষক রচনা লিখতেন। মতামতের তিনটি পর্যায় ছিল—যথা, "দেশের খবর"; "পরদেশী পঞ্জী"; আর "মুসলিম জাহান"। প্রতিটি সংখ্যায় এই মতামতের কলম নজরুলই লিখতেন। নজরুল ধূমকেতুর একুশটি সংখ্যা পর্যন্ত চালিয়ে কারাবরণ করেন ১৩২৯ সালের ২৮শে কার্তিক তারিখে। এই একুশটি সংখ্যার দ্রষ্টব্য বিষয় নজরুল নির্বাচিত মতামতের "হেডিং" ও তার জ্বালাময়ী ভাষার কৃতিত্ব। "দেশের খবর" শীর্ষক কলমে সারা ভারতের সংবাদ পরিবেশন করতেন। "পরদেশী পঞ্জীতে" থাকত বিদেশী খবর এবং মুসলিম জাহানে"-এ পৃথিবীর মুসলিম রাজ্য ও দেশগুলির সব রকম খবর এমন ভাবে আমাদের দেশীয় মুসলমান ও হিন্দুদের কাছে উপস্থাপিত করতেন যে দেশের মুক্তিই জীবনের প্রথম ও শেষ উদ্দেশ্য। এর একটা কারণ এখানে বলা উচিত। ১৯২২ সালে পৃথিবীর মুসলিম দেশগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামে দিকে দিকে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। তাই ভারতীয় তথা বাংলার মুসলমানদের পুরাতন সংস্কার ত্যাগ করে মুসলিম-জাহানের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, পায়ে পা মিলিয়ে ব্রিটিশ-কবল-মুক্ত হবার জন্য "মুসলিম জাহান" মতামতের কলমের সৃষ্টি করেছিলেন নজরুল।[৫]

১২ই মে ১৯২২, অষ্টম সংখ্যায় (দেশের খবর) লেখেন[৬]

মর্ত্তের মতিলাল স্বর্গে

"অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম স্থাপয়িতা ও সম্পাদক বীর সন্তান দেশমান্য মতিলাল ঘোষ গত ১৯ ভাদ্র মঙ্গলবার মধ্যাহ্নে ৭৫ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। *"ইন্নালিল্লাহে ও ইন্নাএলায়হে রাজেউন"* (নিশ্চয় আমরা আল্লার, এবং আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাব)।

আজ কমাস থেকে তিনি নানা রোগে ভুগছিলেন, শেষে নিউমোনিয়া

(৫) "মুসলিম্ জাহান" কলমের লেখক ছিলেন মঈনুদ্দীন হোসায়ন। ঐ কলমের হেডিং-এ কবিতা লিখে দিতেন নজরুল।

(৬) বহু অনুসন্ধানের পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ধূমকেতু পত্রিকার ফাইল পেয়ে যাই। তাতে ১ম সংখ্যা থেকে ৬ষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত নেই। আছে ৭ম সংখ্যা থেকে ২১ সংখ্যা পর্যন্ত নজরুল সম্পাদনা। ২২ সংখ্যা থেকে শ্রীঅমরেশ কাঞ্জিলাল সম্পাদক হন। তার পরে কয়েক সংখ্যা বীরেন সেনগুপ্ত সম্পাদক ছিলেন। পরে কয়েক বছর বাদে প্রতিষ্ঠাতা নজরুল এই বলে "নব পর্য্যায় ধূমকেতু" প্রকাশ করেন ও সম্পাদক হন কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক।

রোগে আক্রান্ত হন এবং এই রোগেই তিনি গতায়ু হন। মতিবাবুর বিয়োগে আজ বাংলামায়ের তুলসী মঞ্চের সন্ধ্যাদীপ নিভে গেল।"

তিনি মতিলাল সম্বন্ধে আরও লেখেন, "তাঁর আত্মার মঙ্গল কামনা করা ধৃষ্টতা মাত্র। মতিলালের মত মহাত্মারও যদি অমঙ্গল হয়—তা যে কোন-কালেই হোক—তা হলে সে ভগবান অত্যাচারী—সে ভগবান মিথ্যা। ভগবানের রাজ্য ইউরোপের ধবল-দৈত্যের রাজ্য নয়।

"বাংলায় এই একজন চিরতরুণ দেখলাম যিনি আমরণ নিজের ধ্রুব লক্ষ্য স্থির রেখেছিলেন। এ সত্য-পূজারী বারে বারেই আসবেন আমাদের এই শ্যাম তরুমূলে এই গঙ্গার কূলে। আমাদের শোক করবার কিছু নাই। পুরাতনের বিদায় অশ্রু নূতনের আগমন হাসিতে করুণ মধুর হয়ে উঠবেই উঠবে।" মহাত্মা মতিলাল ঘোষ দেশের স্বাধীনতার জন্য কখনও আত্মবিক্রয় করে কলমের মর্যাদা হানি করেন নি বলেই নজরুল তাঁর প্রতি এই শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মতিলাল একাধারে ছিলেন বিপ্লবী ও পরম কৃষ্ণ ভক্ত।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা
ঘরশত্রু বিভীষণ

"বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মোট ৬০ জন সদস্যের মধ্যে ৪০ জন নাকি গোয়েন্দা বিভাগের চর বলে ধরা পড়েছে। যে ঘর শত্রু বিভীষণের দল মাকে পরের হাতে সঁপে দেয়। তাদের জন্য মা রুদ্রকালীর রক্তখড়্গ আস্ফালন করে উঠুক। এই মাতৃদ্রোহী স্বার্থান্ধ পিশাচের মুখ শুয়োরের মত জঘন্য হয়ে যাক, বিশ্বের নরনারীর থুথু তাদের মুখে পড়ুক। যে ইংরেজ বিদ্রোহী আইরিশ তরুণ রবার্ট এমেটকে ফাঁসী দিয়ে মেরে তার শব তিন খণ্ড করে কেটে রাস্তার মোড়ে মোড়ে টাঙ্গিয়ে রেখেছিল আর বলেছিল 'দেখ কেমন করে দেশদ্রোহীর প্রতি ব্যবহার করতে হয়', সেই বৃটিশ সিংহ এইসব মাদি টিক্‌টিকিদের সম্বন্ধে কী বলেন?"

"আনন্দময়ীর আগমনে"[৭] টিক্‌টিকি অর্থাৎ গোয়েন্দা ও তাদের আড়-কাঠিদের এই কবিতায় বলেন ঃ

টিক্‌টিকির ঐ ল্যাজুড় সম দিগ্বিদিকে উড়ছে টিকি,
দেবতার আগে পূজে দানব তাদের কাছে ধর্ম শিখি!
পুরুষ ছেলে দেশের নামে চুগ্‌লি খেয়ে ভরায় উদর
টিক্‌টিকি হয়, বিষ্ঠা কি নেই – ছিছি এদের খাদ্য ক্ষুধোর!

আর এক জায়গায় লেখেন—"ধামা ধরা আর মামা ধরা যত"। অর্থাৎ ভারতীয় ইংরেজ মোসাহেব, দালালদের উদ্দেশ্য করে লিখেছেন।

(৭) এই কবিতায় নজরুলের জেল হয়।

মুসলসীতে নূতন করে সত্যাগ্রহ যুদ্ধ শুরু হলে কবি লেখেন :

দুঃশাসনের বস্ত্রহরণ

"এই সত্য নিতে কেহ নাহি পারে কেড়ে
যতই টানিবে খুড়ো তত যাবে বেড়ে

কারণ সরকার সত্যাগ্রহীর দল যতই গ্রেপ্তার করে ততই যায় বেড়ে।

"গণপথ"

বোম্বাইতে গণপত উৎসব সম্পন্ন হওয়ায় কবি লিখলেন :

"এত বাঙালী নেংটি ইঁদুর ; অথচ গণপতির আদর নেই কেন কেহ বলতে পারে"

"ইস্‌তোফা"

"হায়দ্রাবাদ নিজাম বাহাদুরের চাকরী থেকে স্যার আলী ইমাম ইস্তফা দিয়েছেন

যখন পিরিতী ছিল
তখন বেসেছ ভালো
আগে শুয়েছি তেঁতুল পাতাতে
কুলায় না আব মান পাতাতে।"

গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে বহু উকিল ওকালতি ছেড়েছিলেন, অধ্যাপক অধ্যাপনা ছেড়েছিলেন, অনেকেই কালের গতিতে পুনঃ মূষিকঃ ভব হয়েছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ওকালতি ছেড়ে দিয়ে বহু দিন আর আদালতে প্রবেশ কবেন নি, সর্দার মহাতাব সিংয়ের মামলা নিয়ে আবার আদালতে হাজির হয়েছিলেন। এইজন্য কবি নজরুল মন্তব্য করলেন :

"আমরা তুরিয়ানন্দে গান ধরেছি"

দেশ দেশ গণ্ডিত করি মণ্ডিত তবু ভেরী
আসিল যত উকিলবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
যতীন[৮] আসত ঐ জয়াকারাগত ঐ[৯]
মদনমোহন কই

(৮) শহীদ যতীন দাস।
(৯) কংগ্রেসী উকীল জয়াকরের কারাবরণ।

সেকি রহিল চুপ্‌টি আজি কি সব জন পশ্চাতে
লউক ধুচুনী শামলা ভার সব জনার সাথে।

বিদেশী খবরের উপর মতামত দেবার জন্য "পরদেশী পঞ্জী" নামে একটি কলম রাখেন। অষ্টম সংখ্যার অষ্টম পৃষ্ঠায় লেখেন ঃ

হ্যাদেগো নন্দরাণী
শ্যামকে ছেড়ে দে

জগলুল পাশার স্বাস্থ্য খারাপ বলে তাঁকে 'সিসিলি' থেকে 'জিব্রাল্‌টারে' আনা হয়েছে ; বেগম জগলুল স্বামীর কাছে যাবার হুকুম পেয়েছেন।

আমরা গাচ্ছি—
ঠ্যালানাম গাওরে খাঁচার পাখী।
ও ঠ্যালায় বদন মেলে ডাকি।
ও ঠ্যালায় জলে ভাসে শিলে,
ঠ্যালার মত ঠ্যালা দিলে ;
গুঁতো কেষ্ট কেত্তন গারে—
লঙ্কা পারের বাঁদর মিলে।
(ওরে) দেখরে এবার সরষে প্রসূন
যত খটাস আঁখি।
ঠ্যালা ইত্যাদি "

এই বৎসরে মিশরের নেতা জগলুল পাশাকে ইংরেজ সরকার সিসিলি দ্বীপে নজরবন্দী করে রাখে। তাতে তাঁর স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় আন্তর্জাতিক ও মিশরবাসীর আন্দোলনের চাপে পড়ে ইংরেজ জগলুলকে জিব্রালটারে আনতে বাধ্য হয়। তাঁর স্ত্রীকে স্বামীর কাছে থাকবার ব্যবস্থা মেনে নিতে হয়।

কবি নজরুল জগলুল পাশার ওপর ধূমকেতুতে বহু বলিষ্ঠ মন্তব্য লিখেছিলেন। "চিরঞ্জীব জগলুল" বলে একটি অগ্নিময় দীর্ঘ কবিতা লেখেন ; কবিতাটি "জিঞ্জির" গ্রন্থের ৫৩ পৃষ্ঠায় আছে।

পুলিশে-ফুলিশে

"তোমরা বটে আসল মানুষ
তোমরা বটে বীর"

বার্লিনে কমিউনিস্টরা মিছিল বের করে যাতায়াতের অসুবিধা ঘটিয়েছিল বলে পুলিশ জনকতক লোককে গ্রেপ্তার করে। কমিউনিস্টরা তাদের লোকগুলোকে ছিনিয়ে নিতে গেলে পুলিশের সাথে তাদের দাঙ্গা বেধে ওঠে।

উভয় পক্ষে বেশ একটু মারামারি ও লাঠালাঠি চলেছিল। জন-সঙ্ঘ শেষে বোতল ছুঁড়তে থাকে। তখন পুলিশ গুলি-গোলা চালিয়ে চারজন লোক মেরে ফেলে।

ভাগ্যিস এরা "মেরেছে কলসির কানা
তাই বলে কি প্রেম দেবনা" বাণী শোনেনি।

নৈলে মার খেয়েও প্রেমে তাদের বগল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ত। ওদের গায়ে গরম খুন আছে, প্রাণ আছে, তাই বগল বাজিয়ে অত্যাচারীর মুখের সামনে বলে

মেরেছ একটা চাঁটি
ফিরে নাও বিশটা লাঠি
আর অত্যাচারী তাই একটু বুঝে সুঝে লাঠি চালাল।"
হায় ভারতবর্ষ। ও ভারতবাসী!!

এইভাবে বিভিন্ন সংখ্যায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ঘটনাকে অবলম্বন করে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে দেশ প্রেমে সচেতন করে তোলবার জন্য ছোট ছোট কবিতা ও গ্রামের প্রচলিত প্রবাদবাক্যে হেডিং দিয়ে মন্তব্যকে প্রাণবন্ত করে তুলতেন। এই প্রবন্ধে ধূমকেতুর একটি মাত্র সংখ্যার দুটি একটি মন্তব্যের কথা লেখা গেল।

এবার "মুসলিম্ জাহান" কলমের কয়েকটি বাছাই করা মন্তব্য দিলাম। যথা—

"কিল্লাফতে"

কাগজ ছাপা হচ্ছে এমন সময় খোশ খবর এলো, তুর্কীরা স্মার্না দখল করেছে।

তুরীয়ানন্দ!!!

"আফগান চৈতন্য
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

আফগানিস্থানের নামজাদা কাগজ "ইত্তিফাক-ই-ইসলাম" জানাচ্ছেন যে আফগানিস্থানের প্রত্যেক এলাকাতে সমর-বিদ্যালয় খুলবার ইচ্ছা বহুদিন থেকে আমীর মহোদয়[১০] করে আসছেন। কারণ তা নইলে দরকার হলে প্রত্যেক এলাকা থেকে সিপাহী জোটান কষ্টকর হবে। হেরাত সহরে যে সমর-বিদ্যালয়টি খুলবার কথা হয়েছিল তা' আমীর বাহাদুরের সময়াভাবে

(১০) বাদশাহ্ আমানুল্লা জালিমের অত্যাচারীর

খোলা হয় নি। আজ ক'দিন হল খুব ধুমধামের সাথে ঐ স্কুলটি খোলা হয়েছে—'আল আমান্'।

আমাদের (ভারতবাসীর) যে রকম অমর হওয়ার প্রেমবাণী শেখা হচ্ছে, তাতে আর সমর-বিদ্যালয়ের দরকার কি? ও বিদ্যালয়টা লয় না হয়ে গেলেই নয়। কেন এ কাটাকাটি রক্তে নদানদী; কেন এ খোঁচাখুঁচি এর চেয়ে প্রেমের বুলি কপচাও।

কামাল পাশার ওপর বিদ্রোহী কবি একটি নাটকই লিখে ফেলেছিলেন, মুস্‌লিম জাহানের গৌরব প্রকাশ করে। খাঁটি একটা মরদবাচ্চা এই কামাল। তার দাপটে ইংরেজ-এর শিরা উপশিরা প্রায় পট পট করে ছিঁড়ে পড়বার উপক্রম হয়েছিল। এই সময় কামাল গ্রীকদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের সায়েস্তা করে দিয়েছিলেন। গ্রীকরা কামালের কাছে এশিয়ামাইনর ছেড়ে দেবার জন্য সন্ধি প্রস্তাব করে। এ খবর আসবার পর নজরুল হেডিং দিয়ে লিখলেন :

সাবাস কামাল মোস্তাফা
তোরই দেখি মোচ্ তোফা।
খুব কসে ভাই গোস্ত খা।
বাঁধ জালিমের হস্ত পা।

হেডিং-এর পরে মন্তব্য দীর্ঘ তাই লেখা গেল না!

কামাল কর্ম

"কত কেরামত জানরে কামাল
কত কেরামত জানো।
মাঝ দরিয়ায় বাইয়া জাল
ডাঙায় বইসা টানো।"

মিত্রশক্তি মিচ্ কে শয়তানী

৬ই সেপ্টেম্বরের খবরে প্রকাশ যে এশিয়ামাইনরে এবার গ্রীকরা সম্পূর্ণ রূপে তুর্কীর হস্তে পরাজিত হয়েছে।

এদিকে গ্রীক গভর্ণমেন্ট স্থির করেছেন যে তুর্কীর সাথে আর পারা যাবে না। কারণ তাদের সৈন্যের অবস্থা নিতান্তই খারাপ। তাই গ্রীক এখন ঠেলায় পড়ে এশিয়ামাইনরটি বিলকুল ছাড়তে সুরু করেছে। এবং তিন হপ্তার ভেতর ছেড়ে যেতে পারবে বলে ভরসা দিয়েছে।

এ ঘুচুর ঘুচুর ফুচুর ফুচুর ফুরাবেই এবার।
এবার পড়েছ ধরা বধিবে পরাণ।"

এই সময় পরাধীন ভারতের হিন্দু মুসলমানদের বিশেষ করে মুস্‌লিম জাহানের খবরের মাধ্যমে দেশীয় মুসলিমদের নজরুল দেশাত্মবোধে সচেতন করে তুলেছিলেন।

আস্তানায় জয়কেতু

গ্রীকদের পরাজয় বার্ত্তা শুনে কন্সটান্টিনোপলবাসীরা জয়কেতু উড়িয়ে জয়োল্লাস করছিল।

আমাদের জয়কেতু ধূমকেতু দিয়ে অভিনন্দন করছি।

মারহাবা! মারহাবা!! দাও গ্রীকের গা ধুইয়ে। (নজরুলের উল্লাস হলেই বলতেন দে গরুর গা ধুইয়ে)।

চাপে পড়ে বাপকে ডাকা

বহু ফরাসী সংবাদপত্র একযোগে লিখেছেন যে এশিয়ামাইনর ও থ্রেস্‌ তুর্কীকে ফিরিয়ে দিতেই হবে।

আহা! কী কথাই না শুনালে রামধন? তোমার বালাই নিয়ে মরি? এবার গ্রীসের বিষ একটু কমবে বোধ হয়। এমন কানমলা খেয়েও যে সে হার মানবে না তাত বোধ হয় না। দু-কান কাটা সভার মধ্য দিয়ে যায় যে।

যার লাঠি তার মাটি

গরমাগরম ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচার করার জন্য তেহরানের কটা খবরের কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র দেখছি বিদ্বেষ বীজ ছড়িয়ে পড়ছে।

সিটিজন প্রটেক্‌শন লীগ বাংলার পল্লী গ্রাম থেকে কচুরীপানাগুলি দূর করে দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন করছেন। এবার তাঁরা যে এই বিদ্বেষ-বীজানুগুলি মারবার জন্য তাল ঠুকে আসরে নামবেন তা আমরা হলপ করে বলতে পারি।

এঁরা যদি একান্তই একটা কিছু না করেন তা'হলে মান্যবর শাস্ত্রী মশাইকে পারস্যে একবার পাঠানো হোক।"

একটি সংখ্যা থেকে নমুনা স্বরূপ কিছু তুলে দেওয়া হল প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে। নজরুল প্রধান সম্পাদক হিসাবে সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে সকল প্রবন্ধ, কবিতা লিখতেন তার শিরনামা দেখে বাংলার পাঠকমণ্ডলী পত্রিকা পড়বার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। পত্রিকা প্রকাশ হলে কলকাতা মহানগরীতে, মফঃস্বল শহরে ও গ্রাম-গ্রামান্তরে কাগজ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই ছেলে বুড়োর দল লুফে নেবার জন্য হাতাহাতি মাতামাতির সঙ্গে হৈ হুল্লোড় করত। কাগজ পেলেই পাঠকরা রাস্তার মোড়ে, বাড়ির রকে, গাছের তলায় বসে একজন উৎসাহের সঙ্গে পড়ত আর অন্যান্য শ্রোতারা শুনত। শুনতে শুনতে আনন্দে হৈ হৈ করে উঠত, উচ্চহাস্যে আকাশ ফাটিয়ে

দিত তারিফ করতে করতে। কত উৎসাহ, কত সঙ্কল্প যে করত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। এখন আর সে কাগজও নেই, সে লেখক থাকলেও ধনীর দ্বারে ধনের জন্য কলমকে বাঁধা দিয়েছে। কিন্তু পাঠক এখনও আছে। তারা এখনও যুগান্তরের ভূপেন দত্ত; সন্ধ্যার ব্রহ্মবান্ধব, বন্দেমাতরমের অরবিন্দ, ধূমকেতুর নজরুলের মত লেখক চায়; লেখা চায়; চায় সঙ্কল্প করতে মানুষের স্বাধীনতার জন্য।

নজরুল গুরুত্বপূর্ণ সংবাদকে মানুষের মনে ছাপ লাগিয়ে দেবার জন্য প্রচলিত কথা, প্রবাদ বাক্য, মা দিদিমাদের মুখে যে সব কথা শ্লোক হয়ে ঘরে ঘরে নেচে বেড়াত, তার সংগ্রহ করে, কবিতার চুটকি দিয়ে লেখার পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন বলেই এত হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল দেশের পাঠক পাঠিকাদের। সম্পাদকীয় স্তম্ভে দ্বিতীয় পর্যায়ে দৈনিক নবযুগে সংবাদকে বা মতবাদকে পুরো একটা দীর্ঘ কবিতায় লিখতেন। যেমন, "অগ্রনায়ক"; "বাজাই বিষাণ উড়াই নিশান, ঈশান কোণের মেঘে"; "ভয় করিওনা হে মানবাত্মা"; "আগ্নেয়গিরি বাংলার যৌবন"; "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার পরাণ সখা ফৈসুল হে আমার" (এই হেডিংটা ধূমকেতুর মুসলিম জাহানের)। "কালাতে ধলাতে লেগেছে এবার মন্দ মধুর হাওয়া দেখিনাই কভু দেখিনাই ওগো, এমন ডিনার খাওয়া" (এটা ধূমকেতুর পরদেশী পঞ্জীতে আছে)।

প্রথম পর্যায়ে প্রকাশিত "নবযুগ" পত্রিকায় নজরুল মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সহকারী সম্পাদক হিসাবে কৃষক ও মজুর জাগরণের পাঠ নেন। ধূমকেতু মারফত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐক্য জাগিয়ে তুলেছিলেন, তৃতীয় পর্যায়ে লাঙল পত্রিকায় মানব সমাজের সামগ্রিক স্বাধীনতার এবং বিশ্বমুখী আবেদনে নজরুল নিজেকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন "সাম্যবাদ" সিরিজ কবিতাবলির বলিষ্ঠ বিকাশ ও প্রকাশের মাধ্যমে।

ছন্দ সাধনায়

(১)

বাংলা নদীমাতৃক দেশ। বাংলা দেশের বন, উপবন ও প্রান্তরের ঘন সবুজ রং, নদীর কলগান, বিহগের কাকলি, ষড়ঋতুর আবর্তনে প্রকৃতির বিভিন্ন লীলায় বাঙালীকে কবি করে তোলে। এর আকাশের ঘন মেঘ নয়নে নয়নে দেয় নীলাঞ্জন বুলিয়ে। তার কণ্ঠে ফুটে উঠতে চায় গান, লেখনীতে কবিতা, হাতের দশ আঙুল চিত্রমূর্তি গড়বার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে।

তাই এই দেশ কবি, শিল্পী ও গায়কের দেশ। এমন যে বাঙলা দেশ তার শিল্প-সাধনার বাদশা হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পাদপীঠে যে কয়জন কবি তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে কবির আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে ৺সতেন্দ্রনাথ ও কবি নজরুলের নাম করা যায়।

এই দুই কবির সাধনা জীবন প্রভাতে একই খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। তা হল ছন্দ-সাধনার পথ। দুজনেই কবিগুরুর স্নেহ ভাজনীয়। কিন্তু কবি নজরুল ছন্দ-সাধনা করতে করতে মহামানবতার পথে জীবনকে প্রসারিত করে কাব্য-সমুদ্রের সঙ্গে মিশতে পেরেছেন। কোন্ পন্থায় কি পদ্ধতিতে মিশতে পারলেন তার খোঁজ নিয়ে দেখলে জানতে পারা যাবে তাঁর কি কঠোর সাধনা ছিল এই সার্থক হয়ে ওঠার পেছনে।

কবি নজরুল যখন বালক তখন চুরুলিয়ায় লেটোর দলে গান, ছড়া প্রভৃতি লিখে দিতেন। গায়ক হিসাবে গানও গাইতেন ; তাঁর কাকা কাজী বজলে করীমসাহেবের কাছে তাঁর কবিতা ও গান রচনার প্রথম পাঠ নেন। বালক নজরুল কাকার কাছেই প্রথম প্রেরণা পান। তখনকার গান কবিতায় নজরুলের ছন্দ জ্ঞান পাওয়া না গেলেও বেশ গভীর ইঙ্গিত ছিলই। নজরুল কৈশোর অবস্থায় কাকা বজলে করীমের শাগরেদ হন। পরে গোদার শাগরেদ হয়ে স্থানে স্থানে গান গেয়ে বেড়ান, গান লেখেন, ছড়া, কবিতা, নাটক, প্রহসনও দলের জন্য লিখে দেন। ছন্দের সন্ধান এখান থেকেই তাঁর লাভ হয় ও পরিপক্কতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

তারপর আসে সৈনিক জীবন, করাচীর সৈন্য ব্যারাকে। ব্রিটিশ সরকার হিন্দু মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য একজন মৌলবী পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেন। এই পণ্ডিতটির ফারসী, উর্দু, আরবী প্রভৃতি ভাষায় যেমন পাণ্ডিত্য ছিল তেমনি ছিল গভীর জ্ঞান, জ্ঞানী মৌলবীর মনটিও ছিল উদার ও রসময়। সৈন্য বিভাগে বিভেদ সৃষ্টির জন্য মৌলবী নিযুক্ত হয়ে, হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম ধর্ম বিষয়ের ঔদার্যের শিক্ষাই ছড়াতে লাগলেন। কবি নজরুল এঁর হলেন প্রধান শাগরেদ। নজরুল বলতেন 'এই মৌলবীকে না পেলে আমার জীবনে সত্য, সুন্দর ও শিবের দর্শন পেতাম না। আমার যা কিছু শিক্ষা তা এই মৌলবীর কাছেই।'

বাংলা ভাষায় নজরুল ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নানা দেশের কবিতা অনুবাদই

করেননি, সেই সেই দেশের ছন্দকে হুবহু বাঙলা ভাষায় রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করেছেন। কে কতখানি সার্থক হয়েছেন তাঁরাই জানেন যাঁরা এর অনুসন্ধানী। যাঁরা ভবিষ্যতের পাঠক ও তরুণবৃন্দ তাঁরা দেখবেন যে নজরুল এই ছন্দ-সাধনায় যতখানি সার্থক হয়েছেন ততটা আর কেউ হননি—আর কেউ এই চেষ্টাও করেননি হিন্দু মুসলমান লেখকদের মধ্যে।

১৩২৭ সালে মোসলেম ভারতে জ্যৈষ্ঠ মাসে ২য় সংখ্যায় তিনি লেখেন :—হাফিজের একটি গজল। দেখা যাবে ফারসীর মধুর ও সুরময় ঝঙ্কারটি কেমন বাংলায় কবি আনতে পেরেছেন : ফারসীর একটি লাইন,—

"য়ূসোফে গুম্ গশ্‌তা বাজ আয়ফ্‌ ব-কিনান গম্ মখোর" (হাফিজ)
"দুঃখ কি ভাই, হারানো য়ূসোফ কিনানে আবার আসিবে ফিরে ;
দলিত শুষ্ক এ-মরুভূ পুনঃ হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।" ইত্যাদি

এটি একটি গানের সুর—"যেদিন সুনীল জলধি হইতে"।

গজল

মূল কবিতার ছন্দ	এয় ফরোগে আব্‌ রুয়ে	মাহে হোস্‌ন্‌-আব্‌ খুবি আজ চা—	রুয়ে রোখ্‌শা-নেওমা জনখ্‌দা—নেওমা"

হে মোর সুন্দর চাঁদের চাঁদমুখ্‌ তোমার রোশন রূপ মেখেই ;
রূপের জৌলুষ তোমার টোলদার চিবুক গণ্ডের কূপ্‌ থেকেই
ওষ্ঠে প্রাণ! হায় দেখতে তাও চায় গোল্‌-বদন্ ঐ ঘোম্‌টা-হীন,
জানাও ফরমান্ জ্বলবে আরনা নিব্‌বে জান্‌টার মোম্‌টা ক্ষীণ ॥"
ইত্যাদি।

কবিতাটি বেশ বড়। কোথাও পড়তে আটকায় না। প্রাঞ্জল। অবশ্য যাঁরা আরবী ফারসী শব্দ পরিহার করে চলেন বা পড়েন না, চেষ্টাও করেন না তাঁদের পক্ষে প্রথম প্রথম অসুবিধা হবে। হিন্দু মুসলমান শত শতাব্দীর পাশাপাশি থেকেও কেউ কারোর সম্বন্ধেই কিছু জানে না, এটা যেমন দুঃখের, তেমনি বেদনার নয় কি? বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ছন্দের তাল সেই ভাষার হ্রস্ব ও বিলম্বিত মাত্রা বাংলা ভাষার মাধ্যমে যিনি নিয়ে এলেন, তাতে যে আমাদের ভাষা কত উন্নত হল সে কথা আমরা জানলাম না। আর নজরুলের পর বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান তা নিয়ে আর কেউ অগ্রসর হল না।

ছন্দ :	"দিল মে রওদ্	বে দস্‌তম্	সাহিব দিলাঁ	খোদারা"
বাংলা :	"হাত হাতে মোর	হৃদয় রায়	দোহাই বাঁচাও	হৃদয়-বান্।"

কবিতা—
"হাতে হাত মোর হৃদয় যায় দোহাই বাঁচাও হৃদয়-বান্
আফ্‌শোষ আমার গোপন সব্‌ ফস্‌কে যে দেয় নিদয়-প্রাণ।
দশ দিনের এই দুনিয়া ভাই স্বপ্ন-কুহক্‌ কল্প-লোক,
করতে ভালোই বন্ধুদের বন্ধু, তোমার লক্ষ্য হোক।"
ইত্যাদি

কবিতাটি বেশ বড়।

ছন্দ—	আগর্ আঁ তুর	কে সিরাজী	বদস্ত আরদ্	দিলে মারা
বাংলা—	যদিই কান্তা	সিরাজ-গজনী	ফেরৎ দেয় মোর	চোরাই লি্ ফের
কবিতা—	যদিই কান্তা	সিরাজ-গজনী	ফেরৎ দেয় মোর	চোরাই দিল ফের
	সমরকন্দ্	আর বোখরায় দিই	বদল তার লাল্	গালের তিল্ টের।
	লে আও সাকী	শরাব শেষটুক্।	কোথাও নাই ভাই	বেহেশ্‌তেও সে
	নহর্ রোক্‌না	আবাদ তীর আর	এমন্ ঈদ্‌গাহ্;	এ দেশ মে ও সে।
	বাঁচাও বন্ধু—	নিলাজ-চঞ্চল	চটুল চুল্‌বুল্	প্রিয়ার মুখ্ চোখ্
	তুর্কী সৈন্যের	লুটের খাঞ্চার	মতই বিল্‌কুল্	লুট্‌লে সুখ্-লোক।
	অপূর্ণই মোর্	এশ্‌ক্-গুল্‌বাগ্	তাতেই মশ্‌গুল্	ভ্রমর চঞ্চল;
	হুর যে চায় না	সটোল লাল গাল,	হরিণ চোখ, মুখ	কোমল ঢল্‌ঢল্।
	আগেই জান্‌তাম	ব্যাকুল দিন্ দিন্	আকুল যৌবন্	হাসীন্ 'ইউসুফ'—
	প্রেমের টান্ তার	নাশ্‌বে হর্‌বে	'জুলায় খাঁ'র সব্	নারীর গৌরব।" ইত্যাদি*

* কুঞ্জিকা :—"সমরকন্দ, বোখারা=তুর্কীস্থানের দুইটি প্রদেশের নাম।
নহর=কৃত্রিম ঝর্ণা। রোক্‌না আবাদ=হাফিজের জন্মস্থান সিরাজ সহরে উক্তনামে এক কৃত্রিম ঝর্ণা ছিল। সেখানে বসে হাফিজ গান গাইতেন ও কবিতা লিখতেন।
খাঞ্চা=খাবার থালা। এশ্‌ক্=ভগবৎ প্রেম। হাসীন=পরম সুন্দর।
ইউসুফ=এক পয়গম্বরের নাম। খুব সুপুরুষ ছিলেন।
জুলায় খা=ইউসুফের প্রেমে উন্মাদিনী এক সুন্দরীর নাম।" মোসলেম ভারত মাসিক পত্রিকা।

নজরুল তাঁর কবিতার নিচে পাঠকদের এইভাবে কুঞ্জিকা মাধ্যমে তাঁর ব্যবহৃত আরবী ফার্‌সী শব্দের অর্থ লিখে উক্ত ভাষার সঙ্গে, ভাষার ঝঙ্কারের সঙ্গে, ভাষার মাধুর্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

"আরবী ছন্দ" প্রবন্ধে কবির লেখা নিচে দিলাম ঃ

"আরবী ছন্দ" যেমন দুরূহ তেমনি তড়িৎ চঞ্চল। প্রত্যেকটি ছন্দের গতি বিভিন্ন রকমের, কেমন যেন চমকে ওঠা ওঠা ভাব। অনেক জায়গায় ধ্বনি একরকম শুনালেও সত্যি এক রকমের নয়,—তা একটু বেশ মন দিয়ে দেখলে বা পড়লেই বোঝা শক্ত নয়। অনেক জায়গায় তাল এক, কিন্তু মাত্রা আর অনুমাত্রার বিচিত্র সমাবেশের জন্য তার এক আশ্চর্য রকমের ধ্বনি চপলতা ফুটে উঠেছে। আরবী ছন্দ-সূত্রের যেখানে যেখানে × বা + চিহ্ন দেওয়া আছে, সেখানে দীর্ঘ উচ্চারণ করতে হবে।

১। হজয্।

সূত্র ঃ—

×   ×
মফা আয়্লুন মফা আয়্লুন
×   ×
মফা আয়্লুন মফা আয়্লুন।'

কটিব কিঙ্কিণ্
চূড়ীর শিঞ্জিণ্
বাজায় রিণ্ ঝিণ্
ঝিনিক্ রিণ্ রিণ্।

কাঁকন্ কম্পন্
আকুল কন্ কন্
নাচায় মোর মন,
অধীর দিন দিন!

২। রসজ্

সূত্র ঃ—

'মস্তফ্ আলুন্ মস্তফ্ আলুন্
মস্তফ্ আলুন মস্তফ্ আলুন্।'

বিল্কুল নদীর
মন্ আজ অধীর,
ছল্ ছল্ দুতীর
চঞ্চল্ অথির।

বর্ষার মাতন
প্রাণ্ উন্ মাদ্ন
ঝঞ্ঝার কাঁদন
শন্ শন্ গতির

৩। রমল্

সূত্র ঃ—

×   ×   ×   ×
'ফা এলাতুন্ ফা এলাতুন্
×   ×   ×   ×
ফা এলাতুন্ ফা এলাতুন্।'

খাম্খা হাঁস ফাঁস্
দীর্ঘ নিশ্বাস,
নাইরে নাই আশ
মিথ্যা আশ্বাস।

হাস্তে প্রাণ চায়,
অম্নি হায় হায়
বাজ্লো বেদনায়
ক্রন্দন উচ্ছ্বাস।

৪। ×

মোতা কারেব্।

সূত্র ঃ—
× ×
'ফাউলুন্ ফাউলুন্
× ×
ফাউলুন্ ফাউলুন্'।

কলস-জল। রিনিক্ ঝিণ
আবার বল্— ঝিণিক্ রিণ
ছলাৎ ছল্ বলুক ফিন্
ছলাৎ ছল্! কাঁকন মল।

×
৫। সরীত্র।

সূত্র ঃ—'মস্তফ্ আলুন্ মস্তফ্ আলুন্ মফ্উলাতুন্।'

লোকজন বেবাক্ কণ্ঠের গমক্
একদম অবাক্ চম্কায় চমক্
এম্নি গান গায়। বিজলি ঝঞ্ঝায়।
×

৬। খফীফ্

× × × ×
সূত্র ঃ— 'ফা এলাতুন্ মোস্তাফ্ আলুন্ ফা এলাতুন্।'
আস্লো ফাল্গুণ আস্মান জমীন হাস্লো বিল্কুল্!
গাইল বুল্ বুল্ শোন্ ওই অলস ওঠরে খিল খুল!

৭। মযতস্

সূত্র ঃ—
+ +
'মস্তফ্ আলুন্—ফা এলাতুন্
+ +
মস্তফ্ আলুন্—ফা এলাতুন্।'

সই তুই শুধাস্—কেম্নে কই হায়,
প্রাণ মন উদাস কোন্ সে বেদনায়্।
কোন্ মোর পিয়ার বক্ষ-পুট চায়

৮। মোজারা—।।

সূত্র ঃ—

\+ + +
মফা আয়লুন—ফা এলাতন
\+ + +
মফা আয়লুন—ফা এলাতুন।

ডাগর চোখ তোর বিজলী চঞ্চল
কাহার চিন্তায় কান্না ছল্ ছল্ ?
হিঙ্গুল—লাল্ গাল পাংশু পাণ্ডুর,
অধর নীল রং, সিক্ত অঞ্চল।

৯। কামেল্।

সূত্র ঃ—

\+ +
মোতাফা আলুন্ মোতাফা আলুন্
\+ +
মোতাফা আলুন্ মোতাফা আলুন্।

কুহুতান মদির মন্—আগুন দ্বিগুণ
করে প্রাণ অধীর, এ যে সেই ফাগুন,
জেগে ওঠ অলস এ যে সেই বাসর
চেয়ে দ্যাখ বধির ! মদন আর রতির।

১০। পয়াফের্।

সূত্র ঃ—

\+ +
মোফা আল্তুন্ মোফা আল্তুন্
\+ +
মোফা আল্তুন্ মোফা আল্তুন্।

কানের তার দুল্ দোদুল্ দুল্ দুল্
কোথায় তার তুল্ কোথায় তার তুল্ ?
দুলের লাল্ চায় গালের লাল ছায়
শরম পায় গাল নধর তুল্ তুল্।

\+
১১। মোত্দারিক্।

সূত্র ঃ—

\+ +
ফা এলুন্ ফা এলুন্
\+ +
ফা এলুন্ ফা এলুন্

তোর অথই পাইনে থই
মন যতই পাইনে থই।
জিন্তে চাই মন শুধায়
সই ততই কই সে কই ?

+
১২। তবীল।

সূত্র :— { + + 'ফউলুন্ মোফা আয়লুন্
+ +
ফউলুন্ মোফা আয়লুন্।' }

চোখের জল! তুহার তুল্
আবার আয় ভাই, দরদ্ বুঝবার
হিয়ায় মোর আপন জন
সোহাগ তোর চাই এমন কেউ নাই।

+
১৩। মদীদ

সূত্র :— { + + + 'ফা এলাতুন ফা এলুন্
+ + +
ফা এলাতুন্ ফা এলুন্' }

হায় এ কান্নার কোন্ সে দূর পথ
নাইক শেষ, অন্তে হায়
কই মা শান্তির পান্থ-বাস যা'য়
কোন্ সে দেশ? নাই মা ক্লেশ।

+
১৪। বসীত্

সূত্র :— { + 'মোস্তাফ্ আলুন্ ফা এলুন্
+
মোস্তাফ্ আলুন্ ফা এলুন্'। }

কোন্ বন্ এমন বুল্ বুল্ ভ্রমর
শ্যাম-শোভায় বন-বিহগ
প্রাণ মন্ জুড়ায়, চঞ্চল এমন
চোখ ডুবায়? আর কোথায়?

১৫। মন্সরহ্।

সূত্র :— { + + 'মফ্ উলাতুন্ মস্তফ্ আলুন্
+ +
মফ্ উলাতুন্ মস্তফ্ আলুন্'। }

বাদ্লা থম্ থম্ শূন্য ঘর মোর
তায় ঘোর নিশীথ, না'ই কেউ দোসর—

মেঘ্‌লা মাঘ্‌ মাস ঝরছে বায় হায়—
হায় হায় কি শীত। অন্তর তৃষিত।

+
১৬। করাব।

\+ + + +
সূত্র ঃ— মফাআলুন্‌ মফাআলুন্‌ ফা এলাতুন্‌।'
জীবন-সাধন, পেলেন আদর
প্রাণের বাঁধন— পেলেম সোহাগ
হায় সে কান্নাই। মন্‌টি পাই নাই।

+
১৭। যদীদ্‌।

\+ + + + +
সূত্র ঃ— 'ফা এল। তুন্‌ ফা এল। তুন্‌ মফা আয়লুন্‌।'
রক্ত-লাল্‌ বুক, ছিন্ন-কণ্ঠের
সিক্ত চোখ-মুখ কান্না শুন্‌বার
হাসায় লোক ভাই। ধরায় কেউ নাই।

১৮। মশাকেল্‌।

\+ + + ×
সূত্র ঃ— 'ফা এলাতুন্‌ মফা আয়লুন মফা আয়লুন।'
আজ্‌কে শেষ গান, বেদনা সইতেই
বিদায় তারপর জনম যার, নাই
বিদায় চাই ভাই! শান্তি তার নাই।*

কবিগুরু একদা নজরুলের এই ছন্দ বৈচিত্র্যের সাধনা দেখে তাঁকে 'ছন্দ-স্বরস্বতীর বর-পুত্র' আখ্যা দিয়েছিলেন। সহসা অখ্যাত এক মুসলমান কবির প্রতি রবীন্দ্রনাথের এ রকম উদার আচরণের জন্য তৎকালীন রবীন্দ্র-পারিষদরা খুব চটে গিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ ১৯২৪-২৫ সালে। এই সময় কবি নজরুলের খ্যাতি মধ্যাহ্ন সূর্যের মত। এর পূর্বেই তাঁর আরবী ছন্দের উপর উক্ত রচনাটী বিজলী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। নজরুলের পূর্বে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতা মারফত বহু বিচিত্র ছন্দ (বিশেষ করে আরবী, ফার্‌সী ছন্দ) বাংলা কবিতায় আরবী ফার্‌সী কথা যুক্ত করে কবিতা লিখেছেন। কিন্তু নজরুলের মত এতটা বিশদ ভাবে করেছেন বলে জানি না। বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য, শক্তিশালী মরদের ভাষায় দাঁড় করাবার জন্য নজরুলের সাধনাকে এখন অনুধাবন করে দেখার সময় এসেছে। কারণ ভাষা এক সময় যেমন উঁচু খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল, এখন আবার নিচের

* ১৩২৬ সালে লেখা সাপ্তাহিক বিজলী পত্রিকায় প্রকাশিত।

খাতে নেমে এসেছে। রামমোহন, বঙ্কিম, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় দত্ত প্রমুখ বাংলা ভাষাকে যে আসনে বসাতে চেয়েছিলেন, নজরুলের নাম এঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। উপরোক্ত আঠারটি আরবী ছন্দ নিয়ে কবি নজরুল আলোচনা করে দেখিয়েছেন রূপ ব্যঞ্জনায় কোন লাইনে কয়টি অক্ষর বসবে; কোথায় গুরুবাক্য, লঘুবাক্য গ্রথিত হবে এবং সেই অনুপাতে 'যতি'ই বা কোথায় কোথায় পড়বে তা বিশেষভাবে চিহ্নিত করে দেখিয়েছেন। আরবী ফার্সীতে 'নুক্তা' ব্যবহৃত হয়, এই নুক্তাতো বাংলায় চলে না। কিন্তু কবি নজরুল হসন্ত ব্যবহারের দ্বারা আরবী ফার্সীর ধ্বনিমাহাত্ম্য বজায় রেখে দেখিয়েছেন যে এক ভাষার ছন্দ আর এক ভাষায় বে-মানান তো হয়ই না, বরং কাব্য-সঙ্গীতের রূপরস মধুরতর ও সুরময় হয়ে ওঠে। বাঙ্গলা ভাষায় গজল গান যে কতটা সার্থক হয়েছিল সুর, ছন্দ ও ভাষার দিক থেকে তা সকলেই জানেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব থেকে নজরুল এই চেষ্টা কবেছেন।

আরবী ও ফার্সী ছন্দের পরিচয় পেতে গিয়ে তাঁর সংস্কৃত কাব্য ও ছন্দের দিকে দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু করাচী থেকে ফিরেই কলকাতায় বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁব প্রথম পবিচয় হওয়ায় তাঁর সাহিত্য, কাব্য বিপ্লবী-মানসের খাতে বইতে থাকল। 'নবযুগের' সহ-সম্পাদক হয়ে গরম গরম লিখে তরুণদের ব্রিটিশ বিরোধী করে তুলেছেন। পরে 'ধূমকেতু' প্রকাশ করে লেখার জন্য জেলে যান। জেল থেকে ফিরে এসে নানারূপে নানা বিষয়ে লিখতে লাগলেন। কিছুদিন পব হুগলীতে এসে বাস করেন।

এই সময় হুগলীতে সংস্কৃতজ্ঞ, ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ তরুণ কবি শ্রীগীস্পতি ভট্টাচার্য বেশ নাম করেছেন। রচনা পাগল ছেলের দল গীস্পতি-বাবুকে সব সময়ই ঘিরে থাকত। তাঁর প্রতিবেশী কবি শ্রীসুবোধ রায়ও তখন হুগলীতে। পূর্বেই নজরুলের সঙ্গে কলকাতায় সুবোধবাবুর বন্ধুত্ব হয়েছে। এই পরিবেশের মধ্যে এসে পড়লেন বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম।

হুগলীতে এই ত্রয়ীর মিলনে আসর বেশ জমকাল হয়ে উঠল, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গীস্পতি বাবু ইংরেজী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত কাব্য তাঁর স্বাভাবিক উদাত্ত কণ্ঠে অনর্গল আবৃত্তি করে যান নজরুলের আড্ডায়। নজরুল মুগ্ধ হন। নজরুলও গীস্পতিবাবুর কাছে সংস্কৃত ছন্দের অনুশীলন করতে আরম্ভ করেন। নজরুলের স্বাভাবিক প্রবনতায় কাব্য-রূপ ফুটে ওঠে শ্রুতিধর হিসাবে; ছন্দও ধরতে পারেন শোনার মাধ্যমে। কিন্তু কোন ছন্দের কি নাম তা' ঠিক করে দেন গীস্পতিবাবু। কখনও কখনও শব্দকল্পদ্রুম নামক সংস্কৃত অভিধানের 'ছন্দ' পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন উভয়ে।

এই সময় কবি নজরুল তোটক ছন্দ, শার্দুল বিক্রিড়িত, সিংহবিক্রিড়, অনঙ্গ-শেখর, পঞ্চচামর, শিখরিনী, অনুষ্টুপ, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি ছন্দে কবিতা লিখতে শুরু করেন। প্রয়োজন বোধে ভাবকে প্রকাশের জন্য দু'তিনটে ছন্দ ভেঙে মিশ্র ছন্দেও কবিতা লিখেছেন। এখানেও ধ্বনি মাহাত্ম্যকে

বজায় রাখবার জন্য যতি পাতের সামঞ্জস্য রক্ষা করেছেন। কথার বাছাই করে অগ্নিবীণা গ্রন্থে 'ধূমকেতু' ও 'আগমনি' কবিতা দুটি পড়লে দেখবেন তা'তে অমিত্রাক্ষর পয়ার ও আরবী প্রভৃতি ছন্দের সমাবেশ হয়েছে। এই দুটো কবিতায় ভাব বৈচিত্র্যের সঙ্গে ছন্দ বৈচিত্র্যের এত সমাবেশ হয়েছে যে, হয়ত কাব্য-ধর্ম কোথাও কোথাও ব্যাহত হয়েছে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সাবলীলতার জন্য মনকে রসের মণিকোঠায় টেনে নিয়ে যায়; এই রকম মিল, ভাষা ও ছন্দের দুঃসাহসিকতা নজরুলের মধ্যে যেমন দেখা যায় অন্য কবিদের মধ্যে তেমন পাওয়া যায় না।

এই সময় কবিকে দেখেছি ভাব ও ছন্দের অনুসন্ধানে মহাকবি কালিদাস প্রমুখের কাব্য, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের শ্লোক পড়তে। মাঝে মাঝে 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধানের সাহায্য নেবার জন্য মনোনিবেশ করতে; কোথাও কোন পঙক্তিতে ছন্দের নিয়মানুযায়ী কত অক্ষরমালা পড়বে, লঘু-গুরুরূপে তার নির্দেশগুলি নানা রকমে ছোট ছাত্রের মত আপন ভাষায় ধরবার চেষ্টা করেছেন। কোথায় কোন অক্ষরে গুরু-লঘু শব্দের উপর 'যতি' পড়বে তাকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টায় রত রয়েছেন। কবি শ্রীসুবোধ রায় ও কবি শ্রীগীষ্পতি ভট্টাচার্যের সঙ্গে গভীর ভাবে আলোচনায় ডুবে যেতেন। কবি নজরুলের স্বভাবই ছিল যে, যেটা ধরতেন সেটাকে আয়ত্তে না এনেই মাঝ পথে ছেড়ে দিতেন না বা ছেড়ে দিতে পারতেনও না। এ অবস্থাটা কবির বেশি দিন ছিল না। কারণ এই সময়টা জাতীয় আন্দোলনের চারণ কবির কাজে কবি ছিলেন ব্যস্ত; ছন্দ তাল লয়, মান ও সুর প্রভৃতি কবির জন্মগত অধিকার, বোধ হয় স্বভাব কবিদের স্বভাবই এই।

কবি নজরুল 'জাগৃহী' নামক একটি কবিতা 'তোটক্' ছন্দে লেখেন। কবিতাটি বিষের বাঁশী গ্রন্থের একাদশ পৃষ্ঠায় আছে। সংস্কৃত 'শিবাষ্টক' স্তোত্র এই ছন্দে লেখা।

'আজ ধূর্জটীব্যোমকেশ নৃত্য, পাগল
ঐ ভাঙ্গল আগল্ ওরে ভাঙ্গল আগল্।
বলে অম্বুদ-ডম্বরু কম্বু বিষাণ,
নাচে থৈ-তাতা থৈ-তাতা পাগ্লা ঈশান।
দোলে-হিন্দোলে ভীম-তালে সৃষ্টি ধাতার,
বুকে বিশ্ব পাতার বহে রক্ত পাথার।'

এই 'জাগৃহী' কবিতাটি এককালে বিপ্লবীদের খুব প্রিয় ছিল।

ছন্দ সাধনায়

(২)

"পূবের হাওয়া" নামক কবিতাটি নজরুল হুগলীতে থাকবার সময় লেখেন। এই কবিতাটি প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থাকে বিভিন্ন ছন্দের মাধ্যমে লিখে ভারি মনোজ্ঞ করে তুলেছেন। 'পূবের হাওয়া' কবিতাটির পূর্বে 'ঝড়' পশ্চিম তরঙ্গ কবিতাটিও হুগলীতে লেখেন। ঝড় কবিতাটি লিখেছিলেন অসমছন্দে। 'পূবের হাওয়ায়' নানা ছন্দের সমাবেশ হয়েছে, পয়ার, ভাঙা ত্রিপদী ; অমিত্রাক্ষর, কাজরী, বিলম্বিত, দ্রুততাল প্রভৃতি নানা ছন্দে 'ঝড়' লেখা। এই ঝড় কবিতার শুরু হয়—

"ঝড়—ঝড়—ঝড় আমি—আমি ঝড়
শন্—শন্—শন শন শন্—কড় কড় কড়
কাঁদে মোর আগমনী আকাশ বাতাস বনানীতে,
জন্ম মোর পশ্চিমের অস্তগিরিশিরে।—
যাত্রা মোর জন্মি' আচম্বিতে
প্রাচীর অলক্ষ্য পথ-পানে।"

পশ্চিম তরঙ্গ ঝড়ের যাত্রা যে প্রাচী'র অর্থাৎ পূবের দিকে, তারই কথা লিখলেন 'পূবের হাওয়া' কবিতায়। মেঘের খেলা, বৃষ্টি ঝরার বিচিত্ররূপ, তৃষ্ণার্ত পৃথিবীর তৃপ্তিময় আদেশ,—এইসব নানারূপ নানাছন্দের মাধ্যমে বলবার চেষ্টা করেছেন।

'ঝড়' ও 'পূবের হাওয়া' কবিতা দুটি দিয়ে কবির একখানি গ্রন্থ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু 'বিষের বাঁশী' বইখানি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়ার জন্য কবির সে সাধ আর পূর্ণ হয়নি।

কবি 'পূবের হাওয়া' কবিতার প্রথমেই গুরুগম্ভীর অমিত্রাক্ষর ছন্দ দিয়ে শুরু করেন—

'আমি ঝড় পশ্চিমের প্রলয় পথিক
অসহ যৌবন দাহে লেলিহান শিখ
দারুণ দাবাগ্নি সম নৃত্য ছায়া নটে
মাতিয়া ছুটিতে ছিনু ; চলার দাপটে
ব্রহ্মাণ্ড ভণ্ডুল করি। অগ্রসহচরী
ঘূর্ণা-হাতছানী দিয়া চলে ঘূর্ণী-পরী
গ্রীষ্মের গজল গেয়ে পিলু বারোঁয়ার
উশীরের তার বাঁধা প্রান্তর বীণায়।

করতালী ঠেকা দেয় মত্ত তালীবন
কাহারবা দ্রুত তালে।'

পশ্চিম তরঙ্গ ঝড়ের বৈপ্লবিক গতিতে যা অকল্যাণ, যা অন্যায় তাকে পায়ের চাপে গতির বেগে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে করতে কল্যাণময় বর্ষণের কাছাকাছি পীড়িতা ও তৃষিতা পৃথিবীর আনন্দের আমেজ কবি দেখতে পেলেন তাই কবি লিখলেন 'কাজরী' ছন্দে—

"এস মোর শ্যাম সরসা শ্রাবণের কাজলগুলি
ঘনিমার হিঙ্গুল শোষা ওলো আয় রাঙিয়ে তুলি,
বরষা প্রেম-হরষা সবুজের জীবন তুলি
প্রিয়া মোর নিকষ-নীলা। মৃতে কর প্রাণ-রঙিলা।

কাজরী ছন্দের রূপ হল, মাঝে মাঝে জলধারা তীর বেগে ঝরতে ঝরতে থেমে যাবে বা স্বল্প বেগে ধারা নামবে।

এরপর প্রকৃতির বুকে চলে মেঘের আব জলের লুকোচুরি খেলা। কবি নজরুল তাকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন শার্দ্দূল বিক্রিড়িতম ছন্দে—

উৎত্রাস ভীম ইন্দ্রের রথ
মেঘে কুচ কাওয়াজ বজ্রের কামান
চলিছে আজ , টানে উজান
সোন্মদ সাগর মেঘ ঐরাবত
খায়রে দোল্ মদ-বিভোল।

প্রকৃতির লুকোচুরী খেলার পর বর্ষণস্নাত আনন্দ বিহ্বল দিগ্বসনা ঘন সবুজ পত্রের শাড়িতে সেজে, পুষ্করিণী, তড়াগ, নদী প্রভৃতির কুলপ্লাবি আনন্দে নৃত্যময়ী হয়ে উঠলেন। কবি এই রূপকে ব্যঞ্জনা দেবার জন্য 'সিংহ বিক্রীড়' ছন্দকে আবলম্বন করলেন—

নাচায় প্রাণ রণোন্মাদ- বিজয়-গান, গগনময় মহোৎসব।
রবির রথ অরুণ-যান- কিরণ-পথ ডুবায় মেঘ- মহার্ণব॥
+ + + + +
মাঠের পর সোহাগ-ঢল জলদ্-দ্রব্ ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল।
পাহাড়-গায় ঘুমায় ঘোর অসিত মেঘ- শিশুর দল অচঞ্চল॥
+ + + + +
স্বয়ম্ভুর সতীর শোক- ধ্যানোন্মাদ- নিদাঘ-দাব্ তপের কাল +
নিশেষ আজ। মহেশ্বর উমার গাল চুমার ঘায় রাঙায় লাল॥

বর্ষণের ফলে তৃপ্ত ধরণী ফলে ফুলে নব পত্রিকার সমারোহে বিলাসিনীর রূপ ধারণ করলেন। প্রতিটি গৃহ যেমন ধনে ধান্যে, আহারে বিহারে আনন্দময়রূপ গ্রহণ করল, প্রকৃতিও অন্নপূর্ণার রূপে দেখা দিলেন। কবি লিখলেন "অনঙ্গশেখর" ছন্দে—

এবার্ আমার বিলাস শুরু অনঙ্গ শেখরে।
পরশ-সুখে শ্যামার বুকে কদম্ব শিহরে।
কুসুমেষু'র পরশ কাতর নিতম্ব-মন্থরা
সিনান-শুচি স-যৌবনা রোমাঞ্চিত ধরা।

কবি এত দেখে, এত লিখেও তৃপ্ত নন, কোথায় যেন কি ফাঁক রয়ে গেল, কি যেন করা হল না—এই বেদনায় কবির আনন্দের মধ্যে ও হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তিনি লিখলেন—

এবার আমার পথের শুরু তেপান্তরের পথে
দেখি, হঠাৎ চরণ রাঙা মৃণাল-কাঁটার ক্ষতে।
ওগো আমার এখনো যে সকল পথই বাকী,
'মৃণাল হেরি' মনে পড়ে কাহার কমল-আঁখি।

কাঁটার বেদনায় কমল আঁখি দেখা কবির স্বভাব-ধর্ম। তাই তাঁর অনুসন্ধানী মন খুঁজেই চলল 'কমল-আঁখি'-কে এক পথ থেকে আর এক পথে। পথচারী কবি নজরুল বালক বয়স থেকে যৌবনের শেষের দিকে এই স্বল্প সময়ে মাতৃভাষাকে যেরূপে নানা ছন্দের আভরণে সাজালেন তা বড়ই বিস্ময়ের। কত বিচিত্র ছন্দ কবি আয়ত্ত করেছিলেন সে বিষয়ের আলোচনা করবার বিদ্যে আমার নেই। আমি শুধু কবির বিচিত্র কর্ম্ম সাধনার মধ্যে ছন্দ-সাধনার তথ্যটাই এখানে স্বল্প করে দেখালাম। উপযুক্ত গুণীজন যদি কবির এই বিষয়টা বিষদভাবে দেখেন, লেখেন তবেই বাংলাদেশ খুশি হবে।

শিশু-সাথী নজরুল

শিশুদের সঙ্গে নজরুলের যে গভীর আত্মীয়তা দেখা যেত, তা সত্যই অপূর্ব। নজরুল শিশু ও বালকদের কাছে গেলে সব ভুলে যেতেন। তিনি তাদের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতেন। শিশু ও বালকরা নজরুলকে নিজেদের মধ্যে টেনে নিত। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। বয়সের কোন তারতম্যই থাকত না। ছোটয় বড়য়, বড়য় ছোটয় একাকার ওদের মধ্যে কবি যেন ভবিষ্যত দেশের শক্তিমান মানুষকে দেখতে চাইতেন। বালকরাও তাঁকে কাছে পেলে ছেড়ে যেতে চাইত না। কত মজার মজার ছড়া, কবিতা, গল্প বানিয়ে বানিয়ে তাকে বলতে শুনেছি।

কবির শিশুপাঠ্য রচনার পরিমাণ কম নয়। তার মূল্যও যে কম নয় তা পাঠকমাত্রেই জানেন। সেই রচনার ভাষা, ছন্দও শিশুদের বুলির থেকে উচ্চমানের নয়, তা পড়লেই বুঝতে পারা যায়। ভাবের গভীরতার পাণ্ডিত্যও তিনি দেখান নি, অথচ শিশুদের গভীরতায় নিয়ে যাওয়ার আন্তরিক আকর্ষণ কবির রচনাশৈলীর মধ্যে রয়েছে।

শিশু কাব্যগ্রন্থ "ঝিঙেফুল" যখন প্রকাশিত হয়, তখন নজরুল হুগলীতে সপরিবারে বাস করতেন ১৯২৪ সালে। মোগলপুরা লেনের বাসার নিকটে তাঁর প্রতিবেশী হামিদুল নবীর বাড়ি। তাঁর একটি বছর সাতেকের নাতি ছিল। শৈশব অবস্থা থেকে বালকত্বে পা দিয়েছে। নজরুলের সে ছিল ভারি ন্যাওটা। কবির বাড়ি লোকের ভিড়ে সব সময়ই জমজমাট থাকত, গানে আবৃত্তিতে গমগম করত। এই সব ভিড়ে সে ছিল সব সময়ের সভ্য। সুযোগ পেলেই কবির কোলটি দখল করে বসে পড়ত। মায়ের কথা বাড়ির কথা ও খাওয়ার কথাও তার মনে আসত না। প্রায় দিনই ঘুমিয়ে পড়লে কবি ঘাড়ে করে তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতেন।

তখন কবি বেশি সময় গাইতেন রবীন্দ্রনাথের এই গানটি :—

"ও চাঁপা ও করবী
কারে তুই দেখতে পেলি
আকাশ মাঝে
জানি না যে জানি না যে।"

এই গানের মধ্যে যে সব ফুলের নাম আছে তার মধ্যে ঝিঙে ফুলের নাম নেই কেন?—এই প্রশ্ন একদিন ছেলেটির মনে জাগল। প্রায়ই সে কবিকে প্রশ্ন করত, "চাচা ঝিঙে ফুলের গান গাও।" তার নানাকেও (মায়ের বাবা) বলত। একদিন বৈকালের গানের আসরে উক্ত ছেলেটি একটি সদ্য ফোটা ঝিঙে ফুল নিয়ে এসে হাজির তাদের মাচা থেকে।

নজরুল তাকে কোলে নিয়ে আদর করে ঝিঙে ফুলের ওপর এই কবিতাটি লিখে তখনই সুর দিয়ে তাকে শুনিয়ে দিলেন।

ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল।
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে ফুল
ঝিঙে ফুল।
গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝলমল্ দোলে দুল্
ঝিঙে ফুল॥ ইত্যাদি

এই কবিতা ও গান শুনিয়ে তখন কবি উপস্থিত বুড়ো-গুঁড়োদের তাক লাগিয়ে দিলেন। ছেলেটি তো খুব খুশি। প্রায় ৫০ বছর আগের কথা। এখন সে ছেলেটির এ কথা মনে আছে কিনা জানি না। ঝিঙে ফুল বইটি হুগলী থাকতে ছাপা হয়েছিল।

নজরুলের ধর্ম-মা ছিলেন মিসেস এম্ রহমান। তাঁরও বাড়ি ছিল হুগলী চকবাজারে। এঁর বাবার নাম ছিল খানবাহাদুর আনোয়ার সাহেব। খানদানী পরিবার। সরকার ঘেঁসা লোক। নজরুল ছিলেন তেমনি ব্রিটিশ সরকার বিরোধী। মিসেস রহমান ছিলেন লেখিকা, তৎকালীন "সোলতান" প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি লিখতেন। এই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠতা হয়।

আনোয়ার সাহেব ছিলেন সরকারি উকিল ও খানবাহাদুর। নজরুলের নাম শুনলেই খানবাহাদুর তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন। এই সব কারণে মিসেস রহমান তাঁর মেয়েকে নিয়ে নজরুলের চকবাজারের বাড়িতে এসে কিছুদিন ছিলেন। খান বাহাদুর ছিলেন একটু খোনা, তাঁর নাকটি ছিল খেঁদা প্রায় না থাকার মত। তাই মিসেস রহমানকে রাগাবার জন্য প্রায়ই বলতেন—

"ও মা তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাঙ" এ-কথা শুনে রহমান সাহেবা কৃত্রিম রাগ দেখাতেন। এই থেকেই কবি লিখলেন "খাঁদু দাদু" কবিতাটি। রহমান সাহেবা যত রাগ দেখাতেন কবি ততই বলতেন—

"খ্যাঁদা নাকে নাচ্‌ছে নাদা নাক ডেঙা ড্যাং ড্যাং" ইত্যাদি। এই ঘটনার ওপর এই "খাঁদু দাদু" কবিতাটি লেখা হয়েছিল।

ভাষা ও ছন্দের দিকে নজর দিলে দেখবেন যে কত সহজ, সরল, সাবলীল ও শিশুসুলভ। এর আগেই বিখ্যাত কবিতা "লিচুচোর" কবিতাটি লেখা হয়েছিল। এটিই কবির প্রথম শিশু কবিতা। এই কবিতাটি লেখা হয়েছিল ১৯১৯ সালের শেষের দিকে কলকাতায় কুমিল্লাবাসী আলী আকবর

খাঁনের অনুরোধে। তাঁকে কবি আরও কয়েকটি শিশু কবিতা লিখে দিয়েছিলেন।[১]

"পুতুলের বিয়ে শিশু নাটিকাটিও হুগলীতে লেখা। হুগলীতে লেখা এই নাটিকাটিদ্বারা শিশুকাল থেকে দেশের হিন্দু মুসলমান ছেলেমেয়েদের কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতা বর্জনের শিক্ষা দিয়েছেন। নাটিকার নায়িকা কম্‌লি বিবাহ বাসরে গাইছে—

"মোরা এক বৃন্তে দুটি ফুল হিন্দু মুসলমান।
মুসলিম্ তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ॥"

এই নাটিকাতেই কম্‌লির দাদামণিও একজন খেলাঘরের (পুতুলের বিয়ে) নায়ক, সে গাইছে—

"হেড্‌মাষ্টারের ছড়ি, সেকেণ্ড মাষ্টারের দাড়ি,
থার্ড মাষ্টারের টেড়ি, কারে ধরে কারে ছাড়ি।
হেডপণ্ডিতের টিকির সাথে ওদের যেন আড়ি।"
(পুতুলের বিয়ে)

বিষয়বস্তু হচ্ছে এই, কম্‌লির চীনের পুতুল ডালিমকুমারের সঙ্গে টুলির মেম পুতুল বেগমের বিয়ে। এই নিয়ে খেলাঘরের বিয়ের আসর। এই নাটিকার মধ্য দিয়ে কবি কুসংস্কার বর্জিত মন তৈরি করতে চেয়েছেন শিশুকাল থেকেই।

কবি আবদুল কাদির সাহেব ১৩৩৮ সালে শিশু মাসিক প্রকাশ করেছিলেন। তাতে নজরুল লিখেছিলেন—

"কোন্ রূপলোকে ছিলি রূপকথা তুই,
রূপ ধরে এলি এই মমতার যুঁই।
তারা যুঁই এই ভুঁই আসিলি যবে,
একটি তারা কি কম পড়িল নভে ?
ছোট তোর মুঠি ভরি আনিলি মণি,
সোনার জিয়ন-কাঠি মায়ার ননী।"
তোর সাথে ঘর ভরে এল, ফাল্গুন,
সব হেসে খুন হলো কি জানিস গুণ।"[২] ঈদ সংখ্যা,
দৈনিক, কৃষক

---

(১) কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা—মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ—পৃঃ ১১৩
(২) "নজরুল জীবনী"—আবদুল কাদির রচিত ঈদ্ সংখ্যা ১৩৪৮, দৈনিক কৃষক পৃঃ ১১

কাদির সাহেব তাঁর লেখা "নজরুল জীবনী"তে লিখেছেন যে—"দেখেই বুঝেছিলাম, শিশুসাহিত্য রচনায় অগ্রসর হলেও তিনি অক্ষয় যশের অধিকারী হবেন।"৩

"ঝিঙে ফুল' বইতে যে সব শিশু কবিতা বেরিয়েছিল তার অনেকগুলিই হুগলীতে থাকাকালীন লেখা। যে সব বাড়িতে গান গাইতে বা বেড়াতে যেতেন সেখানকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আসরে মুখে মুখে কবিতা বলে তাঁদের খুব আনন্দ দিতেন, পরে বাড়িতে এসে তারই থেকে মনে করে কবিতা লিখে রাখতেন। এমনি করে কবিতার সাজি ঝিঙে ফুলে পূর্ণ হয়ে উঠত।

এই উদ্ধৃতি দেওয়ার কারণ এই যে, শিশু কবিতায় নজরুল যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, সে সম্বন্ধে ভাষাবিদরা অন্যান্য শিশুপাঠ্য রচয়িতা কবিদের ভাষার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা যাতে করেন তারই জন্য।

"সানির ইচ্ছা"৪ কবিতায় শিশুদের মনে আবিষ্কাবের ইচ্ছা যাতে জাগে, জীবন-যুদ্ধে জয়ী হয়ে দেশকে গৌরবান্বিত করতে পারে তার জন্য লিখলেন ঃ—

"মস্ত সাগর রাজ্য আমার
হবো সিন্ধুপতি ;
আমার রাজ্যে কব জোগাবে
রেবা ইরাবতী।"

আবার লিখলেন ঃ—

"তোমার "সানি" যুদ্ধে যাবে
মুখটি করে চাঁদ-পানা
কোল ন্যাওটা তোমার "নিনি"
তোমার ভয়ে আধখানা।"

সাদামাঠা জীবন হবে, মন হবে উঁচু, সকলকে আপন করব, হব বিনয়ী, এভাব যাতে ছোট্টবেলা থেকেই হয় তাই কবি লিখলেন—

"চল্‌বো আমি হাল্‌কা চালে
পল্‌কা খেয়ার হাওয়ার তালে

(৩) নজরুল জীবনী—আবদুল কাদির রচিত ঈদ সংখ্যা ১৩৪৮, দৈনিক কৃষক পৃঃ ১১।

(৪) 'সানি"—কাজি সব্যসাচী—এঁর ডাক নাম কবি রেখেছিলেন—চীনের জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাতার নামে, পুরো নামটা হল সানিয়াৎ সেন।

"নিনি"—কাজী অনিরুদ্ধ—এর ডাক নাম হল—লেনিন। এই থেকেই এঁদের নাম সংক্ষিপ্ত হয়ে হয়েছে সানি ও নিনি। এঁদের নিয়েও কবি অনেক কবিতাই লিখেছেন।

কুসুম যেমন গন্ধ তালে
তরল সবল ছন্দে রে।”

তারপর “সঙ্কল্প”, “কিশোরের স্বপ্ন” প্রভৃতি শিশু কবিতাবলী পড়লে শিশুর উপযুক্ত ভাষার ব্যবহারের দিকে ভাল করে নজর দিলে নজরুলের কৃতিত্ব বোঝা যাবে। তারপর “মায়ামুকুর” কবিতাটিব মাধ্যমে দেশ ও দেশান্তরের মহৎ ব্যক্তিদের ও শহীদদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন শিশু ও বালকদের। এই পরিচয়ের মহৎ কাজটা কবির সঙ্গে অভিভাবকদের সমাধা করতে হবে।

মুনি ঋষি, লেনিন, কামাল, সানিয়াৎ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শিবাজী, সিরাজ, আকবর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতির নাম ও গুণেব পরিচয় দিয়ে কবিতাটি লেখা। কবিতাটি দীর্ঘ।

নজরুলের বাঙালী পল্টনের একমাত্র সুহৃদ ও বন্ধু শ্রীশম্ভু রায়ের যখন প্রথম ছেলে হল, কবিকে শম্ভুবাবু জানাতে কত না আনন্দ প্রকাশ করে ছেলের নামকরণ করলেন “অরিন্দম”। এই অরিন্দমের নামে একটি সুন্দর কবিতা লিখে দিয়েছিলেন, সে কবিতাটি সংগ্রহ করতে পারি নি। কারণ শম্ভুবাবুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরই তিনি মারা যান। শম্ভুবাবুর কাছে শুনেছিলাম যে নজরুল উক্ত অরিন্দমকে নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু শম্ভুবাবুর মৃত্যুর পর ছেলেরা আর সেসব পান নি।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

(১)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। বিদ্রোহী কবি হিসাবেও তাঁর গভীর স্নেহলাভের অধিকারী হয়েছিলেন।

কারামুক্ত চারণ কবি নজরুল শতগুণ উৎসাহ নিয়ে দেশের "অর্ধচেতন" মানুষদের অগ্নিময়ী ভাষায় গান, কবিতা, প্রবন্ধ লিখে "সচেতন" করে তুলেছিলেন। দেশের আপামর সাধারণ, ধনী, দরিদ্র থেকে সকলেই নজরুলকে জাতির কবি বলে স্বীকার করে নিল। এই সময় 'রবীন্দ্র-পারিষদরা' নজরুলকে নানারকমে অপদস্ত করার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু দেশের জনসাধারণের মনে নজরুল-প্রতিভার দ্যুতিতে অসম্ভব প্রভাবিত হয়, যারা অপদস্ত করার চেষ্টা করেছিল, তারাই অপদস্ত হয়ে যায়।

তখন উক্ত সাহিত্যিকগণ অপদস্ত করার জন্য অন্য আরেকটি পথ অবলম্বন করে। রবীন্দ্রনাথকে নজরুল-বিদ্বেষী করার চেষ্টা করে। ইতিপূর্বে এই সাহিত্যিকগণ নজরুল-সত্যেন্দ্রের (দত্ত) বন্ধুভাবকে বিষিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিল।

একদা নজরুলেব অনুপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের কাছে উক্ত সাহিত্যিকগণ ছন্দ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল সম্পর্কে প্রশ্ন করায়, বিশ্বকবি জবাব দিয়েছিলেন, 'সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দের ছান্দগ্য ঋষি, আর নজরুল ছন্দ-সরস্বতীর বরপুত্র।' এই কথায় সত্যেন্দ্রনাথকে তাঁর বন্ধুরা তাতিয়ে তুলবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এরপরে রবীন্দ্রনাথকে নজরুলের লেখায় বড়ই বেশি আরবী ফার্সী ভাষার আধিক্য থাকা নিয়ে, বিশেষ করে কথায় কথায় "খুন" শব্দ ব্যবহারের কথা তুলে রবীন্দ্রনাথকে নজরুল-বিদ্বেষী করার চেষ্টা হয়।

১৯২৬ সালের শেষে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ভ্রমণের কথা ওঠে। সেই সময় রবীন্দ্র-পরিষদের সভায় তিনি একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করেন, দেশের সাহিত্যের ভাষার সমালোচনা করে। ঐ সভায় "বীরবল" প্রমথ চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত লিখিত ভাষণে "খুন" শব্দ নিয়ে আলোচনা ছিল। ঐ লেখাটি ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল। তার অংশ-বিশেষ :—

"সৃষ্টি শক্তিতে যখন দৈন্য ঘটে তখনই মানুষ তাল ঠুকে নূতনত্বের আস্ফালন করে।......সেদিন কোন একজন বাঙালী হিন্দুকবির কাব্যে দেখলুম, তিনি "রক্ত" শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন "খুন"। পুরাতন "রক্ত" শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙা রঙ যদি না ধরে তাহলে বুঝব সেটাতে তাঁর অকৃতিত্ব। তিনি রঙ লাগাতে পারেন না বলেই "তাক" লাগাতে চান।

নূতন আসে অকস্মাতের খোঁচা দিতে; নবীন আসে চিরদিনের আনন্দ দিতে" ইত্যাদি।

এই লেখা পড়ে নজরুলের মনে খুবই আঘাত লাগল। তিনি ব্যথিত হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝে কলম ধরলেন। ১৩৩৪, ১৪ই পৌষের সাপ্তাহিক আত্মশক্তির ৩৭ সংখ্যার তৃতীয় পৃষ্ঠায় "বড়র পিরীতি বালির বাঁধ" নাম দিয়ে একটি সুবৃহৎ প্রবন্ধ লিখলেন। কবি ভারতচন্দ্র কোন ধনী ব্যক্তির কাছে দুর্ব্যবহার পেয়ে লিখেছিলেন—

"বড়র পিরীতি বালির বাঁধ
ক্ষণে দড়ি হাতে—কণেক চাঁদ"

নজরুল ধনী রবীন্দ্রনাথের উপব ভুল বুঝে এই শিরোনামা দিয়ে প্রবন্ধের শুরু কবেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষণের বিরুদ্ধে এটা ছিল প্রতিবাদ। এতে লিখলেন,—বিশ্বকবিকে শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা করে এসেছি সকল হৃদয় মন দিয়ে, যেমন করে ভক্ত তার ইষ্ট দেবতাকে পূজা করে। ছেলেবেলা থেকে তাঁর ছবি সামনে রেখে গন্ধ-ধূপ ফুল-চন্দন দিয়ে সকাল সন্ধ্যা বন্দনা করেছি। এ-নিয়ে কত লোক ঠাট্টাবিদ্রূপ কবেছে।

"এমনকি আমার এই ভক্তির নির্মম প্রকাশ রবীন্দ্র-বিদ্বেষী কোন একজনের মাথার চাঁদিতে আজও অক্ষয় হয়ে লেখা আছে।

"আমার পরম শ্রদ্ধেয় কবি ও কথাশিল্পী শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় একদিন কবির সামনেই এ কথা ফাঁস করে দিলেন, কবি হেসে বললেন,— 'যাক আমার আর ভয় নেই তা হ'লে'।"

তারপর কবি এই প্রবন্ধেই আরবী ফার্সী শব্দ প্রযোগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন: "এই অভিমন্যুর রক্ষী মনে করে কবিগুরু আমায়-ও বাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়েন নি। তিনি বলেছেন আমি কথায় কথায় "খুন"কে খুন বলে অপরাধ করেছি।

"কবির চরণে ভক্তের সশ্রদ্ধ নিবেদন, কবি ত নিজেও টুপি, পায়জামা পরেন, অথচ আমরা পরলেই—।

"এই আরবী ফার্সী শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতিও করেছেন।……

"কবিগুরুর চিরন্তনের দোহাই নিতান্ত অচল। তিনি ইটালীকে উদ্দেশ্য করে এক কবিতা লিখেছেন। তাতে "উতারো ঘোমটা" তাঁকেও ব্যবহার করতে দেখেছি। "ঘোমটা খোলা" শোনাই আমাদের চিরন্তন অভ্যাস। "উতারো ঘোমটা" আমি লিখলে হয়ত সাহিত্যিকদের কাছে অপরাধীই হতাম।…… ঐ একটু ভাল শোনার লোভেই; ঐ একটি ভিন্-দেশী কথার প্রয়োগে অপূর্ব রূপ ও গতি দেবার আনন্দেই আমিও আরবী ফার্সী শব্দ ব্যবহার করি। কবি গুরুও কতদিন আলাপ আলোচনায় এর স্বার্থকতার প্রশংসা করেছেন।"

এই প্রবন্ধটি আত্মশক্তিতে প্রকাশিত হবার পরই রবীন্দ্র পরিষদের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে সাড়া জেগে উঠল। তাঁরা তাঁদের দ্বারা প্রকাশিত বিভিন্ন চাঁট-সাহিত্যের পত্রিকায় নজরুলকে নিয়ে খিস্তিমুখর ভাষায় গদ্যে পদ্যে নৃত্য শুরু করে দিলেন।১

এইভাবে দীর্ঘ প্রবন্ধে নজরুল বাংলা কাব্য ও গদ্য সাহিত্যে আরবী ফার্সী প্রয়োগের অকাট্য যুক্তিদ্বারা সওয়াল করেন।

এ নিয়ে বাগবিতণ্ডার অবসানের জন্য ১৩৩৪ সালের ২০শে মাঘের ৪২ সংখ্যার আত্মশক্তিতে "বীরবল" শ্রীপ্রমথ চৌধুরী "বঙ্গসাহিত্যে খুনের মামলা" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি ছিলেন ব্যারিষ্টার মানুষ। তাঁর এই প্রবন্ধই শেষ পর্যন্ত নজরুল-রবীন্দ্র-আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে রৌদ্রজ্জল হাসি ফুটিয়ে তুলেছিল।

তিনি লেখেন: "কবিগুরু হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ যে কাজী সাহেবকে লক্ষ্য করে এ-কথা বলেছেন—এ-সন্দেহ আমার মনে উদয় হয়নি। যদিচ যে সভায় তিনি ও-কথা বলেন সে-সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম। যতদূর মনে পড়ে কোন উদীয়মান তরুণ কবির নবীন ভাষার উদাহরণস্বরূপ তিনি "খুনের কথা বলেন" কোনও উদিত কবির প্রতি তিনি কটাক্ষ করেননি। ......সর্বশেষে খুনের একটি গুণের উল্লেখ করব—যেটি রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেননি। কবিতা লিখতে হলে মিলের প্রয়োজন—অন্ততঃ বাংলা কবিতাতে তাই। এখন বাংলা ভাষায় 'খুনের' যত মিল খুঁজে পাওয়া যায়, 'রক্তে'র তার শতাংশের এক অংশও পাওয়া যায় না।......

"এমন কি বর্ণ-মালার শেষ অক্ষর জাত হুনের সঙ্গে খুনের সম্পর্ক অতি নিকট। অতএব কবিতায় যদি খুন বাদ দিতে হয় তাহ'লে reason-এর খাতিরে rhyme-কে তালাক দিতে হয়। আর কে না জানে rhyme-এর খাতিরে reason-এর সাতখুন মাপ।" (বীরবল, ২৯. ১. ২৮)

বিদ্রোহী কবি এই প্রবন্ধ পাঠের পর বীরবলকে পাণ্ডা করে বিশ্বকবির কাছে ছল-ছল চোখে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। মানব মনের ভুল বোঝাবুঝির যিনি বহু সমাধান করেছেন সেই মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহী কবিকে সস্নেহে বুকে তুলে নিলেন। "সাধ্যায়ত্ত-সাহিত্যিক"রা চালাকি করতে গিয়ে একটি খাঁটি লোকের কাছে পরাজিত হলেন।

(২)

"সৈনিক-কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম সাহেবের প্রতি

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

ছন্দে গানে বাজাও কবি বাজাও প্রাণের গান,
মুগ্ধকর বিশ্বজনে দাও গো নূতন প্রাণ।

---

(১) শনিবারের চিঠি, হসন্তিকা প্রভৃতি পত্রিকা—এর পাণ্ডা ছিলেন, সজনী দাস, মোহিতলাল প্রভৃতি।

দম্‌কে চলা হাওয়ার মত ছন্দ তোমার চলে
মাড়িয়ে দিয়ে সকল বাধা ক্ষিপ্র-চরণ-তলে।
যৌবনেরি জীবন দিয়ে বৃদ্ধে তরুণ কর,
রাগ-রসেরি পরশ দিয়ে চিত্ত অরুণ কর।
'সে-কাল'-বুড়োর অধর সীমায় মদের পাত্র ধরি'
তোম্‌রা তারে 'এ-কাল' কর, মাতাও নূতন করি।

সমাজ বিশেষ নয় তোমাদের জীবন-নদীর বাধা,
তোমার বীণায় বিশ্ব গানের সকল সুরই সাধা।
তোমার গানের সুরের তাতে অসাড় মরণ জাগে,
বে-রসিকের হৃদয় ভরে প্রণয়-অনুরাগে।
বন্ধুজনের প্রীতির মালা তোমায় দিলাম আজ,
পরবে কি গো এ ?—নাই যে এতে পান্না-চুনীর কাজ!
মহব্বতের ফুলেরি শ্বাস এই মালাতে আছে,
খোস্‌-বু তাহার পৌঁছে দিনু ছন্দে তোমার কাছে।"[২]

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী মহাশয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহভাজনীয় বিশ্বাসী। শ্রীসুধাকান্ত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন তাঁর একান্ত সচিব। ১৯২০ সালে তিনিই একমাত্র লোক যিনি নজরুলকে প্রথম লিখিতভাবে কবিতার মাধ্যমে সংবর্ধনা জানান। শ্রীসুধাকান্তই সেই যুগের নজরুল-সাহিত্য-কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়ে দেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নজরুলের যে-সব লেখা প্রকাশ হত; সেইসব পত্রিকা বা গ্রন্থ, অতি যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথকে পড়তে দিতেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, যতদিন তিনি শান্তিনিকেতনের সঙ্গে এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত রবীন্দ্র দর্শন-প্রার্থীদের তিনি সর্বপ্রকারে সঙ্গ দান করে, নানা কাহিনীর মাধ্যমে আশ্রমের ও রবীন্দ্র-নাথের কথা দিয়ে মশ্‌গুল করে রাখতেন। নজরুলের সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকের কথা তাঁরই কাছে বিভিন্ন সময়ে শুনেছি।

নজরুলের সঙ্গে শ্রীসুধাকান্তই রবীন্দ্রনাথের আলাপ করিয়ে দেন। এই আলাপের কথা তাঁর ভাই শ্রীনিশিকান্ত রায়চৌধুরী বলেছেন ঃ—"সবে শিশু বিভাগ থেকে নতুন গুরুপল্লীতে দাদা সুধাকান্তের বাড়িতে এসেছি। বৌদি তাঁর শিশুপুত্র সৌম্যকান্তকে নিয়ে পিত্রালয় শিবহাটি গ্রাম থেকে সদ্য ফিরে এসেছেন। এই সময় একদিন আমাদের বাড়িতে দাদা তাঁর বন্ধুবান্ধবদের বলছেন শুনলাম—হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজ সন্ধ্যায় গুরুদেবের সংগে দেখা করতে আসবেন। সুধাকান্তের ওপরই ভার

(২) ১৩২৭ সালের কার্তিক মাসের ৭ম সংখ্যার ৪৩৯ পৃষ্ঠায় 'মোসলেম্-ভারতে' প্রকাশিত।

পড়ল তাঁকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসবার, অতিথি-ভবনে তাঁর বাসস্থানের ব্যবস্থা করবার ও কবিগুরুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার। গুরুপল্লীর এই বাড়িটিতেই সুধাকান্তের বন্ধুরা আসতেন এবং তাঁদের আড্ডাটি বেশ জমে উঠত। সুধাকান্ত ছিলেন মজলিসী মানুষ। নানা কথাবার্ত্তার মধ্যে নজরুলের কবিতা নিয়েও আলোচনা হত। দাদার সঙ্গে নজরুলের সবিশেষ পরিচয় আছে—এ খবরটিও আমার কাছে বিশেষ আনন্দের হয়ে উঠল।

"'মোসলেম ভারত' পত্রিকা দাদার কাছে আসতে লাগল, তখন নজরুলের কবিতা নিয়মিতভাবে ঐ পত্রিকার প্রথম দিকেই দেখতে পেতাম ও সাগ্রহে পাঠ করতাম। শুনলাম, পূর্ব্বোল্লিখিত কলাভবনের দোতলায় সান্ধ্য-আসর বসবে, সচকিত মন নিয়ে দাদার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলাম দেখলাম, কবিগুরু বসে আছেন মাঝখানে।···সকলেই সমবেত হয়েছেন। কবিগুরুর পাশে দু'জন আগন্তুক সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, তাঁদের একজনকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখিয়ে দাদা সুধাকান্ত আমাকে বললেন—ঐ দেখ কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এই কথা বলে দাদা নজরুলের সান্নিধ্যেই বসলেন। নজরুলের পাশেই ফেজ্ পরা, কাঁচা-পাকা দাড়ি নিয়ে একজন বসে আছেন।[৩]

"তিনি কবিগুরুকে বলছিলেন—ট্রেনে আসতে আসতে কাজী সাহেব আপনার গীতাঞ্জলীর সবকটা গান আমাকে গেয়ে গেয়ে শুনিয়েছেন। কবিগুরু বললেন—তাই নাকি ? অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি তো! আমার গীতাঞ্জলীর গান সবতো আমারই মনে থাকে না। কাজী সাহেব বললেন, গুরুদেব আমি আপনার কণ্ঠে একটি গান আর একটি কবিতার আবৃত্তি শুনতে চাই। গুরুদেব বললেন, সে কি ? আমি যে তোমার গান আবৃত্তি শোনার জন্য প্রতীক্ষা করে আছি, তাড়াতাড়ি শুরু করে দাও, আমাকে আবার রাত্রিবেলা লেখায় ব্যাপৃত থাকতে হবে। নজরুল দ্বিরুক্তি না করে আবৃত্তি করলেন—'আগমনী, কবিতাটি।"[৪]

"রবীন্দ্রজীবনী"তে জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার লিখেছেন "আসেন অধ্যাপক শহীদুল্লা ও কবি নজরুল ১৯২১ সালে।"[৫]

এইভাবে নজরুলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হৃদ্যতা জমে উঠতে লাগল। একদা রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে থাকতে বললেন। কিন্তু নজরুল তখন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মসমর্পণ করায় আর শান্তিনিকেতনে যোগ দিতে পারেননি।

নজরুল রবীন্দ্র বন্দনায় এতদূর মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন যে "অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি" বলে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখে কুৎসাকারী সাহিত্যিকদের

---

(৩) ডাঃ শহীদুল্লা

(৪) কথা সাহিত্য, নজরুল সংখ্যা ১৩৭৭ জ্যৈষ্ঠ, "আমার কৈশোর স্মৃতিতে নজরুল", লেখক নিশিকান্ত, পৃঃ ১১৬১-৬৩

(৫) রবীন্দ্রজীবনী—প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯, পৃঃ ৮৮

জবাব দিয়েছিলেন আশী বছর জন্মতিথির দিন। কবিতাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম ঃ

"চরণারবিন্দে লহ পুষ্পাঞ্জলি,
হে রবীন্দ্র, তব দীন ভক্ত এ কবির।
অশীতি-বার্ষিকী তব জনম-উৎসবে
আসিয়াছি নিবেদিতে নীরব প্রণাম।
হে কবি সম্রাট, ওগো সৃষ্টির বিস্ময়,
হয়তো হই নি আজও করুণা-বঞ্চিত!
সঞ্চিত যে আছে আজো স্মৃতির দেউলে
তব স্নেহ করুণা তোমার, মহাকবি ।
ধ্যান-শান্ত মৌন তব কাব্য-রবিলোকে
সহসা আসিনু আমি ধূমকেতু সম
রুদ্রের দুরন্ত দূত, ছিন্নহর-জটা,
কক্ষচ্যুত উপগ্রহ! বক্ষে ধরি তুমি
ললাট চুমিয়া মোর দানিলে আশিস্।
দেখেছিল যারা মোর উগ্র রূপ,
অশান্ত রোদন সেথা দেখেছিলে তুমি।
হে সুন্দর, বহ্নি দগ্ধ মোর বুকে তাই
দিয়েছিলে "বসন্তের" পুষ্পিত মালিকা।"

রবিলোকের শান্ত কাব্য যেখানে উৎসারিত হচ্ছিল, নজরুল সেখানে ধূমকেতুর মত এসে কাব্য জগতে উগ্ররূপ প্রকাশ করছিলেন শিবের ছিন্ন জটার মত দেশের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেই সময়ে বাংলার সাহিত্যিক-সমাজের সাহিত্যিকরা তাঁর উগ্ররূপ দেখে হিংসাতুর হয়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতির জন্য; কিন্তু মহাকবি যে অত্যাচারিত মানুষের কান্না নজরুলের মধ্যে শুনেছিলেন, তারই পুরস্কার স্বরূপ মহাকবি তাঁকে "বসন্ত" নাটিকাটি দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন তারই কথা বিদ্রোহী কবি বলছেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথেরই যে আরেকটা রূপ কাব্য-সাহিত্যে নজরুলের মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সেই কথা বলতে গিয়ে বললেন ঃ

"এ তুমি জানিতে হে, কবি মহাঋষি
তোমারই বিদ্যুত-ছটা আমি ধূমকেতু।
আগুনের ফুল্‌কি হ'ল ফাগুনের ফুল,
অগ্নিবীণা হলো ব্রহ্ম-কিশোরের বেণু
শিব শিরে শশীলেখা হল ধূমকেতু,
দাহ তার ঝরিল গো অশ্রু-গঙ্গা হয়ে।"

বিদ্রোহী লেখার পর ১৯৩০ সাল পর্যন্ত যে লেখা নজরুলের আগ্নেয়গিরির গলিত ধাতুর মত বেয়ে যাচ্ছিল, তার পরবর্তী লেখা ও জীবন সম্বন্ধে উক্ত ছ'টা লাইনের মধ্যে বলতে চেয়েছেন, বলতে চেয়েছেন 'তোমারই মহান সৃষ্টি-শক্তির আমি একটা শক্তিমান অংশ। সেই শক্তিমান অংশ নিয়ে তাঁর কোন অহঙ্কার নেই, সৃষ্টির আনন্দ আছে। এক শ' পনের লাইনের এই কবিতায় নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের মহান সৃজন-লীলাকে বন্দনা করেছেন।[৬]

"কিশোর রবি" কবিতায় লিখলেন ঃ

"ভুলাইলে জ্বরা, ভুলালে মৃত্যু ; অসুন্দরের ভয়
শিখালে পরম সুন্দর চির-কিশোর সে প্রেমময়।
নিত্য কিশোর আধারে তুমি অন্ধ বিবর হতে
হে অভয়-দাতা টানিয়া আনিলে দিব্য আলোর রথে।
তোমার এ রস পান করবার অধিকার পেল যারা
তারাই কিশোর ; তোমাতে দেখেছে নিত্য কিশোর তারা।"[৭]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের যে একটা গভীর অন্তরের যোগ ছিল, রবীন্দ্রনাথ যে নজরুলকে নানারূপে উৎসাহিত করেছিলেন তা নজরুল-বন্ধুদের স্মৃতিচারণ গ্রন্থাদিতে ছড়িয়ে আছে।

একদা কয়েকটি পরশ্রীকাতর সাহিত্যিক এই সম্বন্ধে একটা বিরাট ফাটল ধরাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে বিফল হয়েছিল, সে কথা জানা দরকার।

রবীন্দ্রনাথ কবি নজরুলকে জনগণকে উগ্র স্বদেশী আন্দোলনে কাব্য ও রচনা মাধ্যমে উৎসাহ সঞ্চার করার জন্য একদা বলেছিলেন, 'তুমি তরবারি দিয়ে দাড়ি চাঁচ্‌ছ'। এ কথাটায় নজরুল তখন খুবই বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর লেখা "আমার কৈফিয়ৎ" কবিতায় ক্ষোভের সঙ্গে একটা লাইনে লিখেছিলেন, "গুরু কন তুই করেছিস শুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছা"। এইটাই আবার ব্যবহার করেছেন তাঁর "বড়র পিরীতি বালির বাঁধ" নামক প্রবন্ধে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে। আবার তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর "অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি" নামক কবিতায়। এর সুর একেবারে অন্য রকম।

"যখনই কবিতা তব পড়িয়াছি আমি,
তার আস্বাদনে যেন হয়ে গেছি লয়,
রস পান করে আমি হয়ে গেছি রস,
বলিতে পারি না তাই সে রস কেমন!"

(৬) নূতন চাঁদ—প্রথম সংস্করণ ১৯৪৫, পৃষ্ঠা—৩২-৩৩
(৭) নূতন চাঁদ-প্রথম সংস্করণ ১৯৪৫, পৃষ্ঠা ৩৭

রবীন্দ্র-রস আকণ্ঠ পান করেও নজরুল তাঁর বৈশিষ্ট্যকে হারিয়ে না ফেলে স্বকীয়তায় দীপ্তিমান ছিলেন। রবীন্দ্র-রসে রসময় নজরুল তাই 'অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি'তে পুরাতন বিদ্রূপাত্মক বিষয়টাকেই ভক্তি-রস-মণ্ডিত করে বলছেন :

"মনে পড়ে ? বলেছিলে হেসে একদিন
'তরবারি দিয়ে তুমি চাঁছিতেছ দাড়ি !
যে-জ্যোতিঃ করিতে পারে জ্যোতির্ম্ময় ধরা
সে জ্যোতিরে অগ্নি করে হলে পুচ্ছ-কেতু'।
হাসিয়া কহিলে পরে, 'এই যশঃ-খ্যাতি
মাতালের নিত্য সান্ধ্য নেশার মতন।
এ মজা না পেলে মন ম্যাজ ম্যাজ করে
মধু-র ভৃঙ্গারে কেন কর মদ্যপান' ?"

এই কথাটায় যে-সময় নজরুল বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে সময় সমগ্র ভারতের, বিশেষ করে বাংলার সশস্ত্র-বিপ্লব আন্দোলনে প্রেরণা সঞ্চার করছিলেন। আর 'অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি' কবিতা যখন লিখছিলেন তখন নজরুল জীবনের পথ ঘুরে কালীকীর্তন, কীর্তন, আউল বাউল ও ভক্তিমূলক ইসলামী গান লিখছেন। অধ্যাত্ম সাধনা চিন্তায় মশগুল হয়ে আছেন। মশগুল হয়ে আছেন নূতন নূতন সুর সৃষ্টির মাধ্যমে সঙ্গীত রচনায়। তাই ঐ কয়েক লাইন লিখবার পর লিখলেন—

"যে বহ্নি-তরঙ্গ উঠেছিল মোর মাঝে
তোমার পরশে তাহা হলো চন্দ্র-জ্যোতিঃ।
হে রস-শেখর কবি, তব জন্মদিনে
আমি কয়ে যাব মোর নবজন্ম-কথা।
আনন্দসুন্দর তব মধুর পরশে
অগ্নি-গিরি গিরি-মল্লিকার ফুলে ফুলে
ছেয়ে গেছে। জুড়ায়েছে সব দাহজ্বালা।
আমার হাতের সেই খর তরবারি
হইয়াছে খরতর যমুনার বারি।"

এই সময়ে তাঁর বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জ্বালা বিলুপ্ত হয়ে সঙ্গীত সৃষ্টির খরতর যমুনার জোয়ার জেগে উঠেছে। তাই তিনি বললেন, "জুড়ায়েছে সব দাহজ্বালা"। তিনি জনগণের মুক্তি আন্দোলন থেকে অনেক দূরে সরে এসে রস-সৃষ্টির কাজে মশগুল হয়ে গেলেন। তাই লিখলেন,—

"অভিনন্দনের মদ চন্দনিত মধু
হইয়াছে, হে সুন্দর ; তব আশীর্ব্বাদে।"

নজরুল এই সময়টা রেডিও, গ্রামোফোন কোম্পানিগুলিতে নানাভাবে, নানা আঙ্গিকের, হরেক রকম সুর সৃষ্টিতে ব্যাপৃত ছিলেন। শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ নজরুলের এই অবস্থাটা দেখে গেছেন। তাই সেই আশায় 'অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি'তে লিখলেন ;

"আমি জানি মোর আগে রবি নিভিবে না,
তার আগে ঝরে যেন যাই শতদল !"

উক্ত কবিতার উপসংহারে এই দুটি লাইনে তাঁর যে কামনা ব্যক্ত করেছেন, বেশ ভাল করে সমীক্ষা করলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দীপ নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নজরুলের জীবন-দীপও কার্যত নিভে গেল।

১৯৪০ সালের ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্র-তিরোধানের দিনেই নজরুলের এই ব্যাধি প্রকাশ পায়। ঐ দিন রেডিও অফিসে নজরুল ছিলেন এবং ঐখানে বসেই "রবিহারা" নামে একটি কবিতা এবং "ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে" নামে একটি গান লেখেন! 'রবিহারা' কবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে শোকাচ্ছন্ন নজরুল আবৃত্তি করতে পারেন না, বার বার জিহ্বার অসাড়তার আক্রমণে আবৃত্তি ব্যাহত হতে থাকে। সে জন্য নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় উক্ত অসমাপ্ত আবৃত্তি রেডিওতে পাঠ করেন। নজরুল রোগ চেপে রাখেন অনেকদিন। কিন্তু ১৯৪২ সালের ৯ই জুলাই এই রোগ ভালভাবে প্রকাশ পায় রেডিও স্টেসনে। নজরুল সচল হৃদপিণ্ড নিয়েও জীবন্মৃত হয়ে গেলেন।

যদিও দুই কবির জীবন-দীপ নিভে গেল, তবুও তাদের রচনায় নিপীড়িত মানুষের জন্য যে প্রেরণা-প্রবাহ রয়ে গেল তা কাল ও কালান্তরে চির ভাস্বর হয়েই থাকবে।

অখণ্ড ভারতের কবি নজরুল

সার্থক কবি শিল্পী সাহিত্যিকদের সাধন-ফল কোন একটি যুগকে, কোন একটি সীমাকে অবলম্বন করে বিকাশ লাভ করলেও সে সেই যুগকে বা সীমাকে অতিক্রম করে দূর-কালে বেঁচে থাকবার ইঙ্গিত দেয়, শক্তিও রাখে; রস পরিবেশন করে। এক এক কবির, শিল্পীর ব্যক্তিগত এক একটি প্রকাশের পথ থাকে। আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য থাকে। কিন্তু মূলতঃ রসবস্তু সকলেরই এক। নিজের কালের ফলকে যে-সাহিত্যিক যতদূর কালের চিত্ত জয় করার ক্ষমতা রাখে সে তত সার্থক সাহিত্যিক।

কবি নজরুল এমন একজন কবি যিনি সাহিত্য-কমলকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁর জন্মক্ষণ থেকে দুঃখ-সহনশীল গ্রাম্য-মুসলমান পরিবারের মধ্যে। এক কথায় গ্রাম্য-জীবন পঙ্কে পঙ্কজের মত। পঙ্কজ যেমন রবির স্পর্শ না পেলে আনন্দে সব দলগুলি মেলে দিতে পারে না, কবি নজরুলের বাল্য-জীবনে তেমনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমুখী মনের ব্যাঞ্জনাটিও নজরুলের মগজে প্রবেশ করে বাসা বেঁধেছিল। তখন থেকেই কবি নিজের ভাবনা বিশ্বজনের ভাবনার সঙ্গে এক করে দেখার অভ্যাস করেছিলেন।

পরবর্তীকালে নজরুল যখন বিদ্রোহী লিখে তাঁর মনকে স্থুল-সূক্ষ্ম, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, জড়-চেতনা, জীবন্মৃত প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী শক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশের সঙ্গে অণু-পরমাণু সকলের মধ্যে নিজের আত্মপরিচয় ব্যক্ত করলেন; এই অভিব্যক্তির ব্যাপকতায় সকলে যেমন বিস্মিত হয়েছিলেন তেমনি কবির এক নতুন আঙ্গিকের পরিচয় পেয়ে কবিকে সংবর্ধিতও করেছেন। এই সংবর্ধনা যাঁরা করেছেন তাঁরা কেবল হিন্দু নয়; মুসলমান বা খ্রীশ্চানও নয়। এই গুণগ্রাহী জনার্দনগণ 'মানুষ'। এক দিক দিয়ে তাঁরা সর্বভারতীয় মানুষ আর এক দিক দিয়ে সামগ্রিক মানবের মনুষ্যত্ববোধ-প্রিয় বিশ্বের জন্য তিনি। এই উদার 'জনে'রা জনগণের কবির সর্বভারতীয় ও বিশ্বজনের কবিকে চিনেছিলেন। এই ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ, বিনয় সরকার, বিপিন পাল ও আরো অনেকে। অজ্ঞতার জন্য যাঁরা বিশ্বের ভাঁওতাকে বুঝতে পারলেন না, কবি তাঁদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন—

"আমরা তো জানি স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্ত্তাকু এনেছি খাস।" হিন্দু-মুসলমান চোখ বুঁজে রইল।

যাঁরা মরলেন ইংরেজদের হাতে, জেলে ও জেলের বাইরে নরক যন্ত্রণায় ভুগলেন ও ফাঁসি গেলেন তাঁদের নাম রইল আগুনের অক্ষরে ছাপা। স্বাধীনতা এল না, কিন্তু এই সুযোগে নিচু থেকে ঠাঁই হল উঁচুতে স্বার্থান্বেষী ছদ্মবেশী নেতাদের। হিন্দু মুসলমান খ্রীশ্চান জনগণ যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেল।

যখন দুর্জন কার্জন বাংলার অঙ্গচ্ছেদ করতে চাইল রবীন্দ্রনাথ তখন ছেলেদের ডেকে বললো—

"আগে চল আগে চল ভাই,
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।"

বললেন কেউ যদি সঙ্গে না আসে তবে তুই 'একা চল'—যদি আঁধার আসে নেমে, যদি তোকে দেখে ভয়ে কেউ দুয়ার দেয় তবুও তুই একলা চল। যদি সামনে ঘন অন্ধকার রাত্রি ভ্রূকুটি দিয়ে তোকে পথ চলায় দেয় বাধা, তবে বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে তুই একলা চল। সর্বসাধারণের সাথে পা মিলিয়ে চলাই তোর ধর্ম। নজরুল বললেন :

"সকলের সাথে পথে চলি যাবে পায়ে লাগিয়াছে ধূলা।"

রবীন্দ্রনাথ চলার ব্রত গ্রহণের জন্য বললেন :

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলরে!
যদি আলো না ধরে
(ওরে ওরে ও অভাগা!)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা চলরে॥
একলা চলরে॥"

এই সময় রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে বিশেষ করে তরুণদের "চরৈবেতি"র মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ দুর্জন কার্জনের কার্যকলাপের বাধা স্বরূপ দাঁড়িয়ে বাংলার মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তরুণদের সাহস ও প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন। বাংলার ছেলেরা আপন প্রাণ বিসর্জন দিয়ে নির্যাতন সয়ে সে মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেও ছিল। পরবর্তীকালের আন্দোলনে নজরুল এলেন ধূমকেতুর পুচ্ছ-চাবুক নিয়ে। তাঁর সুবিধা ছিল তিনি মুসলমান সন্তান। ভারতবর্ষে হিন্দুদের মুসলমানের ভাল মন্দের আলোচনা করার সাহস ছিল না, কিন্তু নজরুল তাঁর দুধারি জুলফিকারা তরবারি নিয়ে হিন্দু মুসলমানের প্রেম-শূন্য সংস্কারকে যুক্তির খড়্গে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে শুরু করলেন। মোল্লাদের জ্বালায় সাধারণ মুসলমানরা নজরুল থেকে দূরেই রইল সরে; হিন্দুরা

ডিরোজিওর সংস্কারমুক্ত ইয়ং বেঙ্গল শিষ্যদের প্রেরণায় আগে থেকেই পুরুতদের আওতার বাইরে অনেকটা সচেতন মন নিয়ে সরে এসে ভাবতে শিখেছিল কিছু সংখ্যক। তাই নজরুলের 'জাতের বজ্জাতিকে' চোখে চোখে তারিফ করতে লাগল বটে, কিন্তু কাজে ততটা এগিয়ে এল না। এগিয়ে এল তারা যাদের বুদ্ধিমান, বিষয়ী জ্ঞানীরা "বিপথগামী" সন্ত্রাসবাদী বলে নজরে দেখতেন। সেইসব মৃত্যুঞ্জয়ী ছেলেরা, এসব ছেলেদের মধ্যে বহু মুসলমান ছেলেরাও ছিলেন, হিন্দুও ছিলেন ; কিন্তু তাঁরা আদর্শে ছিলেন ভারতবাসী নজরুলের কথায় "মানুষ", সন্তান মোর মার।"

বুদ্ধিমান বিষয়ী ও জ্ঞানী নেতারা এই সব কাজের ফাঁকে কখনও "স্বরাজ" কখনও "ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস", কখনও "স্বাধীনতা" প্রস্তাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের আসর মাতিয়ে রাখছিলেন। আর নিজেদের নিরাপদে রাখবার জন্য বিপ্লবীদের বিপথগামা বলে নিজেদের ভালমানসি জাহির করছিলেন ইংরেজদের আম-দরবারে। সেই জন্য কবি নজরুল "ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের" ওপরে ব্যঙ্গগীতি লিখলেন। "ডোমনী"র গান ঃ

"বগল বাজা দুলিয়ে মাজা
বসে কেন অমনি রে!
ছেঁড়া ঢোলে লাগাও চাটি
মা হবেন আজ ডোম্‌নী রে।
ধুচনি মাথায় হাতে ধামা
দেবে মোদের রসিক রাজ—
ডোমের জাতি ভেবে—দিলেন
ডোমনী করে মাতায় আজ।
বন্দিনী মা ছিলেন আহা,
আজ দিয়েছে মুক্তিরে!
বাজাও ধামা মামার নামে,
রক্ত ঢাল বুক চিরে।
এবার থেকে ধামা ধারী বল-দ্‌দল
ভাবনা কি?
দিব্য খাবে ডুবিয়ে নুলো
পাত্‌নী নাদায় জার নাথি'
"মাভৈঃ! এবার স্বাধীন হনু"!
যাই বলেছি,—পৃষ্ঠে!
পড়ল মনে পীঠস্থান এ
ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস রে!"

এর পরই স্বরাজ ; স্বরাজের পরই স্বাধীনতা, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব চলতে

থাকে। কবি নজরুল এ-সব কয়টা তরঙ্গের ওপর দিয়েই তাঁর জীবন-তুরঙ্গ ছুটিয়ে গেছেন যেমন ঃ

"তরঙ্গে দুলে আজি নাঁইয়া
রণ তুরঙ্গ-ছন্দে।"

রণ তুরঙ্গের মতই ছিল তার উদ্দম উদ্দামের গতি। কিন্তু স্বাধীনতা এল না। যে স্বাধীনতায় কবি চেয়েছিলেন দেশেব প্রতিটি মানুষ সুখে বাস করবে, জীবন-কুসুম প্রস্ফুটিত হয়ে দেশমাতার পূজার অধিকারী হবে। জগতের মাঝে উচ্চ শিরে ও সম্মানে সম্মানিত হবে। দু'চোখ ভরে নেবে জ্ঞানেব আলো। বুক ভরে নেবে উদার ভ্রাতৃত্বের আনন্দ-শ্বাস। আজ দেশ স্বাধীন, কিন্তু নজরুলের ও ক্ষুদিরামের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আজও পায়নি দেশের জনসাধাবণ। অর্থাৎ এক কথায় বিশ্বের অজ্ঞতা সংরক্ষণ-কারীদের জন্ম-শত্রু ছিলেন কবি নজরুল। বিপিনচন্দ্র পাল নজরুল সম্বন্ধে ১৩৩৫ সালে মানিকগঞ্জের সাহিত্য সভার ভাষণের একস্থানে বলেছেন—"কাজী নজরুল ইসলাম, তাঁহার কবিতাব সংগে পরিচিত হইয়া দেখিলাম—এতো কম নয়। এ খাঁটি মাটি হইতে উঠিয়াছে। আগেকার কবি যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা দোতলা প্রাসাদে বসিয়া কবিতা লিখিতেন। নজরুল ইসলাম কোথায় জন্মিয়াছে জানি না, কিন্তু তাঁহার কবিতায় গ্রামের ছন্দ, মাটির গন্ধ পাই। দেশের যে নূতন ভাব জন্মিয়াছে তাহার সুব পাই। তাহাতে পালিশ বেশী নাই; আছে লাঙ্গলের গান। কৃষকের গান। রবীন্দ্রনাথের পর নজরুল ইসলাম নূতন যুগেব কবি।"[১]

এই নূতন যুগের কবি নজরুল মানুষের যে জয়গান গেয়েছেন তার প্রকাশ-ক্ষেত্র বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ হলেও বিশ্বের মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ও ভবিষ্যৎ কালের অত্যাচারিত মানুষের স্বাধীনতার গানই তিনি গেয়েছেন। এক গণ্ডি থেকে আর এক বিস্তৃত ভূমিতে সীমা অতিক্রম করে তাঁর ভাব যে-কোন দেশের মানুষ যে-কোন কালে নজরুল-কাব্য গান থেকে মানুষের স্বাধীন সত্তার নির্দেশ পাবে। আচার্য বিনয় সরকারও নজরুল সম্বন্ধে বলেছেন—"সহজ সরল, খোলা চোখে মানুষের হৃদয় লইয়া *মানুষের পক্ষে চড়া গলায় কথা কহিয়াছেন কাজী নজরুল ইসলাম* ইহাই তাহার কাব্যের চরম গৌরব। *ভাষা, ধর্ম, আচার, আচরণ কোন কিছুর বৈষম্যই কবির অন্তর সাম্যকে বিভক্ত বা দ্বিধাযুক্ত করিতে পারে নাই।* নজরুল যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন, গভীর আবেগের উচ্ছলতায় তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।"[২]

আচার্য বিনয় সরকার "মানুষের পক্ষে চড়া গলায় কথা কহিয়াছেন কাজী নজরুল ইসলাম" উদ্ধৃতির এইটুকু ভালভাবে অনুধাবন করিলে বুঝা

(১) বিপিন চন্দ্রের বক্তৃতাবলী।
(২) বিনয় সরকারের বৈঠকে।

যায় নজরুল তাঁহার দার্শনিক ও কবি মন দিয়ে 'মানুষ'কে দেখেছেন ঈশ্বরের প্রতীক রূপে। তার দুর্গতি যা' দেশে বসে দেখেছেন, দরিদ্র জীবনে ভুগেছেন তাকে দিয়েই দেশের পটভূমিকায় বিশ্বের মানুষের মুক্তির এবং স্বাধীনতার গান গেয়েছেন! এই প্রয়াসের মধ্যে নজরুলের মার্কসবাদ সুস্পষ্ট হয়েছে বিশ্বের মানব প্রেমিক রূপে।

দেশের পটভূমিকার নায়করূপে নজরুলের চোখের সামনে ছিল দুইটি পরস্পর বিরোধী দেশমাতৃকার সন্তান, হিন্দু ও মুসলমান। এদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে পীডন করছে ইংরাজ ও পাদরি; পুরোহিত ও মোল্লা; এক কথায় ধর্মযাজক সম্প্রদায়। এরাই ধর্মের নামে অজ্ঞতার আফিম খাইয়ে হিন্দু মুসলমানকে বিভক্ত করে রেখেছে। হিন্দু মুসলমানের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে আর এক নায়ক এসে দাঁড়িয়ে বললেন—আফিম ছাড়, চল খোলা চোখে আমরা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করি। এই স্পর্শের খেলায় তরুণরা দিল প্রাণ; এলো দেশের স্বাধীনতা, রবীন্দ্রনাথের বাঙলা, নজরুলেব বাঙলা, ভগৎ সিং, শহীদ আসফাক উল্লা, বরকত উল্লার পাঞ্জাব হল খণ্ডিত। বাঙালী হিন্দু মুসলমানের কাছে বাংলা ও পাঞ্জাবের পূর্ব ও পশ্চিম আজ বিদেশ। নজরুল বত্রিশ বৎসর পূর্বে লিখেছিলেন ঃ

"তোমার দত্ত হস্তেরে বাঁধে কার নিপীড়ণ-চেড়ী ?
আমার স্বাধীন বিচরণ রোধে কার আইনের বেড়ী ?'

সেই কবির দেশেই আজ হিন্দু মুসলমান বিদেশী রূপে ছাড়পত্র নিয়ে সারাজীবন বাস করছে। অথচ এই খণ্ডিত ভারতের দুই সরকার কবি নজরুলকে তাঁদের কবি বলে দাবি জানাচ্ছেন। তাঁদের প্রচারের মধ্যে কবি নজরুলের সত্যকারের যে স্বাধীন-সত্তা, মানুষের জন্মগত অধিকারের দীপ্ত বাণী; বাণী নয় বজ্র—আওয়াজের ধমক, তাঁকে তাঁরা দেখছেন না। দেখছেন নিশ্চয়ই, নিজেদের স্বার্থ অটুট করার জন্য বিপরীত প্রকারে দেশের অজ্ঞতা জিইয়ে রাখছেন। ভারত ও পাকিস্তানে সরকারি দপ্তর থেকে কবিকে যে "আমাদের কবি" বলে দাবি করছেন, এ দাবি কি তাঁদের মানায়? নজরুল চিরকাল তাঁর নানা লেখনীর মাধ্যমে মুসলমানদের ও হিন্দুদের জানাতে চেয়েছেন—"আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে তাঁকে ক্ষুধা-শীর্ণ মূর্ত্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকারে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ করে দেখার স্তব ও স্তুতি।"

"কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন—কাফের। আমি বলি ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যাণ্ডশেক করবার চেষ্টা করেছি। গালাগালিকে গলাগলিতে

পরিণত করার চেষ্টা করেছি। *সে হাতে হাত মেলানো যদি হাতাহাতির চেয়ে অশোভন হয়ে থাকে, তা হলে ওরা আপনিই আলাদা হয়ে যাবে। কেন না, একজনের হাতে আছে লাঠি আর একজনের আস্তিনে আছে ছুরি।*'[৩] এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে চল্লিশ বছর আগে নজরুল যে "আস্তিনের তলায় ছুরি" ও "হাতের লাঠি" ইঙ্গিত করেছেন এবং তাতে যে তারা "আলাদা হয়ে যাবে" কথাটা বললেন, সেইটাই হয়ে গেল ১৯৪৭ সালে। নেতৃবৃন্দেরা অজ্ঞ সরল হিন্দু মুসলমান জনসাধারণকে 'আজাদী' ও 'মুক্তি'র ভাঁওতা দিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের ভক্ত করে দিলে। যে কবি 'মিলনের' জন্য চেষ্টা করলেন, তাকে বিভক্ত বাঙালী হয়ে আমরা আমাদের কবি বলি কোন রুচিতে ?

দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার মূল উৎপাটিত করে খাঁটি রাজনীতি দিয়ে সচেতন হিন্দু মুসলমানের দেশরূপে ভারতকে কবি দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই দেশকে উপর তলার কয়েকটি হিন্দু মুসলমান উচ্চস্তবের নেতারা দলগত স্বার্থের জন্য খণ্ড করে ভাগ করে নিজেদের দেশকে বিদেশে পরিণত কবে কি কারণে কবি নজরুলকে নিজেদের কবি বলে প্রচার করেন আর তথাকথিত নজরুল ভক্তরা এটাকে মেনে নিয়ে তালে তালে প্রচার করে কবির আত্মপরিচয়কে ধামাচাপা দিয়ে চলেছেন ? তারা কি ভুলে গেছেন যে কবি নজরুল "নবযুগ" পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখেছিলেন :

"আমি মুসলিমকে সংঘবদ্ধ করার জন্য, তাদের জড়ত্ব, আলস্য, কর্ম্ম-বিমুখতা, ক্লৈব্য, অবিশ্বাস দূর করার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছি। বাংলার মুসলমানকে শির উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য—যে শির এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন সম্প্রদায়ের কাছেও নত হয়নি—আল্লাহ্ যতটুকু শক্তি দিয়েছেন—তাই দিয়ে বলেছি, লিখেছি ও নিজের জীবন দিয়েও তার সাধনা করেছি। আমার কাব্য শক্তিকে, তথাকথিত 'খর্ব্ব' করেও গ্রামোফোন রেকর্ডে শত শত ইসলামী গান রেকর্ড করে নিরক্ষর তিন কোটি মুসলমানের মনের দুর্ব্বলতাকে অটুট শক্তি দেবার চেষ্টা করেছি। আমি এর প্রতিদানে সমাজের[৪] কাছে জাতির কাছে কিছুই চাই নি। এ আমার আল্লাহ্‌র হুকুম, আমি তার হুকুম পালন করেছি মাত্র।

আমি আজ জিজ্ঞাসা করি আমি লীগের মেম্বার নই বলে কি কোন লীগ কর্ম্মীর নেতার চেয়ে কম কাজ করেছি ? আজও "নবযুগে" এসেছি শুধু মুসলমানকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে তাদের প্রবল করে তুলতে তাদের আবার "মার্টার"—শহীদী সেনা করতে। বাঙলার মুসলমান বাঙলার অর্দ্ধেক অঙ্গ।"[৫] যে কারণে হিন্দুদের ডেকেছিলেন, সেই কারণে মুসলমানদেরও

---

(৩) ১৯২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর এলবার্ট হলে নজরুল সংবর্ধনায় কবির অভিভাষণ।

(৪) মুসলমান সমাজ।

(৫) নবযুগের সম্পাদকীয়—"আমার লীগ কংগ্রেস" দ্রষ্টব্য।

ডেকেছিলেন কিন্তু কেউ ঠিকভাবে সাড়া দেয়নি। বরং কবিকে সন্দেহ করেছেন, কাফেরী দলের বলে বিদ্রূপও করেছেন।

আর আজ সেইখানেই খণ্ডিত ভারতের দুই পার থেকে "আমাদের কবি" বলে নজরুলকে নিয়ে টানাটানি চলছে। ভারতের প্রচার বিভাগে ও পাকিস্তানের প্রচার বিভাগে পাল্লা দিয়ে নজরুলকে তাদের সম্পদ বলে দাবি জানাচ্ছেন। হিন্দু মুসলমানের সম্পদ নিশ্চয়ই, কিন্তু ভাঙিয়ে নিজেদের নজরুল সাহিত্য, কাব্য, গান, প্রভৃতির কাজ হাসিল করার জন্য নয়। অধিকারী তারাই যাঁরা মানবতার প্রতিষ্ঠা করতে চান শুধু মানুষের মধ্যে, কোন কাজ হাসিলের মাধ্যমে নয়—তাঁরাই বলতে পারেন কবি তাঁদের। তাঁরা দুই বাংলার হোন, ভারতের হোন বা জগতের হোন। নজরুল শোষিত নিপীড়িত মানুষের।

আজ খণ্ডিত ভারতের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের নজরুল সাহিত্য সাধনার দিন এসেছে; নজরুলের প্রেমসত্ত্বাকে জানবার জন্য; হিন্দু মুসলমান মানুষের পরস্পরের নজরুল মর্মবাদ মূর্ত করবার জন্য। স্বাধীনতা ভোগের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার স্থানও নেই, প্রশ্নও নেই, আছে মানুষের বেঁচে থাকার সকলের সঙ্গে সকলে সুন্দর মন নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলার গতি। নজরুল সাহিত্য তাই দিতে পারে।

নজরুল সাহিত্যের স্থান যে সুদূর পশ্চিমে ও আমাদের বঙ্গের বাহিরেও আপনার সাহিত্য হিসাবে গ্রহণ করেছে সে তথ্যও জানা দরকার। বিংশ শতাব্দীর ছয় দশকে নজরুল একদা নিশাবসানের সংগে সংগে "বিদ্রোহী" কবিতা লিখে বাংলা ও বাংলার বাহিরে বিদ্যুৎ বিকীরণের ন্যায় খ্যাতিমান হয়েছিলেন। বঙ্গমাতার মরদ-বাচ্ছা বিনয় সরকার এগিয়ে এলেন নজরুলের কাছে। তাঁর মতন পণ্ডিত ও চুলচেরা বিশ্লেষকও মুগ্ধ হয়েছিলেন। শ্রীসরকার জার্মানী ও ইংরাজী ভাষায় 'বিদ্রোহী' কবিতা অনুবাদ করে জার্মান ও ইংল্যাণ্ডের প্রত্রিকায় প্রকাশ করেন। হিন্দীতে কবির রচনা কেউ অনুবাদ করেছিলেন কিনা জানি না। তবে আন্দোলনের মধ্যে যে সকল বিপ্লবী বা গান্ধীপন্থী কর্মীরা বাংলায় এসে যোগ দিয়েছিলেন তারা বহু বৈপ্লবিক সংগীতের সুর, বাণী বহন করে নিয়ে প্রদেশে প্রদেশে সেই যুগে (৪২-এর আন্দোলন পর্যন্ত) ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই তখনকার দিনের নিষ্ঠাবান কর্মীরা তাঁর হুগলীর বাড়িতে এসেছেন, আমরা দেখেছি।

তার পর বহুদিন চলে গেছে, নজরুল তার স্বপথ থেকে সরে গিয়ে হলেন ভক্তিমূলক গীতিকার। রেকর্ড ও রেডিও, চলচ্চিত্র, নাট্যমঞ্চের সুর ও গীত পরিচালক। প্রিয়তম বুলবুলের মৃত্যুতে হলেন অধীর, স্ত্রীর অসুস্থতায় নিজের মনভঙ্গে ধীরে ধীরে হলেন সমাহিত। এই অবস্থা যখন তাঁর নিরাময়ের জন্য তাঁকে পাঠান হল রাঁচির মনোবিকলন হাসপাতালে। সেখানে যখন নিয়ে যাওয়া হয় সে সম্বন্ধে গত ১৯৬৫ সালের একটি সংখ্যায় যে পত্রখানি প্রকাশিত হয়েছিল, নিচে তার উদ্ধৃতি দিলাম।

নজরুল কি শুধু বাংলার কবি

১৯৬৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর—'যুগান্তরে' মল্লিনাথ লিখিত 'অন্যতম' কলামে কাজী নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে লেখাটি সকল পাঠককেই আকর্ষণ করেছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। কেবল মল্লিনাথের এই লেখায় নয় বাংলাদেশের সব সংবাদপত্রেই এবং বাঙ্গালী সব লেখকদের লেখাতে নজরুলকে 'বাংলার কবি', 'বিদ্রোহী বাংলার কবি' ইত্যাদি বলে লেখা হয়। আমাদের মনে হয় এতে নজরুলকে বাংলাদেশের সীমায় আবদ্ধ দেখতে চান তারা, যা মোটেই সত্য নয়। অবাঙ্গালী মানুষেরাও নজরুলকে কতখানি ভালবাসেন বাংলা দেশে থেকে তা হয়তো জানা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথকে যেমন একদিকে অবাঙ্গালীরা শ্রদ্ধা করেন তেমনি তাঁরা নজরুলকেও ভালবাসেন এবং সেটা বাংলাভাষীদের চেয়ে কম নয়। তাই নজরুল কখনও বাঙ্গালীর কবি হতে পারেন না, তিনি মানুষের কবি, নিপীড়িত মানুষের কবি। ১৯৫০-৫১ সালের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করি। রাঁচিতে তৎকালীন বিহারের শিল্প মন্ত্রী শ্রীমহেশ-প্রসাদ সিংহের বাংলোয় এক সকালে বসে আছি। সেখানে আসছিলেন বিহার রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি শ্রীপ্রজাপতি মিশ্র। হঠাৎ সেখানে শ্রীমথুরা প্রসাদ এম-পি এসে উপস্থিত হতেই সকলে তাঁর সাথে গিয়ে মোটরে উঠলেন। তাঁদের আহ্বানে আমিও গেলাম। গাড়িটি রাঁচি মানসিক হাসপাতালে গিয়ে পোঁছলে আমার জীবনে প্রথম নজরুল দর্শন সম্ভব হল মথুরাবাবুর জন্যই। এঁরা নজরুলের জন্য হাসপাতালে কি রকম নির্দেশ—অনুরোধ দিয়েছেন তা দেখছিলাম এবার গত মে মাসে হাজারিবাগে রাজনৈতিক সম্মেলনে যখন মথুরাবাবু এসেছিলেন, ১৯৫০-৫১ সালের সেই ঘটনা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। বহু অবাঙ্গালীকে দেখেছি নজরুল কণ্ঠস্থ, কবির গানের প্রচুর রেকর্ড তাদের ঘরে। নজরুল আবৃত্তি করতে তাদের রোমাঞ্চ হতে দেখেছি। বাংলা দেশের সংবাদপত্রের এবং লেখকদের এ ভুল সংশোধন করা উচিৎ বলে আমরা মনে করি। নচেৎ নজরুলকে তাঁরা কবির প্রাপ্য আসন থেকে কেবল বঞ্চিতই করবেন না, নজরুল অনুরাগী অবাঙ্গালীদের মনে বেদনার সৃষ্টি করবেন। নজরুল কি কেবল বাঙ্গালীর সমস্যা নিয়ে বাঙ্গালীর শৃঙ্খল নিয়েই গান গেঁথেছিলেন, যে তাঁকে 'বাঙ্গালীর কবি' বলে ছোট করা হবে? তিনি মানুষের গান গেয়েছিলেন, মানুষের বন্ধন মুক্তির গান, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন বিদ্রোহের গান গেয়েছেন, সেখানে বাংলা বিহার উড়িষ্যার সীমারেখা বা মানচিত্র একটা ফালতু বস্তু। তিনি মানুষের কবি, শুধু বাঙালীর নয়। আশাকরি বাংলাদেশের লেখক মহাশয়েরা ও সংবাদপত্রগুলো এদিকে দৃষ্টি রেখেই নজরুলের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনে ভবিষ্যতে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করবেন।

শ্রীগৌরচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সম্পাদক,
জেলা সাংবাদিক সংঘ, হাজারিবাগ।

অতঃপর সোভিয়েট রাশিয়ার সাংস্কৃতিক বিভাগ কবির এই অনুবাদ করছেন, তাঁরা এই কবিতায় মানুষের পীড়ন মুক্তির প্রেরণা পেয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁরা স্বীকারও করেছেন। জার্মানি সংগীতের মুলুক, সেখানে নজরুলের বিভিন্ন সুরের সংগীতের আলোচনা করে তাঁকে তাঁরা স্বাগতম জানিয়েছেন। শুধু তাই নয় তাঁর ভারতীয় মার্গ-সংগীতের বহুসুরের রেকর্ড তাঁরা সংগ্রহ করেছেন, আরও নজরুল যে সব সুর সৃষ্টি করেছেন সেইসব রেকর্ডও, রেকর্ড না থাকলে স্বরলিপি তাঁরা সংগ্রহ করেছেন। তাই বলি নজরুল অখণ্ড বাংলার, ভারতের ও বিশ্বের কবি। নিপীড়িত মানুষ মাত্রেরই কবি, তাই কবির ভাষায় শেষ করি ঃ

"সকলের সাথে পথে চলি যাব পায়ে লাগিয়াছে ধূলি।"

শতদলের কবি

নজরুল কোন দলের সভ্য না থাকলেও তাঁর রক্তাপ্লুত লেখা সমানে ঝর্ণার গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। কবি নজরুল বলতেন যে, "কবি কোন দলের নয়—কবি হল শতদলের।" এর থেকে বোঝা যায় নিপীড়িত মানুষের মুক্তি যে কোন দলই আনুক না কেন, কবিতো গাইবে দলের জন্য নয়, শতদলের অর্থাৎ যে কোন মানুষের মুক্তির জন্যে। মুক্তি (স্বাধীনতা) মানুষের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার দিতে হবে দেশের সমস্ত মানুষকে এই মনোভাবের উপর এই সময়ে যা লিখতেন, তাই হয়ে যেত সাম্যবাদের পক্ষে রচনা। তৎকালীন চৈনিক নেতা চিয়াং কাইসেক ১৯৪০ সালে আসেন কলকাতায়। চীন তখন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত। সানইয়াত সেনের আন্দোলনের নেতা ছিলেন চিয়াং। কিন্তু কবি নজরুল সানইয়াত সেনকে যে চোখে দেখতেন, চিয়াংকে সে চোখে দেখতে পারেননি। বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি নজরুলকে চিয়াং-এর আগমন উপলক্ষ্যে একটি গান লিখে দিতে বললেন। কিন্তু নজরুলের মন এতে সায় দিল না। তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতাদেব চেয়েও কবি অনেকখানি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন। কারণ পরবর্তীকালে চিয়াং-এর যে পরিবর্তন হল, তাতো সবাই জানেন। তাই কবি চীনের সংগ্রামীদের উপলক্ষ্য করে আর চীন-ভারত সংস্কৃতির উপর এই গানটি লিখলেন।

"চীন ও ভারত মিলেছি আবার
শতকোটি লোক।
চীন ভারতের জয় হোক,
ঐক্যের জয় হোক
সাম্যের জয় হোক।
ধরার অর্দ্ধ নরনারী মোরা
রহি এই দুই দেশে,
কেন আমাদের এত দুর্ভোগ
নিত্য দৈন্য ক্লেশে,
সহিব না আর অবিচার
খুলিয়াছে আজি চোখ,
চীন ভারতের জয় হোক,
ঐক্যের জয় হোক,
সাম্যের জয় হোক।"

প্রাচীন চীনের প্রাচীর ও মহাভারতের হিমালয়
(আজ) এই কথা যেন কয়—

সভ্যতা মোরা শিখায়েছি পৃথিবীরে
ইহা কি সত্যি নয় ?
হইব সর্ব্বজয়ী আমরাই সর্ব্বহারার দল,
সুন্দর হবে, শান্তি লভিবে, নিপীড়িতা ধরাতল।
আমরা আনিব অভেদ ধর্ম্ম নব বেদগাথা শ্লোক !!
চীন ভারতের জয় হোক,
ঐক্যের জয় হোক,
সাম্যের জয় হোক।[১]

মানবতার পূজারী নজরুল। তিনি যে বিভিন্ন সময়ে নানা দলের আন্দোলনের অগ্রগতির জন্য গীত রচনা করেছিলেন তার কয়েকটি উদাহরণ দিলে নজরুলের দেশপ্রেম ও উদার মনের পরিচয় পাওয়া যাবে। কুমিল্লায় থাকাকালে একটি রাজনৈতিক মিছিল পরিচালনার জন্য এই গানটি লেখেন।

যত্রতত্র এই গানটি গেয়ে বেড়িয়েছেন।

কী তার আবেগ আর কী তার আবেদন !—

(১)

"ভিক্ষা দাও ! ভিক্ষা দাও !
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী ;
সন্তান দ্বারে উপবাসী।
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও।
জাগো গো, জাগোগো,
তন্দ্রা অলস জাগো গো,
জাগো রে জাগো রে !!

(২)

মুক্ত করিতে বন্দিনী মা'য়
কোটি বীর সুত ঐ হের ধায়
মৃত্যু-তোরণ-দ্বার-পানে—
কার টানে ?
দ্বার খোলো দ্বার খোলো।
একবার ভুলে ফিরিয়া চাও।

(১) এই গানটি হিজ মাষ্টার্স ভয়েস কোম্পানি রেকর্ড করেছিল। সুগায়ক শ্রীজগন্ময় মিত্র গানটি গেয়েছিলেন।

(৩)

জননী আমার ফিরিয়া চাও।
ভাইরা আমার ফিরিয়া চাও!
চাই মানবতা, তাই দ্বারে
কর হানি মাগো বারে বারে—
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও!
পুরুষ-সিংহ জাগো রে!
সত্য-মানব জাগো রে!
বাধা-বন্ধন ভয়-হারা হও
সত্য-মুক্তি-মন্ত্র গাও।" ইত্যাদি
(ভাঙার গান)

বিভিন্ন দলের দলগত মনোভাব দেখে এবং তিনি কোন্ দলের লোক এই নিয়ে কানাঘুষা শুনে কবি 'আমার কৈফিয়ৎ' বলে একটি কবিতা লিখলেন ১৩৩২ সালের ১লা আশ্বিন।

"আন্‌কোরা যত নন্ ভায়োলেন্ট্ নন্-কো'র দলও নন্ খুশী;
'ভায়োলেন্সের ভায়োলিন্' নাকি আমি, বিপ্লবী-মন্ তুষী।
'এটা অহিংস', বিপ্লবী ভাবে;
নয় চরকার গান কেন গাবে?'
গোঁড়া-রাম ভাবে নাস্তিক আমি, পাতি-রাম ভাবে কন্‌ফুসি।
স্বরাজীরা ভাবে না-রাজী, না-রাজীরা ভাবে তাদের অঙ্কুশি।
নর ভাবে, আমি বড় নারী-ঘেঁষা! নারী ভাবে, নারী-বিদ্বেষী।
'বিলেত ফেরনি?' "প্রবাসী বন্ধু" কন, 'এই তব বিদ্যে, ছিঃ!"

দেশের বিভিন্ন দল, সমাজের বিভিন্ন স্তর কবি নজরুলকে এই ভাবে নিজের নিজের কুসংস্কারের নজর দিয়ে ছোট গণ্ডীর মধ্যে দেখছিলেন। কবি তাই এই 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় বললেন—দল নির্বিশেষে দেশের যে স্বাধীনতার চেষ্টা হচ্ছে, তাদের চেষ্টাকে সার্থক করে তুলবার জন্য, প্রাণবান করে তুলবার জন্য আমায় যখনই ডাকছে তখনই সেখানে আমি উপস্থিত হয়ে আমার গান দিয়ে, কবিতা, প্রবন্ধ দিয়ে এই মহান প্রচেষ্টার আগে দাঁড়াচ্ছি, কিন্তু হায়—

"বোঝে না'ক যে সে চারণের বেশে ফেরে দেশে দেশে গান গেয়ে;
গান শুনে সবে ভাবে, ভাবনা কি? দিন যাবে এবে পান খেয়ে।"

গান শুনে শ্রোতার দল যত বাহবা দিচ্ছেন, কিন্তু কাজ এক কোঁটাও করছেন না—অথচ তথাকথিত কংগ্রেস আন্দোলনকারীরা 'স্বরাজ' দেশের

ঘাড়ে চাপাবেই, তার জন্য তুলছে চাঁদা, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতার ঝড় তুলছে, গান্ধীজী নির্দিষ্ট দিনও ঠিক করে দিচ্ছেন 'স্বরাজ' লাভের। তাই কবি লিখলেন -

"রবে না'ক ম্যালেরিয়া, মহামারী ;
স্বরাজ আসিছে চ'ড়ে জুড়ীগাড়ী,
চাঁদা চাই, তারা ক্ষুধার অন্ন এনে দেয়, কাঁদে ছেলেমেয়ে ;
মাতা কয় ওরে চুপ হতভাগা, স্বরাজ আসে যে, দেখ্ চেয়ে।"

ক্ষুধার জ্বালায় কচি শিশুরা আর থাকতে পারে না, বিদ্রোহী কবির কানে যেন এই ধোঁকা দেওয়ার ফল দেশব্যাপি আর্তনাদের আওয়াজ তুলছে, তাই কবি বললেন—

"ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ ; চায় দুটো ভাত একটু নুন।
বেলা বয়ে যায় খায়নি ক'বাছা, কচি পেটে তা'র জ্বলে আগুন।
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায় ;
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়!
কেঁদে বলি 'ওগো ভগবান. তুমি আজিও আছ কি? কালি ও চুণ
কেন ওঠে নাক তাহাদের গালে, যারা খায়, এই শিশুর খুন'।"

এমনি করে রাজনৈতিক ধোঁকাবাজদের স্বরূপ তুলে ধরেছেন, তাদের সর্বনাশের কামনা করেছেন। দেশবাসী কবির গান, কবিতা উপভোগ করেছেন, কিন্তু সে রকম বলিষ্ঠ চেষ্টা বর্তমানকাল পর্যন্তও কেউ করেননি।

কবি এই সময় থাকেন কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কের "গ্রেস-কটেজে"। এরই পাশে রয়েছে নিম্নশ্রেণী হিন্দু, মুসলমান ও দেশী ক্রিশ্চানদের একটা বস্তি। কবি দেখেছেন স্বরাজ আন্দোলনে এদের কত উৎসাহ। কতই বা এদের রোজগার! গাড়োয়ানী, রাজমজুর, ক্ষেতের মনিষগিরি,—এই তো এদের কাজ। ভদ্রলোকেরা হাত তুলে কতই বা মজুরি দেয়। তারই মধ্যে থেকে এরা জোগান দেয় স্বরাজের চাঁদা। চাঁদা আদায় করেন যত সব শ্রদ্ধেয় গণ-আন্দোলনকারী, বিপ্লবী এবং কংগ্রেসী নেতৃস্থানীয় কর্মীরা।[৩]

গান্ধীজী দিনের পর দিন স্বরাজ লাভের নির্দিষ্ট দিন ধার্য করে দেশের সাধারণের কাছে পৌঁছে দেন। "দিন" চলে যায় স্বরাজ আর আসে না। কবি নজরুল 'গ্রেস কটেজ" সংলগ্ন বস্তির লোকেদের মধ্যে যা অবস্থা দেখেছেন তাই দেখে লিখলেন ঃ

(৩) ৺হেমন্ত কুমার সরকার, ৺তারক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺গোবিন্দ দত্ত প্রভৃতি।

"আমরা ত জানি স্বরাজ আনিতে
পোড়া বার্ত্তাকু এনেছি খাস
কত শত কোটি ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধা
নিঙাড়িয়া কাড়িয়া গ্রাস
এলো কোটি টাকা, এলো না স্বরাজ।
টাকা দিতে নাবে ভুখারি সমাজ।
মা'র বুক হতে ছেলে কেড়ে খায়;
মোবা বলি, বাঘ খাও হে ঘাস।
হেবিনু, জননী মাগিছে ভিক্ষা
ঢেকে বেখে ঘবে ছেলের লাস।'

এই সময় কবি চাঁদ সড়কের ঐ বস্তিকে অবলম্বন করে "মৃত্যু ক্ষুধা" নামে একটি উপন্যাস লেখেন। এই বইটি পড়লে ধোঁকাবাজ বাজনৈতিক দলের স্বরূপ বেশ বোঝা যায়। কবি তাই অন্যায় মিথ্যা ও ভণ্ডামী যেখানে দেখেছেন সেখানেই সত্যের খাঁড়াব আঘাত করেছেন। সত্য কথা বলার সুযোগ যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য কোনও দলের খাতায় নাম লিখিয়ে নেড়া-নেড়ী সাজেননি। যাব কাছে সাহায্য নেবেন, তার অন্যায় তা' হলে তো দেখান যাবে না।

মজুব আন্দোলনে লিখলেন:
"ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল্।
আমবা হাতের সুখে গড়েছি ভাই,
পায়েব সুখে ভাঙব চল্।
আবাব নূতন কবে মল্লভূমে
গর্জাবে ভাই দলমাদল।"

ছাত্রদের আন্দোলনে লিখলেন:
"আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল
আমরা তাজা খুনে লাল কবেছি
সরস্বতীর শ্বেত কমল।"

গান্ধীজীর ওপর লিখলেন:
"আজ না চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে
কংস কারার দ্বার ঠেলে।
শব শ্মশানে শিব নাচে ঐ
ফুল ফুটান পা' ফেলে।"

দারিদ্র্যের উপর কবিতা লিখলেন :
'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে ক'রেছ মহান্
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
কণ্টক মুকুট শোভা। দিয়াছ তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস ;"

কৃষাণ আন্দোলনে লিখলেন :
"ওঠরে চাষা জগদ্বাসী ধর ক'ষে লাঙল
(আমরা) মরতে আছি,
ভালো ক'রেই মরব এবার চল্।
(তখন) আমরা ছিলাম পরম সুখী
ছিলাম দেশের প্রাণ
(মোদের) গলায় গলায় গান ছিল ভাই
গোলায় গোলায় ধান।
(এখন) কোথায় বা সে গান গেল ভাই,
কোথায় সে কৃষাণ ?"

আবার নিখিলবঙ্গ ধীবর সম্মেলনে জেলে সম্প্রদায়ের জন্য লিখলেন :
"নীচে পড়ে রইব না আর
শোন রে ও ভাই জেলে !—
এবার উঠব রে সব ঠেলে।"

আশু মুখুজ্যের মৃত্যুতে বাঙালীর হয়ে তর্পণ করলেন :
"বাংলার শের বাংলার শির
বাংলার বাণী, বাংলার বীর
সহসা ওপারে অস্তমান
এপারে দাঁড়ায়ে দেখিল ভারত
মহাভারতের মহাপ্রয়াণ।"

মাদারিপুরের বিপ্লবী নেতা পূর্ণচন্দ্র দাসের মুক্তিতে আনন্দ-অভিনন্দন জানালেন :
"স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ,
মাদারিপুরের মর্দবীর
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক,
মিলন পদ্মা ভাগিরথীর।"

কুমিল্লার বিপ্লবী মাতা হেমপ্রভা মজুমদারকে উদ্দেশ্য করে প্রণাম জানালেন :

"এস বাঙলার চাঁদ সুলতানা
বীর-মাতা বীর-জায়া গো।
তোমাতে পড়েছে সকল কালের
বীর-নারীদের ছায়া গো।"

বাঙলার নেতা অশ্বিনীকুমাব দত্তের মৃত্যুতে বাঙলার স্বাধীনতাকামীদের হয়ে অর্ঘ্য দিলেন :

"আজো তারা ক্রীতদাস, আজো বদ্ধ-কর
শৃঙ্খল-বন্ধনে দেব ! আজো পরস্পর
করে তারা হানাহানি, ঈর্ষা-অস্ত্রে যুঝি
ছিটায় মনের কালি—নিরস্ত্রের পুঁজি !
মন্দভাষ গাঢ়মসী দিব্য অস্ত্র তার !
"দুই-সপ্ত কোটি ধৃত খর তরবার"
সে শুধু কেতাবী কথা, আজো সে স্বপন !
সপ্তকোটি তিক্ত জিহ্বা বিষ-রসায়ন
উদ্গারিছে বঙ্গে নিতি, দগ্ধ হল ভূমি !
বঙ্গে আজ পুষ্প নাই, বিষ লহ তুমি !
কে করিবে নমস্কাব ! হায়, যুক্তকর
মুক্ত নাহি হলো আজো ! বন্ধন-জর্জর
এ কর পারে না দেব ছুঁইতে ললাট !
কে করিবে নমস্কার ? কে করিবে পাঠ
তোমার বন্দনা গান ? রসনা অসাড় ।
কথা আছে বাণী নাই ; ছন্দে নাচে হাড় !
ভাষা আছে আশা নাই, নাই তাহে প্রাণ,
কে করিবে এ জাতিরে নব মন্ত্র দান !"

কবি সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোকাকুল কবি গাইলেন :

"চল চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিলে পথ ভুলে,
ওগো এই গঙ্গার কূলে।
দিশেহারা মাতা দিশা পেয়ে তাই নিয়ে গেছে কোলে তুলে
ওগো এই গঙ্গার কূলে।"

রবীন্দ্র মোসাহেবরা ছিলেন নজরুল বিদ্বেষী। তাঁরা কবি সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে নজরুলের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে তাতিয়ে তুলেছিলেন, কিন্তু সত্যেন্দ্র-শোক সভায় এই অপূর্ব সঙ্গীতটি নজরুলের কণ্ঠে শুনে ও সত্যেন্দ্রনাথের উপর দুটি কবিতার আবৃত্তি শুনে তাঁদের চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠেছিল। এই গান ও কবিতার মহিমায় সভাপতি শরৎচন্দ্র ও প্রধান

অতিথি রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন কবি নজরুলের হৃদয় কত উদার। সে কথা তাঁরা তাঁদের ভাষণেও বলেছিলেন।

এরপর কবি নজরুল গোকুল নাগের মৃত্যুতে শিউলির মত ঝুরে ঝুরে কাঁদলেন :

"না ফুরাতে শরতের বিদায় শেফালি,
না নিবিতে আশ্বিনের কমল-দীপালি,
তুমি শুনেছিলে বন্ধু পাতা-ঝরা গান
ফুলে ফুলে হেমন্তের বিদায়-আহ্বান।"

১৯২৫ সালের প্রথম দিকে "লিবার্টি" গ্রুপের দৈনিক খুব ঘটা করে আত্মপ্রকাশ করল। যতদূর মনে পড়ে, এই পত্রিকায় নজরুল-বন্ধু কবি সুবোধ রায় সহ-সম্পাদক ছিলেন। প্রথম সংখ্যার তৃতীয় পৃষ্ঠায় নজরুলের "ফরিয়াদ" নামক কবিতাটি বার হয়েছিল। কবিতাটির আরম্ভ :

"এই ধরণীর ধূলিমাখা
তব অসহায় সন্তান
মাগে প্রতিকার ; উত্তর দাও
আদি পিতা ভগবান !—
আমার আঁখির দুখ দীপ নিয়া
বেড়াই তোমার সৃষ্টি ব্যাপিয়া ;
যতটুকু হেরি বিস্ময়ে মরি
ভরে ওঠে সারা প্রাণ !
এত ভালো তুমি ? এত ভালোবাস ?
এত তুমি মহীয়ান ?
ভগবান ! ভগবান !"

মোট ১৩টি স্ট্যানজায় লেখা এ কবিতাটি দীর্ঘ। পুরো এক পৃষ্ঠার দু'কলমে এর জায়গা লেগেছিল। তৎকালে এই কবিতাটি খুব সাড়া জাগিয়েছিল। এর রচনার তারিখ ২৭শে আশ্বিন, ১৩৩২ সাল, স্থান হুগলী। হুগলীতে চারজন সার্থক সাথী পেয়েছিলেন। ভূপতি মজুমদার, গীষ্পতি ভট্টাচার্য, সুবোধ রায় ও মণি মুখোপাধ্যায়।

এর পরই চন্দননগর প্রবর্তক আশ্রম থেকে তাঁকে অক্ষয় তৃতীয়ার মেলায় উদ্বোধন সঙ্গীত গাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করে। তখন হুগলী থেকে কৃষ্ণনগরে মাত্র কয়েকদিন হয় চলে গিয়েছেন। এই সময় উক্ত সভার জন্য লেখেন "প্রবর্তকের ঘুর চাকায়" নামক কবিতা :

"যায় মহাকাল মূর্ছা যায়
প্রবর্তকের ঘুর চাকায় !
যায় অতীত
কৃষ্ণকায়
যায় অতীত
রক্ত পায়
যায় মহাকাল মূর্ছা যায়
প্রবর্তকের ঘুর চাকায়।"

এই বছরের আগের বছরে অর্থাৎ ১৩৩১ সালেও তিনি প্রবর্তক আশ্রমের বাণীপূজা-উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে "দ্বীপান্তরের বন্দিনী" কবিতা লেখেন ঃ

আসে নাই ফিরে ভারত-ভারতী
মাব কতদিন দ্বীপান্তর ?
পূণ্য-বেদীব শূন্যে ধ্বনিল
ক্রন্দন—দেড়শত বছর।"

মজুব-চাষী অান্দোলনেব নব পর্যায়ে অভিনন্দন জানালেন ঃ

"ওড়াও ওড়াও লাল নিশান।
দুলাও মোদের রক্ত-পতাকা
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান॥"

রক্ত-পতাকাকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে কবির নজরে পড়ল নিখিল বিশ্বের নিপীড়িতদের ওপর, তাই লিখলেন ঃ

"জাগো—
জাগো অনশন বন্দী ; ওঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত।
যত অত্যাচারে আজি বজ্রহানি
হাঁকে নিপীড়িত জন-মন মথিত বাণী
নব জনম লভি' অভিনব ধরণী
ওরে ঐ আগত।"

অনুশীলন, যুগান্তর, শ্রীসঙ্ঘ, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স প্রভৃতি বিপ্লবী দল ; স্বরাজ্য পার্টি, খিলাফত ; কংগ্রেস—দক্ষিণ ও বামপন্থী দল, ধর্মীয়, রাজনৈতিক প্রভৃতি যারা যখনই কবিকে চেয়েছে, কবি তখনই তাঁর রচনা দিয়ে দেশের মানুষকে স্বাধীনতা যুদ্ধে সৈনিক হতে—শহীদ হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

ধোঁকাবাজ রাজনৈতিক দলেরা আন্দোলনের নামে দেশকে ঠকিয়েছে, তাই দেশবাসী ঠকতে ঠকতে আর সে রকম সাড়া দেয় নি। কিন্তু কবি তাঁর গান গেয়ে গেছেন শেষ দিন পর্যন্ত—অর্থাৎ যে পর্যন্ত সচেতন ছিলেন।

দেশের স্বাধীনতা ও জনগণকে বাদ দিয়ে কবি নজরুলকে ভাবা যায় না। তিনি ভক্ত, সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পী, সবই হতে পারেন। কিন্তু পরাধীন দেশের দুর্গত মানবের মুক্তিকামী কবি তিনি। ভারতবর্ষ অধ্যাত্ম আচরণের দেশ, সেখানেও তাঁর মানবতা বোধের মাধ্যম এক ব্রহ্মের চিন্তায় উদার মত পোষণের পথ যাতে সকলে গ্রহণ করে—তাঁর জন্যও কবি গান, কবিতা, প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন।

আমাদের দেশে ধর্ম সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক দলের মত নানা দলে বিভক্ত হয়ে আছে। কিন্তু এই সব সম্প্রদায়ের যাঁরা খাঁটি সাধক, তাঁরা এমন একটি স্তরে ওঠেন, যেখানে সব সম্প্রদায়েরই পরিণতি একই ক্ষেত্রে। সেখানে একমাত্র প্রশ্নের সমাধান প্রেম ও প্রেম-জ্যোতিঃ। এই অনুভূতিও নজরুলই সুষ্ঠুভাবে পেয়েছিলেন।

অতঃপর রবীন্দ্র-ভক্ত নজরুল বিশ্বকবির মহাপ্রয়াণে একটি গান ও "রবিহারা" কবিতা লিখলেন। গানে লিখলেন—

"ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে, জাগায়ো না।
সারা জীবন যে আলো দিল, ডেকে তাঁর ঘুম ভাঙায়ো না॥
যে সহস্র করে রূপ-রস দিয়া
জননীর কোলে পড়িল ঢলিয়া
তাঁহারে শান্তি-চন্দন দাও, ক্রন্দনে রাঙায়ো না।
যে তেজ শৌর্য শক্তি দিলেন আপনারে করি ক্ষয়
তাই হাত পেতে নাও,
বিদেহ রবি ও ইন্দ্র মোদেরে নিত্য দেবেন জয়—
কবিরে ঘুমাতে দাও।
অন্তরে হের হারানো-রবির জ্যোতি
সেইখানে তাঁরে নিত্য কর প্রণতি
আর কেঁদে তাঁরে কাঁদায়ো না॥"

কবির মৃত্যুতে কবি দিশেহারার মত হয়েছিলেন। একদা "ধূমকেতু" পত্রিকায়ও রবীন্দ্র-অজ্ঞ দেশবাসীর ওপর লিখেছিলেন—

"রবির শিখা ছড়িয়ে পড়ে দিক্ হতে আজ দিগন্তরে ;
সে কর শুধু পশ্‌ল না মা অন্ধকারার বন্ধ ঘরে॥"

এবার লিখলেন—

"অন্তরে হের হারাণো-রবির জ্যোতি
সেইখানে তাঁরে নিত্য কর প্রণতি
আর কেঁদে তাঁরে কাঁদায়ো না ॥"

শুধু কেঁদে, আবেদন আর নিবেদন করেই আমরা বেঁচে থাকতে চাই, কিন্তু কবিগুরু যে জ্যোতিঃ বিকিরণ করে গেলেন তা যদি আমরা অনুধাবন করতে পারি ; তা হলে হৃদয়বান হয়ে ; সুষ্ঠু-দ্রষ্টারূপে মানব-কল্যাণ-ব্রতী হতে পারি আমরা। কবি নজরুল তাই ছিঁচ্‌কাঁদুনে হতে বারণ করেছেন, বলেছেন অন্তরচারী হতে। এই সঙ্গে "রবিহারা" কবিতায় লিখলেন—

"দুপুরের রবি পড়িয়াছে ঢ'লে
অস্ত পারের কোলে
শ্রাবণের মেঘ ছুটে এল দলে দলে—
উদাস গগন-তলে।
বিশ্বের রবি ভারতের কবি
শ্যাম বাংলার হৃদয়ের ছবি
তুমি চলে যাবে বলে!
তব ধরিত্রী-মাতার রোদন
তুমি শুনেছিলে নাকি
তাই কি রোগের ছলনা করিয়া
মেলিলে না আর আঁখি ?"

এই গান ও কবিতাটি রবীন্দ্র প্রয়াণের দিন সন্ধ্যায় রেডিও স্টেশনে বসে লেখেন ও কবি তখনই রেডিওতে আবৃত্তি করে ও গান গেয়ে শোনান। বেশ মনে পড়ে আবৃত্তির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী কবি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। এর পর "হিজ মাস্টার্স ভয়েস" কোম্পানি গান ও কবিতাটি রেকর্ডও করেছিল।

* * *

দল বললে এই বোঝা যায় যে, ধর্ম ও রাজনৈতিক মতবাদের লোকেরা অপর মতবাদের শক্তিকে খর্ব করার জন্য যে বিশেষ গোষ্ঠী-শক্তি গড়ে তোলে, সেই শক্তি কেন্দ্রীভূত হয় যাদের কেন্দ্র করে, এই হল দল শব্দের রূপ বা সংজ্ঞা। আদর্শের নামে অপরের মনকে মজিয়ে স্বাভাবিক গতি থেকে তাকে আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিরা অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে। অবশ্য যুগ যুগান্তর থেকে এই ভাবেই চলে এসেছে আজ পর্যন্ত। কিন্তু এইটাই সব নয়। কারণ যারা মানব কল্যাণের জন্য আদর্শ জীবন যাপন করে মৃত্যুঞ্জয়ী

হয়ে সকলকে প্রেমের পথে—মানবতা বোধের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশে সামনে পথ দেখান, আলোর ও আনন্দের, তাঁদেরকে যাঁরা ভাঙিয়ে উপার্জনের ও শক্তি সঞ্চয়ের পথকে প্রশস্ত করে, তাদের হাতে তাঁরা বিকৃত হয়ে উঠেন। কবি এই আদর্শবাদী আত্মকেন্দ্রীক দলের ছিলেন আজন্ম শত্রু। তাদের বিরুদ্ধেই তিনি শূলপাণির মত লেখনী চালিয়ে ছিলেন। তাই তাঁর শূল নিক্ষেপের স্থান কোন একটি দুষ্ট স্থানকে লক্ষ্য করে চলেনি। মানবের অকল্যাণকামী মাত্রকেই তিনি ঘা মেরেছেন।

তাই যে সব সাধারণ মানুষ (যাদের সংখ্যাই জগতে বিপুল) এই সব মতবাদের যূপকাষ্ঠ থেকে গর্দান বাঁচিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, কবি নজরুল তাঁদেরই কবি। এই সব মানুষের নানা মন নিয়ে নানা মহাজনদের ভাবধারায় সহজ মনে গ্রহণ করে জীবন মধুময় করে তুলতে চায়—কবি নজরুল তাদেরই কবি।

রসপিপাসু মানুষের বিচিত্র মন নানা রস প্রবাহের কূলে কূলে মানস ঘট ভরিয়ে নেবার জন্য উন্মুখ হয়ে চলেছে যুগ-যুগান্তর।

এই রস প্রবাহের সন্ধান সেই কবিই দিতে পারেন, যিনি মানবমাত্রকে 'নারায়ণ' রূপে ভালবাসতে পারেন, নরের মধ্যে নারায়ণ যে কবি দেখেন সেই কবিই কখনও সুদর্শনধারী আবার কখনও বংশীবাদক। কবি তাই নরশ্রেষ্ঠ। কবি তাই সত্যের পূজারী; সত্যের প্রতিষ্ঠা প্রয়াসী। নজরুল-কাব্য অনুধাবন করলে দেখতে পাওয়া যাবে, কবি-নজরুল মানুষকে নিয়েই স্বর্গ রচনা করতে চেয়েছেন, অধ্যাত্মপুষ্ট মানব সমাজ গড়তে চেয়েছেন, অধ্যাত্ম-মানস নিয়ে সমাজের (বাস্তবের) উন্নতিকামী ছিলেন। তাই বিদ্রোহী কবিতা থেকে শ্যামা সঙ্গীত; কীর্তন থেকে বাউল, ভাটিয়ালী থেকে ঝুমুর সাধারণ মানুষের মন দেয়া-নেয়ার বেদনা থেকে সাধক-স্তরের সর্বত্রই নজরুল 'পথচারী'। পথচারীর মন নিয়ে তিনি বললেন—

"দিয়া বেদনার পরে বেদনা
নাথ দিলে একি এ বিপুল চেতনা।"

এই বিপুল চেতনার জ্বালা না থাকলে জীবের জন্য কি কাঁদতে পারা যায়? আর যে কবির এই কান্না নেই, সে কী করে মানুষের চিত্ত-জয়ী কবি হতে পারবে? কবি নজরুল তাই দেহজ প্রেমে যারা কাঁদছে তাদের জন্য লিখলেন ঃ

"ভালবাসার ছলে আমায়
তোমার গানে গান গাওয়ালে।
চাঁদের মতন সুদূর থেকে
সাগরে মোয় দোল খাওয়ালে।"

বুকে সাগরের দোল নিয়ে কবি নজরুল বৃন্দাবনের মুরলীধরকে ডেকে বললেন—

"এস মুরলীধারী বৃন্দাবনচারী
গোপাল গিরিধারী শ্যাম।
তেমনি যমুনা বিগলিত করুণ
কুলু কুলু স্বরে ডাকে অবিরাম।"

আবার বললেন—

"মোরে সেইরূপে দেখা দাও হে হরি
তুমি ব্রজের বালারে রাই-কিশোরী
ভুলাইলে যেই রূপ ধরি।"

সেইরূপে কবি নজরুলও মজতে চাইলেন। বৃন্দাবনের পুরুষোত্তমকে দেখতে দেখতে কবি বিপুল আঁধারের মধ্যে বিশ্বরূপা কালীর মহতীরূপকে ধরে ফেলে বললেন—

'আর লুকাবি কোথা মা কালি।
আমার বিশ্ব-ভুবন আঁধার করে
তোর রূপে মা সব ডুবালি।"

তারপর বাউল সুরে বাউল ধর্মী সাঁই ফকিরদের তত্ত্বে ধরা দিলেন। আউল-বাউল সম্প্রদায় অণুপরমাণু থেকে গুরু গরীয়ান সমস্ত বস্তুর মধ্যেই সেই সাঁই মানে সাথীকে দেখেন, কবিও তাই বললেন—

"আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল,
আমার দেউল
আমারি এ-আপন দেহ।
আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর
অন্তরে মন্দির—গেহ।"

কবির কাছে বাহির ও অন্তর এক হয়ে গিয়েছে। কবি শুধু শূলই ধরতে বলেছেন তাই নয়, অমৃতের ভাণ্ডও হাতে তুলে ধরবার জন্য অধিকারী হতে আহ্বান জানাচ্ছেন। ভজন সুরে গাইলেন—

"রাখ এ মিনতি ত্রিভুবন পতি
তব পদে মতি (রাখ)

আঁখির আগে যেন সদা জাগে
তব ধ্রুব জ্যোতি ॥"

মীরাবাই বলেছিলেন,
"আঁখন কে আগে ঠাড
রহ গিরিধারী।"

এই জ্যোতি-দর্শনের মন দিয়েই ইংরেজ বিতাডন করতে চেয়েছিলেন, এই জ্যোতির বাসনাই তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিল সুফি, ইস্‌লামী, বৈষ্ণব, শাক্ত, নাথ, যোগী, আউল-বাউল ও খ্রিস্টানী প্রভৃতির উদার মতবাদের পথে। সমস্ত পথের মধ্যেই তিনি একটি উদারতার সডক বা সরল পথ দেখেছিলেন। ইসলামী গানে বললেন –

"তাওফিক দাও খোদা ইসলামে
মুস্‌লিম্‌-জাঁহা পুনঃ হোক আবাদ।
দাও সেই হারানো সুল্‌তানত্‌
দাও সেই বাহু ; সেই দিল্‌ আজাদ।"

কবির চোখে ইসলামীর মুক্ত আজাদি মন ধরা পড়ে। আর ধরা পড়ে দরাজদস্ত্‌, শক্তিমান বাহু ; যে বাহু প্রাচীন দিনে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার অভিলাষ হয়েছিল। তাই তিনি বললেন—

"দিকে দিকে পুনঃ জাগিয়া উঠেছে
দীন্‌-ই-ইস্‌লামি লাল মশাল,
ওরে ও বে-খবর তুইও ওঠ্‌ জেগে
তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল!"

হায় হতভাগ্য বাংলার ও ভারতের মুস্‌লিম। শুভক্ষণে সাড়া দিলে না, কবিকে বিশ্বাসও করলে না। তাই কবি গাইলেন—

"চক্ষে আমার কাবা'র ছবি
বক্ষে মোহাম্মদ্‌ রসুল।
শিরোপরি মোর খোদার আরশ্‌
গাই তারি গান পথ-বেভুল।
লায়লির প্রেমে মজ্‌নু পাগল,
আমি পাগল 'লা-ই লাহ্‌'।
প্রেমিক দরবেশ্‌ আমায় চেনে
অরসিকে কয় বাতুল!"

এইখান থেকেই "পথ-চারী" নজরুল অন্তরচারী হয়ে ওঠেন। অন্তর-পথচারী কবি নজরুল পথের সন্ধান করতে করতে তান্ত্রিক সাধনায় মন স্থির করেন। একেশ্বরবাদী মুসলমান নজরুল সমস্ত পথের ধর্ম-সত্তার আস্বাদন করতে করতে পৌত্তলিক হয়ে ওঠেন কেন? কবি মাত্রই রূপের পূজারী। একটা অবলম্বন না হলে কি দেখে এগোবেন।

তাই 'ইসলামি' কবিতায় তিনি বললেন…

"তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ ;
ক্ষমা কর হজরত্।
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ,
তোমার দেখান পথ্।
ক্ষমা কর হজরত্।
বিলাস বিভব দলিয়াছ পায়
ধূলি সম তুমি প্রভু ;
তুমি চাহ' নাই—আমরা হইব
বাদশা নওয়াব কভু।
এই ধরণীর ধন সম্ভার
সকলের তাহে সম-অধিকার ;
তুমি বলেছিলে, ধরণীতে সবে
সমান পুত্রবৎ।
তোমার ধর্ম্মে অবিশ্বাসীরে
তুমি ঘৃণা নাহি করে
আপনি তাদের করিয়াছ সেবা
ঠাঁই দিয়ে নিজ ঘরে।
ভিন্ ধর্ম্মীর পূজা মন্দির
ভাঙিতে আদেশ দাও নি হে বীর
আমরা আজিকে সহ্য করিতে
পারিনাকো পরমত্।
তুমি চাহ নাই ধর্ম্মের নামে
গ্লানিকর হানাহানি
তলোয়ার তুমি দাও নাই হাতে,
দিয়াছ অমর বাণী।
মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা
সার করিয়াছি ধর্ম্মান্ধতা,
বেহেশ্ত হতে ঝরে নাকো আর
তাই তব রহমত।।"

এই উদার দৃষ্টি দিয়ে কবির নির্দেশে হিন্দু মুসলমান চলল না, তাই তিনি

অন্তর দেউলের হয়ে উঠলেন ভক্ত। তন্ত্রের দুইটি পথ সাধারণতঃ দেখা যায়। প্রথমটা শক্তি লাভ করে শক্তির অপপ্রয়োগের দ্বারা ভেল্কি দেখানোর প্রয়াস নিয়ে সাধনা করা এবং সমাজের নিম্নস্তরের জীবদের ভাঁওতা দেওয়া—এই স্তরের সাধনা।

দ্বিতীয় হচ্ছে—ব্রহ্মময়ীর বিশ্বরূপ দেখা, শুধু কল্যাণ, শুধু প্রেম, মায়ের কাছে শিশুমনের সঙ্গে আত্মসমর্পণ করে। তাই তিনি বললেন—

"(আমার) শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে
জপি আমি শ্যামের নাম।
মা হবে মোর মন্ত্র গুরু
ঠাকুর হবেন ঘনশ্যাম।"

কবির সাধনায় প্রেমই প্রধান, তাই তিনি শ্যাম-শ্যামা মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন। ঐক্যের আশীর্বাদ (রহমত্) হজরতের কাছে কামনা করেছিলেন তাই বলেছিলেন কীর্তন গানে—

"কি সুখে লো গৃহে রব
শ্যাম যদি ওলো যোগী হল—সখা
আমিও যোগিনী হব।"

তাই যোগিনীর মন নিয়ে তিনি তাঁর অন্তরের ঠাকুরের কাছে বলেছিলেন—

"আবার যদি তোমার মায়ায়
রূপ নিতে হয় নূতন কায়ায়
তোমার প্রকাশ রুদ্ধ যেথায়
সেথায় যেন না হয় গতি।"

প্রেমের পথচারী সকল পথের পথিককে সহজ মন—নরম মন নিয়ে প্রেমের পথের পথিকরূপে দেখতে চেয়েছিলেন, তাই নানাভাবে মানুষের দোরে করাঘাত করে ফিরেছিলেন, কিন্তু কেউ সাড়া দিল, কেউ দিল না। বেশির ভাগই কপাট অর্গলবদ্ধ করে রইল। সেই জন্যই কবি বললেন—

"তোমার প্রকাশ রুদ্ধ যেথায়
সেথায় যেন না হয় গতি।"

তাই কবি প্রেমহীন জগতে আজ বাকরোধ করে মহাশ্মশানে শব-সাধনায় বসে আছেন। ঠিক যেন—

"মনে যে-মোর মনের ঠাকুর
তারেই আমি পূজা করি,
আমার দেহের পঞ্চভূতের
পঞ্চপ্রদীপ তুলে ধরি।
ফকীর যোগী হয়ে বনে
ফিরি না তার অন্বেষণে
মনের দুয়ার খুলে দেখি
রূপের জোয়ার, মরি মরি।
আছেন যিনি ঘিরে আমায়
তাঁরে আমি খুঁজব কোথায়;
সমুদ্রেরে খুঁজে বেড়াই
সমুদ্রেতেই ভাসিয়ে তরী।
মন্দিরে ঐ বদ্ধ খোপে
ঠাকুর কি রয় পূজার লোভে?
মনের ধোঁয়া বাড়াও আরো
ধূপের ধোঁয়ায় পায় না হরি?"

জীবের মধ্যে, অণু পরমাণুর মধ্যে বাস্তব বা বস্তুর মধ্যে হরিকে অর্থাৎ প্রেমকে পেতে চেয়েছিলেন, হতভাগ্য দেশ কবি-মানসকে দেখতে পেল না, দলগতভাবে তাকে মুঠোয় ধরে রাখতে চাইলো, সকল মুঠোর বাইরে চলে এসে শতদলের কবি নজরুল ধ্যান-গম্ভীর মৌন-তাপস রূপে এখনও আমাদের মধ্যে রয়েছেন। দেশ প্রেমিক হোক, দেশ কবি-মানসকে বুঝুক. দেশ কবিমানসের বাসনার রঙে মন রাঙিয়ে শত পথের পথচারীদের প্রেমের দু'বাহু প্রসারিত করে উদার বক্ষে তুলে নিয়ে কবির বাসনাকে সার্থক করুক। তবেই নজরুলকাব্য আলোচনা সার্থক হবে।

কবি কখনও কোন দলের, কোন ব্যক্তির মুখ চেয়ে কথা বলেননি, গান গাননি। বর্তমানে যেমন বামপন্থী সাহিত্য সঙ্ঘ, কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ তো আছেই, মুসলিম সাহিত্য সঙ্ঘও আছে। এর পরও পত্র পত্রিকার "গোষ্ঠী সাহিত্য সঙ্ঘ"ও আছে। নূতন সাহিত্যিক শিল্পী যে কোন একটির 'গিলোটিনের' মধ্যে গলা প্রবেশ না করিয়ে সাহিত্য বিকাশের সুযোগ পান না। সেই জন্যই নজরুলকেও এই ভাবে এক সময়ে দলীয় কবিরূপে দেখাবার প্রয়াস চলেছিল।

নজরুলের চোখে ভারতীয় মুসলমান

নজরুল লিখেছেন ঃ

"ইসলাম বলে, সকলেব তরে মোরা সবাই
সুখ দুখ সম-ভাগ করে নেব সকলে ভাই,
নাই অধিকার সঞ্চয়ের।
কারো আঁখি-জলে কাবো ঝাড়ে কিরে জ্বালিবে দীপ ?
দুজনাব হবে বুলন্দ নসিব, লাখে লাখে হবে বদ্‌নসিব ?
এ নহে বিধান ইসলামের।"

(জিঞ্জীর পৃঃ ৪৮)

প্রথম মহাযুদ্ধেব পর ১৯১৯ সাল থেকে কিংবা তার কিছু আগে থেকেই তামাম মুসলিম জাঁহানের যে যে দেশ ইউরোপের সফেদ জাতিগুলির অধিনে ছিল তারা তখন আজাদির জন্য জান কবুল করে তাল ঠুকে গর্দান খাড়া করে দাঁড়িয়ে উঠেছিল। আঙ্গোরায় আনোয়ার পাশা, তুর্কিতে কামাল পাশা, আরবে ইব্‌নে সৌদ; মিশরে জগলুল পাশা, মরোক্কোয় গাজী আবদুল করিম প্রমুখ তখন ইউরোপীয়দের ভয়ের কারণ, নিদ্রায় দুঃস্বপ্নের মত রূপ নিয়েছিল। তাই নজরুল ইসলাম তখন ভারতের মুসলমানদের ইংরেজের বিরুদ্ধে চেতিয়ে তুলছিলেন; এবং মুসলমান ধর্মে কি বলে তা তাঁর অগ্নিময় বাণীর মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের শোনাচ্ছিলেন। ইসলাম ধর্মের মূল কথাই হল সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। এই ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যকে বজায় রাখতে হ'লে যে উদারতার প্রয়োজন সে উদারতার ভ্রাতৃত্বের হাত প্রসারিত দেখতে পাই ইসলামিক দেশ গুলিতে। ভেদাভেদের বিষের জ্বালা শুধু ভারতের মধ্যেই দেখা যায়। জাতীয়তার প্রশ্ন এখানে নেই। কারণ আমাদের ভারতে জাতি ভেদের সহস্র শাখা মানুষকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ভারতবর্ষের ভারতীয়দের দাবি নেই, আছে দলগত দাবি। একদল আর একদলের দাবিকে নিজের দাবি বলে মানে না। তাই হাতে হাতও মেলায় না বরং একদল আর এক দলের সর্বনাশ করতেও দ্বিধা বোধ করে না। ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমানের এই একই ভাব, একই স্বভাব; এই একই প্রকার মনের গঠন। এখানে হিন্দু হোক মুসলমান হোক সকলেই ব্যক্তি বন্দনায় পঞ্চমুখ, কিন্তু উদ্দেশ্যের দিকে তাকিয়ে দেখবার এবং হিন্দু মুসলমানের সম-স্বার্থ বলে চিন্তা করবার ফুরসৎ নেই। এখানে সকলেই কাঠ মোল্লা, সকলেই গোঁড়া ধর্মব্যবসায়ী পণ্ডিত। কিন্তু কারুরই সত্যিকারের দরদবোধসহ পাণ্ডিত্য নেই। পাণ্ডিত্য নেই, নয় তো সে পাণ্ডিত্য প্রবলের টাকায় দালালীর কাজে লাগে।

এই সব চিন্তা করে, এই সব দেখে শুনে কবি নজরুল দেশের মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়কে সজাগ করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। এই ব্রত গ্রহণ করায় তাঁকে তাঁর ঘর, সমাজ সব ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল।

তিনি জীবনের অনুভূতির বেগে সৈনিকব্রত গ্রহণ করে সুদূর করাচী চলে গিয়েছিলেন। ইংরেজের সৈনিক বিভাগে গিয়ে দেখলেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন তাও হবার নয়। এও একটা বড় গোলামখানা। ভারতবাসী ইংরেজের যে গোলামির বেড়ি শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা সে বেড়ি ও শিকল এখানেও সাঁড়াশির মত চেপে ধরেছে। সাধারণ সৈনিকরা যে ব্যবহার পায় তা গৃহপালিত পশুর প্রতি ব্যবহার অপেক্ষা ভাল নয়। যে বেড়ি ভাঙ্গার ব্রত নিয়ে সৈনিক বিভাগে গেলেন সেই বেড়ি তাঁকে অক্টোপাশের মত চেপে ধরায়, নিজেকে ও জাতিকে মুক্ত করার অন্যপথ খুঁজতে লাগলেন। করাচী তার কাছে একটা কারাকক্ষের মত মনে হয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে একটি গবাক্ষও তিনি পেয়েছিলেন, পেয়েছিলেন এক রসিক ফারসী পণ্ডিতকে। তাঁর কাছে ফারসী ভাষা শিখে, ফারসী কবিদের সমস্ত কাব্য পড়ে ফেলেছিলেন। নানা নিয়ম কানুনের বাঁধনের মধ্যেও গান লিখে, গান গেয়ে, প্রবন্ধ, গল্প ও ডাইরী লিখে নিজেকে জিইয়ে রাখতেন। মাঝে মাঝে চাড়া দিয়ে উঠত তাঁর বিদ্রোহী মন, নাড়া দিয়ে উঠত তাঁর দরাজ দস্ত এই গোলামির বিরুদ্ধে। শোনা যায় এই জন্য মাঝে মাঝে কোর্ট মার্শালের টেবিলের সামনে আসামী হয়ে দাঁড়াতেও হয়েছে। কিন্তু যিনি জাতির মুক্তির দিশারি হয়ে এসেছেন তাঁকে কে বাঁধবে, কে তাঁকে রুখবে? তিনি আগামী দিনের বিদ্রোহী কবিরূপে যে প্রতিভাত হবেন, তার প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন সেই করাচীর সৈন্য বিভাগের ব্যারাকে। গ্রামে বসে যে সমাজকে দেখেছিলেন, সে সমাজের মানুষেরা বিদেশী শাসনের জোয়ালে পোষা জানোয়ারের মত দিনগত পাপক্ষয়ের পথে চলেছিল, পরের স্বার্থ বজায় রেখে নিজেদের মধ্যে হানা-হানি রেষা-রেষি করে ভেদাভেদের বিষ-জর্জরিত জীবন যাপন করেছিল। তাই দেখে ব্যথা বোধ করেছিলেন, তারপর সৈনিক বিভাগে গিয়ে তার চরম দৃশ্য দেখে মুষ্টিবদ্ধ হাতে এর প্রতিকার এবং প্রতিশোধের সংকল্প নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন।

এখানে এসে হৃদয়ঙ্গম করলেন ভারতবাসীর অবস্থা। হিন্দু-মুসলমানের অবস্থা নয়, দেশের মানুষের অবস্থা। এখানে দেশের মানুষের অপমান ও অবহেলা দেখলেন। বিদেশীর পীড়নে দুর্ব্যবহারেও শীর উঁচু করে গর্দান খাড়া করে এরা প্রতিবাদ করে না কেন? প্রতিশোধ নেবার জন্য দলবদ্ধ হয় না কেন? কেন প্রবলের বিপুল লোভের খোরাক করে দেশী-বিদেশী ধনী ও শোষকদের মুখের কাছে নিজেদের তুলে ধরেছেন? এইসব প্রশ্ন তাঁর মনে ওঠে আর প্রতিকারের পথ খুঁজে বেড়ান। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় সৈনিকদের সঙ্গে ইংরেজ সরকার যে দুর্ব্যবহার করে, তাতে নজরুলের মন আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তিনি করাচী থেকে বারুদ

হয়েই ফেরেন। কিন্তু বারুদে অগ্নি সংযোগের প্রয়োজন। বাঙ্গালীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন। দেশলাইয়ের কাঠি নিয়ে অতি নীরবে প্রতিক্ষা করছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ। কবি কলকাতায় এসে ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে তাঁর বাসায় উঠেন। বারুদে অগ্নি সংযোগ হল। সেই আগুনের স্রোত বেরিয়ে এলো "মোসলেম ভারত" মাসিক পত্রিকার ও সাপ্তাহিক 'বিজলী'র মাধ্যমে। বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশে বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান চমকে উঠল। "শাত-ইল-আরব" "আনোয়ার পাশা" "কামাল পাশা" "মোহররম" প্রভৃতি কবিতা লিখে নজরুল সোজাসুজি মুসলমানদেব ও হিন্দুদের সচেতন করে তুলতে চাইলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে।

"শাত-ইল-আরব"-এ লিখলেন—

শাতিল্ আরব। শাতিল আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর
শহীদের লহু, দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব বীর
যুঝেছে এখানে তুর্ক সেনানী,
য়ুনানী, মেস্‌রী, আর্‌বী কেনানী;—
লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ বেদুইনদের চাঙ্গা শিব।
নাঙ্গা-শির, শম্‌শের আঁশু-আঁখে হেথা মূর্ত্তি দেখেছি বীর নারীর!
শাতিল-হাতে, আরব! শাতিল-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।"
... ...
"ইরাক-বাহিনী! এ যে গো কাহিনী,
কে জানিত কবে বঙ্গ-বাহিনী.
তোমার ও দুঃখে "জননী আমার!" বলিয়া ফেলিবে তপ্ত নীর?
রক্ত-ক্ষীর—

পরাধীনা! একই ব্যাথায় ব্যথিত ঢালিল দু'-ফোঁটা ভক্ত-বীর।
শহীদের দেশ। বিদায়! বিদায়!! এ অভাগা আজ নোয়ায় শির।"
("অগ্নিবীণা")

কবি আরব দেশের শাতিল-আরব নদীকে বন্দনা করলেন। আরবের এই স্থানটিকে কবি নজরুল ভারতের প্রয়াগ তীর্থের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। কারণ, যুগ যুগ ধরে ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করেছে মরদের দল, অন্যায়ের রাজানুচরের হাতে কত মর্দ শহীদ হয়েছে, কত নারীও শহীদান হয়েছেন, তাঁদের বাঙালী পল্টনেরা সলাম জানিয়েছিল। কেন জানিয়েছিল? কারণ শয়তান ইংরেজদের বুটের তলায় ভারতের হিন্দু মুসলমান থেঁতলান জীবন যাপন করেছে, তাঁরা বিদেশে গিয়ে বীরের আত্মদানের মর্ম বুঝেছিলেন এবং সেই মর্মকথাই আমাদের বুঝতে বলেছিলেন, বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমানদের, কারণ তাদের তীর্থ, সেই মহান আরবের ভূমিকে কলঙ্কিত করতে ছাড়েনি এই ইংরাজ

শয়তানের দল। সেই শয়তানই ভারতীয় মুসলমানেরও ঘাড়ে চেপে রয়েছে; তাই কবি বলেছেন, "গোলাম কখনও মুসলমান হতে পারে না।" অতএব হে ভারতীয় মুসলমান ভাই-বোনেরা, তোমরা মুসলিম শহীদের রক্তে রঞ্জিত শাতিল-আরবকে সলাম করবার মত উপযুক্ত হয়ে ওঠ, হাতিয়ার ধরবার মত মরদ বাচ্ছার দরাজ দস্ত্‌কে গড়ে তোল। কি করে গড়ে তুলবে? গড়ে তুলবে ভারতের ঘাড়ে যে দেশী-বিদেশী শয়তান আছে তাকে ঘায়েল করার অভ্যাসের ভেতর দিয়ে। এই বিষয়টাই কবি এই কবিতায় বোঝাতে চেয়েছিলেন। তিনি 'মোহর্‌রম্‌' কবিতায় বলেছেন—

ফিরে এলো আজ সেই মোহর্‌রম্‌ মাহিনা,—
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না!
উষ্ণীষ কোবানের, হাতে তেগ্‌ আরবীর,
দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির;"

নিজের দেশের মুসলমানেরা যাতে ভারতবর্ষের বাইরের মুসলমানদের মতই পৌরুষের জীবন পায় তাই কবি দেখতে চেয়েছিলেন।

"দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির" এই কথাটা শির উঁচিয়ে ভারতের মুসলমানরা যাতে বলতে পারে সেইটাই কবি চেয়েছিলেন। কিন্তু ধনতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদী শয়তান ইংরাজ, দেশীয় ইংরাজ তাঁবেদারগণ বিধাতার কলিজার উপর বসে শুধু এই ভারতবর্ষের মুসলমানদেরই বিপথে পরিচালিত করল, ধর্ম-দালাল মোল্লা-মৌলবীদের মাধ্যমে। কিন্তু ইরান, তুরান, মিসর, মরোক্কোর পায়জারের দাপটে চাঁদী সামলাতে নাজেহাল হয়েছিল। আফ্‌শোষ করে কবি "আনোয়ার" কবিতায় বললেন:

আনোয়ার! আনোয়ার!
দিল্‌ওয়ার তুমি জোর তলওয়ার হানো, আর
নেস্ত-ও-নাবুদ করো, মারো যত জানোয়ার!
আনোয়ার! আফ্‌সোস!
বখ্‌তেরই সাফ দোষ,
রক্তেরও নাই ভাই আর সে যে তাপ জোশ,
ভেঙে গেছে শম্‌শের—পড়ে আছে খাপ-কোষ!
আনোয়ার! আফ্‌সোস্‌!
আনোয়ার! আনোয়ার!
যে বলে সে মুসলিম্‌—জিভ্‌ ধরে টানো তার!
বেইমান জানে শুধু জানটা বাঁচানো সার!
আনোয়ার! ধিক্কার!
কাঁধে ঝুলি ভিক্কার!

তলওয়ারে শুধু যার স্বাধীনতা শিক্ষার !
যারা ছিল দুর্দ্দম আজ তারা দিক্‌দার।
আনোয়ার ! ধিক্কার।"

ভাবতীয় মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ না দেওয়ায়, স্বাধীন ভারতের জন্য ভিতরে তাগিদ না থাকায়, সমস্ত বকম আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকায়, কবি নজরুল ভাবতীয় মুসলমানদের আগে তারা কি ছিল এবং এখন তারা কি হয়েছে, সেটা বারংবার দেখিয়েছেন এই যে,—ইংরেজ যখন রাজা হয়ে পীডন করে, তখন ভারতবাষীকেই পীডন করে, সে পীড়ন হিন্দুর কাছে এক রকম মুসলমানদের কাছে আর এক রকম হয়ে আসে না। সে পীডনের ব্যথা সে শোষণের রুক্ষতা হিন্দু মুসলমানের কাছে একই রকম হয়ে আসে। কিন্তু দুই ভাইয়ের মধ্যে বিভেদ বাঁধিয়ে রাখবার জন্য কখনও একজনকে জনবুলের বুটের তলায় রগড়ায়, আর একজনকে ইংলণ্ডেশ্বরের হাতে ক্ষীরসর খাওয়ায়। এই ক্ষীরসরটাকেই কবি বলেছেন ঃ—

"কাঁধে ঝুলি ভিক্ষার !"

এই ভিক্ষায় হিন্দু কখনও মুসলমানকে দূরে সরিয়েছে, আবার মুসলমান কখনও হিন্দুকে অসুবিধায় ফেলেছে। কিন্তু এই দুই ভায়ের দেশের সম্পদ যা এই সুযোগে লুঠছে জন্মলুঠেরা ইংরাজ। কবি তাই "মিলন গানে" লিখলেন—

ভাই হয়ে ভাই চিন্‌বি আবার ! গাইব কি আর এমন গান।
(সেদিন) দুয়ার ভেঙ্গে আসবে জোয়ার, মরা গাঙে ডাকবে বান ॥
(তোরা) স্বার্থ-পিশাচ যেমন কুকুর তেমনি মুগুর পাসরে মান।
(তাই) কলজে চুঁয়ে গলছে রক্ত দল্‌ছে পায়ে ডল্‌ছে কান ॥
(যত) মাদী তোরা বাঁদী বাচ্ছা দাস-মহলের খাস গোলাম।
(হায়) মাকে খুঁজিস ? চাকরাণী সে, জেলখানাতে ভানছে ধান ॥
(মার) বন্ধ ঘরে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হল দুই নয়ান !
(তোরা) শুনতে পেয়েও শুনলিনে তা' মাতৃহন্তা কুসন্তান ॥
(তোরা) বাঁদর ডেকে মানলি সালিশ, ভাইকে দিতে ফাটল প্রাণ।
(এখন) সালিশ নিজেই খা ডালা সব, বোকা তোদের এই দেখান ॥

স্বাধীনতার দাবির লড়াইয়ে নিজেদের মীমাংসা নিজেরা না করে তৃতীয় পক্ষ ইংরেজকে ডেকে ব্যবস্থা করতে গিয়ে সমস্ত দেশটাকেই হারাতে হল। এখানে কবি দুটো লাইনের মধ্যে "কথা মালার" সেই দুই বিড়াল আর বাঁদরের গল্পের অবস্থাটা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। হিন্দু মুসলিম

দুই বিড়াল, সালিশ ইংরেজ-বাঁদরের কাছে স্বদেশকে রুটির মত তুলে দিলে সমান ভাগ করে দেবার জন্য। ন্যায়পরায়ণ (?) শ্বেতবুদ্ধি সম্পন্ন ইংরেজ দাঁড়িপাল্লার ওজনের ধাপ্‌পার আড়ালে সবটাই খেয়ে ফেলল। সেই থেকে দেশ কারাগারে পরিণত হল। যখন হিন্দু চেয়েছে দেশকে মুক্ত করতে মুসলমান তখন বিরোধীতা করেছে। আবার মুসলমান যখন ব্রিটিশ-বিরোধী নীল আন্দোলনে, পিণ্ডারী যুদ্ধে, ওয়াহাবী, ফরাজী প্রভৃতি আন্দোলনে ইংরাজকে ঘায়েল করতে চেয়েছে হিন্দুরা বিরোধীতা করেছে, সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের দুর্নাম দিয়ে তা যে অবহেলা করেছে, অবশ্য এর মধ্যে শয়তানের (ইংরাজরা) দু'কাঠিও খেলা করেছে—কিন্তু সত্যদৃষ্টি দিয়ে সম্মিলিত আন্দোলন কেউ করেনি।[১] তাই কবি বললেন ঃ

(১) উনবিংশ শতাব্দীতে এবং তার পূর্বে ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধী যে সকল আন্দোলন হয়েছিল, যেমন, সন্যাসী, ওয়াহাবী, ফরাজী, সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল, সিপাহী ইত্যাদি বিদ্রোহ হয়েছিল, তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা ধর্মের জিগির ছিল। কেউ কি অস্বীকার করতে পারেন যে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেও ধর্মের নামে মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে ইংরেজ বিরোধী করার পদ্ধতি ছিল না? ভারতবর্ষে এতবড় সশস্ত্র-বিপ্লবী আন্দোলনেও তাঁরা ধর্মে-দীক্ষা নিয়ে তবে বিশ্বস্ত কর্মী হতে পারতেন। এত দিনের মত পরিষ্কার কথা। মধ্য-যুগীয় আন্দোলনের এই ছিল পদ্ধতি। সেজন্য ওয়াহাবী, ফরাজী আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট বললে হবে কেন? ভারতীয় হিন্দুরা যেসব আন্দোলন করেছেন তাঁর মন্ত্র বা শ্লোগান ঠিক করেছিলেন "বন্দেমাতরম।" মুসলমানরা তাঁদের শ্লোগান ঠিক করেছিলেন "আল্লা হু আক্‌বর।" অথচ এই শ্লোগানের মাধ্যমে দুই হিন্দু মুসলিম মনগত ফারাকই থাকলেন, মুখে মিলনের নাটকাভিনয় চলতে লাগল। তারই ফল হল বুদ্ধিজীবী হিন্দু মুসলমানেরা, হিন্দু মুসলিম্ ধনতন্ত্রবাদীদের দালালি করে চোখের পলকে দেশ ভাগ করে ভারত-পাক-এর শাহান্‌শাহ্‌-সম্রাট হয়ে বসলেন।

অথচ আজও অনেক হিন্দু মুসলিম নিরপেক্ষ রাজনৈতিক কর্মী সাহিত্যিকরা "ওয়াহাবী" "ফরাজী" আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলে নির্দেশিত করেন। আমাদের গুপ্ত সমিতির আন্দোলনের পদ্ধতি অনুযায়ী তারাও বৃহৎ বৃহৎ আন্দোলনে জীবন দিয়েছেন, ফাঁসী গেছেন। কেউ বলতে পারেন ভারতবর্ষের বিপ্লব, আন্দোলনে যে সকল কর্মসূচী ছিল তাতে দেশ স্বাধীন হলে মুসলমানেরাও তার ভাগ পাবে, এ কথা তাতে ছিল? অবশ্য চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের মহানায়ক সূর্য সেনের স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী ও ইশ্‌তিহারের ভারতীয় হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলের স্বাধিকারই স্বীকার করে প্রচার করেছিলেন।

"(তোদের) হাড় খেয়েছে মাস খেয়েছে এখন চামড়াতে দেয় হ্যাঁচকা টান।
(আজ) বিশ্বভুবন ডুক্‌রে ওঠে দেখে তোদের অসম্মান্ ॥
(তোরা) করলি কেবল অহরহ নীচ কলহের গরল পান।
(আজো) বুঝলি না হায় নাড়ী ছেঁড়া মায়ের পেটের ভায়ের টান।"

হিন্দু মুসলমান যদি রাষ্ট্র অধিকারে জাতিভেদের এবং ধর্মের গোঁড়ামিকে স্থান না দিয়ে সম্মিলিত আন্দোলন করত তবে ইংরেজকে দাঁতে কুটো নিয়ে মাটিতে মুখ ঘস্‌ড়াতে ঘস্‌ড়াতে সমুদ্র পাড়ি দিতে হত। তাই কবি বলেছেন,

"ঐ বিশ্ব ছিঁড়ে আনতে পারি পাই যদি ভাই তোদের প্রাণ
(তোরা) মেঘ বাদলের বজ্র বিষাণ (আর) ঝড় তুফানের লাল নিশান ॥"

দেশের স্বাধীনতা আসে বহুর রক্তদানের মধ্য দিয়ে, যে রক্তদানের রং-এর প্রতীক হল লালনিশান। জগতে যারা সম্মিলিত শক্তির দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করেছে তাদের প্রতীক হল লালনিশান। এই লালনিশানকে কবি দেখে ছিলেন ফরাসী বিপ্লব ও রুশ বিপ্লবের মধ্যে। তাই তিনি ভারত-বাসীকে মুক্তি আন্দোলনের সম্মিলিত রক্তদানের মধ্য দিয়ে সার্থক করবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। যে সময়ে এই গান, কবিতা লিখেছেন, সে সময় পৃথিবীময় প্রধান প্রধান মুসলিম দেশগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। এদিকে কামালপাশা তুরস্ককে স্বাধীন করার জন্য অটল সংগ্রাম করে সফলতা করায়ত্ব করেছেন। "কামালপাশা" কবিতায় তাই লিখলেন—

"ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই
অসুর পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই।
কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই।
হো হো কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই।"

কামালের সংগ্রামকে কবি বলেছেন "তুর্কী নাচন।"

কামালের দাপটে অসুর পুর অর্থাৎ ইংরেজ প্রভৃতিরা একেবারে টলমল করে উঠেছিল।

"সুবহ্-উম্মেদ" কবিতায় লিখলেন—
"হিজরত করে হজরত কিরে
এলো এ মেদিনী মদিনা ফের?
নূতন করিয়া হিজরী গণনা
হবে কি আবার মুসলিমের?"

ধর্মনিরপেক্ষ অথবা রাজনৈতিক ধর্মকে গৌণ করে ভারতবর্ষের মানুষ মাত্রের সুখী সমাজ ও স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকারের প্রশ্নে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিই প্রথম আন্দোলন করেন ও দেশকে পরিচালনা করেন। নজরুলের বিপ্লবী সাহিত্যের বক্তব্যও এইটাই।

এশিয়া আফ্রিকার মুসলিমরা প্রায় একই সঙ্গে দিকে দিকে এগিয়ে চলেছে শুধু ভারতের মুসলিমরা তাদেব দেশের দিকে ফিরেও চাইছেন না; ভারতবর্ষকে মনেপ্রাণে দেশ বলে মেনে নিতে পারেননি। তাই কবি বলছেন—

"খর রোদ পোড়া খর্জ্জুর তরু
তারও বুক ফেটে ক্ষরিছে ক্ষীর।
সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা—
ভারতের বুকে নাই রুধির।"

মবক্কোর স্বাধীনতা যুদ্ধেব নেতা "গাজী আবদুল কবিম" রিফের সর্দার ছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত দলবল নিয়ে স্পেনেব বুকে অস্ত্রশস্ত্রসহ ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর বীরত্ব দেখে সমস্ত ইউরোপ তাঁর কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমানেবা ইংরেজের ভাঁওতায় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেননি। কবি তাই উক্ত কবিতায় লিখলেন—

"মরা মরক্কো মরিয়া হইয়া
মাতিয়াছে করি মরণ পণ,
স্তম্ভিত হয়ে হেরিছে বিশ্ব
আজো মুস্‌লিম ভোলেনি রণ।
জ্বালাবে আবার খেদিব প্রদীপ
গাজী আবদুল করিম বীর,
দ্বিতীয় কামাল রিফ সর্দ্দার
স্পেন ভয়ে পায়ে নোয়ায় শির।
রিফ শরিফ্‌ সে কতটুকু ঠাঁই
আজ তারি কথা ভুবনময়।
মৃত্যুর মাঝে মৃত্যুঞ্জয়ে
দেখে যাহারা তাদেরই জয়।
× × ×
ফেরাউন আজও মরেনি ডুবিয়া
দেরী নাই তার; ডুবিবে কাল।
জালিম রাজার প্রাসাদে প্রাসাদে
জ্বলেছে খোদার লাল মশাল।"

যখন পৃথিবীময় এই ভাব "স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার" এই বাণীকে সফল করার জন্য জনগণ প্রাণ পণ করছে তখন ইংরেজ কবলিত ভারতবর্ষের—

"কশাইখানার সাত কোটি মেষ
ইহাদের শুধু নাহি কি ত্রাণ ?
মার খেয়ে খেয়ে মরিয়া হইয়া
উঠিতে এদের নাই কি প্রাণ ?
জেগেছে আরব ইরাণ তুরান
মরক্কো আফগান মেসের।
এয় খোদা! এই জাগরণ রোলে
এ মেষের দেশও জাগাও ফের।

তাই প্রতিবেশী আফগানীস্থানের রাজা আমানুল্লা সিংহাসন ছেড়ে দেবার সময় "আমানুল্লা" কবিতায় লিখলেন—

"বুকের খুসির বাদশাহ তুমি, শ্রদ্ধা তোমার সিংহাসন
রাজাসন ছাড়ি মাটিতে নামিতে দ্বিধা নাই—তাই করি বরণ।
তোমার রাজ্যে হিন্দুরা আজো বেরাদার-ই-হিন্দ্ কাফের,
প্রতিমা তাদের ভাঙনি, ভাঙনি একখানি ইট মন্দিরের।"

এরপর দ্বিতীয় খলিফা 'উমর ফারুখের' অপূর্ব আদর্শ জীবনের কথা দেশবাসীকে শোনালেন, বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়কে তাঁর ন্যায়নিষ্ঠ উদার স্নেহময় জীবন সম্বন্ধে জানালেন। খাঁটি মুসলমান কে ? তার কাজের রূপই বা কি ? তিনি লিখলেন—

"শত প্রলোভন বিলাস, বাসনা ঐশ্বর্য্যের মদ
করেছ সালাম দূর হতে সব ছুঁইতে পারেনি পদ।
সবার ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া তুমি ছিলে সব নীচে।
বুকে করে সবে বেড়া করি পার আপনি রহিলে পিছে ;
হেরি পশ্চাতে চাহি—

তুমি চলিয়াছ রৌদ্র দগ্ধ দূর মরু পথ বাহি।"

দ্বিতীয় খলিফা 'উমর ফারুখ' মুসলিম জাতির এক শ্রেষ্ঠ নেতা। তার আদর্শময় অপূর্ব জীবন শিক্ষার এক বিশাল ভাণ্ডার।

কিন্তু ভারতীয় মুসলমানেরা ভারতবর্ষের চলমান আন্দোলনে যোগ না দিয়ে, ইংরেজ তাড়ানোর কাজে সাহায্য না করে ভাগাভাগিতেই মেতে রইল। কবি এই সব ব্যাপারে ব্যথা পেতে লাগলেন। দেশের জাতীয়

আন্দোলনে তখন দুই ধারাই প্রবল গতিতে চলেছে—বৈপ্লবিক ও অহিংস আন্দোলন। নজরুলের ইচ্ছা ছিল যে ভারতীয় মুসলমানেরা ভারতীয় বিপ্লবীদের সাথে হাত মেলায়। সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ভারতের আজাদি যাতে আসে সেই ভাবেই তিনি তাঁর লেখনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তারপর বিখ্যাত "খালেদ" কবিতায় লিখলেন—

মুসলমান
"খুন দেখিয়াছে, তুন বহিয়াছে,
নুন বহেনিক কভু।"

"নুন বহেনিক কভু" কথাব মানে হল, মুসলমান কখনও গোলামি করেনি। ভারতবর্ষের মুসলমানেরা গোলামির জোয়াল কাঁধে বহায় ভাবতেব বাইরের মুসলমানেরা কখনও এদের স্বজাতি বলে মানেনি।[২] যদি এরা দেশকে আজাদি দিতে পারত, তবে জগতে এরা স্বাধীন দেশের গৌববেব আসনে বসতে পারত ও সম্মানও পেত; কিন্তু হায় জডতাই ভাবতীয় মুসলমানকে সংগ্রাম বিমুখ করে দিয়েছিল, তাই তিনি "শহীদী ঈদ" কবিতায় লিখলেন—

"চাহি নাক" গাভী দুম্বা উট
কতটুকু দাম? ও দান ঝুট্।
চাই কোরবাণী, চাই না দান।
রাখিতে ইজ্জৎ ইস্লামের
শির চাই তোর তোর ছেলের।
দেবে কি? কে আছ ইস্লামের?

*　　　*　　　*

শুধু আপনারে বাঁচায় যে,
মুসলিম নহে ভণ্ড সে!
ইস্লাম বলে—বাঁচো সবাই।
দাও কোরবাণী জান ও মাল,

(২) ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে করাচীর আলীভ্রাতৃদ্বয় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে নিখিল ভারত মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সওকত আলী ও মহম্মদ আলী এই দুই ভাই মহাত্মাজীর আন্দোলনের একনিষ্ঠ দুইটি সেনানায়ক ছিলেন। মহম্মদ আলী আরবে মুসলিম ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদান করতে গিয়েছিলেন। তিনি সেই ধর্ম মহাসম্মেলনে কিছু বলতে চান তখন সকলে 'ভারতীয় মুসলমান মুসলমান নয়'—এই বলে তাঁকে কোন কথা বলতে দেয়নি। এই অপমানে তিনি গোলাম ভারতে না ফিরে মিশরে যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বেহেশত্ তোমার কর হালাল।
স্বার্থপরের বেহেশত নাই।
ডুবে ইসলাম, আসে আঁধার।
ইবরাহিমের মত আবার
কোরবাণী দাও প্রেয় বিভব।
"জবীহুল্লাহ" ছেলেরা হোক্।
যাক সব কিছু সত্য বোক্।
মা হাজেরা হোক মায়েরা সব।"

ঈদ উৎসবের মধ্য দিয়ে জাতীয় আন্দোলনের দিকে মুসলিম সমাজটাকে টানতে চাইলেন কবি। ঈদ উৎসব যে গরিব মুসলমানদের নয় ওটা ব্রিটিশের দালাল ধনী মুসলমানদের কথা, সে কথাও লিখলেন 'জাকাত লইতে এসেছে ডাকাত চাঁদ' কবিতায়।

'তুমি আল্লার হুকুম লইয়া বলিছ আকাশে যেন
ওরে শহিদান ভোগীরা এখনো জাকাত্ দেয়না কেন?
ভোগীদের উদ্ধত অন্নে আছে আছে অধিকার,
এই পৃথিবীর ক্ষুধিতের, এযে ফরমান্ আল্লার।
কেড়ে নে ওদের সঞ্চয়, সব কিছু লুটিয়া নে,
খোদার আদেশ পালন করিবি, বাধা দিবে তাতে কে?
কেন ভয়ে তোরা মরিয়া আছিস, জীর্ণ জরায় হায়,
হাতের নিকট ক্ষুধার খোরাক, মরিস তবু ক্ষুধায়?
হাত বাড়াবার নাইকি সাহস. হাতকি পঙ্গু তোর?
ডাকাত এসেছে জাকাত লইতে; ওঠ ওঠ কম জোর।
এসেছে ঈদের চাঁদ, আনিয়াছি আল্লার ফরমান,
এবার ধনীর দৌলতে এফতার হবে রমজান॥"

ব্রিটিশের ধনে ধনী হয়ে সাম্রাজ্যবাদের দালালি করে যে বিত্তশালী মুসলমানেরা মুসলমান সমাজকে বছরের বছর রোজায় রেখে ঈদের উৎসব করে, তাদেরও দৌলত লুটে নিয়ে রোজার এফতারের জন্য আহ্বান করলেন, কিন্তু কবি কারুর সাড়া পেলেন না। কবি যদি সাড়া পেতেন তাহলে রিফ-সুর্বারের মত, কামালের মত, তিনিও দেশের ঝুটা আজাদির বদলে সাচ্চা আজাদি আনতে পারতেন। সে আজাদিতে ধনী ও গরিব থাকত না। দেশের আপামর সকলেই খেতে পেত, পড়তে পেত ও শিখতে পেত। যে আজাদিতে প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত সে আজাদির কামনাই তিনি করেননি। তিনি 'কৃষকের ঈদ্' কবিতায় আরো স্পষ্ট করে বললেন—

"বেলাল ! বেলাল ! হেলাল উঠেছে পশ্চিম আস্‌মানে
লুকাইয়া আছ লজ্জায় কোন মরুর গোরস্থানে !
হের ঈদগাহে চলিছে কৃষক যেন প্রেত কঙ্কাল
কসাই-খানায় যাইতে দেখেছ শীর্ণ গরুর পাল ?
রোজা এফতার করেছে কৃষক অশ্রু সলিলে হায়,
বেলাল ! তোমার কণ্ঠে বুঝিগো আজান থামিয়া যায়।
থালা ঘটি বাটি বাঁধা দিয়ে চলিয়াছে হের ঈদ্‌গাহে
তীর-খাওয়া বুক, ঋণে-বাঁধা শির লুটাতে খোদা বরাহে
একটি বিন্দু দুধ নাহি পেয়ে যে খোকা মরিল তাব
উঠেছে ঈদের চাঁদ হয়ে কি সে শিশু-পাঁজরের হাড় ?"

বর্তমানের ইমামদেব কথা কবি বললেন—

"কোথায় ইমাম ? কোন সে খোৎবা পড়িবে। আজিকে ঈদে ?
চারিদিকে তব মূর্দার লাস, তারি মাঝে চোখে বিঁধে
জরীর পোষাকে শরীর ঢাকিয়া ধনীরা এসেছে সেথা
এই ঈদগাহে তুমি কি ইমাম ? তুমি কি এদের নেতা ?
নিঙাড়ি কোরাণ হদিস ওফেকা, এই মৃতদের মুখে
অমৃত কখন দিয়াছ কি তুমি হাত দিয়ে বল বুকে।"

উমর ফরুক, খালেদ প্রভৃতির মত নেতা তো ভারতবর্ষে দেখাই যায়নি, রিফ্‌ সর্দার করীম, কামাল পাশা, জগলুল পাশার মত যদি একজন নির্ভীক ও নির্লোভ নেতা আসতেন তবে কবি নজরুলের বাসনা পূর্ণ হত। সেই ভারতের হিন্দু-মুসলমান ধর্মান্ধর দল ধর্মের, অমৃতের নামে স্বার্থপরের বিষ পান করে, করে মাতলামি। এই মদ সরবরাহ করে ঝানু সাম্রাজ্য-বাদী তার টাকশাল থেকে তথাকথিত নেতাদের। কিন্তু শুদ্ধ, সত্য প্রেমের দৃষ্টি থাকলে, মানুষ মাত্রকে আপনজন ভাবলে তথাকথিত ধনবান ও বিত্তবান নেতাদের সৃষ্ট আন্দোলনের খোরাক ভারতের জনগণ কখনই হোত না। তাই কবি বললেন—

"আল্লার নাম লইয়াছ শুধু, বোঝনিক আল্লারে !
নিজে যে অন্ধ সে কি অন্যেরে আলোকে লইতে পারে ?
নিজে যে স্বাধীন হইল না স্বাধীনতা দেবে কাকে ?
মধু দেবে সে কি মানুষে, যাহার মধু নাই মৌচাকে ?"

নেতাকে চিনে নেবার জন্য বললেন কবি নজরুল, যার তার কথায় মহৎ কর্ম করতে যাওয়া ভাল নয়; তাতে সর্বজনীন ক্ষতি ছাড়া আর বিশেষ কিছুই হয় না। সেই ক্ষতিই আমরা হিন্দু মুসলমানেরা করে এসেছি।

এত করেও, এত লিখেও যখন কোন সাড়া পেলেন না, তখন কবির ভিতরে একটা হতাশা এসেছিল। এই সময় ১৯২৬ সালে কলকাতায় প্রচণ্ড দাঙ্গা বেঁধে গেল। কবি তখন কৃষ্ণনগরে থাকেন। কলকাতায় এসে তখন "গণবাণী" পরিচালকদের সঙ্গে দেখা করেন। বর্তমান, ভবিষ্যৎ দেশের কাজের কী রূপ হবে তারও আলোচনা হয়। কবিকে এই সময় খুব উত্তেজিত অবস্থায় দেখেছি। তাঁর এতদিনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ত্যাগ সবই যেন ধুলিস্যাৎ হতে চলেছে। যেন চোরাবালির উপর বাসা বেঁধেছিলেন এই সময় "যা শত্রু পরে পরে" লেখেন 'গণবাণী'তে ছাপা হয় ১২ই অক্টোবর, ১৯২৬ সালে। "হিন্দু মুসলিম যুদ্ধ" গণবাণীতেই ছাপা হয় ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৬ সালে। এর সঙ্গে দুটি প্রবন্ধও লেখেন "হিন্দু মুসলমান" নামে। এই প্রবন্ধ দুটি 'দুর্দ্দিনের যাত্রী' নামে গ্রন্থাকারে ছাপা হলে ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। কবি নজরুল এই সময় দেশীয় হিন্দু মুসলমানদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন তৃতীয় পক্ষের উস্কানিতে নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই কেন করছ। তৃতীয় পক্ষের যারা দালাল তারা ধর্মের মুখোস পবে তোমাদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। "হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধ" কবিতায় লিখলেন—

"তোদের আঘাতে টুটেছে তোদের মন্দির মস্জিদ,
পরাধীনদের কলুষিত করে উঠেছিল যার ভিত্।
(খোদা) খোদ যেন করিতেছে লয়
পরাধীনদের উপাসনালয় !
স্বাধীন হাতের পূত মাটি দিয়া রচিবে বেদী শহীদ।
টুটিয়াছে চূড়া ? ওরে ঐ সাথে টুটেছে তোদের নিদ,
কে কাহারে মারে , ঘোচেনি ধন্ধ ; টুটেনি অন্ধকার ,
জানেনা আঁধারে শত্রু ভাবিয়া আত্মীয়ে হানে মার।
উদিবে অরুণ, ঘুচিবে ধন্দ,
ফুটিবে দৃষ্টি, টুটিবে বন্ধ,
হেরিবে মেরেছে আপনার ভায়ে বন্ধ করিয়া দ্বার।
ভারত ভাগ্য করেছে আহত ত্রিশূল ও তরবার॥
যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ পড়ে মন্দির চূড়া
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রুদুর্গ গুড়া।
প্রভাতে হবে না ভায়ে ভায়ে রণ
চিনিবে শত্রু চিনিবে স্বজন,
করুক কলহ—জেগেছে ত তবু—বিজয় কেতন উড়া।
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন স্বর্ণ লঙ্কা পুড়া।"

কবি নজরুল ছিলেন আশাবাদের কবি। দাঙ্গার প্রথম দিকে উত্তেজনার পর নৈরাশ্য আসে। তারপরে দীপ্ত চোখে দেখলেন, যে-জাতি জড় ভরতের মত

ছিল সে যে কারণেই হোক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, তৃতীয় পক্ষ ও দালালের উস্কানিতে হানাহানি করছে; এই বিংশ শতাব্দীতে ভুল এদের ভাঙবেই একদিন, আজ না হয় কাল এই ভুল ওরা ধরতে পারবেই, তাই বললেন যারা ল্যাজে আগুন ধরিয়েছে সেই আগুন একদিন তাদের ঘরের মট্‌কাতেই লাগবে, আগুন লাগবে ইংরেজের স্বর্ণলঙ্কায়ও। কিন্তু সে ভুলও তাঁর ভাঙল সেদিন যেদিন মুসলমান সমাজের চাঁইরা তাঁকে কাফের বলে প্রচার করলেন। সেই থেকে বৃহত্তর মুসলমান সমাজের বাইরে সরে যেতে বাধ্য হলেন। মুষ্টিমেয় তরুণ মুসলিম অবশ্য তাঁকে ছেড়ে যাননি, তাঁরা মুসলিমও নন হিন্দুও নন। তাঁরা মানুষ, তাঁরা বাঙালী এই মধুর বোধটা তাঁদের ছিল। এইভাবে তিনি হিন্দু মুসলমানদের থেকে সরে যেতে লাগলেন। হিন্দুর ভেদনীতি ও মুসলমানের গোঁড়ামীর জন্য অন্তর ব্যথায় ভরে উঠেছিল। রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে তাঁর কবি হৃদয় অন্য খাতে প্রবাহিত হতে লাগল। নানাদিক থেকে কবির ওপর নানা প্রশ্নের হামলা চলছিল। তাই তিনি "আমার কৈফিয়ৎ" নামে একটি কবিতা লেখেন। কবিকে যখন কাফের বলে ফতোযা দেয় তখন তিনি তার উত্তরে বলেন—

মৌ-লোভী যত মৌলবী আর মোললারা কন হাত নেড়ে
দেব দেবী নাম মুখে আনে সবে দাও পাজীটার জাত মেরে।
ফতোয়া দিলাম কাফের কাজীও
যদিও শহীদ হইতে রাজী ও!
"আম্‌পারা"[৩] পড়া হামবড়া মোরা এখন বেড়াই ভাত মেরে
হিন্দুরা ভাবে পার্শীশব্দে কবিতা লেখে ও পাত-নেড়ে।
* * *
বন্ধুগো আর বলিতে পারি না বড় বিষ জ্বালা এই বুকে
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা
তাই লিখে যাই এ-রক্ত লেখা
বড় কথা বড় ভাব আসেনাক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছো সুখে।
পরোয়া করিনা বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে
মাথার ওপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা ক'রো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।

এখানে কবি লিখলেন "সোনার শত ছেলে"। এই সোনার শত ছেলে

(৩) আমপারা—কোরানের একটা অধ্যায়। এই বইটি কবি কাব্যানুবাদ করেছিলেন।

হল ভবিষ্যৎ ভারতের নয়া জমানার যুবক সম্প্রদায় ; "তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস" যারা খাচ্ছে তারা হল দেশী বিদেশী শোষক দল, তাদের অত্যাচারের অবসানের জন্য কবি লিখলেন, শত দুঃখকে অবহেলা করে, তাদের সর্বনাশের আশা ঐ ভবিষ্যতের সোনার ছেলেদের ওপর ন্যস্ত করেছেন ; তারা হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়, তারা ভারতবাসী।

বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানে ও বাংলায় কেরালায়ও দেখা যাচ্ছে যুবক ও ছাত্র-সম্প্রদায় ধর্মকে গৌণ করে বাস্তবমুখী আন্দোলনের পথে খরগতিতে চলেছে। পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র সম্প্রদায় থেকে তো বাংলা ভাষার জন্য তিন ডজন তরুণ শহীদই হোলেন। দেশ খণ্ডিত হলেও নজরুলের শিক্ষা যে তরুণ জীবনে মানুষের প্রেমে, মানুষের বাস্তব স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত হয়েছে, তাতে ভাবি মানবসমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখা দেবে।

নজরুলের ধর্মপ্রবণতা

প্রভো বিশ্ব মূলাধার !
অনন্ত নাম ধর তুমি তোমার হয় অনন্ত আকার
কখন সাকারেতে বিরাজ কর কখন নিরাকার।
কেহ তোমায় বলে কালী কেহ বলে বনমালী
কেহ খোদা আল্লা বলি তোমাকে ডাকে সারাৎসার,
নামের গুণে পারের দিনে সকলি হয় পার ॥
অনন্ত নাম ধরে ধরে ভক্তে বাঁধ ভক্তি ডোরে
তোমার টানে অনিবার ॥
তুমি দয়া করে ঘুচাও নাথ মনের অন্ধকার
হিন্দু কিম্বা হোক মুসলমান,
তোমার পক্ষে সবই সমান,
আপন সন্তান জাতি কি বিচার ?
ভক্ত, সকল জাতির শ্রেষ্ঠ, চণ্ডাল কি চামার।
জন্ম নিয়া মুসলমানে বঞ্চিত হব শ্রীচরণে
আমি মনে ভাবি না একবার।
এবার লালমামুদে হরেকৃষ্ণ নাম করেছে সার।[১]

কবি লালমামুদ মৈমনসিং জেলার 'বাওইডহর' গ্রামের এক দরিদ্র ঘরে জন্মেছিলেন। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে মসজিদের মারফৎ কখনও মিলাত সরিফের মধ্যে, কখনও কালী, রাধাকৃষ্ণ কীর্ত্তনের মধ্যে, আউল বাউল, সন্ত ফকীর প্রভৃতির সঙ্গে মিশে, জীবনের ধর্মকে বেছে নেবার জন্য তন্ময় হয়ে থাকতেন। কবি শিল্পীদের জীবন-ধর্মই এই। এই জীবন-ধর্ম যে শুধু কবি শিল্পীদের মধ্যে তাই নয়—যারা বিশিষ্ট গুণ নিয়ে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীমা নিয়া, গুণীর উপাদান নিয়ে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, তারা শিশুকাল থেকে অদৃশ্য গতির ও আবেগের তোড়ে বর্ষায় ঢল নামা অবস্থার মত নিজেরা পথ কেটে চলেন।

দুখুমিয়া বালক কালে সেই পরম আবেগ ও গতির স্পর্শ পেয়েছিলেন। তিনি আট বছর বয়স থেকেই এই প্রাণাবেগের আবর্তে আত্মসমর্পণ করে নিজের পথের ও পাথেয়র সন্ধানে বেড়িয়েছিলেন।

বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিরাই তাঁদের বালক কালের হাবভাবে, চলাফেরায়

(১) "বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি"—সঙ্কলিত শ্রীজ্যোতিন্দ্র-মোহন ভট্টাচার্য, কবিতা নং ৮৬।

যে-ভাব প্রকাশ করেন, তা তাঁরা তাদের অবচেতন মনেই করেন। কিন্তু গুণকে ও গুণীকে যারা চিনতে পারেন তাঁরা বলছেন যে শিশুর জীবন-প্রভাত আগামী দিনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

কবি নজরুলের জীবন ধারার উৎসমুখেই ভবিষ্যতের বিদ্রোহী কবির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ঐ দামাল দুখুমিয়াতে। ১৮।১৯ বছর থেকে ৩২ বছর বয়সের মধ্যে তাঁর মহৎ কর্ম শেষ করে ঐ বালককালের অধ্যাত্ম উৎসমুখে ফিরে গিয়েছিলেন ৩৫ বছর বয়স থেকে।

ভাবপ্রবণ দুখুমিয়া বালক কালে পীর হাজী পালোয়ানের মাজারের খাদেম হয়েছিলেন। চারদিকে উঁচু পাহাড়ী জমি। গাছে গাছে, লতায় লতায় স্থানটাকে প্রাচীরের মত ঘিরে রয়েছে, বৃহৎ দীঘির পারে রয়েছে মাজার, চারিদিকের মৌনতাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় যেন, তার মধ্যে ৮।৯ বছরের একটি গ্রাম্য বালক স্তব্ধ হয়ে পীরের মাজারের কাছে কী চাইছেন? কী তার কাজ সেখানে? ঝাঁট দিচ্ছে, সন্ধ্যায় দিচ্ছে ধূপ ধূনো গুগ্‌গুল আর আলোর মালা জ্বালিয়ে। উপবাসী হয়ে দিনে, কখনও কখনও রাত্রেও কী সাধনা সে করে? বালকের মনে জাগে ভাব, জাগে সুর, কথা এসে কণ্ঠের কাছে ঠেলাঠেলি করে, "হুজুর পালোয়ান আমায় মানুষ কর, আমায় মানুষ কর"—এই প্রার্থনা করে মাজারের পাথরে মাথা ঠুকে ঠুকে। কোন এক অজ্ঞাত ভাবের বৃশ্চিক-দংশনে সারাক্ষণ অস্থির হয়ে থাকে। কোন একটি মহৎ ভাবকে করতল মুষ্ঠিতে ধরবার জন্য বনের মধ্যে ছুটোছুটি করে। কখনও কখনও একা একা কথা বলে। ছন্দোবদ্ধ বাক্য দ্বারা প্রার্থনা করে চলে। এই ভাবের ও আচরণের মাধ্যমে ধর্মের ও মর্মের হদিস খুঁজে চলেছিলেন। সেই সময়েই দুখুমিয়া ঐ মাজারের 'এমামতি'র কাজও করেন। এমামতির কাজ বলতে বোঝায় ধর্ম ব্যাখ্যাকার। মাজারে যারা মানত করবার জন্য, পীরের অনুগ্রহ পাবার জন্য জমায়েত হত, তারা বালকের সেবার আগ্রহ দেখে, নিষ্ঠা ও ভাববিহ্বলতা দেখে তাঁকে বেশ সমীহ করে চলত। তারা দুখুমিয়ার কাছে মধুর ধর্ম ব্যাখ্যা শুনে মৌজ হয়ে যেত, ভুলে যেত তারা তাদের ঘর বাড়ি। ভুলে যেত তার সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে; ডাগর ডাগর ভাবাকুল চোখ দুটিতে সকলের গ্লানি যেন মুছে নিত, ফকীরের আশীর্বাদ যেন ঝরে পড়ত তার চোখ দুটি থেকে। ঐ সময়েই কবি মুসলমান ধর্মের উদার মতবাদ সুফী, মোল্লা, মৌলবীদের কাছ থেকে জেনেছিলেন। বালক, বয়সে অন্ততঃ বার বছর বয়স পর্যন্ত দুখু-মিয়া নিষ্ঠার সঙ্গে সকল প্রকার আচরণ করেছেন। কিন্তু উদার মতের যা পরিচয় পেয়েছিলেন স্বভাবতঃ সমাজের মধ্যে আচরণের মিল না দেখে ক্রমে সরে যেতে লাগলেন, তাঁর ভাষাতেই বলি, "মৌ-লোভী যত মৌলবী"দের থেকে।

পীরের খাদেম হয়েও দুখুমিয়া হিন্দুদের ধর্মমতের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ঐ বয়সে রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ভাগবত ইত্যাদি তন্ময় হয়ে পড়তেন। কাছাকাছি যেসব সাধু সন্ত থাকতেন তাদের আস্তানায় যাতায়াত

করে লক্ষ্য করতেন, অনুভব যাতে করতে পারেন তার জন্য প্রার্থনা করতেন পীরের মাজারে। হুগলীতে থাকতে মাঝে মাঝে বলতেন, "এখনও পীরের উদাত্ত আহ্বান আমি রাত্রে শুনতে পাই।" হাজী পালোয়ান সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত বীরত্বের এবং যৌগিক ক্ষমতার প্রবাদ কথাও বলতেন। সেই প্রবাদ বাক্য থেকে বোঝা যায় পীর হাজি পালোয়ান একজন উদার সুফী সন্ন্যাসী ছিলেন। এই সুফী সন্ন্যাসীর আস্তানায় কবি নজরুলের মানব-মুক্তি সাধনার দীক্ষা হয়েছিল বলে বলেন। দুখুমিয়ার এই শক্তি সাধনার উৎস প্রবাহিত হয়েছিল মনুষ্য সমাজের দিকে। শক্তিহীন, বোধহীন আচার-সর্বস্ব জাতিকে বীর্যবান করে তুলতে চেয়েছিলেন হাজী পালোয়ানের শিষ্য নজরুল। জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার সে পথ তিনি নিয়েছিলেন গান, সুর ও বাণীর পথে। সেই পথ পেয়েছিলেন লেটো নামক গ্রাম্য গানের দলে।

কবিব মনের অস্থিরতা তাকে ঐ সময় ঘব ছাডা করে দেয়। মাঝে মাঝে কোথায় যান আবার ঘরে ফিরে আসেন। মাজারে কিছুদিন স্তব্ধ হয়ে থাকেন, আবার কোথায় পাডি দেন। ধর্মেব আচার আচরণের অনুশীলন ক্রমে কমে আসতে থাকে, বাডতে থাকে অন্তরঙ্গ ধর্মবোধের গভীরতা। তাঁর ব্যবহারে গ্রামের লোকেরা বুঝতে পারে না তার অন্তর্মুখী গতিকে। সেই থেকে তাকে গ্রামের সবাই "তারাক্ষেপা" নাম দিল। এই সময় বামাক্ষেপা বেঁচে আছেন। তাঁর নাম নিখিল ভারতে ছড়িয়ে গিয়েছে। কবির জন্মভূমি থেকে তারাপীঠ খুব দূর নয়। বর্ধমানের শেষে বীরভূমের শুরু, এই সীমাবেখায় চুরুলিয়া গ্রাম। ঐ গ্রাম থেকে নানুর, কেন্দুলিও খুব দূরে নয়। যেমন শক্তি সাধক বৈষ্ণব মহাজন তেমনি বাউল ও সুফী ফকিরের সমাবেশ এই বীরভূমের সীমান্তে ছিল। তাই ওখানকার একটা রেওয়াজই হয়েছিল ভাবুককে "ক্ষেপা" বলে ডাকা। নজরুলকেও সবাই এই রেওয়াজেই "তারাক্ষেপা" বলে ডাকত। কবি নজরুল কোনদিন তারাপীঠে গিয়ে বামাক্ষ্যাপাকে দর্শন করেছিলেন বলে জানা যায় না। তবে ধর্মের জন্য তার যে একটা ক্ষ্যাপামি ছিল বা খেয়াল ছিল সেটা সত্য, সেই জন্যই ঐ নামটা তার হয়েছিল।

শক্তিকে হাতেকলমে জানবার জন্য দুখুমিয়া কাজী নজরুল ইসলাম প্রাণ তুচ্ছ করে সৈনিকব্রত গ্রহণ করে প্রথম মহাযুদ্ধের সৈনিকরূপে যোগ দিয়েছিলেন। এই জন্য তিনি খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন অন্তরলোকের পথ থেকে। কিন্তু সে রেশ যে রয়ে গেল তা তাঁর পরবর্তী লেখায় বোঝা যায়। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে "বাণী বন্দনায়" লিখলেন,

"রক্তাম্বর পর মা এবার
জ্বলেপুড়ে যাক শ্বেতবসন্;
দেখি ঐ-করে সাজে মা কেমন
বাজে তরবারি ঝনন-ঝন্।

শ্বেত শতদল-বাসিনী নয় আজ
রক্তাম্বরধারিণী মা।
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।"

মনোযোগ দিয়ে দেখলে কবির চিন্তাধারাকে ধরতে পারা যাবে। কবি জাতিকে শক্তিমান হতে বলেছিলেন, ন্যাকামি আর মেয়েলিপনা পরিহার করতে বলেছিলেন। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে নূতনরূপে চিন্তা করার জন্য আহ্বান করেছিলেন বিদগ্ধজনদের। তিনি দেখেছিলেন, ভারত তথা বাঙলার লোকেরা বহিরঙ্গ পূজায় এত মেতেছে যে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে। তাই হাজী পালোয়ানের শিষ্য জাতিকে পালোয়ান হবার জন্য বললেন—

"টুঁটি টিপে মার অত্যাচারে মা,
গলার হার হোক নীল ফাঁসী,
নয়নে তোমার ধূমকেতু জ্বালা
উঠুক সরোষে উদ্ভাসি।
হাস খল খল দাও করতালি
বল হর হর শঙ্কর!
আজ হতে মাগো অসহায় সম
ক্ষীন ক্রন্দন সম্বর।"[১]

নিজের শক্তি সম্বন্ধে জাতি ইচ্ছা-অন্ধের মত চোখ বুজে অসহায়ের কান্নায় কপাল চাপড়ে অত্যাচারীকে দোষ দিয়ে নিজের নিজের কর্তব্যে অবহেলা করছে, প্রবল ইংরাজ তার বুটের চাপে বুক মাড়িয়ে গুড়িয়ে শাসন করছে। কবি নজরুল তা সহ্য করতে না পেরে তার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। তিনি দেখলেন জাতিকে ফেলে নিভৃত সাধনায় যদি পড়ে থাকি তাহলে আমার নিজের 'উন্নতি' হতে পারে, কিন্তু জাতি ও দেশের মানুষ থাকবে পেছনে পড়ে। তাই সেই আত্মকেন্দ্রীক পথে না গিয়ে তিনি দু-হাত বাড়িয়ে জাতিকে বীরত্বের সাধনায় আহ্বান করলেন। প্রবলকে বিনাশ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে বললেন। বললেন আগে সবাই বাঁচ তারপর বাইরের আচারের দ্বারা মনকে উন্নত করবে। সেইজন্য লিখলেন "জাতির বজ্জাতি" গান—

(১) নজরুল ১৩৩৩ সালে ৫ই জ্যৈষ্ঠ "ছাত্রদল"-এর গান লেখেন। তাতে আছে,

"তাজা খুনে লাল করেছি
সরস্বতীর শ্বেত কমল।"

"জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছ জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে জাত ছেলের হাতের নয়ত মোয়া।
বলতে পারিস বিশ্বপিতা ভগবানের কোন্ সে জাত
কোন ছেলের তার লাগলে ছোঁয়া অশুচি হন জগন্নাথ।"

এমনি করে যুক্তি দিয়ে ঘরে ঘরে যেয়ে সবাইকে সচেতন করতে লাগলেন। জাতিকে বললেন তোমরা তোমাদের অবস্থাটা বুঝে দেখ, যেখানে ধামা ধরছ, জুতোর ঠোক্কর খাচ্ছ ঃ

"দিন-কানা সব দেখতে পাস না দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে
কেমন করে পিষছে তোদের পিশাচ জাতের জাঁতাকলে ?
তোরা জাতের চাপে মারলি জাতি সূর্য্য ত্যজি নিলি বাতি
তোদের জাত ভগীরথ এনেছে জল জাতবিজেতের জুতো ধোওয়া।"

ভেদাভেদের বিষ জাতিকে একেবারে জর্জরিত করে দিয়েছে। ধর্মের নামে, আচার সর্বস্বতার মাধ্যমে অমানুষের পর্যায়ে এনেছে. এই গ্লানি এই অন্তর্বিমুখতা থেকে জাতিকে শুদ্ধ করে সংগ্রামী করে তুলবার ব্রত নিলেন। যুক্তি দিয়ে তিনি বললেন ঃ

"ভগবানের ফৌজদারী কোর্ট নাই সেখানে জাত বিচার,
(তোর) পৈতে টিকি টুপি টোপর সব সেথা ভাই একাকার।
জাত সে শিকেয় তোলা রবে
কর্ম নিয়ে বিচার হবে

(তা'পর) বামুন চাঁড়াল এক গোয়ালে নরক কিম্বা স্বর্গে থোওয়া।"

কবি মুকুন্দ দাসের একটি গানে আছে—

"এসেছ ল্যাংটা যাইবে ল্যাংটা
মাঝখানে কেন গণ্ডগোল ?"

জন্মাবার পর থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই সময়টুকুকেই কবি "মাঝখানে" বলে বলেছেন। এই মাঝখানেই যত ভেদাভেদ, রেষারেষি, বড়র দাপট, ছোটর চোখের জল, কিন্তু চোখ বুঁজলেই সব মিয়ার স্থান হল ভস্মে কিম্বা মাটিতে। এই বিষয়ে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে নজরুলের লেখা এই কটা লাইনে ঃ—

"(এই) আচার বিচার বড় করে প্রাণ দেবতায় তুচ্ছ ভাবা
(বাবা) এই পাপেই আজ উঠ্‌তে বস্‌তে সিঙ্গী মামার খাচ্ছ থাবা।

(তাই) নাইক অন্ন নাইক বস্ত্র,
নাইক সম্মান নাইক অস্ত্র,
(এই) জাত জুয়াড়ীর ভাগ্যে আছে আরো অশেষ দুঃখ সওয়া”

ধর্ম ব্যবসায়ীরা জুয়াড়ীর মত জাত নিয়ে জুয়া খেলছে; জুয়া খেলার মৌতাতে প্রাণ-দেবতাকে তুচ্ছ করে আচার-সর্বস্ব করে ধর্ম নিয়ে ফাটকার বাজারে জাত-ধর্ম বিকৃত করছে। মানবের প্রাণ-ধর্ম চাপা পড়ছে এই ধর্ম ব্যবসায়ীদের লোভ-পাষাণের তলায়। জাতির অন্তর-মুখে যে-পাথর চাপা রয়েছে তাকে অপসারণের ব্রত নিয়ে কবি নেমে পড়লেন পথের ধূলায়, বললেন—

“যা আছে থাক্না চুলায়
নেমে পড় পথের ধূলায়
নিশান দুলায় ঐ প্রলয়ের ঝড় রে।”

হাজী পালোয়ানের খাদেম দুখুমিয়া নির্জন সাধনায় যে মর্মবোধ পেয়েছিলেন, সেখানে হিন্দু মুসলমান কিছুই নেই, সেখানে আছে অত্যাচারিত, শোষিত বাঙালী, গোলাম বাঙালী, মোহাচ্ছন্ন বাঘের বাচ্চা বাঙালী তার নিত্য অসম্মান, অবহেলা দারিদ্র্যে দুঃখে, ছেলে মেয়ে নিয়ে নিত্য অনাহার জর্জরিত বাঙালী। এই বাঙালীকে কবি নজরুল দূরে সরিয়ে নিজের আত্মিক চিন্তায় মগ্ন না থেকে প্রলয়োল্লাসে শূলপানির শূলের মত ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। জাতিও তাঁর এই কামনার সঙ্গে আন্দোলনের মাধ্যমে এগিয়ে গিয়েছিল। মানুষের স্বাধীনরূপে বেঁচে থাকার এই মর্ম উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর লেখায়—

“অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানেনা সন্তরণ
কাণ্ডারি! আজি দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি পণ!
হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারি! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।”

কবি নজরুলের দেশের মানুষ অসহায় ভাবে ডুবছে, এটা তিনি সহ্য করতে পারেননি। দেশের ইজ্জত, গৌরব দেশের মানুষ। মানুষই গৌরব সৃষ্টি করতে পারে। সেই মানুষের সমবেত শক্তিই কবির মাতৃরূপ, মরমিয়া-ধর্মী নজরুলের এই ছিল ইষ্টদেবী। ইষ্টদেবীর চিন্তায় কবির লেখনী এগিয়ে চলেছিল। অন্তরের প্রেমধর্মকে সকলের মধ্যে সংক্রামিত করে চলেছিলেন। এই প্রেম-ধর্মে তিনি মানুষের বহির্মুক্তি চেয়েছিলেন, অর্থাৎ স্বাধীনতা। তিনি বলতেন গোলাম কখনও বড় কাজ করতে পারে না। গোলামির বেড়ি ভেঙে জাতি যদি স্বাধীন হতে পারে তবে সে মুক্তির পথ পাবে। নইলে

একা একা মোক্ষতে কি লাভ ? তাই মানুষ হয়ে মানুষকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন :—

"কেন খুঁজে ফের দেবতা ঠাকুর মৃত-পুঁথি কঙ্কালে ?
হাসিছেন তিনি অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালে।"

পরে লিখলেন,—

"মস্‌জিদ এই, মন্দির এই, গীর্জা এই হৃদয়।
এই খানে বসে ঈশা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কোথা নাই।"

বীরভূমের সীমান্তে চুরুলিয়া গ্রামের দুখুমিয়া অনেক সহজিয়া সুফী, ফকীর, বাউল, আউল, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতির সঙ্গে ঘুরেছেন। সুফী সন্ন্যাসীর মাজারের অসীম নির্জনতায় মাথা খুঁড়ে যে-সত্যের পরিচয় পেয়েছিলেন তাই অস্ত্র করে মিথ্যার ব্যবসায়ী ইংরাজ ও তার সাহায্য-কারীদের বুকে শূলের মত নিক্ষেপ করেছিলেন। তার ফলও ফলেছে, কিন্তু সেই ফল ভোগ করছে স্বার্থান্বেষীরা।

কবি নজরুলের মন ক্রমে ক্রমে অন্তর পথের দিকে পা বাড়াল। ১৯২৯ সালের শেষ দিকে "ঠকচাচা" বন্ধুর দলের ব্যবহারে তিনি মনে আঘাত পান। তার মধ্যে দুই একজন প্রকাশক ও রাজনৈতিক মেজদাদা গোছের নেতাও ছিলেন। এই সব লোকদের নীতি ছিল নিজেদের "কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী।" এই ভাবে তারা কবি নজরুলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায় কবি ক্রমে আবার নিভৃতবাসী হয়ে পড়লেন। এই সময় কবি নতুন করে সামুদ্রিক গ্রন্থ, জ্যোতিশ শাস্ত্র, কোরাণ, পুরাণ, বেদ, বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পড়তে শুরু করেন। তার সঙ্গে যোগশাস্ত্র পড়ে আসন প্রাণায়াম মুদ্রার মাধ্যমে মনকে কী করে কেন্দ্রীভূত করা যায় তারই হদিস খুঁজতে লাগলেন। অবশ্য তখনও যোগ অভ্যাস না করে গ্রন্থই পড়ছিলেন। এই সময় তিনি ভক্তিমূলক গান লিখতে শুরু করেন। "চলমন আনন্দ ধাম", "এস হৃদি রাস-মন্দিরে এস হে রাসবিহারী কালা", "আমার সকলি হরেছে হরি", "কোথায় তুই খুঁজিস ভগবান সে যে রে তোরই মাঝারে রয়", "আমার কালো মেয়ের পায়ের তলে দেখে যা আলোর নাচন", "তুমি দুখের বেশে এলে বলে ভয় করি কি হরি ?" "ধ্যান ধরি কিসে হে গুরু তুমি যোগ শিখাইতে এলে ?" "হে গোবিন্দ ও অরবিন্দ চরণে শরণ দাও হে" প্রভৃতি অজস্র গান কবি লিখে চললেন। এর সঙ্গে চলল তাঁর নিভৃত নিঃসঙ্গ জীবন। বহুলোকের সমাগমের মধ্যেও তিনি তাঁর চারিদিকে নির্জনতার বেড়া দিয়ে থাকতেন। তখন উপার্জনও করছেন

অজস্র, কিন্তু কোথায় যেন খট্‌কা রয়েছে তাঁর চলার মধ্যে। ফজলুল হক-সাহেব খুব ঘটা করে দ্বিতীয় পর্যায় "দৈনিক নবযুগ" পত্রিকা প্রকাশ করলেন আপার সার্কুলার রোডে কাজী নজরুল ইসলামকে প্রধান সম্পাদক করে। কবি সম্পাদকীয় লিখতে লাগলেন বড় বড় কবিতায়। আবার জ্বালাময়ী গদ্যেও সম্পাদকীয় স্তম্ভ পূর্ণ হতে লাগল। কিন্তু এই এলাহি কাণ্ডের মধ্যে থেকেও কবি আনমনা ও উদাসীন থাকতেন।

কবি নজরুল আধ্যাত্মিকতার পথে যে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তা তার কয়েকটি ব্যবহারে ধরা পড়ছিল। হকসাহেব প্রধান মন্ত্রী হয়ে দিল্লী থেকে ফিরবেন শুনে নানা দৈনিক কাগজের প্রতিনিধিরা হাওড়ায় সমবেত হয়েছিলেন। 'দৈনিক কৃষক' ও 'নবযুগের' ছোটবড় কর্মীরাও সকলেই সেখানে উপস্থিত। কবি নজরুলও ঐদিন হাওড়ায় গিয়েছিলেন। তাঁকে কয়েকটি তরুণ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করায়, নজরুল বললেন—"এ প্রণাম তো আমার প্রাপ্য নয়। যে সর্ব্বশক্তি মহামায়ার বিভূতি আমার মধ্যে রয়েছে এ প্রণাম তাঁরই পাওনা, তাঁকেই আমি ফিরিয়ে দিলাম।" যেসব তরুণ উপস্থিত ছিলেন তাঁরা কবির কথাকে হেঁয়ালী বলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই সময়টা কবি সেই মহামায়ার চিন্তায় টইটম্বুর হয়েছিলেন! কিন্তু চিন্তা আর কাজ তো এক কথা নয়। চিন্তায় যতটা এগিয়ে যাচ্ছিলেন কাজে ততটা এগুতে না পারায় মনে তাঁর সোয়াস্তি ছিল না।

কবির প্রিয় পুত্র বুল্‌বুল্ এর আগেই মারা গিয়েছিল। তাতে কবি খুব শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। কিছুদিন যাবার পরে সাধ্বী স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেই বালক কালের অন্তর্মুখীনতা আবার অন্তরে সাড়া দিয়ে ওঠে। এই সময়ে অজস্র টাকা ব্যয় করে চিকিৎসা করেও স্ত্রীকে রোগমুক্ত করতে পারেন না। কখনও শিবের মানৎ করেন, গুণী পীরের সাহায্য নেন। যে তারকেশ্বরের মোহন্ত তাড়াবার জন্য গান লেখেন সেখানে স্ত্রীর রোগমুক্তির জন্য দাঁতে কুটো নিয়ে হত্যা দিয়ে পড়ে থকেন, কালীবাড়িতে পাঁঠা বলিদান করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। স্ত্রীকে রোগমুক্ত করতে না পেরে মনের ধৈর্য হারাবার উপক্রম হয়।

বিক্ষিপ্ত অবস্থায় একদিন সকালে সাড়ে দশটার পর আর মেগাফোন কোম্পানির অফিসে থাকতে পারলেন না। সেদিন কনকনে শীত। বেড়িয়ে এলেন হ্যারিসন রোডের উপর। দৃষ্টি ঠিকরে পড়ল ও-ফুটপাতে। সামনে ও কি! ওঁরা কারা!

"তারা" এসেছেন "বামার"[৩] ছবি নিতে। এ ছবি ফটো নয়। সাধারণ জগতের ছবি নয়। ব্রহ্মার সঙ্গে বামা যখন এক ; এ হল সেই অবস্থার ছবি। বিশ্বের চিত্রজগতে এ ধরনের চিত্র এই প্রথম। অসাধারণ কল্পনা। এই কল্পনা আকাশ কুসুম নয়। ইমেজ থেকেই ইমেজারি। বস্তু সাপেক্ষ। বড় গুহ্য

(৩) "তারা" হলেন তারাক্ষ্যাপা। "বামা" হলেন বামাক্ষ্যাপা। তারা-ক্ষ্যাপা ছিলেন বামাক্ষ্যাপার প্রধান শিষ্য।

রঙের ইঙ্গিত। বড় গোপন সাধনার অমূল্য সম্পদ; এঁকেছেন দেশ বিদেশের খ্যাতিসম্পন্ন বিদ্রোহী চিত্রশিল্পী সিদ্ধপুরুষকে ধরেছেন তুলিকার সাহায্যে কুলাচারী অবধূত। যোগীবর বড় প্রচ্ছন্ন থাকেন। আত্মগোপন করা তাঁর স্বভাব। জনসাধারণকে ধরা ছোঁয়া দেন না। যাঁরা জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত তাঁরা তাঁর প্রসংশায় পঞ্চমুখ। তাঁকে ভালবাসেন। অধ্যাত্মপথে যাঁরা চলাফেরা করেন তাঁরাই এর কথা অনেক বলেন। তাঁরা শ্রদ্ধা করেন। মনে পড়ল একটা কথা। সে কথা না বলে থাকতে পারছি না।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় একদিন বলে উঠলেন, "জান তো যুগান্তরের পূজা সংখ্যাটির ব্যাপার। অবনীন্দ্রনাথের হাতে সেই সংখ্যাটি দেওয়া হ'ল, কভারটি দেখতে দেখতে ঠাকুর মহাশয় কি রকম হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে ছল ছল নেত্রে বললেন—"মন্দিরের বাইরে রয়ে গেলুম আমরা কারুকার্য্য নিয়ে, 'ভোলা'[৪] এল মন্দিরের মধ্যে ঢুকে "মা"কে চুরি করে নিয়ে গেল।"

কাজী এঁদের দূর থেকে চিনতে পারলেন। চট্ করে ছুটে এলেন এ ফুটপাতে। চড়বে তারাক্ষ্যাপা ছবি নিয়ে মোটর গাড়িতে।

কবি এসে দু'জনকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করলেন। তারাক্ষ্যাপা হেসে বললেন, কাজী অনেকটা এগিয়ে এসেছে। যাই ভাই আমাকে এখনই যেতে হবে। উনি তো রইলেন ওঁর সঙ্গে আলাপ কর। মোটর ক্ষ্যাপাকে নিয়ে স্টার্ট দিল।

বিদ্রোহী কবি, বিদ্রোহী শিল্পীকে নূতন ভাবে দর্শন করলেন। কি দেখলেন। আমরা দেখি একজন পুরুষ একাধারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ নীরব কর্মবীর, অনাসক্ত চিত্রশিল্পী আবার আধ্যাত্মিক রাজ্যে চিন্তামগ্ন পরিব্রাজক অবধূত। কবি তাঁকে বললেন—"শান্তি কি করে পাব?"

যোগী ধীর কণ্ঠে বললেন, শান্তিতো তোমার হাতে কবি। কি ভাবছ, যা ভাবছ তা নয়; after all human flesh is too weak. মানুষের অপরাধ কি!......ঔষধ খেলে কি হবে যদি system ঔষধ ধারণ না করে? ধর্ম ধর্ম করে ক্ষেপলে তো হবে না। আগে দেখ কে ধারণ করছে। কেই বা ধর্ম করতে চলেছে। রক্তমাংসে গড়া কবির system না universal system-এর শক্তির কবি। ধর্ম বোঝা অত সোজা। তার ওপর ধর্ম দুর্বলের নয়। ধর্ম সবলের। তারপর ধর্মরূপ সাপ নিয়ে নাড়াচাড়া কর। তুমি যে পথ নিতে এখন চলেছ ও পথ ছেড়ে দাও।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরোধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

(৪) শিল্পাচার্য পূজনীয় শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়। এঁর সন্ন্যাস আশ্রমের নাম ব্রহ্মানন্দ অবধূত। শিল্প জগতের নাম ম্যাক্স। পরিশিষ্টে শিল্পাচার্যের পরিচিতি দ্রষ্টব্য।

তন্ত্র এখন তোমার নয়। তান্ত্রিক দীক্ষা বা কোন দীক্ষা নিয়ো না। তন্ত্র তোমার সহ্য হবে না। বিশেষতঃ তোমার দেহ ওতে গড়া নয়। তন্ত্র সাধকের জন্য। অন্য কারও জন্য নয়। সাধক ছাড়া তন্ত্রের অধিকারী হতে পারে না। তোমার দীক্ষার প্রয়োজনও দেখি না। যেমন আছ কবি হয়ে তেমনটি থাক। মনে হয় তাঁর কৃপায় তোমাদের ইসলাম ধর্মের একটি "গোপন রাত্রি"র যে রূপটি আছে তার দর্শন তোমার হয়ত মিলতেও পারে। কবি ইসলাম ধর্মের দু'একটি কথা উত্থাপন করলে তিনি মুসলমান ধর্মের গুরু সাধনার মূল বস্তু বুঝিয়ে দিলেন। গোপন সাধকের নিগূঢ় সাধনার মূল রূপই এক। তোমাদের মুসলমান ধর্মে কি "সোহং" নাই? দুই-ই এক, এ ধর্ম ভাল ও ধর্ম মন্দ তুমি যে বলছ কিসের আপেক্ষিক বিচারে! বিষয় বস্তু নিয়ে। না, তা হয় না, বিষয় বস্তুতে ভাল মন্দ নাই। আসল ভাল মন্দ মনেতে! ধ্যান করে যাচ্ছ। ওতে কিছু হবে না, শুধু সময় নষ্ট। আগে সংযমী হও। তবে তো ধ্যান ফলবে।

তারপর "মঙ্গলময় রাত্রির" দু একটি লক্ষণ ও সঙ্কেত কবিকে বুঝিয়ে দিলেন। আর বললেন, "স্ত্রীর বুঝি অসুখ। মৃত্যু কি গাছের ফল মট করে বোঁটা ভেঙ্গে নিলেই হল, যাও গৃহে যাও! গোলমাল করো না।' কিন্তু সাবধান। চট করে শক্তির সাধনা করতে যেও না। বলেই বা কি হবে এ যে 'প্রাক্তন'" এই বলে অবধূত মৃদু হেসে তীরের মত বেগে রাস্তায় লোকের মধ্যে কোথায় গিলিয়ে চলে গেলেন।

কাজী রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিহ্বল। "মঙ্গলময় রাত্রির" কথাতে চোখ থেকে কবির টপ্ টপ্ করে ফল্গুধারায় জল ভেঙে পড়ল। প্রায় বিশ মিনিট পরে কবি আপনাতে ফিরে এলেন। চেয়ে দেখলেন দু' দশ জন পথিক বিস্ময়ে কবির দিকে তাকিয়ে আছেন। কবি কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরলেন।

কিছুদিন কেটে গেল কবির মন ক্রমশঃ অন্তর্মুখী হয়ে চলেছে। ১৯৩৬ সাল, দেশমাতার ভক্ত সন্তান নজরুল মহাকালীর ভক্ত হয়ে উঠলেন! লালগোলার হাই স্কুলের শিক্ষকের সঙ্গে ঘটনাক্রমে কবির সাক্ষাত হল। তিনি গৃহীতান্ত্রিক বরদাচরণ আগমবাগীশ। তাঁর কাছ থেকে তান্ত্রিক মতে দীক্ষা নিয়ে নজরুল সাধনা শুরু করেন। শ্রদ্ধেয় আগমবাগীশ কোন রকম যোগাভ্যাস করতে নিষেধও করেছিলেন। আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা ইত্যাদি উপযুক্ত যোগীগুরুর কাছে না শিখে অভ্যাস করতে নিষেধ করায় কবি প্রথম প্রথম ভাব সাধনা আরম্ভ করেছিলেন। সাধনার পর "জবার" গানটি লেখেন—

"বল্‌রে জবা বল্
কোন সাধনায় পেলিরে তুই
শ্যামা মায়ের চরণ তল্।

তোর সাধনা আমায় শেখা (জবা)
জীবন হোক সফল।
মায়া-তরুর বাঁধন টুটে
মায়ের পায়ে পড়লি লুটে,
মুক্তি পেলি উঠ্‌লি ফুটে
আনন্দ বিহ্বল।
কোটি গন্ধ কুসুম ফোটে
বনে মন-লোভা
কেমনে মা'র চরণ পেলি
তুই তামসী জবা।
তোর মত মার পায়ে রাতুল,
হব কবে প্রসাদি ফুল
কবে উঠবে রেঙে
মায়ের পায়ের ছোঁয়া লেগে
কবে তোরই মত রাঙবে রে মোর
মলিন চিত্তদল।"

কবি এইখানে জবাকে "তামসী" বলেছেন, কারণ মানুষও তামসী, জবাও তামসী। কিন্তু জবা মায়ের চরণ পেল আর আমি পাব না?—কবির এই ব্যাকুলতা দেখেছি।

স্ত্রীর অসুস্থতা এই সময় চরমে ওঠে। আস্তে আস্তে যা প্রিয় তা সবই চলে যাচ্ছে, বন্ধুদের আঘাত, অবিশ্বাস প্রভৃতিতে তিনি নারায়ণকে আহ্বান করে বললেন,—

"তোমার মহাবিশ্বে কিছু
হারায় নাতো কভু
আমরা অবোধ অন্ধ মায়ায়
তাইত কাঁদি প্রভু
তোমার মতই তোমার ভুবন
চিরপূর্ণ হে নারায়ণ,
দেখতে না পায় অন্ধ নয়ন
তাই এ দুঃখ প্রভু।"

তিনি যে জগতকে, মানুষকে ভালবেসেছিলেন, অনন্ত বিশ্বাসে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেছিলেন, সে সব যে মিছে নয়, অনাদিকালের বিধাতা যে সব গ্রহণ করেছেন, এবং কালের কুটিল স্রোতও নজরুলকে স্বীকার করে নেবে, তাঁর কর্মজীবনে যে সত্য ছাড়া মিথ্যার আশ্রয় ছিল না, সেই বিষয়টা যে তার নানা রচনার মধ্যে বেঁচে রইল, সেই কথাই কবি এই গানটির মধ্যে বলে গেছেন।

কিন্তু মন তাঁর সেই মহামায়ার জ্যোতি না দেখে আর শান্তি পাচ্ছিল না। তাই তিনি এই সময় আহার প্রায় ছেড়ে দেন, শুধু চায়ের উপর থাকেন। রেকর্ড কোম্পানিগুলিতে গানের ডাইরেকসন দেন, গলা শুকিয়ে ওঠে, প্রচুর চা ও পান দিয়ে গলাকে সরস করে রাখেন। এই সময় বেতারে তাঁর "বিচিত্রা'র" আসর ছিল। মাঝে মাঝে বেতারে নাটকও করতেন, সিনেমা, নাটকে গান লিখতেন, গানের সুর দিতেন। সকালে বেড়িয়ে সারাদিন কর্মব্যস্ততার মধ্যে থেকে বাড়ি ফিরে সামান্য দুধ খেতেন। খেয়ে সারারাত আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি অভ্যাসে মনঃসংযোগ করতেন। একখানি যোগাম্বুধি নামে যোগশিক্ষার বই কিনে তাই দেখে দেখে যোগাভ্যাস করতেন। তাঁর গুরু আগমবাগীশের নির্দেশের বিরুদ্ধে চলতে লাগলেন। নেশার মত তাঁকে এই কাজটি পেয়ে বসল।

বাল্যে মুসলিম সাধনার উদার মতের গূঢ়ভাবকে তিনি পেয়েছিলেন। পরে বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে রুদ্র ও রুদ্রাণীর ভক্ত হয়ে ওঠেন। মধ্য বয়সে মহামায়ার ভক্ত হয়ে পড়েন, তার সঙ্গে পান চিরপ্রেমের আধার রাধাকৃষ্ণের ভাবকে, এই ভাবনার, সাধনার সঙ্গে পান ভারতীয় ধর্মের ব্রহ্ম-ভাব। কবি নজরুলের জীবনব্যাপী ভাব সাধনায় জীবন স্পন্দনকে তিনি সব মানুষ, জীব, প্রাণীর মধ্যেই অনুভব করেন। তিনি শ্যামের কথা বলতে গিয়ে এক কীর্তন গানে বললেন ঃ

"কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া গো॥
আমি যত ভুলি ভুলি করি
তত আঁকড়িয়া ধরি, তত মরি সাধিয়া
সাধিয়া সাধিয়া সাধিয়া গো॥
শ্যামের সে রূপ ভোলা কি যায়
নিখিল শ্যাম যার শোভায়।
আকাশে সাগরে বনে কান্তারে
লতায় লতায় যে রূপ ভায়।"

এই কীর্তন গানখানি প্রায় পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী লেখা। কবি বস্তু থেকে ভাবে, বৃহৎ থেকে রেণুতে রেণুতে মহাজীবনের স্পন্দনকে শ্যাম রূপে দেখেছেন। ঠিক এই গানটির পরেই যে কীর্তন গানটি লেখেন সেখানি এই—

"আমি কি সুখে লো গৃহে রব
শ্যাম হল যদি যোগী ওলো সখী
আমিও যোগিনী হব।
শ্যাম যে পথ দিয়ে চলে যাবে
সেই পথের ধূলি হব

সে চলে যেতে দলে যাবে
সে সুখে লো ধূলি হব।”

এই গানখানিতে আত্মসমর্পণের ভাব ফুটে উঠেছে। কবি মাত্রই প্রেমিক। কিন্তু বাস্তব জীবনে প্রেমের আঘাত পেতে পেতে কবি নজরুল পরম প্রেমের সন্ধান পেয়ে ধ্যান-রসের আস্বাদ পেয়েছিলেন। কিন্তু আস্বাদে এ রসের ক্ষুধা মেটে না, তৃষা বাড়ায়। এই রস-ভাণ্ডারে একদিন নানক, কবীর, কবি জ্যায়সী, রাজকুমার কবি দারা, সুফী কামাল, দাদু প্রমুখ আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কবি নজরুলের জীবনের এই দিকটা যদি আলোচনা করা যায় তবে তাঁকেও ভারতীয় সংস্কৃতির একজন সাধক বলে মানতে হবে। কবি সকল ধর্মের ভাব সাধনার পথ চলতে চলতে মানব ধর্মের সমন্বয় লাভ করে এই গানটি লিখলেন—

“আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে
জপি আমি শ্যামা নাম
মা হবেন মোর মন্ত্র গুরু
ঠাকুর হবেন ঘনশ্যাম।
ডুব দিয়ে শ্যাম-যমুনাতে
আমি খেলব হোলি শ্যামের সাথে।
শ্যাম যদি হন বিমুখ, তবে
মা পুরাবে মনস্কাম।”

কবি এখানে শ্যাম ও শ্যামার দুটি পথকে ধরে একটি পথে যেতে চেয়েছেন। সে পথ ব্রজধাম, অর্থাৎ প্রেমের পথ। এই প্রেরণাতেই তিনি ভাবসাধনায় তুষ্ট থাকতে না পেরে যোগ-অভ্যাসের কঠিন পথে পা বাড়িয়েছিলেন।

যোগও একপ্রকারের ব্যায়াম। তবে ব্যায়াম শিক্ষায় দেহের পুষ্টির সঙ্গে মনের একটা ফুর্তি পাওয়া যায়। সেখানেও শিক্ষকের প্রয়োজন। উপযুক্ত ব্যায়াম-গুরুর কাছে না শিক্ষা করে ব্যায়াম করলে শরীরে নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়। যোগ শিক্ষাতেও ব্যায়ামের সঙ্গে মনোজগতের একাগ্রতার সম্পর্ক রয়েছে। সেজন্য সাধারণ ব্যায়াম শিক্ষা থেকে যোগ শিক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশি। আত্মগোপন করে যে-সব যোগীরা থাকেন, লোকালয়ের মধ্যে যাঁরা সাধারণতমভাবে ঘুরে বেড়ান তাদের কাছে শোনা যায়, শরীরটা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম তন্ত্রীর জাল দিয়ে তৈরি; ভুল করে যোগ অভ্যাস করলে কখন কোন স্থান থেকে সূক্ষ্ম তন্ত্রী ছিঁড়ে যাবে তা সাধারণ চিকিৎসকগণ বুঝতে পারেন না। এ বুঝতে পারেন কেবল একমাত্র উপযুক্ত যোগী-গুরু। তাই শিষ্যকে তাঁরা এমনভাবে পাহারা দেন যে, কোন একটি সামান্যতম ভুলে যেন শিষ্যের ক্ষতি না হয়। এই যোগ-অভ্যাসের ভুলের জন্য

কত লোক পাগল হয়ে গেছে! কত লোক বাতব্যাধিতে পঙ্গু হয়েছে, অথর্ব হয়ে গিয়েছে। তার প্রমাণ আমাদের দেশে প্রচুর রয়েছে। কবি নজরুল গুরু ছাড়াই বই দেখে যোগী হতে গিয়েছিলেন, গুরুর সযত্ন সতর্ক দৃষ্টির বাইরে এই কাজ করতে গিয়ে, তার শিরা, উপশিরা, বোধশক্তি স্তম্ভিত হয়ে গেছে। যোগশাস্ত্রে একে স্তম্ভন বলে। এই রোগ পাশ্চাত্যের ডাক্তাররা সারাতে পারেই না, সাধারণতঃ উত্তম কবিরাজদেরও সাধ্য নেই। এই রোগ সারাতে পারা যেত যদি হিমালয়ের কোন অবধূত যোগী-গুরু পাওয়া যেত। কারণ তাঁদের এসব ব্যাধির অলিগলির খবর জানা আছে।

কবিকে বহিরঙ্গ ও স্থূলতায় বিশ্বাসী বিদগ্ধজনেরা বিলাতে নিয়ে গেলেন চিকিৎসা করবার জন্য, কিন্তু তাঁর মনস্তত্ত্বের খবর নিয়ে এদিকে চেষ্টা করলেই তো ফল হয় কিনা দেখা যেত। তাঁর জীবনে ধর্মপ্রবণতা ছিল, জীবনের প্রথম থেকেই ঝোঁক ছিল যোগী হয়ে ওঠবার দিকে। ঘাত প্রতিঘাতে ছেলেবেলার ঝোঁকটা মাঝ বয়সে আবার তাঁকে ঠেলে নিয়ে চলেছিল।

যাঁরা নজরুলের বন্ধু, যাঁরা তাকে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় অন্যতম। তাঁকে এবিষয়ে আমি একদিন বলেছিলাম। তিনি কথাটা স্বীকারও করেছিলেন। যখন যোগাভ্যাসের বিষক্রিয়া ধীরে ধীরে তাঁর দেহের মধ্যে শুরু হয়েছিল তখন তিনি বুঝেছিলেন যে তাঁর দেহের মধ্যে একটা বিষম পরিবর্তন আসছে। তাই কখন উত্তেজিত, কখন মুহ্যমান এই অবস্থায় কাটাতে থাকেন। সেই সময় তিনি একটি মর্মান্তিক গান লেখেন 'শেষ আরতি' নামে—

"পঞ্চ-প্রাণের প্রদীপ শিখায়
লহ আমার শেষ আরতি!
ওগো আমার পরম গতি
ওগো আমার পরম পতি ॥
বহু সে কাল বাহির দ্বারে
দাঁড়িয়ে আছি অন্ধকারে
এবার দেহের দেউল ভেঙ্গে
দেখব নিঠুর, তোমার জ্যোতি ॥
আমি তোমায় চেয়েছিলাম
শুধু সেই সে অপরাধে
ধ্যান ভেঙ্গেছ আমার, ফেলে
নিত্য নূতন মায়ার ফাঁদে
আজ মায়ার ঘরে আগুন জ্বেলে
পালিয়ে যাব পাখা মেলে,
জীবন যাহার মিথ্যা স্বপন
মরণে তার নাইক ক্ষতি

কেটে দিলাম নিঠুর হাতে
যে বাঁধনে বেঁধেছিলে
রইল না আর আমার বলে
কোন স্মৃতি এ নিখিলে।
আবার যদি তোমার মায়ায়
রূপ নিতে হয় নূতন কায়ায়,
তোমার প্রকাশ রুদ্ধ যেথায়
সেথায় যেন না হয় গতি ॥"

নজরুলের 'ইসলাম' সাধনা

'দাদূ সব্‌সে এক্‌কে সো এক্‌ন জানা।
জনে জনে কাহরৈ গয়ায়হু জগৎ দিবানা ॥
সোই জন সাধু সিদ্ধ সো সোই সতবাদী সূর।
সোই মুনিয়র দাদূ বড়ে সন্‌মুখ্‌ রহনি হজুর ॥
সোই জোগী সোই জাগমাঁ সোই সোফী সোই সেখ্‌।
সোই সংন্যাসী সেবরা দাদূ এক্‌ অলেখ্‌।
সোঈ কাজী সোঈ মুল্লাঁ সোই মোমিন মুসলমান।
সোঈ সয়ানে সব ভলে জে রাতে রহিমান ॥'

'হে-দাদূ, সবাই তো ছিলেন সেই একেরই (জন) ; সেই এককেই জানা হইল না বলিয়া এই পাগল জগৎটা নানা জনের নানা সম্প্রদায়ে হইয়া গেল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন।

'সেই জনই সাধু, সেই সিদ্ধ, সেই সত্যবাদী, হে শূর, হে দাদূ সেই শ্রেষ্ঠ মুনিবর যে প্রভুর সমক্ষে থাকে নিত্য হাজির !

'সেই তো যোগী, সেই তো জঙ্গম (এক শ্রেণীর শৈব), সেই তো সুফী, সেই তো শেখ, সেই তো সন্ন্যাসী, সেই তো সেবড়া (এক শ্রেণীর জৈন সাধু), সদাই প্রভুর কাছে থাকে হাজির, হে দাদূ এক অলেখ (যার প্রভু)।

'সেই কাজী, সেই মুল্লা, সেই মোমিন, সেই মুসলমান, সেই তো সুবুদ্ধি-মান, সেই তো সব রকমে ভাল যে দয়াময়ের সঙ্গে প্রেমে রহে অনুরক্ত।[১]

দাদূ গ্রন্থে সাধক দাদূর যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তাঁকে নিম্নশ্রেণী মুসলমান চর্মকারের সন্তান বলা হয়েছে। যে শ্রেণীতেই মানুষ জন্মগ্রহণ করুক না কেন তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায় কর্ম ও প্রেম সাধনার মাধ্যমে। নজরুল বলেছেন—

'শুন মানুষের বাণী
জন্মের পর থাকে নাকো কোন মানব জাতির গ্লানি।'

দাদূ জন্মগ্রহণ করেন চর্মকারের ঘরে ; কিন্তু বালক বয়স থেকেই তিনি প্রেমের বেদনায় ব্যাকুল হয়ে নানা সাধুসন্ত, সুফী ফকিরদের সঙ্গ করে ভগবৎ প্রেমের হদিস খুঁজে বেড়ান। খুঁজতে খুঁজতে কবির-পুত্র সুফী সাধক কামাল-এর দেখা

---

(১) উপরোক্ত উদ্ধৃতি শ্রীক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী রচিত 'দাদূ' গ্রন্থের ২৮৬ পৃষ্ঠায় আছে। শ্লোকের শিরোণামা—ভগবানের সেবকের সম্প্রদায় নাই।

পান। পরবর্তীকালে বোম্বাই প্রদেশের এক নিভৃত পল্লীতে তিনি সাধনায় লিপ্ত হলেও জীবিকার জন্য চর্মকার বৃত্তি (বা কারুর মতে জোলার বৃত্তি) পরিত্যাগ করেন নি। দাদূ ১৬০০ সালে জীবিত ছিলেন। আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বেও তিনি বেঁচে ছিলেন। কথিত আছে বাদশা আকবর সময়ে সময়ে দাদূর কাছে গিয়ে উদার ধর্মমত নিয়ে আলোচনা করতেন, তাই সুফী সাধক দাদূ বললেন—

'ভগবানের সেবকের কোন সম্প্রদায় নেই।'

তাঁদের কোন শ্রেণী নেই, জাত নেই—সেখানে আছে সচেতন মনের প্রেমের তীব্র বেদনা। সে বেদনায় তাঁরা পৃথিবীর সকল কিছুকেই আত্মীয় বলে মনে করেন। এই মনোভাবের ভেতর দিয়েই নজরুল বললেন—

'শুন মানুষের বাণী
জন্মের পর থাকে নাকো কোন মানব জাতির গ্লানি।'

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মণ' কবিতায় বললেন সত্যকামকে—

'অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্য কুলজাত।

তাই রবীন্দ্রনাথ দাদূ সম্বন্ধে ভূমিকার একস্থানে বলেছেন, 'যেহেতু ভারতীয় সমাজ ভেদ-বহুল, যেহেতু এখানে নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা জাতি, সেই জন্যই ভারতের মর্মের বাণী হচ্ছে ঐক্যের বাণী। সেই জন্যই যাঁরা যথার্থ ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাঁরা মানুষের আত্মায় আত্মায় সেতু নির্মাণ করতে চেয়েছেন। যেহেতু বাহিরের আচার ভারতে নানা আকারে ভেদকেই পাকা করে রেখেছে সেই জন্যই ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধনা হচ্ছে বাহ্য আচারকে অতিক্রম করে অন্তরের সত্যকে স্বীকার করা।[২,৩]

---

(২) 'দাদূ' গ্রন্থে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকায় ৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

(৩) কুরাণেও আছে—

Svra CIX-UNBELIEVERS
MECCA—6 VERSES
In the name of God, the compassionate,
the Merciful,
Say : O ye UNBELIEVERS !
I worship not that which ye
worship,
And ye do not worship that
which I worship ;
I shall never worship that
which ye worship,
Neither will ye worship that
which I worship,
To you be your religion ; to
me my religion.

আমরা ভারতীয় হিন্দু মুসলমানগণ ইসলাম সম্বন্ধে যা জানি তা এতই অন্ধ এবং সংস্কারের মন নিয়ে জানি, এবং জানার একটা অহঙ্কারের সঙ্গে প্রকাশ করি, তাতে আমাদের অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। কিন্তু আমরা আমাদের দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে মানবিক দৃষ্টি দিয়ে যদি বিচার করি তাহলে হিন্দু হয়ে ইসলাম ধর্মকে, মুসলমান হয়েও হিন্দু ধর্মকে বুঝতে পারি। নজরুল মুসলমান ঘরের ছেলে, সে হিন্দুদের পৌরাণিক ঘটনার উপমা দিয়ে লেখায় হিন্দুরা বলেন—সে হিন্দু, মুসলমানরা বলেন কাফের। আবার নজরুল যখন খৃষ্টান ও ইসলামিক পুরাণ থেকে লিখলেন তখন হিন্দুরা বলেন ওটা মুসলমানদের খুশি করার জন্য লিখছেন। কবিকে হিন্দু না বললে হিন্দুর মনে বড দ্বিধার ভাব হয়। কিন্তু তাঁকে খাঁটি মুসলমান, মানব প্রেমিক বললে সব গোলই মিটে যায়। আজ এই দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও দেশ ভাগাভাগির দিনে নজরুলের ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানদের অনুভব করার দিন এসেছে। তাঁর ইসলামীত্ব আমার অনুভব করলে আমাদের সমাজ জীবনের গণ্ডগোল মিটে যাবে।

কবি নজরুল ভেদ বিভেদ জর্জরিত দেশে গরিব মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি সমাজ-রূপকে দেখে বেদনা বিহ্বল চিত্তে প্রেমের বাণী শুনিয়ে গেছেন। বহু প্রকার ধর্মমতের মধ্যে ইসলাম ধর্মকে প্রায় অর্ধ পৃথিবী গ্রহণ করে আছে সশ্রদ্ধ অন্তরে। সেই ইসলাম ধর্মের সন্তান নজরুল। নজরুল-জীবনে ইসলামীর একটা দিক আছে। ইসলাম মানে শান্তিপ্রিয়; এই ধর্ম শান্তি প্রয়াসীরই ধর্ম। ঈশ্বর সৃষ্ট এই পৃথিবীকে গোঁড়া মোল্লা, পুরুত ও পাদ্রীরা আত্মস্বার্থ কায়েম করার জন্য ধর্মের জিগীর তুলে অশান্তির আগার করে তুলে। তাদেরই দ্বারা তামাম দুনিয়ায় আজ পাপের আগুনে জীবনে জীবনে চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে। এরই বিরুদ্ধে সত্যের খাঁড়া হাতে দাদূ, কবীর, সুফী কামাল, রজ্জব প্রভৃতি থেকে 'নজরুল তক্' সবে উদার প্রেমধর্মের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য সাধনা করেছেন।

বালক বয়স থেকে প্রৌঢ় বয়সের প্রান্ত পর্যন্ত নজরুলের বিচিত্র কর্মও মর্মময় জীবনে এই দীপ্তিময় আলোক বিচ্ছুরিত হয়েছে। এই আলোর উৎস ইসলাম ধর্ম থেকেই উপলব্ধি করেছেন নজরুল, সেইজন্য এই উপলব্ধি নজরুলের বিকাশেরও একটা দিক। এই দিকটাকে যদি পর্যালোচনা করা যায়, তা হলে দেখা যাবে হিন্দু ও ভারতীয় মুসলমানেরা ইসলাম সম্বন্ধে যা জানেন বলে গর্ব করেন সেটা কত ভুল ভাবেই না জানেন। ভারতীর হিন্দু-মুসলমানকে কবি সচেতেন মন নিয়ে প্রেমের পথে মানবোচিত উদারতার সহিত মানুষের ধর্ম ও কর্মের অধিকারী হবার নির্দেশই দিতে চেয়েছিলেন।

কবির এই ইসলামী দিকের হদিস কাঠমোল্লা বা জাহিলরা জানেন না। (বা জানলেও আমল দেন না)। তাই তাঁরা জনগণকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেন। রাষ্ট্রশক্তি-ও এই জাহিল বা মোল্লা পুরুত; সোফিস্ট পাদ্রীদের পিছনে থেকে রাষ্ট্রভিত্তিকে কায়েম রাখবার জন্য সর্ব প্রকারেই

সাহায্য করে, এবং ভাঁওতায় যাঁরা ভুলতে চান না, এমন মরদদের সায়েস্তা করে ধর্মের ভাঁওতাবাজ ভণ্ডদের দিয়ে এই জাহিলরাই সক্রেটিসের মত পণ্ডিতকে 'হ্যামলক' পান করিয়েছিল। সত্যান্বেষী ব্রুণোকে পাদ্রীরা পুড়িয়ে মেরেছিল।[৪]

গ্যালিলিওকে হত্যার প্ররোচনা দিয়েছিল, খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়েছিল, বুদ্ধকে বিষমিশ্রিত খাদ্য দিয়েছিল, এরাই নজরুলকে কাফের বলে প্রেমিকের কোমল বুকে আঘাত হেনেছিল। এরাই নজরুলের রূপকে আচ্ছন্ন রেখেছিল নানা অপপ্রচারের দ্বারা। ধর্মবিশ্বাসী সরল জনসাধারণ এই ভ্রান্তি অনুসারী মোল্লাদের দ্বারা বিপথগামী হয়ে ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক আন্দোলনের অনুগামী হননি। এই বেদনা কবি নজরুলকে কর্মময় পথ থেকে সরিয়ে মর্মময় পথের দিকে মোড় ঘুরিয়েছিল।

তিনি অতি দুঃখের সঙ্গে প্রিন্‌সিপ্যাল ইব্রাহিম খানসাহেবের চিঠির জবাবে লেখেন—"আমায় মুসলমান সমাজ কাফের খেতাবের যে শিরোপা দিয়েছে তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। একে আমি অবিচার বলে কোনদিন অভিযোগ করেছি বলে তো মনে পড়ে না। তবে আমার লজ্জা হয়েছে এই ভেবে; কাফের আখ্যায় বিভূষিত হবার মত বড় তো আমি হইনি। অথচ হাফেজ, খৈয়াম, মনসুর প্রভৃতি মহাপুরুষের সাথে কাফেরের পঙ্‌ক্তিতে উঠে গেলাম!" নজরুল গাইলেন—

'আল্লাহ্‌ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়।
আমার নবী মোহাম্মদ, যাহার তারিফ জগৎময়॥
আমার কিসের শঙ্কা?
'কোরাণ' আমার ডঙ্কা।
ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়॥'

তবে কি কবি কাফের? তবে নজরুল আল্লাহ্‌র এমন ভক্ত যে, তিনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে শমসের (তলোয়ার) দিয়ে জয় করতে চাননি, জয়ী হতে চেয়েছেন 'ইশক্‌' ভগবৎপ্রেম দিয়ে। যে প্রেমের উন্মাদনায় চৈতন্য আচণ্ডালে দিয়েছেন কোল, যবন- হরিদাসকেও মাথায় তুলে নিয়েছেন, সেই প্রেমেরই উত্তরাধিকারী নজরুল। অ-প্রেমিকদের নিষ্ঠুর ধর্ম প্রকাশে বিভেদ বাঁচিয়ে রাখতে যে দুঃখ নিত্যই সমাজ জীবনকে অসহায় করে তুলছে তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন কবি। কবি উক্ত চিঠির এক স্থানে বললেন,—'আমার বিদ্রোহ-ও 'যখন চাহে এমন মা'র বিদ্রোহ নয়, ও আনন্দের অভিব্যক্তি, সর্ব্ববন্ধন মুক্তির—পূর্ণতম স্রষ্টার।' ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে-শান্তির সাধনা

(৪) ১৪শ শতকের মনীষী—জিওভার্ণো ব্রুণো। গ্যালিলিওর মত উনিও প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে স্থির সূর্যকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। এই অপরাধে তাঁকে পুরুত পাণ্ডার দল পুড়িয়ে মারে।

রয়েছে সেই শান্তির অধিকারী সকল মানুষ হোক, এই ছিল তাঁর কামনা। তাই তিনি গাইলেন—

'আল্লাহ্ নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে
ফলবে ফসল বেচবে তারে কিয়ামতের হাটে।
পত্তনীদার যে এই-জমির
খাজনা দিয়ে সেই নবিজীর
বেহেশতেরই তালুক কিনে বসব সোনার খাটে।
মসজিদে মোর মরাই বাঁধা, হবে নাকো চুরি;
'মনকে'র নকীব দুই ফেরেশতা হিসাব রাখে জুড়ি।
রাখব হেফাজতের তরে
ইমানকে মোর সাথী করে
রদ হবে না কিস্তি, জমি উঠবে নাকো লাটে।'

এই আল্লাহ্‌র নামের ফসল ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে যে কবি পেয়েছেন—সেই প্রেম ইশক্। এই ফসলের ক্ষেত হৃদয়। হৃদয়ে যার এই ফসল ফলে মৃত্যুর পরেও এই ফসল মরাই বাঁধা থাকে মসজিদরূপ দেহে। তাই সুফী-সাধক দাদূ বলছেন,—'ভগবানের সেবকের কোন সম্প্রদায় নেই।' কবি নজরুল সম্প্রদায়ের স্থূল বোধ ভুলে মানুষকে (যে দেহকে তিনি মসজিদ বলে জেনেছেন) দু হাত বাড়িয়ে জাপটে ধরতে চাইলেন প্রেমের ফসলের মরাই বোধে। প্রেম সাধনার গূঢ় পথে তাইতো বলেছেন,

'গাহি সাম্যের গান।
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নহে, নহে কিছু মহীয়ান।'

যে পথে যাত্রা করেছিলেন সে পথকে হিন্দুর সাধনার পথ বলবেন হিন্দুরা, মুসলমানরা বলবেন কাফেরী পথ। কিন্তু মুসলমান চর্মকার সুফী সাধক দাদূ বললেন 'ভগবানের সেবকের কোন সম্প্রদায় নেই।' এ কথার তাৎপর্য ধরেই দেখা যাচ্ছে নজরুল বালক বয়সে সুফী হাজী পালোয়ানের যেমন মুরীদ হয়েছেন তেমনি আবার আগমবাগীশের কাছে তান্ত্রিক দীক্ষাও নিয়েছেন। এইখানে কথা হচ্ছে সম্প্রদায়গত সীমাকে অতিক্রম করে যে ব্যক্তি মহা-মানবের প্রেম উপলব্ধি করতে পারেন তার কাছে সকল সম্প্রদায়গত ভাবই ঈশ্বর লীলার বিকাশরূপে প্রতিভাত হয়ে থাকে। তাই যা দেখছেন তাকেই দুহাত দিয়ে আপন প্রেমসত্তায় মিশিয়ে নিতে চেয়েছেন। 'লালমামুদ' বলেছেন,—

'তুমি দয়া করে ঘুচাও নাথ মনের অন্ধকার
হিন্দু কিম্বা হোক মুসলমান।

তোমার পক্ষে সবই সমান,
আপন সন্তান জাতি কি বিচার ?
ভক্ত সকল জাতির শ্রেষ্ঠ, চণ্ডাল কি চামার।'[৫]

বালক বয়সেই কবি নজরুল এই ভাবের অধিকারী হয়েছিলেন।

নজরুলের ইসলামী দিক ভাল করে পর্যালোচনা করতে হলে তাঁর জীবনের তিনটি যুগের লীলাকে অনুসরণ করতে হবে। প্রথম বাল্য লীলা, দ্বিতীয় বিদ্রোহীরূপ, তৃতীয় অন্তরচারী নজরুল। এই তিন যুগের সারই হল নজরুলত্ব। এই তিন যুগ বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, নজরুলের সত্তা সাধক-সত্তা। হিন্দু মুসলমান সাধনার যে ক্রিয়া সেই ক্রিয়ারই অনুসারী তিনি। তাই তিনি হিন্দুও নন মুসলমানও নন। তিনি খাঁটি ভারতীয়। ভারতীয় তথা এশিয় আধ্যাত্মবাদের অধিকারী। তাঁর ধর্ম মরমীয়া ধর্ম। তবুও মুসলমান নজরুলের ইসলাম ধর্মের রূপ কি ছিল সেটাও দেখা দরকার। কারণ মুসলমান জনসাধারণ তাঁকে কু-নজরে দেখায় যে ভুল করেছেন, তাতে যে ভারতীয় হিন্দু মুসলমানদের কল্যাণ না হয়ে অকল্যাণই হয়েছে, তা আজ বুঝবার দিন এসেছে। তিনি ইসলামী গানের একস্থানে বলেছেন—

'বক্ষে আমার কাবার ছবি
চক্ষে মোহম্মদ রসুল।
শিরোপরি মোর খোদার আরস
গাই তারি গান পথ বে-ভুল ॥
লায়ালির প্রেমে মজনু পাগল
আমি পাগল 'লা ইলা'র ;
প্রেমিক দরবেশ আমায় চেনে
অরসিকে কয় বাতুল।'[৬]

অরসিকরা কবিকে পাগল মনে করতে পারেন, বিপথগামীও মনে করতে পারেন, কিন্তু প্রেমিক দরবেশ আউল বাউল যাঁদের অন্তরের প্রেমালোক দিকবিদিকে বিচ্ছুরিত হয়ে সকলকে আলিঙ্গন করতে চায় তাঁরাই কবিকে চেনেন, তাঁরাই কবির গুণের ভাবগ্রাহী জনার্দন। তাই কবি বললেন—

'ওরা খোদার রহম মাগে
আমি খোদার ইশক্ চাই।'

(৫) 'বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' গ্রন্থের ৮৬নং কবিতা।
(৬) জুলফিকার গ্রন্থের ২৭ পৃঃ

প্রেমের সাধক নজরুল খোদার আশীর্বাদের চেয়ে খোদার যে প্রেম তাকেই মহামূল্য দিয়েছেন, তাই তো দুঃসাহসী কবি বলতে পেরেছেন—

'আমার মনের মসজিদে দেয়
আজান হাজার মুয়াজ্জিন,
প্রাণের 'লও হে' কোরাণ লেখা
রুহ্ পড়ে তার রাত্রিদিন।',

যার হৃদয়কে হাজার মোয়াজ্জিনের ভাব পাগল করেছে তাকে কি আর আচার আচরণের শৃঙ্খল বেঁধে রাখতে পারে? প্রেমের মন্দিরে পৌঁছবার সিঁড়ি গোনার চেয়ে তাঁর কাছে গতির দামই বেশি। তাই স্বল্প জীবনেই কবির সার্থক জীবন। আনন্দময় জীবন লাভের জন্য ঝড়ের গতিতে চিন্ময় ও মৃন্ময় জগৎ পরিক্রমা করলেন কবি নজরুল।

তাই বালক বয়সের নজরুল যখন হাজী পালোয়ানের খাদেম ছিলেন তখন তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে সাঁঝে দিতেন আলো, পীরের স্থান ঝাঁট দিয়ে সাফ রাখতেন। উপবাস, নমাজ প্রভৃতি সবই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন, তখন থেকেই তাঁর মনের মিনারে হাজার বেলাল মুয়াজ্জিনের আকুল আহ্বান শুনতেন—'ওরে ওঠ, আর ঘুমাসনে; ঘুমের থেকে প্রার্থনাই শ্রেষ্ঠ।'[৭] সেই যে ফজ্‌রের আজানের ডাক শুনে কবি বালক কালে জেগেছিলেন, সেই জাগরণই তাঁকে জাতিকে জাগিয়ে তুলবার প্রেরণা দিয়েছিল। কবি গাইলেন জাগরণীর গান—

'জাগো গো জাগো গো
তন্দ্রা অলস জাগো গো—
জাগো রে জাগো রে
মুক্ত করিতে বন্দিনী মায়।'[৮]

এই সুরের উৎস ঐ হাজী পালোয়ানের মাজার। ঐ মাজারই তাঁকে ইসলামের উদার সুফী মতবাদের দিকে নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা বর্জিত জীব-প্রেমিক রূপে গড়ে সত্যের ডঙ্কা বাজাবার শক্তি দিয়ে মুক্তির নকীব্ করেছেন।

সাম্প্রদায়িকতা জর্জরিত ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান সমাজকে মুক্তির পথে, স্বাধীনতার পথে উদার ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখবার জন্য হিন্দু মুসলমান মনিষীগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির সংগঠক ধারক ও বাহক হিন্দু ও মুসলমান সুফী সন্ত, কবি ও শিল্পীরা; হিন্দু মুসলমানের মিলিত দান এই 'ভারতীয় সংস্কৃতি', যার কাছে বিশ্বের দরবারে

(৭) 'আস্‌সালাতু খায়েরোঁ মিনান্নৌম'—prayer is better than sleep।
৮ ১৯২২ সালে লেখা 'গান ভাঙার গান' পুস্তক দ্রষ্টব্য।

বিদেশীরা মাথা নত করে ভারতীয় সংস্কৃতিকে স্বীকার করেছেন। এই সংস্কৃতির যারা পুরোভাগে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে যুবরাজ দারা, তাঁর গুরু সুফী সরমদ্, জেবউন্নিসা থেকে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস মহাজন প্রমুখরা। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল পর্যন্তকে এর সংগঠক বলা যায়। এঁদের বাণী আমাদের প্রেমের পথে নিয়ে যেতে চেয়েছে ; সকলের সত্তাকে স্বীকার করে সকলকে আত্মীয় বলে মেনে নেবার শিক্ষা দিয়েছেন। নজরুল সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করে পূর্বসূরীদের মশল্চী হিসাবে প্রেমের উদারতার আলোক বিতরণ ও বিকিরণ করছেন।

তাঁর ইসলাম ধর্মই তাঁকে মানবমাত্রকেই স্বীকার করার শিক্ষা দিয়েছে। তাই তিনি সাম্প্রদায়িক হিন্দু মুসলমানকে বলেছেন—

'হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন ?
কাণ্ডারী বল ডুবিছে 'মানুষ' সন্তান মোর মার।'

কবির এই মা বিশ্বপ্রকৃতি, যে প্রকৃতিতে হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি জন্মলাভ করল, বেড়ে উঠল। তাঁর মতে তারা অভেদ। এই বোধ আমাদের জাগল না বলেই, স্বার্থপরেরা জাগতে দিল না বলেই সাম্প্রদায়িকতার বিষ আজ আমাদের দেহের, বুদ্ধির, রুচির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করল। কবির ডাকে আমরা সাড়া দিলাম না বলেই আজ আমরা প্রেম সমুদ্রের তীর থেকে সরে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতার সাহারায় পুড়ে মরছি। কবির ভাষায় 'ফেরাউন দজ্জাল বেশী ধনতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদীদের বুটের তলা থেকে আজও আমরা মুক্তি পেলাম না।' মুক্তির বাধা মোল্লা-পুরুতরা দেশের সাধারণকে ভ্রান্ত পথে চালিয়ে পরোক্ষে সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করেছে ; সেইজন্য তিনি জিজ্ঞাসা করলেন 'কৃষকের ঈদ' কবিতায়—

'এই ঈদ্-গাহে তুমি কি ইমাম ? তুমি কি এদেরই নেতা ?
নিঙাড়ি কোরাণ হদিস ও ফেকা, এই মৃতদের মুখে
অমৃত কখন দিয়াছ কি তুমি ? হাত দিয়ে বল বুকে।
নামাজ পড়েছ ; পড়েছ কোরাণ, রোজাও রেখেছ জানি
হায় তোতাপাখী শক্তি দিতে কি পেরেছ একটুখানি ?'

যাদের শাস্ত্রপাঠে অন্তরে আলো জ্বলে না, প্রেমের বান উচ্ছ্বসিত হয়ে দূর-দিগন্তকে প্লাবিত করবার জন্য জীবনকে দিওয়ানা বা মস্ত করে দেয় না, কবি নজরুল তাঁদের অর্থাৎ সেই ধর্মোন্মাদ প্রচারকদের 'তোতা পাখী' বলে বর্ণনা করেছেন। এই তোতা পাখী পণ্ডিতরাই ধনীর দাঁড়ের শোভা বর্ধন করে অন্ন স্বল্প ছোলা কলায় তুষ্ট থেকে মুখস্থ বুলির চটকে সমাজকে সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত করেছেন। কবির ইস্লাম, কবিকে, ভগবৎ

শক্তির আলোকে মশগুল করে শক্তির অধিকারী করে তুলেছিল বলেই তিনি মরদেয় মত জোরের সঙ্গে জাহিলদের বলতে পেরেছেন—

'আল্লাতত্ত্ব জেনেছ কি, যিনি সর্ব্বশক্তিমান ?
শক্তি পেল না জীবনে যে-জন সে নহে মুসলমান।'

এই আল্লার শক্তি পাওয়া যায় প্রেমে, এই প্রেমহীন তত্ত্ব ফাঁকা দর্শন। কবি তাই শৈশব সাধনায় যে অনুভূতি পেয়েছিলেন তাকে দশ বৎসর বয়সে সুন্দর-রূপে প্রকাশ করেছেন ঃ

গুণ গুণ সুরে অলি বসিছে কমলে
বিভুগানে মত্ত বিহঙ্গম দলে ॥
তাহে আজ রবে,
জীবন সংশয় হবে।
বুঝি রইতে হবে, জনম দুঃখে।
নজরুল ইসলাম্ বলে প্রিয়ার চরণে ধরে ॥

কবি দশ বৎসর বয়সেই মুসলিম গূঢ় সাধন তত্ত্বে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। এই সময় সুফী ফকীরের নির্দেশে মরমীয়াবাদের সাধন শুরু করেন, তিনি জপে তপে সুফী হাজী পালোয়ানের নিরালা কবর স্থানে সব সময়েই বিভোর হয়ে থাকতেন। তাঁর উপাস্য আল্লাকে তখন থেকেই 'প্রিয়া' রূপে দেখেছেন, দেখেছেন ফুল্ল কমল রূপে; শুনেছেন অন্তর্নিহিত প্রেম মধু আহরণকারী ভক্ত মধুপের গুঞ্জন, বুঝেছিলেন এই মধু যে পান করতে চায়, এই কমল আননের রূপে যে মশগুল হতে চায়, তার জীবন সংশয় হয়ে থাকে, এবং তাঁর এই প্রেমের আদর্শ যে কলঙ্কহীন রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকে তাকে 'জনম-দুঃখে' বাস করতে হয়।[১] তখন থেকেই তাঁর পরবর্তী জীবনের চলেছিল প্রস্তুতি। পরবর্তীকালে দারিদ্র্য জীবনে খৃষ্টের কণ্টক মুকুটের মর্যাদায় নিজেকে 'রসে'র বাদশা মনে করতেন।

তাই এই দুঃখের মধ্যেও প্রিয়া বা আল্লার সঙ্গে কী দিয়ে যোগ রাখলে আনন্দ থাকবে অটুট, তার হদিস খুঁজতে গিয়ে বললেন—

(১) বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধার আক্ষেপানুরাগ পর্যায়টি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়, যখন কৃষ্ণ প্রেমে মগ্ন আত্মসমর্পিত-প্রাণা রাধিকাকে নানা ভাবে দৈনন্দিন সংসারে গঞ্জনা সহ্য করতে হচ্ছে দেখি,—তখন কবির 'জনম দুঃখে'র কথাটি মনে পড়ে। আরো দেখতে পাওয়া যায়, যারা সমাজ জীবনে সৎ-পথে বা সত্য পথে আদর্শবাদীরূপে থাকেন, তাঁরাও মৃত্যু পর্যন্ত নানা দুঃখেই অতিবাহিত করেন। তাই বলে আদর্শবাদের পথ কি ত্যাজ্য ?

'দিবা যামিনী মান ভাঙাও পাঁচবার করে
মালা তিরিশ ফুলে ॥
পরাও হে তার গলে ॥
বাগানে তা'হলে পাবে হে সুখে।

এই সুখ উপাসনা যৌগিক সুখ। এই বাগান কবির সাধনোচিত হৃদয়। এই হৃদয়ে যে ভক্তি-কুসুম প্রেম-মধু পূর্ণ হয়ে উঠবে তারই কথা কবি বলেছেন। কিন্তু মানুষের অহমিকার প্রতিকূল বায়ুতে তার উপাস্যের কাছে এসেও দূরে যায় চলে। সেজন্য কবি তাঁর প্রিয়ার মান ঐ দশ বৎসর বয়সেই পাঁচ ওক্ত নমাজ দিয়ে ভাঙাতে চেয়েছিলেন; চেয়েছিলেন 'তিরিশ ফুলের মালায়' গুণগান করে খুশি করতে। আশ্চর্য কিছুই নয়, এই ভারতবর্ষ তথা এশিয়ায় প্রেমধর্মের পথে বহু সাধক শৈশব কাল থেকেই তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনের আলোকের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে তাঁদের প্রচারক তাঁদের মহৎ জীবন তুলে ধরেছেন। কবি নজরুলকে আমরা গতানুগতিক কবিরূপে দেখেছি, তাঁর এ দিকটা না দেখে; আমরা উচ্ছৃঙ্খলতাই দেখেছি, দেখিনি তাঁর অন্তরের সাধন রূপের আলোক বিচ্ছুরিত রূপকে।

তিরিশ ফুলের মালা, পাঁচ ওক্ত নমাজ, রোজা, উজু প্রভৃতি আচরণের ভিতর দিয়ে কবি সেই সাধন পথেই গিয়েছিলেন। যেখানে গেলে আর আচার আচরণের প্রয়োজন হয় না। যে পথে সুফী কামাল, কায়েশ-গজ্জালি 'দাদূ' চামার বা জোলা, সুফী সরমদ, সুফী হাজী পালোয়ান, খৈয়াম ও হাফিজ প্রভৃতি উদার সাম্প্রদায়িকতাহীন মহামানবতার প্রেমের হদিস পেয়েছিলেন কবিও সেই পথেরই পথচারী।

খৈয়াম ও হাফিজ তাঁদের কাব্যে যেমন সুরা, সাকী, বুলবুল, পানশালার মাধ্যমে তাঁদের সাধনবাণীর ভাব প্রকাশর জন্য প্রধান অঙ্গরূপে ব্যবহার করেছিলেন। তার অর্থ যেমন সাধারণ পাঠকেরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। নজরুলের 'ইসলামী'র এই দিকটা যে কত গভীর ও কত অসীম তা আজ বোঝবার দিন এসেছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এই যুগের সমন্বয়বাদকে যেমন সহজ সরলরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন—নজরুলের ব্যাকুলতাও এই সমন্বয়বাদেরই আর একটি কালোপযোগী বিকাশ। তাঁর এই সাধনফলও নানা পথের যৌগিক আস্বাদন থেকেই হয়েছে।

মুসলমান সাধন-পথের দুইটি দিক আছে—'সালেক্' ও 'মজ্‌জুব'। যাঁরা শাস্ত্রের বিধি নিষেধ মেনে নমাজ রোজা প্রভৃতির দ্বারা ধর্ম সাধনা করেন তাঁরা সালেক্‌পন্থী, আর যাঁরা শাস্ত্র প্রভৃতির বিধি নিষেধের অধীন না থেকে ঈশ্বর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে সাধনা করেন তাঁরা হলেন মজ্‌জুবপন্থী। নজরুলের বালককাল কিছুটা সালেক্‌পন্থার অনুগামী ছিল। কিন্তু কবি অসীম উপলব্ধির ক্ষমতায় মজ্‌জুবপন্থার অধিকারী হয়েছিলেন। এই মজ্‌জুবপন্থাও তাঁর মনে তুষ্টি দিতে পারেনি। তিনি তান্ত্রিক সাধনার

কিছু পূর্বে জনৈক অধ্যাত্ম গোপনচারী দরবেশের কাছে ইসলামী যোগ সাধনার শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই সাধনারও দুইটি গূঢ় পথ আছে। তার অর্থ রূপ ও বিধি সম্বন্ধে আমি নগণ্য ও অনধিকারী, তবুও যেটুকু শুনেছি তাই নিবেদন করছি। একটি ফাণা' ও আর একটির নাম 'ফিলফাণা'। প্রথম যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে মানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক মহিমা প্রচার করে থাকে, আর ফিস্‌ফাণা' সেই স্তর, যে স্তরে আর মানুষ নেবে আসে না, ধ্যানানন্দে মৌজ হয়ে যায়। এই সময় কবি নজরুল মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে গিয়ে বলেন ঃ

'যাঁর ইচ্ছায় আজ দেহের মাঝে দেহাতীতের নিত্য মধুর রূপ দর্শন করছি, তিনি যদি আমার সর্ব্ব অস্তিত্ব গ্রহণ করে আমার আনন্দময়ী প্রেমময়ী শক্তিকে ফিরিয়ে দেন, সেই শক্তির চোখে যদি আবার অশ্রুবন্যা বয়, তাঁর অঙ্গে যদি আবার অমৃত রসধারা প্রবাহিত হয়, পৃথিবীকে সুন্দর করে যাব।' এই 'যদি'র অর্থ আজ বুঝতে হলে আমাদের উপরের সাধন পদ্ধতির কথা ভাবতে হবে। কবি এই দরবেশ নির্দেশিত পথ ছেড়ে অবশ্য এর কিছুদিন বাদেই তান্ত্রিক সাধনার প্রতি ঝুঁকে পড়েন।

হাফিজের বাল্যজীবনের সঙ্গে নজরুলের বাল্যজীবনের একটি মিল আছে। হাফিজ বাল্যকালে এক সমাধিমন্দিরে আলো দান করতেন। 'একদিন সন্ধ্যাকালে হাফিজ আলো দিতে গিয়ে দেখেন কয়েকজন আরেফ্ (যোগী) ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বসিয়া আছেন। তিনি সেই ধ্যানস্তিমিত আরেফদিগের স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হন। পরে তাহাদের নিকটে কিছু কিছু ধর্মোপদেশ লাভ করেন।[১০] কবি নজরুলও বাল্যকালে সুফী ফকিরের সমাধিমন্দিরের সেবক ছিলেন। মজ্‌জুব সাধক হাফিজ তাঁর কাব্য 'দিওয়ান ই হাফিজ'-এ যে সুরা সাকী নিয়ে কাব্য রচনা করলেন তার ভিন্ন অর্থ হাফিজ জীবনীতে যা দিয়েছে তা জানলে নজরুলের ইসলাম ধর্মকে বুঝতে সহজতর করবে বলে এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম।

'সুরা শব্দে প্রেম বা মত্ততা, সুরাদাতা (সাকী) শব্দে প্রেমোদ্দীপক গুরু; সুরালয় (পানশালা)' প্রেমনিকেতন, সুরার কলস, প্রেমিক, পান-পাত্র হৃদয়, অগ্নি উপাসক প্রেমোৎসাহী; প্রতিমা শব্দে সখা, প্রতিমামন্দির শব্দে সখা-নিকেতন, উদ্যান শব্দে প্রেমিক-মণ্ডলী; বসন্ত ও ঈদ শব্দে সখার সম্মিলন কাল, বুলবুল শব্দে প্রেমতত্ত্ববাদী লোক প্রভৃতি বুঝায়।'[১১]

গূঢ় তত্ত্ববাদীরা ঠিক গুপ্ত সমিতির মতই আপন সাধনরূপ লুকিয়ে রাখার জন্য নানা ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় (code) কথা বলেন, এই রেওয়াজ হিন্দুদের মধ্যেও যেমন, মুসলমান খ্রীষ্টান সাধকদের মধ্যেও তেমনি দেখা

(১০) ১৯২০ সালে আর. পি. নাথ কর্তৃক প্রকাশিত (৪র্থ সংস্করণ) হাফিজগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(১১) ঐ 'হাফিজ' জীবনী

যায়। অধিকারী না হলে যেমন বোঝা যায় না, তেমনি অনধিকারীকে বোঝাতে যাওয়াও অপরাধ—একেই 'মন্ত্রগুপ্তি' বলে।

কবি নজরুলকে দেশের বিদগ্ধজনেরা যেমন ভালবাসেন তেমন করে চিনবার চেষ্টা করেননি। তাঁকে মুসলমানরাও তেমনি চিনতে চেষ্টা না করে কাফের ফতোয়া দিতে কসুর করেননি।

নজরুল ইসলাম ধর্মে উদার ও গূঢ়তত্ত্ববাদী সুফী সাধকদের ধর্ম সাধনার পদ্ধতি অনুসন্ধান করে বৈষম্যের মধ্যে সাম্য প্রচার, অশান্তির মধ্যে ইসলামের শান্তিবাদ প্রচারের প্রয়াসী ছিলেন। কবি হাফেজের অনুবাদে বললেন—

'আমি মাতাল, প্রেম-বিলাসী
পাগল, ভুবন দাহনকারী
বসলে কাছে রটবে কুযশ
তাইত থাকি দুয়ার রোধি ॥[১২]

কবি বাইরের জগৎ থেকে সবে গিয়ে দুয়ার বন্ধ করে, সুরায় পাগল হলেন। সে-সুরার সন্ধান কজনায় রাখলেন? তাই তো হাফজের কথায় নিজের কথা বললেন—

'ওরে হাফেজ শেষ কর তোর
কৃত্রিম এই কলমবাজি।
হল সময়,—খোলা পাতা
ঝোলায় তুলে রাখা আজি।'
'নীরব হয়ে বসার পালা
এবার রে তোর, আজকে শুধু
শূন্য গেলাস টইটুম্বুর
করবে ঢেলে শেষ সিরাজী ॥'[১৩]

কবি তাই কলমবাজি ছেড়ে দুয়ার বন্ধ করে অধ্যাত্ম-সিরাজী পূর্ণ পিয়ালায় চুমুক দিয়ে মৌন মশগুল হয়ে থাকার পথ বেছে নিলেন। কোন আরেফের নির্দেশে মজ্‌জুবপন্থী হয়ে নজরুল 'ফিল্‌ফানা' সাধনার আনন্দ-লোকে সজীব হয়ে থেকেও সমাধির আনন্দে বিভোর হয়ে আছেন, কে জানে?

একথা অনেকেই জানেন যে কবি যখন ধীরে ধীরে অন্তরে গভীর ঠাঁই করে নিচ্ছেন সেই সময় কোন লোক তাঁর হাতে যখন কলম তুলে দিয়ে কিছু 'লেখা' আদায় করার চেষ্টা করছেন।[১৪] তখন তিনি কলম ছুঁড়ে ফেলে

(১২) 'হাফিজ'-নজরুল ৭৩ নং কবিতা
(১৩) নজরুল কৃত রুবাইয়াৎই হাফিজের ৬৩নং কবিতা
(১৪) কবি মঈনুদ্দিন খাঁ কৃত যুগস্রষ্টা নজরুল।

দিলেন। যে লোক জীবনে লেখার আনন্দে, গানের আনন্দে উচ্ছল থাকতেন, সেই কবি কলম ত্যাগ করলেন, গান গাওয়া ছাড়লেন। লোক সমাগমে যার ছিল অপার আনন্দ তিনি নিরালায় আস্তে আস্তে সরে গেলেন।—কেন? এই অবস্থা হওয়ার কিছু পূর্বেই তাঁর রুবাইয়াৎ হাফিজের অনুবাদ প্রকাশ হয়েছিল।

আমরা কবিকে পাগল বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করলাম। তাঁর এই অবস্থার জন্য আমরা নানারকম কুৎসাও রটনা করে নিজেদের মুরুব্বিয়ানা জাহির করলাম। কিন্তু তাঁর সাধন-পথের অনুসন্ধান করতে প্রবৃত্ত হলাম না।

স্বল্প জীবনেই অনেক লেখা, অনেক গান, অনেক রকমের কাজ, বহু যশ, টাকা, অপযশ সবই পেলেন; কিন্তু কী যেন পেলেন না; যা পেলেন না, কবি নজরুল তারই জন্য ব্যাকুল হয়ে সেই না-পাওয়ার আনন্দকে খুঁজতে লাগলেন, বললেন—

'তারি আমি বান্দা গোলাম
সৌখিন্ যে রস-পিয়াসী!
গলায় যাহার দোলায় বিধি
পাগল প্রেমের শিকলি ফাঁসী
প্রেমের এবং প্রেমকে জানা
স্বাদ অ-রসিক জানবে কিসে?
পান্ করে এ সুরার ধারা
সুর লোকের রূপ বিলাসী।[১৫]

এই রসেরই সাধনায় কবি মশগুল হয়ে গেলেন। বহু জনসভার মধ্যে রসিকের দেখা না পেয়ে তিনি রসিক খোদার সাথে মুখোমুখী আসন পেতে প্রেম-রসপূর্ণ দেহ-পাত্র তুলে ধরে আছেন,—সেই সুরলোকের রূপ আর পান-বিলাসীর দিকে।

এখানে মুসলমান জোলার সন্তান মরমী সাধক ও কবি কবীর দাসের কথা ভেবে দেখলে নজরুলের মর্মবাদকে ধরবার হয় তো সুবিধা হবে। কবীরের পিতা নিরু, মাতা নিমার একমাত্র সন্তান ছিলেন কবীর। কবীর ছেলেবেলা থেকেই ধর্মপাগল। তৎকালে সাধক, পণ্ডিত, ভক্ত আচার্য রামানন্দ ছিলেন সাধক ও সমাজ সংস্কারক। তাঁর কাছে ছলনা করে কবীর রামমন্ত্র দীক্ষা নিয়ে একলব্যের মত সাধনা করতে শুরু করেন, সাধনায় সিদ্ধও হন।

তার সময় ভারতবর্ষে ভেদবিভেদে হিন্দু মুসলমান ক্রমে মাথা তুলে উঠছিল, কিন্তু কবীর তাঁর গানের মাধ্যমে চাবুক দিতে কসুর করেননি। কবীর যেমন তাঁর সাধন ভাবকে হরি; গোবিন্দ; কেশব; সাহিব প্রভৃতি

(১৫) নজরুল কৃত রুবাইয়াৎই হাফিজের ৩৩নং কবিতা।

নামে প্রকাশ করেছেন নজরুলও তেমনি হরি; কালী; কালা; রাধা আল্লা; ইলা, সাঁই, ব্রহ্মময়ী প্রভৃতি দিয়ে তাঁর ভাবকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কবীর যেমন তাঁর সময়ে বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠানে রত ব্রাহ্মণদের পরিহাস করে বলেছেন—

'মালা ফেরত জনম গয়া, গয়া ন মন্‌কা ফের
করকা মালা ছোড়কে, মনকে মালা ফের।'

'মালা ফেরাতে ফেরাতে তোমার জনম গেল কেটে; মনের দ্বিধা সন্দেহ এখনও গেল না। ওগো এবার থেকে তোমার মনের মালাটি ফেরাও।' কবীর সন্ন্যাসীদের বললেন—

'মন না রগাঁয়ে
রগাঁয়ে যোগী কাপড়া।
আসন মাড়ি মন্দির সে বৈঠে
ব্রহ্ম ছাড়ি পূজন্ লাগে পথরা।

'রে যোগী মন না রগাঁয়ে বসন রাঙালি, মন্দিরে এসে বসলি আসনে। ব্রহ্ম ছেড়ে (প্রেম) পূজলি পাথর?'
কবি নজরুলও বললেন—

'গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান্,
যেখানে মিসেছে হিন্দু-বৌদ্ধ মুসলিম্-ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!
* * *
বন্ধু বলিনি ঝুট্,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজ মুকুট।
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধগয়া এ, জেরুজালেম্ এ, মদিনা, কাবা-ভবন।
মস্‌জিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈশা মূসা পেল সত্যের পরিচয়
এই রণ-ভূমে বাঁশীর কিশোর গাহিলেন মহাগীতা,
এই মাঠে হ'ল মেষের রাখাল নবীরা খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা-মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি
ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান
এইখানে বসি' গাহিলেন তিনি কোরাণের সামগান।

মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন-মন্দির কাবা নাই।'

কবীর মুসলমান মোল্লাদের উদ্দেশ্য করে বললেন—

'না জানৈ সাহব কৈসা হৈ,
মুল্লা হো কর বাংগজো দেবৈ
ক্যা তেরা সাহব বহরা হৈ।
কীড়ীকে পগ নেবর বাজে
সোভি সাহব সুন্‌তা হৈ।'

'ওরে জানিনে তোর প্রভু (সাহব) কি রকম ? মোল্লা হয়ে চেঁচিয়ে আজান দিস্ কেন, তোর প্রভু কি বধির ? ক্ষুদ্র কীটের পায়ে যে নূপুর বাজে তাও তিনি শুনেন এ কি তোর জানা নেই।'

কবীর তৎকালীন ভেদ-বিভেদ বিলাসীদের যখন এমনি তীব্র চাবুক মারছিলেন তখন তাঁর ডাক পড়ে বাদশাহ ইব্রাহীম লোদীর দরবারে। বাদশা তাঁকে ধর্মদ্রোহীতার জন্য অপরাধী করে প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দেন—

'হুজুর আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই। আমার দেশ হচ্ছে অমর-ধাম। আমার কাজ অমর-ধামের বাণী সকলকে শুনান।'

তখন এক অমাত্য তাঁকে ধমকে উঠে গর্দান নেবার ভয় দেখালে কবীর দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন—

'কবীরা কাঁহাকে ডরে ? শির পর সৃজন হার।
হস্তী চড়ী ডরিয়ে নহী, কুত্তিয়া ভুখে হাজার॥

'কবীর ভয় করেন কাকে ? মাথার উপরে আছেন সৃষ্টিকর্তা, হাতীতে চড়ে যে যায় তার পিছনে কুকুর ডাকতে থাকলে কি হবে।' রাজা তাকে বিদায় দিলেন ভক্তি সহকারে।

আপনারা জানেন নজরুল রাজরোষে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের সময় আনন্দিত মনে এই রকমই দৃপ্ত জবানবন্দী দিয়েছিলেন—'রাজার বাণী বুদ্বুদ, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র। আমি কবি, আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রবেশিকা, ভগবানের বাণী, সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে। কিন্তু ন্যায় বিচারে সে বাণী ন্যায়-দ্রোহী নয়। আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই, আমি অমৃতস্য পুত্রঃ।' যে বাদশারও 'বাদশা'র সেবক সে মানব হিতের জন্য কবীরের মত সাহসের সঙ্গে মানব-কল্যাণের বাণী শোনাতে পারে, দারার মত গর্দান জালিমের হাতে ছেড়ে দিয়েও প্রেমের সুরায় মত্ত হয়ে শহীদ হয়। কবি নজরুলের

ইসলামও তাঁকে এই শিক্ষাই দিয়েছিল। তিনি এই শিক্ষা দেশবাসীকে দিয়ে বলেছিলেন :—

'তোমারই করুণায় যাবই তোমায় জেনে,
বসাব মোর হৃদে তোমার আরস এনে,
আমি চাই না বেহেশ্‌ত্‌, রব বেহেশ্‌তের মালিক লয়ে।'[১৬]

বহু ইসলামী সঙ্গিত, কবিতা ও প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে তাঁর স্বজাতি ভারতীয় হিন্দু মুসলমানদের তিনি ডাক দিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন :

'যিনি সকল মানুষের দেবতা, তিনি আজ মন্দিরের কারাগারে, মসজিদের জিন্দানখানায়, গির্জার গোল (goal)-এ বন্দী। মোল্লা-পুরুত, পাদ্রী-ভিক্ষু—জেল ওয়ার্ডার-এর মত তাঁহাকে পাহারা দিতেছে। আজ শয়তান বসিয়াছে স্রষ্টার সিংহাসনে।'

'ভূতে পাওয়ার মত ইহাদেরে মন্দিরে পাইয়াছে, ইহাদেরে মসজিদে পাইয়াছে। ইহাদের বহু দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।'[১৭]

সালেক্‌পন্থী সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আইনের প্রহসনে ১৬৫৭ সালে এক সুফী নাঙ্গা ফকীর সম্রাটকে ধর্মমাতলামীর জন্য সাবধান করায় ঘাতকের হাতে গর্দান দিতে হয়েছিল। তাঁর নাম শহীদ সরমদ্‌। ইনি উদার ধর্মমতাবলম্বী দারার গুরু ছিলেন। এও তাঁর মৃত্যুর আর একটি কারণ। মৃত্যুর পূর্বে শহীদ সরমদ্‌ সম্রাট আলমগীরকে বলেন—'আমি মানুষ বাদশাকে মানি না, আমি জানি প্রেমের বাদশা খোদাতালাকে, নানা জীবের লীলার মাধ্যমে ;—আমি তাই মুসলমানও আবার মুসলমান নয়ও।'

তাতে ঔরঙ্গজেব তাঁকে কাফের বলে মৃত্যুদণ্ড দেন, তিনি তার উত্তরে বলেন :

'হাম ফুর্‌কানাম্‌ হাম কাশি শিরী রাহ্‌ বানাম্‌,
রাবিয়ি এহু দানাম্‌ কাফিরাম মুসলমানম্‌।'

অর্থাৎ—আমি একই সময়ে কোরাণের অনুবর্তী ; আমি পুরোহিত ; সন্ন্যাসী ইহুদী যাজক্‌, হিন্দু ও মুসলমান।[১৮]

নজরুলের ইসলাম ও শহীদ সরমদ্‌, সুফী কামাল, কবীর দাস, রজ্জব, মনসুর প্রভৃতির ইসলাম এক। এই 'ইসলাম' ধর্মের অনুসারী প্রেমিক মাত্রই —সে যে জাতেরই হোক।

(১৬) এখানে স্পষ্টতঃই দ্বৈত তথা রস সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। রামপ্রসাদও বলেছিলেন 'চিনি হতে চাইনে গো মা চিনি খেতে ভালবাসি'।
(১৭) নজরুল লিখিত রুদ্রমঙ্গল গ্রন্থের 'মন্দির মসজিদ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
(১৮) শান্তিনিকেতনের ফার্সী পণ্ডিত ফজল মহম্মদ আসিরি কর্তৃক অনুদিত রুবাইয়াৎ-ই-সরমদ্‌ থেকে।

নজরুলের জীবন-দেবতা

কবি নজরুল "বিদ্রোহী" কবিতা লিখবার পর মানব-জীবনে অফুরন্ত গতিবেগ ও আবেগ সঞ্চার করার প্রেরণায় চলচঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন।

তিনি চলায়, বলায়, কর্মে ও আদর্শে কুঁড়েমি, ন্যাকামিকে বরদাস্ত্ করতে পারতেন না। তিনি চেয়েছিলেন দেশের সাধারণ লোক তরুণ ও নরনারী নির্বিশেষে কর্মবীর হোক—শোষণ পীড়নের জবরদাস্ত্ শত্রু হোক। ন্যায়কে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণবলি দিক, অন্যায়কে উৎখাত করুক। জীবনের প্রতিটি পথে বীর পদক্ষেপে কর্মে, প্রেমে জগতের সামনে জাতিকে উচ্চশীর্ষে গৌরবমণ্ডিত কাঁটার মুকুট পরে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবার শক্তি সঞ্চয় করে তাকে সঞ্চারিত করে দিক দিকে দিকে। তিনি এই আকাঙ্ক্ষাই শুধু করেন নি তথাকথিত বিলাসী কবিদের মত। তিনি নিজের জীবনে "আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাবার" ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। এই ছিল তাঁর জীবন সম্বন্ধে ধ্যান। সেই ধ্যানের মূর্তিই অগ্নিময় ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর বিভিন্ন বৈপ্লবিক গানে, কবিতায়, রচনায়। "জীবন বন্দনা" কবিতায় তাঁর জীবনের প্রতি বন্দনার মহান ভাব ব্যক্ত হয়েছে—

'গাহি তাহাদের গান
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।'[১]

কবি প্রথমেই তাঁদের বন্দনা গাইলেন, যাঁরা মানবজাতিকে ক্ষুধায় বাঁচবার জন্য দিলেন ফসল। "অন্নব্রহ্ম" তত্ত্বের প্রথম ও প্রধানতম কথারই বন্দনা এটি। উপনিষদের গোড়ার কথাও এটিই। উপবাসী মানুষ কোন মহৎ কাজ যেমন করতে পারে না, তেমনি অতিভোজও অপদার্থ জীবন বহন করে। অথচ "ফসল" এমন একটি দ্রব্য যা প্রয়োজন মাফিক গ্রহণ করলে শরীরের শান্তি, মননশীলতা, পেশীর সবলতা, ধমনীর সুনিয়ন্ত্রিত প্রবাহ, সব মিলিয়ে বুদ্ধির ও কর্মের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। তাকেই উপনিষদে "অন্নব্রহ্ম" বলেছেন। অতিভোজীর দল আজও এই ফসল নিয়ে ফাট্কাবাজি করে দেশে অশান্তির আগুন জিইয়ে রাখছে।

এমন যে "ফসল" তাকে যারা কঠিন মাটিকে তৈরি করে জলের স্রোতধারায় উর্বরতার জন্য খাল কাটল, বন্যার হাত থেকে ফসল বাঁচাবার জন্য বাঁধ বাঁধল, মৃত্তিকার কঠিনতা যাদের মুষ্টির তলে বাঁধা পড়ল, যার

(১) জীবনবন্দনা—সন্ধ্যা পর্ব্ব

প্রাণপণ শক্তি ও যত্নে ধরণী শস্য সম্ভার মানুষের মুখে তুলে ধরলে,—সেই শ্রম-সাধককে আর সেই অন্নকে বন্দনা জানিয়ে নজরুল গাইলেন—

'শ্রম-কিনাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দ্দয়-মুঠি-তলে
ত্রস্তা ধরণী নজ্‌রানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।
বন্য-শ্বাপদ-শঙ্কুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা
যাদের সাধনে হল সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা।
কূপ-মণ্ডুক "অসংযমী"র আখ্যা দিয়াছে যারে
তারি তরে ভাই গান রচে যাই ; বন্দনা করি তারে।'২

শুধু তাই নয়, বন্য হিংস্র জানোয়ারের অগম্য সেইসব জায়গাকে কব্জায় আনবার জন্য যারা লড়াই করে মানব-সভ্যতার বাগিচায় পরিণত করল ; যারা এই কাজ করতে "বনের ব্যাঘ্র মরুর সিংহের" শক্তিকেও সায়েস্তা করে মানব-সভ্যতার প্রসারের পরেও "বর্বর" নাম নিলে, যারা প্রাণ তুচ্ছ করে বিষম বিষাক্ত ফণীর সঙ্গে লড়াই করে তাদের লোপাট করে শহর, নগর, রাজধানী প্রতিষ্ঠা করল অপরিমেয় প্রাণ ও জীবনীশক্তি দিয়ে ; কবি তাদের বন্দনা গাইলেন—

'এল দুর্জয় গতিবেগ সম যারা যাযাবর শিশু
তারাই গাহিল নব-প্রেম-গান ধরণী-মেরীর যিশু'৩

এই শ্রমিকরাই যিশুর আত্মদানের মত উৎপাদন করে যুগ যুগ নিঃস্ব হয়ে চলেছে। এদের ঘর নেই ; বিষয় সম্পত্তিও নেই, এরা দুটো হাতকে পরিশ্রমের যন্ত্র করে নিত্য নব নব সৃষ্টি করার দুর্বার বেগে শ্রম করে যাচ্ছে। তারাই সভ্যতার জৌলুষের গৌরবের অধিকারী। এরাই উপেক্ষিতা মেরীর মত এই ধরণীকে মহিমময়ী করেছে, দিয়েছে সম্ভ্রম। তাই নজরুল এদের বন্দনা করে আজ বিশ্বে নমস্য।

যারা অরণ্য কেটে বসাল আমরাবতী তারা তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে ঠাঁই পেল এঁদো পচা ডোবার মত দুর্গন্ধময় বস্তিতে। এই অবস্থাকে চিরস্থায়ী করতে যারা আইন করল নজরুল সেই ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদীদের ছিলেন চিরশত্রু। তাই "ফরিয়াদ" কবিতায় লিখলেন—

'মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ
মাটির মালিক তাঁহারাই হন ?

(২) জীবনবন্দনা—সন্ধ্যা পৃষ্ঠা ৪
(৩) জীবনবন্দনা—সন্ধ্যা পৃষ্ঠা ৪

যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ, আজ সেই তত বলবান্
নিতি নব ছোরা গড়িয়া কশাই বলে জ্ঞান বিজ্ঞান ॥'[৪]

নজরুল শুধু লিখেই সন্তুষ্ট থাকেননি, তিনি কাজের মধ্যেও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কৃষিসমাজের উন্নতির জন্য গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরেছেন, তাদের জন্য কৃষাণের গান লিখেছেন। নিখিলবঙ্গ ধীবর সমিতির সম্মেলনে গিয়ে তাদের মত করে গান লিখেছেন, তাদের সঙ্গে মিশেছেন। শ্রমিক সম্মেলনের গান লিখে শ্রমিকদের মধ্যে গেছেন। হুগলীতে থাকতে স্বর্গীয় বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বহু শ্রমিক সভায় গিয়েছেন। তাঁর জীবন-দেবতার মূল প্রসারিত ছিল মেহনতী মানুষের সমাজের গভীরতম প্রদেশে।

আজ আমাদের দেশে নজরুলকে "মিষ্টিক" কবি বলে একশ্রেণীর সুধীমণ্ডলী প্রচার করছেন। কিন্তু নজরুল আজ নমস্য হয়েছেন, পূজা পাচ্ছেন মেহনতী মানুষের কবি বলেই। কবি হয়েও অত্যাচার, শোষণ, শাসনের বিরুদ্ধে নিজেকে ধনীর হাতে বিক্রয় করে না দিয়ে, দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন। সেই কথাটা আজ মেহনতী সংস্থাগুলি ও আমাদের প্রিয় সরকারকে তরুণদের ও জনগণের মধ্যে পুনঃপ্রচার করে কবির আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে আর মেহনতী শ্রেণীকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে হবে—আর শোষকশ্রেণীর বিলোপের সংগ্রামে নজরুল-সাহিত্যকেও একটি হাতিয়ার হিসাবে নিতে হবে।

(৪) ফরিয়াদ—সর্বহারা পৃষ্ঠা ২০



হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম



নজরুল ও তাঁর বন্ধু বিবাহের পুরোহিত মঈনুদ্দীন হোসেন

পরিশিষ্ট

নজরুল বন্ধু শম্ভু রায়ের পত্রাবলী

[কাজী নজরুল ইসলামের সৈনিক-জীবনের প্রথম দিন থেকে তাঁর বন্ধু শ্রীযুক্ত শম্ভু রায়মহাশয় আমাকে নজরুল সম্বন্ধে কয়েকখানি পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রগুলি এখানে দেওয়া হল। এর থেকে নজরুল জীবনের প্রস্তুতির যুগ সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া যাবে। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় ৪৯নং বাঙালী পল্টন ব্রিটিশ ভেঙে দেবার পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরি পান। নজরুলকে ব্রিটিশ সরকার দিয়েছিল সাব রেজিস্ট্রারের পোস্ট। নজরুল সেই নিয়োগপত্র ছিঁড়ে ফেলে কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের পথ বেছে নিয়েছিলেন। শম্ভুবাবু ট্রেজারি অফিসার হয়ে ১৯৫২ সালে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅরিন্দম রায়ের নামকরণ নজরুল তাঁর বন্ধুর অনুরোধে করেন। কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি দেহত্যাগ করেন। বর্তমানে তাঁর ছেলেরা চন্দননগর হাটখোলা দয়ের ধারে বাস করছেন।]

১নং পত্র

বাবুগঞ্জ, হুগলী
২৪।৬।৫৭

প্রাণতোষবাবু, বই পড়লাম।

আপনি কাজী সম্বন্ধে যে সব তথ্য জানেন তা সত্যই মধুর। কাজীকে আপনি সত্যই চিনতে পেরেছেন। কাজী শাপভ্রষ্ট দেবতা। পল্টনে যেদিন কাজী যায় সেদিন থেকে আরম্ভ করে পল্টন থেকে যেদিন আমি চলে আসি সেদিন পর্যন্ত আমি ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। অবশ্য কাজীর উদার প্রাণে ঘনিষ্ঠতা গজিয়ে তোলা কারও পক্ষেই অসম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ তখন আমরা সবাই জুটেছি গুলি-বারুদের মুখে প্রাণ দিতে। পিছনে তাকাবার সময় ছিল না—প্রবৃত্তিও ছিল না।

নিজেরা সব মিলতাম ব্রজের রাখাল বালকের মত। কাজীর পড়াশোনার প্রতি বেশ প্রীতি ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত পুস্তকই ও শরৎচন্দ্রের সব লেখাই কাজীর কাছে ছিল। তা'ছাড়া মাসিক পত্রিকাদি প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, মানসী ও মর্মবাণী সবুজ পত্রিকাদি প্রভৃতি সবই কাজী রাখত। এছাড়াও কাজীর কাছে দেখেছিলাম Seditious Committee-র Report। এদেখে বুঝতাম কাজী বিদ্রোহী বাঙলার বিপ্লবী দলকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। হাসি আনন্দ ছিল তার সম্বল। পল্টনের প্রায়

৭০০০ বাঙালীর মধ্যে নানা শ্রেণীর ও নানা প্রকৃতির মানুষ ছিল। গাইয়ে বাজিয়ের সংখ্যাও কম ছিল না। Bengali Volunteer Committee-র দয়ায় আমাদের কোনও অভাবই, অবশ্য পল্টনের আইন সঙ্গত কিছুই অপূরণ থাকত না। তাই আমাদের Folding table, harmonium থেকে আরম্ভ করে Banjo, Clarionate, Coronate বেহালা প্রভৃতি সকল রকমের গীত-বাদ্যাদির জন্য যন্ত্র পল্টনকে সরবরাহ করা হয়েছিল। গাইয়ের, বাজিয়েরও অভাব হয়নি। বেশ ভাল ভাল গাইয়ে বাজিয়েরাও পল্টনে যোগদান করেছিল। এঁরা প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যায়ই কাজীর ঘরের সম্মুখে বসে দারুণ ভাবে গান বাজনা চালাতেন। আর সেই সময় যখন গান মিলের উচ্চস্তবে গিয়ে উঠত তখন দর্শকরা 'বাহবা' দেবার ছলে উল্লাসে বলে উঠতেন "চালাও পান্‌সি বেলঘরিয়া", "ঘি চপ্‌চপ্‌ কাবুলী মটর," "দে গরুর গা ধুইয়ে" ইত্যাদি এবং আপনি যে "দে গরুর গা ধুইয়ে"—প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন তার গোড়ার ঘবে এই।

কাজী পল্টনে অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী ও সভ্য জীবন যাপন করেছেন। তাঁর কোর্ট মার্শালের সম্মুখীন হবার কথা সম্পূর্ণ অলীক ও ভিত্তিহীন। তাঁব পরম দরদী মন বাঙালীকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য বালক সুলভ সরলতা নিবন্ধন নির্মল স্বার্থহীনতা প্রসূত আইনের বাইরে এগিয়ে গেলেও এ কার্যে সাধারণের উপকার ছাড়া ক্ষতি কখনও হয়নি। কাজী যে দরদী তা' সবাই জানত তাই তাব উপর সবারই আবদার ছিল। বিপদে পড়লে সবাই কাজীর স্মরণ নিত।

এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য বলবার আছে তা' পরে জানাব। এখন আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, নজরুল কি করে রাশিয়ার স্বাধীনতার খবর পেয়েছিল। আমাদের ব্যারাকের কর্তৃপক্ষের শ্যেন দৃষ্টি ছিল যাতে আমরা বাইরে থেকে কোন রকম রাজনৈতিক খবর না পাই। সে জন্য পত্র পত্রিকা যা আসত তা পরীক্ষা করে আমাদের দেওয়া হত। তা সত্ত্বেও "বজ্র আটুনী ফস্‌কা গেরো"র মত হওয়ার দরুন ও সব খবরাখবর কি করে জোগাড় করত সেই জানে।

নজরুলের আড্ডা থেকেই বাছাই করা কয়েকজনকে সে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সংবাদ দিত, যেমন আইরিশ বিদ্রোহ ও রুশদের কথা। আমরা কয়েকটি বন্ধু এসব বিষয় যেমন সাবধানতার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতাম নজরুল তার ভাবকে তেমন করে চেপে রাখতে পারত না। অবশ্য তার একটা পথ ছিল, গান ও কবিতার সাহায্য, সে গান গেয়ে ও কবিতা পড়ে তার ভাবকে ব্যক্ত করত। সৈন্যদের মধ্যে এ সব নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামাত না।

একদিন সন্ধ্যায় ১৯১৭ সালের শেষের দিকেই হবে, এখন ঠিক স্মরণে আনতে পারছি না, হয়তো সেটা শীতের শেষের দিক। নজরুল তার বন্ধুদের মধ্যে যাঁদের বিশ্বাস করতেন, তাঁদের এক সন্ধ্যায় খাবার নিমন্ত্রণ করে। অবশ্য এ রকম নিমন্ত্রণ প্রায়ই সে তার বন্ধুদের করত। কিন্তু

ঐ দিন যখন সন্ধ্যার পর তার ঘরে আমি ও নজরুলের অন্যতম বন্ধু, তার অর্গান মাস্টার হাবিলদার নিত্যানন্দ দে প্রবেশ করলাম, তখন দেখলাম, অন্যান্য দিনের চেয়ে নজরুলের চোখে মুখে একটা অন্যরকম জ্যোতি খেলে বেড়াচ্ছিল। উক্ত নিত্যানন্দ দেমহাশয়ের বাড়ি ছিল হুগলী শহরের ঘুটিয়াবাজার নামক পল্লীতে। তিনি অর্গানে একটা মার্চিং গৎ বাজানর পর নজরুল সেই দিন যে সব গান গাইলেন ও প্রবন্ধ পড়লেন তা থেকেই আমরা জানতে পারলাম যে রাশিয়ার জনগণ জারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। গান বাজনা প্রবন্ধ পাঠের পর রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং লালফৌজের দেশপ্রেম নিয়ে নজরুল খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এবং ঠিক মনে নেই, সে গোপনে আমাদের একটি পত্রিকা দেখায়। ঐ পত্রিকাতে আমরাও বিশদভাবে সংবাদটি দেখে উল্লসিত হয়ে উঠি সেদিন সারা রাতই প্রায় হৈ হুল্লোড়ে আমাদের কেটে গিয়েছিল।

কাজী যে কাজ আরম্ভ করত তা শেষ না করে কখনও ছাড়ত না। তাই যে লেখা সে পল্টনে যাবার আগেই আরম্ভ করেছিল সে অভ্যাস সে সমস্ত পল্টনের জীবনেই চর্চা করে গেছে। এত যার আনন্দ, এত যার উৎসাহ যে, "নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গের" মতই উচ্ছ্বসিত আজ সে নিস্তব্ধ। ভগবানের কি ইচ্ছা কে জানে!

ইতি—
ভবদীয়
শম্ভু রায়
২৪।৬।৫৭

২নং পত্র

প্রাণতোষ বাবু, অনেক সময় অনেক কথা মনে পড়ে। ধরে রাখার অভ্যাস নেই। আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর মাঝে মাঝে টুক্‌রো টুক্‌রো লিখে পাঠাব। প্রথম চিঠিতে নজরুলের দরদী মনের কথা বলব বলেছিলাম।

একবার একজন LT নাম LT Driver বেচারী বোধ হয় বেশীক্ষণ একদম অফিসে বসে বাহ্যের বেগ সহ্য করতে না পেরে হেগে ফেলেছে। আর তার পাতলা বাহ্যি একদম সার্টের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে একেবারে পট্টি বুট ছাপিয়ে বেয়ে এসেছে। বেচারী কাঁচুমাচু হয়ে ছুটেছে। কাজী (নজরুল) সেখানে বসে আছে প্যান্ট কোট বুট পট্টির ভাণ্ডারের আড়াল যেখানে, এই আশায় যে কাজীর কাছ থেকে প্যান্ট পট্টি প্রভৃতি চেয়ে নিয়ে ওখানে কাজীর গুদামের এক কোণে লুকিয়ে সব বদলে ফেলে আবার ঠিক হয়ে এসে বসবে।

ঐ অবস্থা দেখে কাজী একটা ছেলেকে দৌড়ে আমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিল। আমি এসে দেখি বিপদগ্রস্থ সাহেবকে কাজী প্যান্ট স্টকিং, পট্টি বের করে দিয়েছে। আর সাহেব তাই বদলাচ্ছে। সাধারণ ভাবে কাজী কিন্তু ইউরোপীয়ানদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত; কিন্তু বিপদে পড়া এই লোকটিকে

অযাচিত সাহায্যও করেছে। এমনি পল্টনে কত দরিদ্র যে কাজীর কাছে কত রকমে সাহায্য পেয়েছে তার অন্ত নেই।

পল্টনের Committee-র দরুণ Harold এর বাড়ির Folding Organটি কাজীর ঘরেই থাকত। কাজীর হারমোনিয়াম বাজনা ও গান শিক্ষার প্রাথমিক ঠিকানাও ওখানে। কাজীর প্রথম Organ বাজিয়ে গান আমার বেশ মনে আছে— "ওকি হোলো গো আমার

বুঝিবা সজনী হৃদয় আমার হারিয়েছে" ইত্যাদি।

কাজীকে Organ বাজনার শিক্ষা দেন হুগলীর ঘুটিয়াবাজারের হাবিলদার নিত্যানন্দ দে।

আপনার
শম্ভু রায়
২৭।৬।৫৭

৩নং পত্র

প্রিয় চাটুজ্জ্যেমশাই,

কাজী সম্বন্ধে চাকরি জীবনে আর একটি ঘটনা যা আমাকে বিশেষ গৌরবান্বিত ও শ্রদ্ধান্বিত করেছিল, সেটা হচ্ছে এই যে, কাজী যে সাম্যবাদের কবি তার প্রমাণ আমি ১৯২৮ সালে পেলাম। ঐ সময় আমি ২৪-পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার সার্কেল আফিসার (চৌকিদারী)। একদিন বসিরহাট থেকে অনেক দূর, বোধ হয় ১৬।১৭ মাইল হবে, চারঘাট নামে এক ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শনে বেরিয়েছি বাই সাইকেলে—তখন বাই সাইকেলই আমাদের আদর্শ যান—বাসা থেকে বেরিয়েই দশ বারো গজের মধ্যে মুন্সিফ-বাবুর ওখানে তাঁর ১৯ বছরের বি. এ. ক্লাশের কুমারী কন্যা দোতলায় অর্গান বাজিয়ে গান ধরেছেন—"কে বিদেশী মন উদাসী" ইত্যাদি। প্রাতঃকাল, বালিকাকণ্ঠের মধুর সুর বিশেষ করে বন্ধু রচিত গান মনকে আনন্দে ভরে দিল। বেশ একটা তৃপ্তিবোধ করলাম। তারপর ঘন্টা দুই বাইক করার পর চারঘাটে প্রেসিডেন্টের বাড়ি, তখন প্রেসিডেন্টের বাড়িতেই ইউনিয়ন বোর্ড অফিস হত।

একটা মাঠ, সেইটে ঘুরে যেতে হয়, সেই মাঠে চাষীরা কাজ করছে। তার মধ্যে একজন সুন্দর মোটা গলায় সেই "কে বিদেশী মন উদাসী" ইত্যাদি গান ধরেছে। কি মধুর কণ্ঠস্বর, কি স্বাধীন সুর। চিত্ত আমার পরম তৃপ্তিতে ভগবানের চরণে নুইয়ে পড়ল ;—হে ভগবান আমাদের কাজী কত উদার,—শহরের ধনীর প্রাসাদ থেকে সুদূর পল্লীগ্রামের দরিদ্র চাষীর কর্মক্ষেত্র মুক্তশষ্য প্রান্তর এর সুষমামণ্ডিত মহিমায় ছড়িয়ে গেছে। এই সর্বকালীন কবি আজ বিধির বিধানে মূক, বোধশক্তিহীন। ইতি

শম্ভু রায়
২৯।৬।৫৭

৪নং পত্র

শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
মহোদয় সমীপেষু—

প্রাণতোষবাবু,—সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জানবেন। হঠাৎ নজরুলের কথা মনে পড়ায় সুদূর অতীতের মধ্যে মন ডুবে গেল। কত আনন্দ কত মুক্ত মন ছিল আমাদের। যা দেখতাম, যা শুনতাম তাই কত মধুর তাই কত সুন্দর লাগত, কত অনেন্দেরই যে ছিল দিনগুলো। স্বাধীন হলাম, কিন্তু ইংরেজের শোষণের চেয়ে আমাদের দেশীয় শোষকদের শোষণ যে কত ভয়াবহ হয়ে উঠল, চোখ, কান ও মনকে যে কতখানি পঙ্গু করে দিল এরা, ভাবতে পারি না। আজকেও নজরুলের প্রয়োজন যত বেশি করে মনে পড়ছে তার সঙ্গে মনে পড়ছে তার লীলাখেলার সব মধুর ও মহান ছবি। আজ আপনাকে দুটি ঘটনার কথা জানাব।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে একদিন ছুটির দিনে। জনাতিনেক ছেলে বেড়াতে বার হল। তারা ঘুরতে ঘুরতে করাচীর বাজারে ঢুকল। অনেকক্ষণ ঘোরা-ঘুরির পর তারা একটা ঘড়ির দোকানে ঢুকল। মালিকের সঙ্গে ঘড়ির দরদাম করবার সময় দোকানের মালিকটি ছেলেদের বললে যে 'বাঙালীরা আবার টাকা দিয়ে ঘড়ি কিনতে পারে নাকি ?' একথা শুনে ছেলে তিনটি অপমান বোধ করায় কথা কাটাকাটি থেকে ব্যাপারটা মাথা ফাটাফাটির পর্যায় পৌঁছল। ছেলেরা গেছে যুদ্ধে, তাদের মরীয়া জীবন, তারা অপমান সহ্য করবে কেন ? ঘড়ির দোকানের কাঁচের আলমারি, শো-কেশ প্রভৃতি ভেঙে তছনছ্ করে ফিরে এল ব্যারাকে। আমি তখন "ডিসিপ্লিনারী ইনচার্জ জমাদার।" আমার কাছে এসে সরল ভাবে সব কথা বলায় ব্যারাকের বিপদবারণ নজরুলের কাছে নিয়ে এলাম ওদের। নজরুলের উদার প্রাণের দরজা খোলাই ছিল। বিশেষ করে ডানপিটে ছেলেদের নজরুল খুব ভালবাসত। বাঙালী ছেলেরা বাঙালীর অপমানের জবাব দেওয়ায় নজরুল খুশি হয়ে তাদের ও আমাকে অভয় দিল। করাচীর ব্যারাকে নজরুল ছিলেন "কোয়ার্টার মাষ্টার হাবিলদার", মানে বুট্, প্যান্ট, কোট, মোজা, কম্বল প্রভৃতির সরবরাহকারী। অনেক চেষ্টা করে এ কাজটা সে জোগাড় করেছিল। এসব পোষাক পরিচ্ছদের ভাঁড়ারের আড়ালে বসে সব সময়ই লেখা পড়ায় মশগুল থাকত।

যাই হোক আমি কাজীকে এর একটা বিহিত করতে বলায় কাজী অনেকক্ষণ পরামর্শ করে বললে—ওদের হাজিরা লিখে নাও, আর আমি সবাইকে নূতন পোষাক দিচ্ছি, পুরানোগুলোতে কাদামাটি রক্ত লেগে আছে, ওগুলো পুঁতে ফেল তা হলেই ওরা বেঁচে যাবে। তাই করা হল।

কিছুক্ষণ বাদে দোকানের মালিক পুলিস সুপারিনটেনডেন্টকে নিয়ে এল সনাক্ত করবার জন্য। কিন্তু সে সবাইকে আবোল তাবোল করে সনাক্ত করায় মামলা গেলো ফেঁসে, ছেলে তিনটি বেঁচে গেল।

এর পরের ঘটনাটি আরো মজার। যখনকার কথা বলছি তখন ৪৯ নং বাঙালী পল্টনে কাতারে কাতারে কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় সবাই যোগ দিচ্ছিল। বাঙলা থেকে একটি ফুটফুটে সুন্দর কিশোর এসে যোগ দিল, আশা বড় যোদ্ধা হবে। কিন্তু যে আসবে সেই যে সৈন্য হতে পারবে তা হত না। অনেক বিভাগ ছিল, তাদেরকে বিভাগ অনুযায়ী ভাগ করে দেওয়া হত। অবশ্য সৈন্য বিভাগের যে কোন বিভাগে ঢুকতে পারলেই একদিন না একদিন সৈন্য পদে উঠতে পারবে এই মনে করে এরা তাই মেনে নিত। এই ছেলেটি রাঁধুনীর কাজ নিয়ে করাচীতে আসে। Head cook গোবিন্দ ছিল ভারী অত্যাচারী। যত রাঁধুনী ছিল গোবিন্দ এদের সকলের ওপর অত্যাচার করত। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ছেলেটি বাঙলায় পালিয়ে আসে। ব্যারাক থেকে পালিয়ে যাওয়া সৈনিকদের আইনে খুব অপরাধ। তাই তাকে বাঙলা থেকে গ্রেপ্তার করে করাচীতে নিয়ে আসে এবং বিচারের ব্যবস্থা হয়।

এই বিচারের ভার পড়ে লেফ্‌টেন্যাণ্ট ডগলাসের ওপর। ডগলাস ছিল আই. সি. এস. অফিসার। যুদ্ধের পরে মেদিনীপুরে ডগলাস ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসে স্বদেশী আন্দোলনে নর, নারী ও কর্মীদের ওপর খুব অত্যাচার করায় বাঙলার বিপ্লবীদল তাকে গুলি করে খুন করে।

এহেন ডগলাস হল উক্ত ছেলেটির বিচারক। ডগলাস তখনি মাত্র দেশ থেকে এসেছে। একেবারে আনকোরা, এদেশের ভাব ভাষা কিছুই বোঝে না। তাই সবাই নজরুলকে ধরল যে এই ছেলেটিকে বাঁচানোর বুদ্ধি বার করতে হবে। মন্ত্রণা সভা বসল। আমি, মনীরুদ্দীন ও নজরুল অনেক পরামর্শ করে ছেলেটিকে কি বলতে হবে তা' বুঝিয়ে দিলাম। মনীরুদ্দিন সাহেবকে ও ছেলেটাকে মহড়া দেবে আর নজরুল আকার ইঙ্গিতে ঐ ছেলেটিকে কি বলতে হবে তা বোঝাবার চেষ্টা করবে। বিচারক ডগলাসের কাছে ছেলেটিকে আনা হল। ডগলাস জিজ্ঞাসা করল What is gobindo ? ছেলেটি বুঝতে না পারায় নজরুল তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল— "gobindo is another name of blanket, sir" (কম্বলের আর এক নাম গোবিন্দ, স্যার) যেখানে কম্বল, প্যাণ্ট পোষাক চাঁই করা ছিল নজরুল সেখানে গিয়ে মনীরুদ্দীনকে সেই ছেলেটাকে কেবল কম্বলের স্তুপটা দেখাচ্ছে আর জোড় হাতে তাকে বলতে বলছে।

ডগলাসের কি মনে হল ভগবানই জানেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন— "Is not gobindo free issue ?" (গোবিন্দ কি ফ্রি ইসু হয় না?)। নজরুল মনীরুদ্দিনকে হাত ইসারায় বললে 'না' (No), মনীরুদ্দিন তখন বললে "No"। তখনই লেফ্‌টেন্যাণ্ট ডগলাস হুকুম দিলে—"Issue twelve gobindos for my followers, বলেই সাহেব চলে গেল। উপস্থিত সবার মুখে হাসি ফুটল, ছেলেটা বাঁচল আর আমরা সবাই ১২ খানা করে "গোবিন্দ" পেলাম। সেই থেকে কম্বলের কথা বলতে হলে আমরা "গোবিন্দ" বলতাম

আর হাসির হুল্লোড় পরে যেত। এমনি করে নজরুলের বুদ্ধিতে আমরা মুস্কিলে আসান পেতাম।

ইতি
ভবদীয়
শম্ভু রায়
৩০।৮।৫৭

শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
গৌরী নিবাস, প্রতাপপুর
হুগলী।

৫নং পত্র

প্রাণতোষ বাবু,

ব্রিটিশ কর্তৃক অসামরিক জাতি বলিয়া অবজ্ঞাত বাঙালীকে সৈনিক হিসাবে কৃতিত্ব অর্জনের সুবিধা দিবার জন্য ১৯১৪-১৮ সনের মহাসমরে প্রথম বাঙালী Double Company সংগঠিত হয়। ১৯১৬ সালে এদের মোট সংখ্যা ছিল ২২৮ জন। কয়েকজনকে এদের কলকাতা থেকে পাঠান হয়। N.W.F.P-র নওসেরা ক্যান্টনমেন্টে ৪৬নং পাঞ্জাবী বাহিনীর সঙ্গে মিলে সৈনিকের কাজে শিক্ষানবিসি করত। ওখানে বাঙ্গালী খুব খ্যাতি অর্জন করে এবং সকলের প্রিয় হয়ে উঠে। নওসেরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বাঙালী ডবল কোম্পানিকে হঠাৎ প্রায় তিনমাস পরেই ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে করাচীতে বদলী করে দেওয়া হয়।

১৬নং রাজপুত বাহিনীর সঙ্গে শিক্ষানবিসির জন্য সংযুক্ত করা হয়। ১৬নং রাজপুত বাহিনী কিছুদিন পরেই কিন্তু···সার্ভিসে চলে যায়। যাবার সময় ঐ রেজিমেন্টের Commanding Officer Col. Venrenon বাঙালী Double Company-কে তাঁদের সৈনিকের কাজে নৈপুণ্য দেখে Scout করে Field Service-এ নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বাংলা থেকে ঠিক হয় যে বাঙালীর পুরো একটা রেজিমেন্ট না করে Field Service-এ বাঙালীকে পাঠান হবে না। তারপর বাঙালী রেজিমেন্ট সংগঠনের আদেশ জারি হল বোধ হয় ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে।

দলে দলে বাঙালী ছেলেরা সৈনিক হিসাবে যোগ দিতে লাগল এবং এই সময় কোনও একজনের সঙ্গে কাজীও করাচীতে সৈনিক হিসাবে যান। কাজীর অন্তর ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে, অতএব বিদ্রোহী, তথাপিও শিক্ষানবিসিতে কাজী কখনও আইন বা নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করেননি। তাঁর শিক্ষানবিসি কৃতিত্বপূর্ণই ছিল।

রেজিমেন্ট গড়ে উঠতে না উঠতেই রেজিমেন্টকে মেসোপটেমিয়া পাঠাবার হুকুম হয়। সে সময় করাচীতে আমাদের ১১৭ নং মারহাট্টা রেজিমেন্টের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখা হয়েছিল। ঐ রেজিমেন্টের Commanding Officer

Major Water, আমরা Field Service-এ মেসোপটেমিয়া যাচ্ছি শুনে, আমাদের বলেছিলেন যে এই সব অশিক্ষিত রিক্রুট নিয়ে কখনও মরুভূমি অঞ্চল মেসোপটেমিয়ায় নিয়ে যেওনা। সুশিক্ষিত ও পুরাতন সৈনিকদেরও মরুভূমি অঞ্চলে যুদ্ধ প্রণালী বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিলে তবেই Desert অঞ্চলে সারভিসে অথবা যুদ্ধে পাঠানর নিয়ম।

তোমরা বাঙালী, না হয় বুঝলাম তোমরা সব বিষয়ে অতি অল্প সময়ে বুৎপত্তি লাভ করতে পার, কিন্তু আমি বলব তোমরা অন্ততঃ পক্ষে এদেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে ছমাস শিক্ষানবিসি করে বিশেষ ভাবে সৈনিকের কাজে শিক্ষিত হয়ে তবে মরুভূমি অঞ্চলে মেসোপটেমিয়ায় যাও। যুদ্ধ পাগল বাঙালীর ছেলেরা বিশেষ করে আমাদের তখনকার অতি প্রিয় অধিনায়ক জমাদার শৈলেন বসুমহাশয়, পরে ইনি সুবেদার মেজর হয়েছিলেন এবং Indian Distinguished Service-এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে তৎক্ষণাৎ মেসোপটেমিয়ায় চলে যাবার বন্দোবস্ত করেন। কি যে দৃশ্য। নূতন রিক্রুট বাঙালীর ছেলেরা স্থানাভাবে সর্বত্র গাদি মেরে আছে। বাঙালীর ছেলের প্যাণ্ট, ব্লেজার, পট্টি, মোজা, বুট প্রভৃতি কিছুই তাদের ফিট করেনি। কারণ Ordinance Depot থেকে এই সব Indian Regiment-এর জন্য পোষাক দৈনিক প্রচুর পরিমাণে আমাদের ওখানে পৌঁছচ্ছে আর বিলি হচ্ছে। সাজ-সজ্জার গুণে কুলিমার্কা চেহারা করেই চলেছে যুদ্ধ করতে, তারপর Rifle, Bagout এবং Trench Diggs-এরা নূতন, যারা এসেছে কেউই খালি হাতেই তখনও প্যারেড শিক্ষায় উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। তাদের দেওয়া হল Rifle Bagout ও Ammunition অর্থাৎ গুলি এবং সঙ্গে নিতে হবে আটমণ ঝোলা। ঠিক ছিল ওদের শিক্ষা দেওয়া হবে আরবের মরুভূমি বসরাতে।

কি সুন্দর ব্যবস্থা। শুধু মাত্র Double Company-র সৈনিকরাই তখন শিক্ষিত। আবার এর মধ্যে একদলকে খচ্চর বাহিনী করেও আগে ও এক পাল খচ্চর দিয়ে বেলুচ রেজিমেণ্টের খচ্চর বাহিনীর সঙ্গে জাহাজ বন্দী করে বসরায় পাঠান হল। কত যে বড় বড় জমিদার আর ভাল ভাল ঘরের নন্দদুলালরা এই সব কাজে নিযুক্ত হলেন তার ইয়ত্তা নেই। প্রথম দল বাঙালী সৈনিকেরা ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে জান কবুল করে বসরা চলেছে। মোট কথা, প্রথম দলে যেতে দেবেন যিনি আমাদের শিক্ষানবিসি হিসাবে তখন করাচীতে তিনিও কিন্তু সার্ভিসে যেতে পারেননি এবং নজরুল ও আরও অনেকেও field-এ যাবার অত্যন্ত আগ্রহ সত্ত্বেও মেসোপটেমিয়ায় যেতে পারেননি। কারণ, অজুহাত এই দেখান হল Depot-এর কাজ অত্যন্ত দরকারী এবং ওখানে ভাল লোক কেউ না থাকলে এখানকার যে সব নূতন ছেলেরা রিক্রুট হয়ে আসবে তাদের শিক্ষা প্রভৃতি পশ্চাৎপদ হলে Regiment-এর সুনাম নষ্ট হবে এবং Field-এ রেজিমেণ্টের কাজ ভাল করতে পারবে না। অতএব প্রথম Double Companyতে যাঁরা যোগ দিল তাদের মধ্যে কতক এবং নবাগতদের মধ্যে বাছাই করা কয়েকজন যেমন, নিতাই সিং (পরে full fledge Col.

হয়ে Retire করেন), বঙ্কিম ব্যানার্জি (ইনি I. P. হন, Police... Kings Medal প্রভৃতি অর্জন করেন ও পরে পুলিস সুপারিনটেনডেণ্ট হন), প্রভৃতিও এঁদেরই সমসাময়িক কাজী নজরুল ও আরও কয়েক-জনকে Depot-তেই অর্থাৎ করাচীতেই থেকে যেতে হয়। Depot-এ থাকা কোনও Disqualification নয় বরং এঁদের ক্ষেত্রে Depot-এ থাকা প্রয়োজনীয়ই হয়ে পড়েছিল। আমরা কিন্তু করাচীতে প্রথমে Gaza Line-এ ছিলাম না, প্রথম ওটাকে বোধহয় তখন Marhatta Line বলত।

Karachi Brigade ground-এর পাশে সেখানে ছিলাম। তারপর করাচীর বেরিয়াল গ্রাউণ্ড-এর কাছ বরাবর একেবারে শেষ প্রান্তে আমাদের জন্য নূতন করে Gaza Line-এর ব্যারাক তৈরি হয়। চাটাইয়ের উপর মাটি দিয়ে ছাদ, মাটিরই দেয়াল আর নিচেও মাটি। আর কাছেই British Regiment-এর সেনাদের সব Barrack প্রভৃতি court-এ যেমন সুন্দর সব electric, water works প্রভৃতি ব্যবস্থা সম্বলিত দোতালা ব্যারাক আছে সেই রকম ব্যারাকেই বাস করতে দেওয়া হত। কর্তৃপক্ষের কতক-গুলো ব্যবস্থা দেখে মনে হত ওপর থেকে বাঙালী পল্টনকে অক্ষম প্রতিপন্ন করবার দুর্দম চেষ্টা চলেছে। সৈনিক জীবনের প্রারম্ভেই ভীষণ কঠোরতা ও কর্ম্মের মধ্যে ফেলে দিয়ে বাঙালী মনকে সৈনিক জীবন সম্বন্ধে তিক্ত ও বিষাক্ত করে তুলেছিল, তারপর সহানুভূতিবিহীন কতকগুলি হৃদয়হীন ব্যক্তিকে বাছাই করে পক্ষপাতিত্ব নিবন্ধন দায়িত্বপূর্ণ কমিশণ্ড অফিসার পদে নিয়োগ করে নানা রকমে এদের মনকে বিষিয়ে দেওয়া হল। তাই এরা Bagdad-এ পাগলের মত Commissioned Officer-এর উপর গুলি চালিয়ে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চাইল। ফলে বাঙালীর সৈনিক জীবন কলঙ্কময় হয়ে গেল, সমস্ত একটা জাতির প্রভূত স্বার্থত্যাগ ও নিষ্ঠা সত্ত্বেও।

বস্তুত যারা লক্ষ্য করেছে বা যারা জানতে চেয়েছে তারা বুঝেছে বাঙালীর মত সৈনিক পৃথিবীতে বিরল। এদের বুদ্ধি, দক্ষতা, নিয়মানুবর্তীতা ও সহনশীলতা অসম্ভব। যেমন অন্য সব সরকারি কাজে দেখেছি এখানেও তেমনি দেখে এলাম ঘোড়াকে গাড়ির পিছনে জুড়ে দিয়ে ঘোড়ার পিছে চাবুক হাঁকড়ে গাড়ি চালাবার বন্দোবস্ত। ভালবাসা দিয়ে মন না জয় করে ভয় দেখিয়ে দমিয়ে রাখার চেষ্টা পূর্ণোদ্যমেই চলেছিল।

বিদ্রোহী বাঙালীকে কিন্তু সামলে রাখা দায়। এরাই মনের জোরে কলকাতায় সুরাবর্দি পরিচালিত হত্যালীলার হাত হতে শহরকে ও অসহায় শহরবাসীকে রক্ষা করেছিল। আজও সর্বত্রই বাঙ্গালীকে পিছনে ফেলে রাখবার চেষ্টা পূর্ণোদ্যমেই চলেছে এবং একদিন বিভীষণ-পন্থী বাঙালী এই কার্যে সহায়তা করেছিল। তবে মহাপুরুষের সেই কথা স্মরণীয় "বাংলা আজ যা ভাবছে, সারা ভারত কাল তাই ভাববে"। বনে জঙ্গলে নির্বাসন দিলেই বাঙালী জংলী আর পশ্চাৎপদ হয়ে যাবে না। নিজস্ব রূপ একদিন না একদিন দেখাবেই। তার জলন্ত দৃষ্টান্ত নেতাজী সুভাষ।

জান দিল কিন্তু শির দিল না। বাঙালী বিভীষণরাই সম্বল কারণ, আপাত-মধুর সুখ সম্বন্ধে ইতিহাস যে কখনও জানাতে পারে না, কেউ কেউ বা করেন গোঁসাইদের মতই—হাতে হাতে যে দক্ষিণা পেয়ে থাকে।

কাজী সম্বন্ধে লিখতে যেয়ে এতগুলো অবাস্তব কথা বলতে হল তার কারণ কাজী সৈনিকের কাজ বেশ দক্ষতার সঙ্গে শিখে নিয়ে যখন বুঝল যে শুধু সৈনিকের কাজ করা মানে কুকুরবৃত্তি করা, এতে দেশের বা জাতির কল্যাণ কিছুই হবে না, এবং রায়সাহেব রায়বাহাদুর, খানসাহেব, খানবাহাদুর প্রভৃতির মনোভাবই সৃষ্টি হবে, তখন সে কায়মনে নিজের লেখনীর শক্তিতে চারণ কবি সেজে জাতির চরিত্র ও মনোবল সৃষ্টি করতে চাইল।

এই সময় কোয়ার্টার মাস্টার জমাদার মনীরুদ্দীন আহমদ (পল্টনের নানা) আমাকে একদিন কাজীকে তাঁর অধীনে নিযুক্তির জন্য অনুরোধ জানালেন। কাজীও স্বীকৃত। অতএব কোয়ার্টার মাস্টারের স্টাফে নায়ক হয়ে ঢুকল এবং পরে হাবিলদার পদে উন্নীত হল। এই সময় তিনি নিত্যকার প্যারেড, গার্ড ডিউটি, ফেটিগ ডিউটি প্রভৃতি হতে নিস্তার পেয়ে একান্তভাবে বাণীর চর্চা করেছেন এবং ভগবৎ কৃপায় এক মহাপণ্ডিত মুসলমান মৌলবীরও সহযোগিতা পেয়ে গেছেন। কাজী যখন প্রথম 'লয়লে মজনু' পড়ে তখন মাঝে মাঝে তার শ্লোকগুলি পড়ে ব্যাখ্যা করে আমাদের শোনাত। কিন্তু উলুবনে মুক্তা ছড়ানোর মতই কাজীর ইচ্ছাকে আমরা নিষ্ঠুরভাবে ব্যর্থ করে দিতাম। কারণ তখন আমরা ভাবতাম, সৈনিকের হাতিয়ার চালনা আর যুদ্ধ কৌশল শিক্ষাই সর্বস্ব, এই কাজ করলেই জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি হবে।

তখন বুঝিনি যে ব্রিটিশের অধীনে সৈনিকবৃত্তি কুকুরবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব নজরুলের প্রকাশিত রণক্ষেত্রের কাহিনী সমন্বিত প্রবন্ধ পড়ে যাঁরা মনে করেন কবি গুলি বারুদের মধ্যে ট্রেঞ্চে থেকে সৈনিক হিসাবে যুদ্ধ করেছে তাঁরা সঠিক সংবাদ জানে না।

বাঙালী রেজিমেন্টের কোন সৈনিককেই গুলি বারুদের মধ্যে যুদ্ধ করতে দেওয়া হয়নি। যারা মেসোপটেমিয়ায় গিয়েছিল তাদের দিয়েও পুলিসের কাজই করান হয়েছে, যুদ্ধ তাঁরা কেউ করেন নি। কবির চিন্তাধারাই কবির লেখনীর মুখে ফুটে বেরিয়েছে। কাজীর সত্যকারের মনোভাব তাঁর বিদ্রোহী কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে, এবং তার চরিত্রও সে এই পথেই সম্পূর্ণভাবেই গড়ে তুলেছিল।

ইতি—
আপনার
শম্ভু রায়
৯।১০।৫৭

নজরুল সেবক
প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
গৌরী নিবাস, প্রতাপপুর
হুগলী

"আনন্দময়ীর আগমণে" কবিতায় জানবার বিষয়

১৯২২ সাল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বর্ণযুগ। এই সময় দেশের কি রকম অবস্থা ছিল এবং রাজনৈতিক নেতাদের কার কি রকম অবস্থা, মনোভাব ও কাজের পন্থা কী রকম ছিল তা এই কবিতাটিতে সুন্দর ও বলিষ্ঠরূপে ফুটে উঠেছে। হিন্দু-মুসলমান ঘরগেরস্থ ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সাধারণ দেশবাসী এই আন্দোলনে কে কিভাবে সহযোগিতা করেছে, কোন শ্রেণী বিরোধীতা করেছে এবং কী করা উচিত কবি দীপ্ত-কণ্ঠে আগমনী-পূজায় পূজা-বিলাসীদের (যে-পূজা-বিলাসীরা আজো পূজা-অভিনয় করে যাচ্ছে তাদেরও) আঘাতের ভিতর দিয়ে, বেদনার সঙ্গে, ভালবাসা দিয়ে সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য আহ্বান করেছেন। ১৯২২ সালে সারা ভারতে প্রবল গতিতে সহিংস ও অহিংস আন্দোলন চলছিল। কিন্তু বিশিষ্ট নেতারা, যাঁরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্রষ্টা তাঁরা এক-একজন এক এক রূপে অবস্থান করছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ, বারীন্দ্র, পুলিনবিহারী শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধীজী প্রভৃতির কথা অতি চমৎকার করে বলেছেন। এই কবিতাটি বুঝতে হলে Referenceগুলি ধরতে হবে। সেইটাই ক্ষুদ্র সাধ্যানুযায়ী নিচে জানাচ্ছি।

১। *"বিষ্ণু নিজে বন্দী আজি ছয় বছরী ফন্দী কারায়"*—এই "বিষ্ণু" শব্দের দ্বারা কবি গান্ধীজীকে বোঝাচ্ছেন—কারণ, গান্ধীজী তখন দেশবাসীর স্বাধীনতা লাভের পন্থা দেখিয়েছিলেন চরকার সুতা কাটার মাধ্যমে। উক্ত চরকাকে কবি বিষ্ণু-চক্র বলেছেন। সমগ্র ভারতবর্ষে গান্ধীজীর সম্মান তখন প্রায় বিষ্ণুর মতই ছিল। এই সময় গান্ধীজীকে ব্রিটিশ ছয় বছর সশ্রম কারাবাসের হুকুম দেয়।

২। *"মহেশ্বর আজ সিন্ধুতীরে যোগাসনে মগ্ন ধ্যানে"*—শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে যোগীরূপে সমুদ্রতীরে বাস করছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলন যিনি সৃষ্টি করলেন, তিনিই সেই বিপুল আন্দোলনের বাইরে রইলেন।

৩। *"অরবিন্দ-চিত্ত"*—অরবিন্দ অর্থে কবি *হৃদয়পদ্মকেই* বলেছেন। শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনা কবে সার্থক হয়ে দেশবাসীকে নির্দেশ দেবে সে আশা-ভরসা কবি পাচ্ছেন না, অথচ শ্রীঅরবিন্দ যদি এই আন্দোলনের পুরোভাগে থাকতেন তবে স্বাধীনতার লড়াই সার্থক হোতই!

৪। *"দম্ভ-অসুর গ্রামচ্যুত ব্রহ্মা চিত্ত-রঞ্জনে হায়*
কমণ্ডলুর শান্তি-বারি সিঞ্চি যেন চাঁদ-নদীয়ায়।"

এই আন্দোলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ব্রহ্মারূপেই বিরাজ করছিলেন। তাঁর ত্যাগে তখন শুধু দেশ কেন বিদেশের চিত্তও ত্যাগের গেরুয়া রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। চিত্তরঞ্জন তখন *নদীয়ার চাঁদ* শ্রীগৌরাঙ্গের মতই উৎপীড়িত দেশবাসীর মনে স্বাধীনতার যে শান্তি তা বুঝিয়েছিলেন আপামর সাধারণকে।

কিন্তু এমন যে *দেশবন্ধু*, এমন যে *চিত্তরঞ্জন* তিনিও দাম্ভিক ব্রিটিশ অসুর-গ্রামে অর্থাৎ কারাগারে যান, উক্ত পূজার সময় *গ্রামচ্যুত* অর্থাৎ মুক্তি পেয়েছিলেন। এই সময় গান্ধীজী ও দেশবন্ধুর শান্তিবাণীতে যেমন কাজ হচ্ছিল তেমনি অ-কাজও বেড়ে যাচ্ছিল বেশ। অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচার চরমে গিয়ে পৌঁছেছিল।

৫। *"দেবতারা আজ জ্যোতিহারা"*—এই দেবতা শব্দের দ্বারা কবি তখনকার আমলের ছোট বড় নেতাদের বোঝাতে চেয়েছেন।

৬। *"সুরেন্দ্র আজ মন্ত্রণা দেন"*—যখন দেশে এই আন্দোলন তখন জাতি গঠনকারী মহান নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকারের বাংলা প্রদেশের মন্ত্রীত্ব নেন।

৭। *"রবির শিখা ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে আজ দিগন্তরে*
সে কর শুধু পশল না মা অন্ধকারার বন্ধ-ঘরে।"

যখন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরব চরমে গিয়ে পৌঁছেছে তখন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথেরও গৌরব, কী সাহিত্যের দিক থেকে, কি ত্যাগের উদাহরণের দিক থেকে চরমত্ব লাভ করেছিল। প্রবন্ধ, কবিতা, গান লিখে দেশের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করছিলেন। নানা প্রবন্ধের মারফত দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন মনোভাব ও কাজের বিশ্লেষণ করে বোধ শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করছিলেন, জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের প্রতিবাদস্বরূপ *"নাইট"* উপাধি ত্যাগ ও ভারত সরকারের কাছে কড়া-ত্যাগ-পত্র প্রেরণ প্রভৃতি কবির মহান কাজ দেশের বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করেছিল, কিন্তু বুদ্ধিজীবিরা (যাঁরা আন্দোলনমুখী ছিলেন তাঁরা) দেশের সাধারণ লোকের কাছে কবির এই রূপ পৌঁছে দেয়নি। "থোড-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়" একঘেয়ে জীবনের মধ্যে নূতন প্রাণ-সঞ্চার করেনি উক্ত দেশ-কর্মীরা। বিশ্বকবি পৃথিবীর সামনে স্বাধীনতা আন্দোলনে যে মহান-কর্ম করলেন তা' পৃথিবীব্যাপি পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল কিন্তু দেশের অবোধ অন্ধকারময় কারাগারের মত জন-চিত্তে সেধোলো না।

৮। *"গগন পথে রবি রথের সাত-সারথি হাঁকায় ঘোড়া,*
মর্ত্যে দানব মানব পিঠে সওয়ার হয়ে মারছে কোঁড়া।"

বিশ্বকবির এই সময়ে একটি সাহিত্যিকগোষ্ঠী ছিল। এই সাহিত্যিক গোষ্ঠীর ছিল সাতটি নেতা বা রবীন্দ্রনাথের মোসাহেব। এই সময় এই সাতটি মোসাহেবের সাহিত্য-জগতে ছিল ভারি দাপট। বাংলাদেশে কোন নূতন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও গায়ক হলেই তাঁদের পিছনে ফেউয়ের মত লেগে যেতেন এঁরা।

৯। *"বারি ইন্দ্র-বরুণ আজি করুণ সুরে বংশী বাজায়"*—

সমস্ত বিপ্লবের অগ্রদূত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ "মাণিকতলা বোমা মামলা"র বিচারে যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। বারীনবাবু দীপান্তরে গিয়েই আগুনের পূজারী হয়েও প্রেমের পূজারী হয়ে উঠলেন। যিনি ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর সঙ্গে "যুগান্তর" পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক

হিসাবে "বোমার দার্শনিকতত্ত্ব", "কী পদ্ধতিতে বোমা তৈরী করা যায়" প্রভৃতি লিখতেন তিনি, আন্দামানে গিয়ে লিখলেন "দীপান্তরের বাঁশী" নামক প্রেমের কবিতা ও গানের গ্রন্থ। তিনি লিখলেন ঃ

"প্রতি অঙ্গ মোর কানু ক্ষুধাতুর,
সে কানু কেন রে দূর এতদূর ?
মম প্রেমেরি রাজা তো ছিলনা নিঠুর ;
কোটী কুঞ্জে সে যে হয়েছে আমার।"

আরো লেখেন ঃ

"বিষয়ে বিষয়ে বঁধূ
আছো ওগো মধু হয়ে,
কামনা পাগল আমি
তাইতো জগৎলয়ে।"

ইত্যাদি গান লিখতে শুরু করেন।

১০। *"বুড়ি-গঙ্গার পুলিন-বুকে বাঁধছে খাঁটি দস্যু রাজায়"*—

ঢাকা শহরের বুকে বুড়িগঙ্গা নদী প্রবাহিত। এই নদীর তীরে মহান বিপ্লবী নেতা পুলিনবিহারী দাসের জন্ম। নৈহাটির মিত্র বংশীয় ব্যারিস্টার সতীশচন্দ্র মিত্রের সহযোগিতায় পুলিনবাবু *অনুশীলন সমিতি* প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিপ্লবী দলের নাম অনুশীলন সমিতি রাখা হয় সাহিত্য সম্রাট ও বন্দেমাতরম গীত রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত "*অনুশীলন*" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের নামানুযায়ী। এই বিপ্লবী সমিতি উক্ত গ্রন্থের নির্দেশানুযায়ী চরিত্রকে গঠন করে দেশের যোদ্ধারূপে প্রস্তুত হত। এই সমিতির সংগঠক ছিলেন পুলিনবিহারী। তাঁর চরিত্র মাধুর্যে, দৃঢ়তায়, অস্ত্র-চালনায় সব্যসাচীর মত ক্ষমতা দর্শনে তৎকালে দেশের প্রণম্য ছিলেন তিনি। এ হেন পুলিনবিহারীকেও ব্রিটিশ সরকার বিশেষরূপে ঘায়েল করে তাঁকে দুর্বল করে ফেলেছিল।

১১। *গলিজ*—অপবিত্র

১২। *"তাজহারা যা'র নাঙ্গাশিরে গরমা গরম পড়ছে জুতি"*—

তাজ শব্দের অর্থ টুপি, পাগড়ী। টুপি ; পাগড়ী থাকে মাথায়, এ দুটি জিনিস হল জাতীয়তার গৌরবস্বরূপ। সেই গৌরব-চিহ্নহীন যে মাথা সে মাথায় বিদেশী শাসকের অপমান জুতোর মত পড়ছে—সেই গৌরবহীন জাতি যখন বড় কথা বলে তার কি মূল্য এই সংসারে।

১৩। *চুগলি*—এর কথা ওর কাছে লাগানো। অর্থাৎ স্বার্থের জন্য দেশের কর্মীদের সর্বনাশ করত যারা পুলিশের কাছে খবর দিত।

শিল্পাচার্য বিদ্রোহী ভোলা চট্টোপাধ্যায়
ভি-সি পরিচিতি

কলকাতা হ্যারিসন রোডের ওপব ৮৪এ নং "পটলডাঙ্গা হাউসে" খ্যাতিমান শিল্পী, সাধক ও পণ্ডিত শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের নবজন্মের (রেনেসাঁর) স্বর্ণযুগের মধ্যবর্তীকালে ঠাকুর বাড়ির ভরা জোয়ারের মধ্যে তাঁর মানসলোক গড়ে ওঠে শিল্পগুরু শ্রীঅবনীন্দ্রের হাতে। অবনীন্দ্রের শিষ্যগণ খাঁটি ঋষি যুগেরই ভারতীয় শিল্পী। অবনঠাকুরের শিষ্যগোষ্ঠী নিখিল বিশ্বে ভারতের স্থান গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। শিল্পী ভোলানাথ এই গোষ্ঠির অন্যতম শ্রেষ্ঠ-শিল্পী। পৃথিবীর নানা দেশে তিনি কাটিয়েছেন। কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য কখনও হারিয়ে ফেলেননি।

পরে সংসারধর্ম পরিত্যাগ করে ত্যাগী সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করে আজো অন্তরচারী অধ্যাত্ম লোকের পরিব্রাজক রূপে বিরাজ করছেন। তিনি তাঁর জীবনকে সেই 'Devine' রূপের রস গ্রহণ করে—বাস্তব-রূপ শিল্প চর্চা থেকে সরে দাঁড়িয়ে সেই অধ্যাত্ম-মহাশিল্প-রসে ডুবে আছেন।

ইউরোপীয় শিল্প ধারাকে আয়ত্বে আনবার জন্য জার্মানি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশে কাটিয়ে তিনি আধুনিক যুগের চিন্তাধারা, মননশীলতাকে অবলম্বন করে এক সময়ে যে চিত্র সৃষ্টি করেছেন তা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল রূপে আজো বেঁচে আছে "কোর আর্টস্" প্রভৃতি নানা পত্র-পত্রিকায়।

কলকাতায় ১৯৪৬ সালের মহাদাঙ্গার (ভারতের স্বাধীনতার নামে যে দাঙ্গা) সময় তাঁর লক্ষাধিক টাকা মূল্যের স্টুডিও ধ্বংস হয়ে যায়। এই স্টুডিওটি ছিল মুস্‌লিম্ অধ্যুষিত অঞ্চলে। এটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় দেশ কত মূল্যবান বস্তু যে হারিয়েছে তা দাঙ্গাকারী স্বাধীনতা বিলাসীরা বুঝবে না।

গুরুভাইদের গতানুগতিক ভারতীয় আঙ্গিকের অঙ্কন রীতির বিরুদ্ধে এক সময়ে ভোলানাথ প্রবন্ধ লিখে, ছবি এঁকে রীতিমত বিদ্রোহ ঘোষণা করে জয়ী হন। বিদ্রোহী শিল্পী ভোলানাথ ছিলেন এঁদের নেতা। তৎকালীন মোসাহেব শিল্পীগোষ্ঠী তাঁকে "বিদ্রোহী শিল্পী" আখ্যা দিয়ে প্রচার করে।

তিনি জার্মানি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে V.C. নামে খ্যাত। এই নামটা তাঁর ছদ্ম নাম নয়; আত্মগোপনের। দেশে এক সময়ে ফরোয়ার্ড, লিবার্টি, অ্যাডভ্যান্স, অমৃতবাজার প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকায় ব্যঙ্গ চিত্র আঁকতেন। উক্ত পত্রিকাতে জাতীয় সংস্কৃতিমূলক এবং বিভিন্ন শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধও

লিখেছেন। প্রবন্ধের ভাষা ও বিশ্লেষণ যেমন প্রখর তেমনি ভাবগম্ভীর ছিল। ব্যঙ্গ-চিত্রে ছিল তীক্ষ্ণতা, তেমনি বিরোধী পক্ষের ভয়ের বস্তু।

V. C. সোজাসুজি পাথরের ওপর ছবি এঁকে লিথোগ্রাফীর প্রচলন করেছিলেন। বহু রঙের মুদ্রণ শিল্পে তিনি যে বিশেষ রীতির আবিষ্কার করেছিলেন তা Max Multicolour Process নামে খ্যাত। Max ছিল শিল্পী ভোলানাথের Pen-name. Four Arts আন্দোলনের তিনি ছিলেন অগ্রদূত।

শিল্পী ভোলানাথের সন্ন্যাস আশ্রমের নাম হল ব্রহ্মানন্দ অবধূত। যে-সকল যোগী প্রকাশ্যে আসতে চান না, তাঁরা এঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। দেশ-বিদেশের বহু পণ্ডিত ও গুণী শিল্পীরা V. C. ও Max এর কথা যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন তেমনি ভারতবর্ষে এলে তাঁরা তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্য আগ্রহ দেখান ও ব্যগ্রতার সঙ্গে তার অবস্থানের অনুসন্ধান করে থাকেন।

এই গ্রন্থের "ধর্মপ্রবণতায় নজরুল" অধ্যায়ে সাধকাগ্রগণ্য বামাক্ষ্যাপার শিষ্য তারাক্ষ্যাপার কথা বলা হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী ভোলানাথের আঁকা বামাক্ষ্যাপার ছবি দেখে ভাবমগ্ন হয়ে কী বলেছিলেন, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তা বলেছেন।

কবি নজরুলের দীক্ষাগুরু শ্রীবরদাকান্ত আগমবাগীশের পূর্বে শ্রীভোলানাথ কবিকে তাঁর সাধন পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন! আসন প্রণায়াম প্রভৃতি করতে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন এসব করলে তোমার ফল ভাল হবে না ?

শ্রদ্ধেয় পরিমল গোস্বামী লিখেছেন—১৯৪১ সালে ধর্মতলার থোবর্ণ লেনের লিপিকা প্রেস থেকে রূপ ও রীতি' নামক একখানা মাসিকপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী, শিল্পী ভোলা চট্টোপাধ্যায় (ভি. সি)। শচীন্দ্রলাল ঘোষ, আমি এবং আরও অনেকে সেখানে যেতাম।[১] তার পরে অন্যত্র লেখেন "১২নং ওয়াটারলু স্ট্রীট (১৯৪২) বিদ্রোহী সাধক-শিল্পী ভোলা চট্টোপাধ্যায় (V. C.) এক প্রকাশনার উদ্বোধন করলেন। এটিতে কোন ব্যবসাদারী চেহারা ছিল না, একটি বৈঠকখানা মাত্র, নাম সন্থাগার। সন্থ মানে সাধুই সম্ভবত। ডক্টর কালিদাস নাগ উপস্থিত থেকে সবার কল্যাণ কামনা করলেন। এর প্রধান উদ্যোক্তা বিনয়কৃষ্ণ দত্ত। কিন্তু প্রকৃত সন্থ বা সন্ত বা সাধু মাত্র দুজন, ভোলা চট্টোপাধ্যায় ও বিনয়কৃষ্ণ দত্ত। বাদবাকী সবাই গৃহী সন্ন্যাসী।"[২]

"ভোলা চট্টোপাধ্যায় বা ভি. সি-র কথা আগে উল্লেখ করেছি। এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। বিদ্রোহী শিল্পী ভি. সি। নিজের আদর্শের সঙ্গে জীবনকে এমন ভাবে মিশিয়ে দেওয়া এ যুগে বিরল। ছাব্বিশ সাতাশ

(১) পরিমল গোস্বামীর স্মৃতি চিত্রণ গ্রন্থ ঃ—পৃষ্ঠা ৩০৯
(২) ঐ ঐ „ ৩১৩

বছর আগে এঁর নেতৃত্বে 'আর্ট রেবেল সেন্টারের প্রদর্শনী হয়। ভি সি-র অনুগামী ছিলেন কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার, অবনী সেন, গোবর্ধন আশ, রবি বসু ইত্যাদি। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ইয়র্ক ম্যানসনে সম্মিলিত ভাবে এই প্রথম আধুনিক শিল্পের প্রদর্শনী। এর আগে কিউবিষ্টিক রীতির শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের একক প্রদর্শনী মাত্র হয়েছে।

"বাংলাদেশের শিল্পের ইতিহাসে এ সব কাহিনী লেখা পড়েছে কি না জানি না। এই সময়েই বর্তমান আর্ট একাডমির সূত্রপাত হয়। এবং এঁদের মধ্যে যাঁরা শুধু শিল্পে নয় জীবন দর্শনে বিদ্রোহী, তাঁরা পরে এ দল থেকেও বেরিয়ে আসেন। এই শেষোক্ত দলে ভি সি, কালীকিঙ্কর ও রবি বসু। প্রথম দুজনের সঙ্গেই আমি ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত। ভি সি'র মত দৃঢ় মেরুদণ্ড বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যে কোন অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে না, টাকার লোভ থেকে বা সম্পূর্ণ মুক্ত; এমন ব্যক্তিত্বের কথা আমার মনে বিস্ময় জাগায়। জনমত এবং গুণগ্রাহিতাকে এবং টাকার মূল্যে শিল্পমূল্য বোধকে ষোল আনা অগ্রাহ্য করে নিজের সৃষ্টির আনন্দে ডুবে সমস্ত জীবন কাটিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে আর এক শিল্পী কালীকিঙ্কব ঘোষদস্তিদার—ভি সি-ব অনুজ হবার দাবি রাখে।"৩

(৩) স্মৃতিচিত্রণ—পরিমল গোস্বামী পৃষ্ঠা ৩২০-২১ দ্রষ্টব্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক তোলা "দলিল সম্মত ছায়াচিত্রে নজরুল"

খবরের কাগজে পড়লাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুই হাজার ফিট ফিল্মের মধ্যে নজরুলকে নিয়ে দলিলসম্মত ছায়াচিত্র করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগে আমার কবিবন্ধু শ্রীগোপাল ভৌমিক বিশেষ দায়িত্বশীল পদে কাজ করছেন। আমি তাঁকে টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানালেন সাহিত্যিক ও নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়মহাশয় এই কাজের প্রযোজক হিসাবে কাজ করছেন। আমি কয়েকদিন চুপ করেই রইলাম। কারণ শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়মহাশয়ের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না।

কবি নজরুলের বড় ভাইয়ের ছেলে শ্রীমান আবদুস্ সালাম তখন "রেডিয়েণ্ট প্রসেসে" কাজ করছিলেন। শ্রীমান সালাম আমার কাছে এসে মন্মথবাবুর কথা বলায় আমার লেখা একখানি "কাজী নজরুল" তাঁকে পাঠিয়ে দিলাম। তাতে তিনি খুব খুশি হয়ে আমাকে এই চিঠি কখানি লেখেন ঃ

(১নং চিঠি)

Copy

WEST BENGAL SECRETARIAT
HOME (PUBLICITY) DEPARTMENT

Calcutta, the 12. 12. 56

Dear Sri Chatterjee,

I do not know how to thank you adequately for the very timely presentation of your invaluable biography of the Poet Nazrul Islam. The Government of West Bengal is producing a biographical documentary of 2000 ft. on the Poet's life. I am directing it. I shall be grateful if you would kindly meet me this week-end to discuss matters relating to the Poet's events of life. Kindly let me know per Kazi Abdus Salam when and where we may meet, on or before Saturday next.

Have you in your possession by any chance old copies of the newspapers which Nazrul edited? We have failed to secure any such copy inspite of our best efforts.

Hoping to meet you at the earliest opportunity, and with kindest regards.

Yours sincerely,
Sd.- Manmatha Ray

Sri Prantosh Chattopadhaya

WEST BENGAL SECRETARIAT
HOME (PUBLICITY) DEPARTMENT

Calcutta, the 195 .

D.O. No ....PUB

AURORA STUDIO
21.12.56.
4 P.M.

Dear Chatterjee,

I am working at Aurora Film Studio, and, should like you to come and help me just for an hour to-day. I am sending a transport.

Should it be impossible to-day. Would you come to the Studio to-morrow at 3 P.M. ?

More when we meet.

Yours sincerely,
Sd/- Manmatha Ray

প্রথমেই আমরা আব্দুল হালিমসাহেবের বাড়িতে গেলাম, ধূমকেতু, লাঙল, গণবাণী ও নবযুগ পত্রিকার পুরানো ফাইলের সন্ধানে। গণবাণী ও লাঙলের ফাইল ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছু পাওয়া গেল না। হালিমসাহেব মন্মথ রায়মহাশয়কে ফাইল দুটি দিলেন। তারপর ৬নং হাজী লেনে গেলাম। এখানে কবির বিবাহ হয়েছিল শ্রীযুক্তা আশালতা দেবীর সঙ্গে। এখানে বাড়িটির ফটো নেওয়া হল। এখান থেকে গেলাম নবাব আব্দুর রহমান স্ট্রীট ; যেখানে দৈনিক নবযুগ পত্রিকা বার হয় ১৯২০ সালে। সেখান থেকে লোয়ার সার্কুলার রোডে—এখানে দ্বিতীয়বার নবযুগ প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর চলে আসি ৭নং প্রতাপ চ্যাটার্জি স্ট্রীটে; এখানে নজরুল ১৯২২ সালে ধূমকেতু প্রকাশ করেন। এই বাড়ির পাশেই সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাস করতেন তাঁর নিজ বাড়িতে। প্রস্তর ফলকে বঙ্কিমবাবুর অবস্থানের কথা খোদিত আছে। তারপর ৩নং কলেজ স্কোয়ার, কবি নজরুলের খ্যাতি যে কাগজের মারফৎ ছড়িয়ে পড়ে সেই 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার অফিস গৃহ দেখতে।

ওখান থেকে নজরুল লাঙল, গণবাণী প্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন ৩৭নং হ্যারিসন রোডের দোতালার উত্তর কোণের ঘর থেকে, সেখানে যাওয়া হয়।

সর্বত্রই ফিল্মে ছবি তোলা হয়।

বহু চেষ্টায় ধূমকেতু পত্রিকার সন্ধান 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে' পাই ও শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়কে জানাই। তিনি ধূমকেতুর প্রচ্ছদপটের ছবিও তোলেন।

A. K. Mukherjee, M.A.,
Superintendent, Hooghly Jail.

Hooghly Jail
Dated, the 8th August 1957.

D O. NO. 2078 dated 8.8.57

Dear Sir,

With reference to your letter dated the 3rd June, 1957, asking for certain informations regarding Poet Kazi Nazrul Islam's incarceration in this jail, I am to state as follows :

The poet who was convicted under section 124 I.P.C. by the Chief Presidency Magistrate, Calcutta on 16.1.23 and sentenced to one year's R.I., arrived at this jail from the Alipore Central jail on 14.4. 23. He occupied cell No. 5 in the east facing row of cells. He was transferred from here to Berhampore jail as a special class prisoner on 18.6.23. The records show that he was aged 24, but no records could be traced regarding his hunger-strike.

Thanking you,

Yours sincerely,
Sd/- A.K. Mukhcerjee
8.8..57
(A.K. Mukherjee)

To
Shri Prantosh Chatterjee
'Gouri Nibash'
Protappur, Chinsurah.

নজরুল রচনাবলী

নাম	প্রকাশ-কাল	
১। অগ্নিবীণা	অক্টোবর, ১৯২২ খৃঃ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ	কবিতা
২। দোলন চাঁপা	১৩৩০, আশ্বিন	,,
*৩। বিষের বাঁশী	১৩৩১, ১৬ই শ্রাবণ	,,
*৪। ভাঙার গান	১৩৩১, শ্রাবণ	,,
৫। ছায়ানট	১৩৩২	,,
৬। পূবের হাওয়া	১৩৩২, আশ্বিন	,,
৭। চিত্তনামা	১৩৩২, শ্রাবণ	,,
৮। ব্যথার দান	১৩২৯, ফাল্গুন	গল্প
৯। রিক্তের বেদন	১৯২৪	,,
১০। বাঁধন-হারা	১৩৩৪, শ্রাবণ	পত্রোপন্যাস
১১। যুগবাণী	১৩২৯, কার্তিক	প্রবন্ধাবলী
১২। দুর্দিনের যাত্রী	১৩২৯, শ্রাবণ	,,
১৩। রুদ্রমঙ্গল	১৩৩২, চৈত্র	,,
১৪। সাম্যবাদী	১৩৩২, পৌষ	কবিতা
১৫। সর্বহারা	১৩৩৩	,,
১৬। ফণি-মনসা	১৩৩৪, শ্রাবণ	,,
১৭। সিন্ধু হিন্দোল	১৩৩৪	,,
১৮। জিঞ্জীর	১৩৩৫	,,
১৯। বুলবুল	১৩৩৫, আশ্বিন	গান
২০। চোখের চাতক	১৩৩৬ অগ্রহায়ণ	,,
২১। চক্রবাক	১৩৩৬	কবিতা
২২। সন্ধ্যা	১৩৩৬	,,
*২৩। প্রলয়শিখা	১৩৩৭	,,
*২৪। চন্দ্রবিন্দু	১৩৩৭	গান
২৫। মৃত্যুক্ষুধা	১৩৩৭	উপন্যাস
২৬। ঝিলিমিলি	১৩৩৭	নাটক
২৭। নতুন চাঁদ	১৯৪৫ খৃঃ	কবিতা
২৮। কাব্যে আমপারা	১৯৩৩ "	"
২৮ ক রাজবন্দীর জবানবন্দী	১৯২২ "	—
২৮-খ ঝিঙে ফুল	...	কবিতা
২৯। মরু ভাস্কর	১৯৫০ খৃঃ	,,

---

* বইগুলি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে

	নাম	প্রকাশ-কাল	
৩০।	আলেয়া	১৩৬৮	নাটক
৩১।	জুলফিকার	...	গান
৩২।	গানের মালা	...	,,
৩৩।	গুল্‌-বাগিচা	১৩৪০	,,
৩৪।	বুলবুল ২য় খণ্ড	...	,,
৩৫।	সুর-সাকী	...	,,
৩৬।	নজরুল-গীতিকা	১৩৩৭	,,
৩৭।	গীতি শতদল	...	,,
৩৮।	দেবীস্তুতি	১৩৭৫	,,
৩৯।	রাঙ্গাজবা	১৩৭৩	,,
৪০।	মধুমালা	১৩৬৫	নাটক
৪১।	শেষ শওগাত	১৩৬৫	কবিতা
৪২।	গীতিমাল্য	১৯৬৯ খৃঃ	গান
৪৩।	সন্ধ্যামালতী	১৩৭৭	,,
৪৪।	শিউলি-মালা	...	গল্প
৪৫।	কুহেলিকা	...	উপন্যাস
৪৬।	হাফিজ	১৩৩৭	কবিতা
৪৭।	বন-গীতি	১৩৩৯	গান
৪৮।	ঝড়	১৩৬৭	কবিতা
৪৯।	পিলে পটকা, পুতুলের বিয়ে	১৩৭০	নাটিকা
৫০।	ওমর খৈয়াম	...	কবিতা
৫১।	ঘুম জাগানো পাখী	১৩৭১	,,
৫২।	প্রেমের কবিতা	১৩৭৫	,,
৫৩।	ঘুম পাড়ানী মাসী-পিসি	১৩৭২	,,
৫৪।	সঞ্চিতা	১৩৩৫	কবিতা সংগ্রহ
৫৫।	ধূমকেতু	১৩৬৭	প্রবন্ধাবলী

নিম্নে—নজরুল গ্রন্থ যা দুষ্প্রাপ্য হয়েছে

নাটিকা—১। কাবেরী তীরে ২। কাফেলা ৩। ছন্দসী ৪। বিয়ে বাড়ী ৫। সাপুড়ে ইত্যাদি।

গানের বই—১। নির্ঝর, ২। হারা-মণি

কবিতা—১। ঝিঙেফুল, প্রভৃতি।

উপসংহার

কবিবর নজরুল ইসলাম সম্পর্কীয় তথ্যগুলি, যাহা এতদিন ধরে সংগ্রহ করেছি, তাহা সহৃদয় সাহিত্যরসিক ও পাঠকবর্গের সামনে এনে ধরলাম। প্রামাণ্য ঘটনাগুলির সমাবেশই এই পুস্তকে করেছি।

কবি সম্বন্ধে এত তথ্য পেয়েছি যে, সবগুলি দিতে গেলে পুস্তকের কলেবর বেড়ে যায়। তাছাড়া পাতার সংখ্যা দেখে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পাবে। তাই নজরুলের আধ্যাত্মিক সাধনা পরিমিত কালের ঘটনাবহুল দিনগুলি আমার দ্বিতীয় গ্রন্থে যথাযথ ভাবে সংস্থাপিত করতে বাসনা করছি।

কবির আধ্যাত্মিক সাধনা কি ভাবে আমাদের অগোচরে কাজ করে চলেছিল সেটা আমরা কেহ লক্ষ্য করিনি। উহার বিশেষ ঘটনাগুলি দেখলে বাহ্যিক নজরুল ছেড়ে অন্তরঙ্গ নজরুলের বিশেষ খোঁজ পাওয়া যায়।

কবি নজরুল আমাদের বাঙালীর, ভারতের। কবিকে আমাদের মত দেখব। বিদেশী দেওয়া চশমা পরে কবিকে দেখাটা আমি অভ্যাস করিনি। সুতরাং সেরূপ কোন কিছু লিখিনি।

সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আমি নৈহাটীর শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দত্ত ও ঢাকা বিক্রমপুর নিবাসী (উপস্থিত হুগলীবাসী) বন্ধুবর শ্রীনীরদবরণ মুখোপাধ্যায় এম. এ-র নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রইলাম।

নজরুল কি মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছিলেন ?

শ্রদ্ধেয় ক্রান্তি সম্পাদক

সমীপেষু,

পত্র নং ১

আপনার পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত "নজরুল প্রসঙ্গ" পড়িয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। বর্তমানে কবি নজরুলকে লইয়া নানা পত্র পত্রিকায় লেখা চলিতেছে। ইহা যেমন আশার কথা তেমনি দেশবাসী যে জীবন স্পন্দন হারাইয়া ফেলে নাই তাহারও প্রমাণ। কিন্তু তথ্য লইয়া আলোচনা করিতে গেলে দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ রাখিতে হয়।

"নজরুল প্রসঙ্গে" লেখক বহুকথা লিখিয়াছেন, তাহা লইয়া মতভেদ থাকিলেও আলোচনায় অগ্রসর হইব না, কিন্তু যেখানে তিনি লিখিয়াছেন "উনিশশ সতেরোয় যুদ্ধে গেলেন। মেসোপটেমিয়া...উল্টে রণাঙ্গনের সেলের শব্দের সাথে সাথে ফারসী কাব্যের সাথে তাঁর দ্বিতীয়বার পরিচয় ঘটল এখানে।" সেখানে শুধু মতবাদ সত্য নয়, তথ্যগত বিভ্রান্তি দেখা দিয়াছে।

প্রথমতঃ, যুদ্ধটা ১৯১৭ সালে নয়, ১৯১৪ সালে। দ্বিতীয়তঃ, নজরুল করাচীর ওদিকে একেবারেই যান নাই ; মেসোপটেমিয়া রণাঙ্গনের সেলের আওয়াজ কবিসুলভ স্বপ্নেই দেখিয়াছেন।

কবি নজরুল যে সৈনিকদলে ছিলেন তার নাম ৪৯নং বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট। প্রথমদল অবশ্য মেসোপটেমিয়া গিয়েছিল। নজরুল ছিলেন দ্বিতীয় দলে।

এই সৈন্যদলের অনেকে এখনও বাঁচিয়া আছেন। তাঁহাদের কাছ হইতে এবং স্বয়ং কবির মুখ হইতে শুনিয়াছি যে তাহারা করাচীতেই ছিলেন, তৈরি ছিলেন ডাক পড়িলেই যাওয়ার জন্য। কিন্তু ডাক পড়ে নাই, যাওয়াও হয় নাই। এ বিষয়ে করাচীর 'নজরুল একাডেমির' সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ২।৪।৬০ তারিখে "দেশ" পত্রিকায় পত্র লেখেন "এখন অনুসন্ধানে জানা গেছে যে নজরুল করাচীর বাহিরে যান নাই। ৪৯নং বাঙ্গালী পল্টনের হেড কোয়ার্টার ছিল করাচীর পূর্ব উপকণ্ঠে বর্তমান আবেসিনিয়া লাইন-এ, যাহা সে সময় 'গ্যাজা লাইন' নামে পরিচিত ছিল"। উক্ত পত্র সমর্থন করিয়া আমি ২৩।৪।৬০ তারিখে দেশ পত্রিকায় একটি দীর্ঘ পত্র দিয়াছিলাম। এই ভুল সর্বত্রই চলিতেছে। এমনকি "পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষৎ"-এর যে বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক আছে সেখানেও এই ভুল রহিয়াছে। আশাকরি, আপনার পত্রিকায় চিঠিখানি ছাপাইয়া প্রচলিত ভ্রান্তি নিরসনে সাহায্য করিবেন।

আপনাদের
—প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

পত্র নং ২

গত ২৩শে মে'র "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীগোপাল ভৌমিকের "কবি নজরুল ইসলাম" শীর্ষক প্রবন্ধ পড়ে করাচী থেকে জনাব মীজানুর রহমান প্রবন্ধ লেখককে যে ব্যক্তিগত পত্র লিখেছেন সেই পত্রে তিনি কবি নজরুলের মধ্যপ্রাচ্য গমন সম্বন্ধে কিছু নূতন আলোকপাত করেছেন। বিষয়টি সাধারণে প্রকাশিত হলে এ সম্বন্ধে প্রকৃত নির্ণয় সহজ হতে পারে বলে উক্ত পত্রখানি থেকে সংশ্লিষ্ট অংশটুকু প্রকাশ করা হল। লেখক মিঃ রহমান পাকিস্তান সরকারের একজন ডেপুটি সেক্রেটারি এবং করাচীতে প্রতিষ্ঠিত 'নজরুল একাডেমী'র সম্পাদক। আলোচ্য পত্রে তিনি লিখেছেন "২৩।৫।৫৩ তারিখের "দেশে" প্রকাশিত আপনার প্রবন্ধ "কবি নজরুল ইসলাম" এইমাত্র পড়বার সুযোগ হলো। প্রবন্ধটি আমার ভালো লেগেছে। আপনি নজরুল সম্বন্ধে যা বলেছেন আমি সে সম্বন্ধে একমত। তবে এক বিষয়ে আমার মনে হয় আপনার একটু ভুল হয়েছে। আপনি লিখেছেন তিনি হাবিলদার হয়ে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে গিয়েছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের রণাঙ্গনে।"

"নজরুল ৪৯নং বাঙ্গালী পল্টনের সাধারণ সৈনিক রূপে করাচী আসেন —হাবিলদার হন ইহা সত্য।

"তবে তিনি ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের রণাঙ্গনে যাননি বলেই আমরা জানি। রণাঙ্গনের চিত্ত চাঞ্চল্যকর বিবরণ সম্বলিত সৈনিক বা হাবিলদার কবির লেখা পড়ে আমাদেরও পূর্ব্বে এই ধারণা ছিল যে নজরুল রণাঙ্গনে গিয়েছিলেন। তখন অনুসন্ধানে জানা গেছে যে নজরুল করাচীর বাইরে যাননি। ৪৯নং বাঙ্গালী পল্টনের হেড কোয়ার্টার ছিল করাচী সহরের পূর্ব্ব উপকণ্ঠে বর্ত্তমান আবিসিনিয়া লাইনে যাহা সে সময় 'গাজা লাইন' নামে পরিচিত ছিল। নজরুল কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল অফিসেই ছিলেন হাবিলদার হয়ে।

"আপনার সুলিখিত প্রবন্ধে যে সামান্য ত্রুটি চোখে পড়েছে অপরিচিত বন্ধু হিসাবেই তা আপনার গোচরীভূত করলাম। আশাকরি এতে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। মক্ষিকাবৃত্তির অঙ্কুশ তাডনায় নয় "মধুমিচ্ছন্তি বর্ব্বরা" নীতির অনুপ্রেরণাতেই উপরের ভুলটুকু প্রদর্শন করলাম—তা বোধহয় খুলে বলবার দরকার করে না।"

মীজানুর রহমান,
সেক্রেটারী, নজরুল একাডেমী, করাচী

সঙ্কলিত সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা থেকে (২০ বর্ষ, ৩৮শ সংখ্যা, শনিবার ২রা শ্রাবণ ১৩৬০, ইংরাজী ১৮ই জুলাই ১৯৫৩)

নজরুলের বংশলতা

কাজী আমীন্ উল্লাহ্

কাজী ফকির আহ্মদ

কাজী সাহেবজান | কাজী নজরুল | আলী হোসেন | কুলসুম (মেয়ে)

কাজী নজরুল:

কাজী কৃষ্ণ মহম্মদ (মৃত) | অরিন্দম খালেদ (বুলবুল, মৃত) | সব্যসাচী (সান-ইয়াৎ-সেন) | অনিরুদ্ধ (লেনিন)

সব্যসাচী (সান-ইয়াৎ-সেন):

ফিল্‌ফিল্ | মিষ্টি | বাবুল

অনিরুদ্ধ (লেনিন):

অনির্বাণ | অনুপম | পুঁটুরানী

ইস্‌লামী

তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ ,   ক্ষমা ক'রো হজরত্‌ ।
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ, তোমার দেখানো পথ ।
ক্ষমা করো হজরত ॥
বিলাস বিভব দলিয়াছ পায়, ধূলি-সম তুমি প্রভু,
তুমি চাহ নাই—আমরা হইব বাদ্‌শা-নওয়াব কভু ।
এই ধরণীর ধন সম্ভার
সকলের তাহে সম-অধিকার,
তুমি বলেছিলে, ধরণীতে সবে সমান পুত্রবৎ ॥

তোমার ধর্ম্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণা নাহি ক'রে
আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাঁই দিয়ে নিজ ঘরে ।
ভিন্‌ ধর্ম্মীর পূজা-মন্দির
ভাঙিতে আদেশ দাওনি, হে বীর,
আমরা আজিকে সহ্য করিতে পারিনাকো পরমত্‌ ॥

তুমি চাহ নাই ধর্ম্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি,
তল্‌ওয়ার তুমি দাও নাই হাতে দিয়াছ অমর-বাণী
মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা
সার করিয়াছি ধর্ম্মান্ধতা,
বেহেস্‌ত্‌ হ'তে ঝরে নাকো আর তাই তব রহমত ॥

১৩৫৪ যুগান্তর, শারদীয়

নজরুলের গান ও স্বরলিপি

নজরুলের যে গানগুলির স্বরলিপি এযাবৎ বিভিন্ন পুস্তকে সংকলিত হয়েছে তার একটি তালিকা দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় প্রকাশিত কুড়িটি পুস্তকে স্বরলিপিসহ গানগুলি আছে। স্বরলিপি পুস্তকগুলির, স্বরলিপি-কারের এবং প্রকাশকের নাম নিচে উল্লেখ করা হল এবং বাঁদিকের ক্রমিক সংখ্যাগুলি গানের তালিকায় ডান দিকে রেখে কোন গানের স্বরলিপি কোন বইটিতে আছে সেটা নির্দেশ করা হয়েছে। আর কোন স্বরলিপি পুস্তকের কথা আমার জানা নেই। যাঁরা স্বরলিপি ব্যবহার করেন তাঁরা যেন ছাপার ভুলগুলি স্বরলিপিকারদের কাছ থেকে সংশোধন করে নেবার প্রয়াস পান। নবরাগের দ্বিতীয় সংস্করণ ও বেণুকায় ছাপার ভুল কমই আছে, সুরলিপিও নির্ভুল। প্রবীণ নজরুল সংগীতবিদরা কিছু কিছু স্বরলিপি সম্পর্কে অভিযোগও করেছেন ব্যক্তিগত ভাবে। সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি পুস্তকে অন্য গীতিকারের গানও নজরুলের গান বলে ছাপা হয়েছে।

ক্রমিক সংখ্যা	বই-এর নাম	স্বরলিপিকার	প্রকাশক
১	সুরমুকুর	নলিনীকান্ত সরকার	ডি. এম. লাইব্রেরী
২	সুরলিপি	জগৎ ঘটক	,,
৩	নজরুল স্বরলিপি	,,	,,
৪	নজরুল সুর সঞ্চয়ন (১)	কাজী অনিরুদ্ধ	,,
৫	নজরুল সুর সঞ্চয়ন (২)	,,	,,
	(বলরে জবা বল)	,,	,,
৬	সুর-ছন্দিতা	,,	অনন্য প্রকাশক
৭	আনন্দ-সুন্দর	মনোরঞ্জন সেন	তপনকুমার সেন
৮	নবরাগ	জগৎ ঘটক	হরফ প্রকাশনী
৯	বেণুকা	,,	,,
১০	পটদীপ	নিতাই ঘটক	,,
১১	সুরমল্লার	বেচু দত্ত/অনিরুদ্ধ	,,
১২	গীতি-আলেখ্য	কাজী অনিরুদ্ধ	,,
১৩	নজরুল রাগ-বিচিত্রা ১ম	,,	,,
১৪	নার্গিস	,,	,,
১৫	সুরবাহার	কমল দাশগুপ্ত/ ফিরোজা বেগম	হরফ প্রকাশনী
১৬	সঙ্গীতাঞ্জলি ১ম	নিতাই ঘটক	জেনারেল প্রিন্টার্স
১৭	ঐ ২য়	,,	,,
১৮	সঙ্গীতাঞ্জলি ৩য়	নিতাই ঘটক	জেনারেল প্রিন্টার্স

ক্রমিক সংখ্যা	বইয়ের নাম	স্বরলিপিকার	প্রকাশক
১৯	সঙ্গীতাঞ্জলি ৪র্থ	নিতাই ঘটক	জেনারেল প্রিণ্টার্স
২০	নজরুল সুর সঞ্চয়ন (৩য়) (গোধূলী)	কাজী অনিরুদ্ধ	ডি. এম. লাইব্রেরী
২১	কারার ঐ লৌহ কপাট	,,	হরফ
২২	সুর ও বাণী	,,	,,
২৩	ঘর ভুলানো সুরে	বেচু দত্ত	,,

অঞ্জলী লহ মোর	সঙ্গতাঞ্জলি ১ম
অনেক কথা বলার মাঝে	ঐ ৪র্থ
অরুণকান্তি কে গো	নজরুল রাগ বিচিত্রা
অন্তরে তুমি আছ চিরদিন	সুর-ছন্দিতা
অনেক ছিল বলার যদি	ঐ
অগ্নিগিরি ঘুমন্ত উঠিল	বেণুকা
আজিকে তনু মনে লেগেছে	আনন্দ সুন্দর
আনন্দ সুন্দর ঘনশ্যাম	ঐ
আমি চাঁদ নহি অভিশাপ	ঐ
আমি আছি বলে	ঐ
আমি প্রেম পাগলিনী রাধা	ঐ
আর অনুনয় করিবে না কেহ	ঐ
আজকে গানের বান ডেকেছে	সঙ্গীতাঞ্জলি ১ম
আমার গানের মালা আমি	ঐ
আমার ঘরের মলিন দীপালোকে	ঐ
আমি যার নূপুরের ছন্দ	ঐ
আমি সুন্দর নহি	ঐ
আসিবে তুমি জানি প্রিয়	ঐ
আজি রক্ত নিশি ভোরে	ঐ ৩য়
আজ সকালে সূর্য্য ওঠা	ঐ ৩য়
আমি সন্ধ্যা মালতী বনছায়া	ঐ
আঁধারের এলোকেশ ছড়িয়ে	ঐ
আজ শ্রাবণের লঘু মেঘের	ঐ
আয় মা উমা	ঐ
আবার ভালবাসার সাধ জাগে	ঐ ৪র্থ
আমার নয়নে নয়ন রাখি	,,
আলগা করগো খোঁপার বাধন	,,
আমার উমা কই গিরিরাজ	,,
আজি দোল ফাগুনের দোল	সঙ্গীতাঞ্জলি ৪র্থ
আজি রক্ত নিশি ভোরে	কারার ঐ লৌহ কপাট

আজ ঘুম নহে নিশি জাগরণ	নজরুল স্বরলিপি
আমি কি সুখে লো গৃহে রব	,,
আমার গভীর জলের নদী	,,
আয় পাষণ্ড যুদ্ধ দে তুই	নার্গিস
আমার ভুবন কান পেতে রয়	,,
আয় বনফুল ডাকিছে মলয়	,,
আমাব যাবাব সময় হল	,,
আজি মনে মনে লাগে হোরী	সুরমল্লার
আমি কূল ছেড়ে চলিলাম	,,
আমি পথ মঞ্জরী ফুটেছি	বেণুকা
আসে রজনী সন্ধ্যামণির	,,
আমি প্রভাতী তারা	,,
আসে বে ঐ ভাবত আকাশে	কারার ঐ লৌহ কপাট
আবার কি এলরে বাদল	পটদীপ
আধখানা চাঁদ হাসিছে	,,
আরো কতদিন বাকী	,,
ইরাণের রূপ মহলের শাহজাদী	নবরাগ
ঈদ মোবারক হো	সুবছন্দিতা
উতল হল শান্ত আকাশ	আনন্দ-সুন্দর
উদার অম্বর দরবারে	বেণুকা
উচাটন মন ঘরে রয় না	সুরলিপি
এখনো ওঠেনি চাঁদ	আনন্দ-সুন্দর
এ ঘোর শ্রাবণ নিশি	,,
এ কি হাড়ভাঙা শীত	পটদীপ
এ দেবদাসীর পূজা লহ	,,
এই শিকল পরা ছল	কারার ঐ লৌহ কপাট
এ কি অপরূপ রূপে মা	কারার ঐ লৌহ কপাট
এলরে শ্রীদুর্গা	নজরুল সুর সঞ্চয়ন (৩য়)
এলরে এল ঐ রণরঙ্গিণী চণ্ডী	,,
এ কূল ভাঙ্গে ও কূল	নজরুল সুর সঞ্চয়ন (৩য়)
এস কল্যাণী চির আয়ুষ্মতী	পটদীপ
এল ঐ বনান্তে পাগল বসন্ত	সুরমল্লার
এলে কি শ্যামল পিয়া	নজরুল স্বরলিপি
এ আঁখিজল মোছ পিয়া	,, / সুরমুকুর
এই ভারতে নাই যাহা	কারার ঐ লৌহ কপাট
এই রাঙা মাটির পথে লো	নজরুল সুর সঞ্চয়ন
এই সুন্দর ফুল, এই সুন্দর ফল	সুর ও বাণী
এস শঙ্কর ক্রোধাগ্নি	নবরাগ

কোন সুদূরের চেনা বাঁশীর	সুরমুকুর
কোন দূরে ওরে যায় চলে	সুরলিপি
কোন বিদেশের নাইয়া	নার্গিস
কোন রস যমুনার কূলে	,,
কোন কূলে আজ ভিড়ল	নজরুল স্বরলিপি
কোথা চাঁদ আমার	সুরমুকুর
কোথায় গেলি মাগো আমার	বলরে·জবা বল
কল-কল্লোলে ত্রিংশ কোটি কণ্ঠে	কারার ঐ লৌহ কপাট
খড়ের প্রতিমা পূজিস	সঙ্গীতাঞ্জলি ২য়
খেলিছ এ বিশ্বলয়ে	বলরে জবা বল
খেলিছে জল দেবী	নজরুল সুরসঞ্চয়ন
খেলে নন্দের অঙিনায়	নবরাগ
খোল খোল গো আঁখি	নার্গিস
গগনে কৃষ্ণ মেঘ দোলে	সঙ্গীতাঞ্জলি ৩য়
গভীর রাতে জাগি	বেণুকা
গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়	সুর ও বাণী
গঙ্গা যমুনা নর্মদা	সুরলিপি
গরজে গম্ভীর গগনে	নজরুল স্বরলিপি
গাহে আকাশ পবন	সুব ছন্দিতা
গুল বাগিচার বুলবুলি	নার্গিস
গুঞ্জমালা গলে কুঞ্জে	নজরুল রাগ বিচিত্রা
গোধূলীর রঙ ছড়ালো	নজরুল সুরসঞ্চয়ন (৩য়)
ঘন ঘোর বরিষণ ডমরু বাজে	সুর ছন্দিতা
ঘর ছাড়া কে বাঁধতে এলি	সঙ্গীতাঞ্জলি ৩য়
ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি	নজরুল সুরসঞ্চয়ন
ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে	,,
ঘুমাও ঘুমাও দেখিতে এসেছি	সুরমল্লার
ঘুমিয়ে আছে শ্রান্ত তয়ে	আনন্দ-সুন্দর
চপল আঁখির ভাষায়	নবরাগ
চমকে চমকে ধীর ভীরু	সঙ্গীতাঞ্জলি ২য়
চল্ চল্ চল্	নজরুল স্বরলিপি
চাঁদনী রাতে মল্লিকা	নজরুল রাগ বিচিত্রা
চেয়োনা সুনয়না	পটদীপ
চিকন কালো বেদের	,,
চিরদিন কাহারো সমান	নার্গিস
চৈতালী চাঁদনী রাতে	নজরুল রাগ বিচিত্রা
চৈতালী চাঁদের আলো	সুরমল্লার
চোখ গেল পাখিরে	নজরুল সুরসঞ্চয়ন

চোখের নেশায় ভালবাসা	সঙ্গীতাঞ্জলি ১ম
ছন্নছাড়া বেদের দল	গীতি আলেখ্য
ছাড ছাড আঁচল বঁধু	নার্গিস
ছাড়িতে পরাণ নাহি চায়	সুরমুকুর
জংলা মায়ের জংলী	গীতি আলেখ্য
জহরৎ পান্না হীরার বৃষ্টি	সুর ছন্দিতা
জয় দুর্গা দুর্গতি নাশিনী	গীতি আলেখ্য
জয় হোক জয় হোক	সঙ্গীতাঞ্জলী ২য়
জয় মহাকালী	”
জয় রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা	”
জয় হরপ্রিয়া শিবরঞ্জনী	”
জয় দুর্গা জননী	আনন্দ সুন্দর
জয় ব্রহ্মবিদ্যা শিব সরস্বতী	বেণুকা
জনম জনম তব তরে	সঙ্গীতাঞ্জলি ৪র্থ
জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছিস	সুরবাহার
জাগো জাগো শঙ্খ চক্র	সঙ্গীতাঞ্জলি ২য়
জাগো মোহন জাগো কিশোর	আনন্দসুন্দর
জাগো হে রুদ্র	সঙ্গীতাঞ্জলি ৪র্থ
জাগো নারী জাগো	নজরুল স্বরলিপি
জাগো অনশন বন্দী	নজরুল সুরসঞ্চয়ন
জাগো অরুণ ভৈরব	নবরাগ
জাগো যোগমায়া মৃন্ময়ী	সুরলিপি
জানি জানি প্রিয়	নবরাগ
জাগ জাগ রে মুসাফির	সুরলিপি
জাতের নামে বজ্জাতি সব	কারার ঐ লৌহ কপাট
জানি জানি তার সে আঁখি	সঙ্গীতাঞ্জলি ৪র্থ
ঝর ঝর ঝরে শাওন ধারা	” ২য়। আনন্দ সুন্দর
ঝিলের জলে কে ভাসালে	বেণুকা
জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী	নজরুল সুরসঞ্চয়ন ৩য়
টলমল টলমল পদভরে	নজরুল স্বরলিপি
ডুবু ডুবু ধর্মা তরী	সুরমুকুর
ডাকতে তোমায় পারি যদি	সঙ্গীতাঞ্জলি ৪র্থ
তব মুখখানি খুঁজিয়া	পটদীপ
তব গানের ভাষায়	”
তরুণ প্রেমিক প্রণয় বেদন	সুরমুকুর
তরুণ অশান্তকে বিরহী	নজরুল রাগ বিচিত্রা
তিমির বিদারী অলখ	সঙ্গীতাঞ্জলী ২য়
তাপসিনী গৌরী	বেণুকা

তুমি আরেকটি দিন থাকো	নজরুল সুরসঞ্চয়ন ৩য়
তুমি সারা জীবন দুঃখ	সুরমল্লার
তুমি হাতখানি যবে রাখ	সুর ও বাণী
তুমি আমার সকাল বেলার	নজরুল সুরসঞ্চয়ন
তুমি সুন্দর তাই	নবরাগ
তুমি শুনিতে চেওনা আমার মনের কথা	সুর ও বাণী
তুমি ভোরের শিশির	সুরলিপি
তুমি যে হার দিলে	সঙ্গীতাঞ্জলি ৪র্থ
তুমি আঘাত দিয়ে মন ফেরাবে	সুর ও বাণী
তুমি দিলে দুঃখ	,,
তুমি যতই দহনা	ঐ ৩য়
তুই কালী মেখে	ঐ ১ম
তুই বলহীনের বোঝা	সুরবাহার
তুই পাষাণ গিরির মেয়ে	,,
তোরই নামের কবচ	,,
তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে	সুর ও বাণী
তোর কালো রূপ দেখতে	বলরে জবা বল
তোর রাঙা পায়ে	পটদপী
তোমারি আঁখির মত	,,
তোমার হাতের সোনার	সঙ্গীতাঞ্জলি ১ম
তোমার বিনা তারের গীতি	সুর ও বাণী
তোমার কূলে তুলে	সুরলিপি
তোমার মহাবিশ্বে কিছু	সুরছন্দিতা
তোমার বুকের ফুলদানিতে	নার্গিস
তোমার কুসুম বনে	সঙ্গীতাঞ্জলি ৩য়
ত্রিভুবনের প্রিয় মোহম্মদ	পটদীপ
থির হয়ে তুই বস	সুরবাহার/বলরে জবা বল
থৈ থৈ জলে ডুবে	নার্গিস
দক্ষিণ সমীরণ সাথে	বেণুকা
দাও সহ্য দাও ধৈর্য	,,
দাঁড়ালে দুয়ারে মোর	সুরলিপি/সঙ্গীতাঞ্জলি ১ম
দিনের সকল কাজের মাঝে	অনন্দ সুন্দর। সঙ্গীতাঞ্জলি ৩য়
দিতে এলে ফুল প্রিয়	সঙ্গীতাঞ্জলি ১ম
দীপ নিভিয়াছে ঝড়ে	নার্গিস
দীনের হাতে দীনদুঃখী	সুরবাহার
দুর্গম গিরি কান্তার মরু	সুরমুকুর
দুধে আলতায় রঙ	সুরলিপি
দূর দ্বীপবাসিনী	নজরুল সুরসঞ্চয়ন

দে দোল্ দে দোল	কারার ঐ লৌহ কপাট
দেখে যারে রুদ্রাণী মা	আনন্দ সুন্দর
দেবযানীর মনে প্রথম	নবরাগ
দেশ গৌড় বিজয়ে	বেণুকা
দোল ফাগুনের দোল	আনন্দ-সুন্দর
দোলে নিতি নবরূপে	নজরুল রাগবিচিত্রা
দোলন চাঁপা বনে দোলে	নবরাগ
দোপাটি লো লো করবী	সুরলিপি
ধূলি পিঙ্গল জটাজুট	নবরাগ
নমঃ নমঃ নমো বাঙলাদেশ মম	কারার ঐ লৌহ কপাট
নহে নহে প্রিয় এ নহে	নজরুল স্বরলিপি
নন্দ লোক থেকে আনন্দ লোক	সুরবাহার
নন্দদুলাল নাচে	বল রে জবা বল
নয়ন ভরা জল গো	নজরুল সুরসঞ্চয়ন
নন্দলোক হতে আমি	বলরে জবা বল
নদীর নাম সই অঞ্জনা	সুর ছন্দিতা
নদীর স্রোতে মালার	সঙ্গীতাঞ্জলি ৩য়
নয়ন মুদিল কুমুদিনী	নজরুল রাগবিচিত্রা
নন্দন বন হতে কে গো	নজরুল সুরসঞ্চয়ন (৩য়)
নাচে সুনীল দরিয়া	সুর ছন্দিতা
নাই চিনিলে আমায়	সঙ্গীতাঞ্জলী ৩য়
নাচের নেশায় ঘোর	সুর ও বাণী
নাচো শ্যাম নটবর	ঐ ৩য়
না মিটিতে সাধ মোর	সুরলিপি
নাইয়া ধীরে চালাও	সুরমল্লার
নারায়ণী উমা	বেণুকা
নাচিয়া নাচিয়া এস	বল রে জবা বল
নিম ফুলের মউ	গীতি আলেখ্য
নিশি নিঝুম ঘুম	নজরুল রাগবিচিত্রা
নিশি ভোরের বেলায়	গীতি আলেখ্য
নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে	সঙ্গীতাঞ্জলি ২য়
নিশীথ রাতে ডাকলে	ঐ ৩য়
নিশি কাজল শ্যামা	আনন্দ-সুন্দর
নিশি ভোর হল জাগিয়া	সুরমুকুর
নিশি না পোহাতে	সুরলিপি
নিশি ভোরে অশান্ত	পটদীপ
নিশি পবন নিশি পবন	সুরমল্লার
নীল যমুনা সলিল কান্তি	বেণুকা

নীলৎপল নয়না নীলবর্ণা	সঙ্গীতাঞ্জলি ২য়
নৃত্যময়ী নৃত্যকালী	আনন্দ-সুন্দর
নূরজাহান নূরজাহান	নজরুল সুর সঞ্চয়ন
পরদেশী মেঘ যাওরে	সুর ছন্দিতা
পথ চলিতে যদি	নার্গিস
পথ হারা পাখী	নজরুল সুরসঞ্চয়ন
পদ্মার ঢেউরে	,,
পদ্মদীঘির ধারে ধারে	সুরমল্লার
পলাশ ফুলের মৌ	,,
পরমাত্মা নহ তুমি	পটদীপ
পরদেশী বঁধু ঘুম	আনন্দ-সুন্দর
পথিক ওগো চলতে পথে	সুরমুকুর
প্রণমামি শ্রীদুর্গে নারায়ণী	সুরবাহার / সঙ্গীতাঞ্জলি ২
পর জনমে দেখা হবে	সুরমুকুর
পরো পরো চৈতালী	সঙ্গীতাঞ্জলি ৪র্থ
পায়েলা বোলে রিনিঝিনি	নবরাগ
পাশে জ্যোছনাতে কে	সুরলিপি
পাষাণে ভাঙাল ঘুম	ঘর ভুলানো সুরে
পাষাণ গিরির বাঁধ টুটে	আনন্দ-সুন্দর
পায়ে বিঁধেছে কাটা সজনী	সঙ্গীতাঞ্জলি ৪র্থ
প্রভাত-বীণা তব বাজে	আনন্দ-সুন্দর
প্রথম প্রদীপ জ্বালো	নজরুল রাগবিচিত্রা
প্রজাপতি প্রজাপতি	সুরছন্দিতা
পিয়া স্বপনে এলো নিরজনে	সুর ও বাণী
পেয়ে কেন নাই পাই	সঙ্গীতাঞ্জলি ৪র্থ
পেয়ে আমি হারিয়েছি	
পুঁথির বিধান থাক	ঐ ২য়
পিউ পিউ পিউ বোলে	সুরলিপি
পরি জাফরাণী ঘাঘরি	নজরুল সুরসঞ্চয়ন (৩য়)
ফাগুন রাতের ফুলের	নজরুল স্বরলিপি
ফিরে গেছে সই এসে	সঙ্গীতাঞ্জলি ৩য়
ফিরে আয় ঘরে	নার্গিস
ফুল ফাগুনের এল	সুরমল্লার
ফুটিল মানস মাধবী	সঙ্গীতাঞ্জলি ১ম
ফুলের জলসায় নীরব কেন	নজরুল সুরসঞ্চয়ন
বকুল চাঁপার বনে কে	সঙ্গীতাঞ্জলি ৪র্থ
বধু তোমার আমার এই	নজরুল রাগবিচিত্রা
বনে যায় আনন্দ দুলাল	বেণুকা



শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	যা আছে	যা হবে
১৩	৩৩	যেখানে	সেখানে
১৬	২০	হামিজুল	হামিদুল
২১	২৩	পলায় যানে	পলায় আকাশ পানে
৩৮	২৩	বিদেশে পলাতক	বৃটিশ সরকার ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে ভারতবর্ষ থেকে বহিস্কৃত করে।
৪৩	১৫-১৯	ছবির গতিটা ছিল...... পদ্ম ফুটে উঠছে	উদার আকাশে জ্বল জ্বল করছে তারা, গতিশীল ধূমকেতু তার ল্যাজে চাবুক উঁচিয়ে তাড়া করে চলেছে গ্রহ উপগ্রহকে। ১
৪৫	২৭	"বঙ্কিমপ্রসাদ"	"বঙ্কিম প্রসঙ্গ"
৫২	২৬	"আসচিন"	"আর্সটোন"
৫৩	১১	ধবল কুষ্ঠ	ধবল কুষ্ঠি
৫৭	২০	ছিঁড়িছে বন্ধন	ছিঁড়িতে বন্ধন
৫৮	১৯	হুগলী জেলে পাঠিয়ে	হুগলী জেলে না পাঠিয়ে
৬৪	৩২	একটি নোটিশ	একটি নাটক
৬৫	২৯	ইন্দু প্রয়াস	ইন্দু প্রয়াণ
৭৪	৮	মিসেস এস্ রহমান	মিসেস এম্ রহমান
৭৫	১৬	"জটাটরী	"জটাটবী
৭৬	৩১	ক্ষুর হানা মেয়ে	ক্ষুর হানা মেঘে
৭৭	২০	আমি তাই পূরের হাওয়া	আমি ভাই পূবের হাওয়া
৮২	২৪	হাতে নিয়ে রব বেণু	হাতে নিয়ে রবাব বেণু
৯৪	২১	বন কে এলরে ভাই	বন কে বলে রে ভাই
৯৮	৯	মরু ভাঙা হাল	মরু ভাঙা হল
১১০	১৪	স্নেহের বষ্টন	স্নেহের ব্রজ
১২৭	২০	১৮১৮ সালের ঘটনা	১৯১৮ সালের ঘটনা
১৪১	১২	উৎস সুখ উন্মুখ	উৎসুক-উন্মুখ
১৬১	২১	বেসুর হিয়া	বেণুর হিয়া
১৬৫	২৯	অরিন্দম খালেদ নামে তৃতীয় পুত্রের	দ্বিতীয় পুত্রের
১৭০	৭	কীর্তনের আসর	কীর্ত্তনের আখর
১৭২	৩০	তখ্‌তে তখত্‌ পশীন	তখ্‌তে তখ্‌ত্‌নশীন
১৭৩	২৩	দিলে কত বিপুল চেতনা	দিলে এ কী-এ বিপুল চেতনা

(১) ৪৩ পৃঃ ১৫-১৯ লাইনে যে বর্ণনা করা হয়েছে সেটা ভুল। নজরুলের জেল হলে অমরেশ কাঞ্জিলাল "সারথি" অর্থাৎ সম্পাদক হন। কাঞ্জিলালের জেল হলে নজরুলের শ্যালক বীরেন সেনগুপ্ত সারথি না লিখে সম্পাদক লেখেন ও প্রচ্ছদপট পরিবর্তন করে ধূমকেতু প্রকাশ করেন। এখানে ভুলক্রমে বীরেনবাবুর প্রচ্ছদের বর্ণনা করা হয়েছে।

পৃষ্ঠা	লাইন	যা আছে	যা হবে
১৮০	৩২	মামা ধরা যত	জামা ধরা যত
১৮১	২৬	যতীন আসত ঐ	যতীন আগত ঐ
১৮৮	১৪	মাহে হোস্‌ন্‌ আব	মাহে হোস্‌ন্‌ আজ
,,	১৫	জনখ্‌দা—নেওমা	হে জনখ্‌দা—নেওমা
,,	১৭	কুপ থেকেই	কূপ থেকেই
,,	১৮	ঘেমটা-হীন	ঘোমটা-হীন
,,	৩০	হাত হাতে মোর	হাত্‌ হতে মোর
,,	৩০	হৃদয় বায়	হৃদয় যায়
১৮৯	২	চোরাইলি্‌ ফের	চোরাই দিল্‌ ফের
,,	৪	বোখরায়	বোখারায়
১৯০	১৬	রসজ	রযজ্‌
১৯১	৮	সরাীত্র	সরাীএ
,,	১৯	মস্‌তফ্‌ আলুন	মস্‌তফ্‌ আয়লুন
১৯২	২১	ঐ	ঐ
,,	১৫	পয়াফের	ওয়াফের
১৯৭	১৬	আদেশ	আবেশ
২০১	৪	ফিঙে ফুল	ফিঙে-কুল
২১০	৩৩	অগ্নিবীণা হল ব্রহ্ম-কিশোরের বেণু	অগ্নিবীণা হল ব্রজ-কিশোরের বেণু
২২২	১	কবির এই অনুবাদ করছেন	কবির বই অনুবাদ করছেন
২৩৭	৩৫	তাই তব বহুমত	তাই তব রহমত
২৪২	১৬	শম্‌শের আঁশু আঁখে	শম্‌শের হাতে আঁশু-আঁখে
,,	১৭	শাতিল-হাতে আরব	শাতিল আরব
২৫০	২৯	রিফ-সুর্বারের	রিফ্‌-সর্দারের
২৫১	৮	খোদা বরাহে	খোদার রাহে
২৬০	১০	যা আছে থাক না চুলায়	যা আছে যাক না চুলায়
২৬১	৯	মন্দির কোথা নাম	মন্দির কাবা নাই
২৬৭	১৩	জপি আমি শ্যামা নাই	জপি আমি শ্যামের নাম
২৭৬	৩৩	"গান ভাঙার গান"	"ভাঙার গান"
ফুট নোট			
২৮০	৬	'ফিস্‌ফানা'	'ফিল্‌ফানা'
২৯৯	২৯	দন্ত-অসুর গ্রামচ্যুত	দন্ত-অসুর গ্রাসচ্যুত
৩০০	২	গ্রামচ্যুত	গ্রাসচ্যুত
৩০১	১৪	বুড়িগঙ্গার পুলিন বুকে বাঁধছে খাঁটি	বুড়িগঙ্গার পুলিন বুকে বাঁধছে ঘাঁটি
৩০২	১৭	"কোর আর্টস্‌"	"ফোর আর্টস্‌"

নির্ঘণ্ট